দ্য কিংডম
অব
আউটসাইডারস
(ইহুদি দখলদারিত্ব, সন্ত্রাসবাদ ও
মোসাদ সাম্রাজ্যের ইতিবৃত্ত)
সোহেল রানা

দ্য কিংডম অব আউটসাইডারস

সোহেল রানা

প্রকাশকের কথা

জায়োনবাদীরা ধর্ম ও পূর্বসূরিদের এক কাল্পনিক প্রতিশ্রুতির দোহাই দিয়ে ভূমি দখলের এক ঘৃণ্য অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এ জন্য তারা আন্তর্জাতিক আইন তো দূরের কথা, নিজেদের ধর্মীয় নিয়মেরও কোনো তোয়াক্কা করছে না। তাদের একটাই মিশন– ভূমিদখল। ইতোমধ্যে তারা পশ্চিমা দেশগুলোর পূর্ণ মদদে মুসলিমবিশ্ব তথা আরব দেশগুলোর অনৈক্য ও দুর্বলতার সুযোগে জেঁকে বসেছে ফিলিস্তিনিদের ভিটেমাটির ওপর। ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে একটি অবৈধ রাষ্ট্রও গঠন করে ফেলেছে; অথচ তারা সেখানে বহিরাগত ও আশ্রিত।

তরুণ লেখক সোহেল রানা তুলে নিয়ে এসেছেন– কীভাবে বহিরাগতরা ফিলিস্তিনিদের ভূমি দখল করে সাম্রাজ্য তৈরি করছে। লেখকের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি জনাব শাহাদত হোসেন স্যারকে, যিনি ভূমিকা লিখে দেওয়ার মাধ্যমে বইটিকে আরও ঋদ্ধ করেছেন।

পাঠকরা এই বই থেকে সমৃদ্ধ জ্ঞান অর্জন করতে পারবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২০

লেখকের কথা

'ইহুদিবাদ' নামের রাজনৈতিক আন্দোলন এক অপ্রতিরোধ্য প্রাচীরে পরিণত হয়েছে। এর পেছনে যেমন আছে মিথলজি, তেমনি আছে ইতিহাসের অসত্য, অর্ধসত্য ও বিকৃত উপস্থাপনা। শত শত বছরের চেষ্টায় ইহুদিরা নিজেদের মতো করে জাতিসত্তার একটি ইতিহাস দাঁড় করাতে পেরেছে, যার রক্ষাকবচ খোদ 'বাইবেল'। এর বাইরে গিয়ে যারা ইতিহাস চর্চা করেছেন, ইহুদিদের বর্ণিত ইতিহাসের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন, তারা ইজরাইলের মূল ধারায় চিহ্নিত হয়ে আছেন 'নিউ হিস্টোরিয়ান' নামে। ইহুদি সমাজে তাদের দেখা হয় 'বাতিল' হিসেবে।

পশ্চিমা মিডিয়া আর ক্রিশ্চিয়ান জায়োনিস্টদের সমর্থন-প্রোপাগান্ডা প্যালেস্টাইনে (ফিলিস্তিন) 'ইজরাইল' নামক এক দানবের উপাখ্যান তৈরি করেছে। যে পশ্চিমের অর্থ ও অস্ত্রের জোরে 'ইহুদিবাদ' হতে পেরেছে প্রতিষ্ঠিত, কালের পরিক্রমায় জনমতের বিরুদ্ধে ক্ষমতায় টিকে থাকার বাস্তবতায় সেই পশ্চিমাদেরই হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছেন ইহুদিদের কথিত 'ঐতিহাসিক শত্রু' আরব শাসকরা। ১৯৪৮, ৫৬, ৬৭ ও ৭৩ এ ফিলিস্তিনিদের হয়ে ইজরাইলের বিরুদ্ধে লড়াই করা মিশর, জর্ডান ও সৌদি আরবের এখনকার শাসকগণ নতুন চমক দেখাচ্ছেন। মধ্যপ্রাচ্যে ইজরাইলের দৃশ্যত প্রধানতম শত্রু শিয়া ইরানকে ঠেকাতে সৌদি-মিশর-আমিরাত অক্ষ ইজরাইল ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ছে। আর তাতে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বাস্তবতা দিনকে দিন হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে। কাজেই এককালে আরব জাতীয়তাবাদের যে গালগল্প তাদের শাসকদের কাছ থেকে শোনা যেত, তারই কফিন এখন উত্তরসূরিদের কাঁধে। জাতীয়তাবাদের মোড়কে হিরোইজমের পরীক্ষায় তারা হেরে গেছেন ইহুদিবাদের কাছে। '৪৮-এর যুদ্ধেই কচুকাটা হয়েছে আরব জাতীয়তাবাদ, আর রাষ্ট্র হিসেবে টিকে গেছে দখলদার 'ইজরাইল'।

১৯৪৮-এর প্রথম আরব-ইজরাইল যুদ্ধে আরবদের পরাজয় আর ইজরাইল রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন নিয়ে বিস্তর আলোচনা-গবেষণা হয়েছে। ইংরেজি, হিব্রু ও আরবি ভাষায় শত-সহস্র বই বেরিয়েছে। এসব বইয়ে আলোচনার বড়ো একটা অংশ জুড়েই থেকেছে 'ইহুদিবাদ'। তবে, বাংলা ভাষায় এ নিয়ে মৌলিক বই একেবারে হাতেগোনা। এখানকার বেশিরভাগ বইতেই ইজরাইল-ফিলিস্তিন সংকট স্থান পেয়েছে বেশ বড়ো পরিসরে। কিন্তু 'ইহুদিবাদ' ঘিরে যে বৈশ্বিক রাজনীতি আর অর্থনীতির মারপ্যাঁচ– সেই আলোচনা গুরুত্ব পেয়েছে সামান্যই। তাই এই বইটিতে পূর্ণাঙ্গভাবে ইহুদিবাদকে ব্যবচ্ছেদ করার চেষ্টা করেছি।

কীভাবে ইহুদি জাতীয়তাবাদের সূচনা হলো? প্রাচীন আমলে ইহুদি নির্যাতন ও বিতাড়নের কাহিনিগুলো কি সাজানো মিথ? নাকি বাস্তবেই এমন কিছু ঘটেছে? কীভাবে জায়োনিস্টরা আরব ভূখণ্ডে স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েম করে ফেলল? আরবরা কেন ইউরোপ-আফ্রিকা ছেড়ে আসা শরণার্থীদের চাপ ঠেকাতে পারেনি? পশ্চিমারা কেনই-বা বলপূর্বক এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বৈধতা দিয়ে দিলো? কট্টর ইহুদিবাদের পেছনে কারা ঢালছে কাড়ি কাড়ি অর্থ? তাতে কার কী স্বার্থ? সহজ ও প্রচলিত শব্দচয়ন আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্য বিন্যাসের মাধ্যমে এসব প্রশ্নের জুতসই উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে বইটিতে।

এতে ইজরাইলি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের দুর্ধর্ষ কিছু অভিযানের বর্ণনা আছে, আছে ব্যর্থতার গল্পও। বিতর্কিত রথসচাইল্ড পরিবার কীভাবে বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করছে? হামাস নেতা খালিদ মেশাল মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরেছেন কীভাবে? ইয়াসির আরাফাতের মৃত্যু কি স্বাভাবিক ছিল? নাকি তাকে হত্যা করা হয়েছে? হলোকাস্টের মতো তিক্ত অভিজ্ঞতার পর কীভাবে জোড়া লাগে ইজরাইল-জার্মান সম্পর্ক? ইরাক, মিশর ও সিরিয়ার পরমাণু কর্মসূচির পরিণতি কী হয়েছিল? ইরানি পরমাণু প্রকল্পে কারা সাইবার হামলা চালিয়েছিল? ইহুদি সন্ত্রাসবাদের বিপরীতে আরবদের সশস্ত্র প্রতিরোধ কেন ব্যর্থ হলো? সবই আলোচনায় এসেছে। আছে দুই ফিলিস্তিনি সশস্ত্র সংগঠন– হামাস এবং পিএল'র উত্থানের গল্প, আছে ইজরাইলি দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে হামাসের প্রতিরোধ যুদ্ধের খবর। বইটি ইতিহাস আশ্রিত হলেও এতে ইহুদিবাদকে ঘিরে থাকা আন্তর্জাতিক রাজনীতি, কূটনীতি ও সম্পর্কের ভাঙা-গড়া ফুটিয়ে তোলা হয়েছে অনেকটা গল্পের মতো করে। আর দেখানো হয়েছে ইহুদিবাদের কারণ, প্রভাব ও বিস্তার। গুরুত্ব পেয়েছে ভূ-রাজনীতি ও প্রতিরক্ষা পরিস্থিতি। তবে এই বইয়ের মূল উদ্দেশ্যেই হলো ইহুদিরা প্যালেস্টাইনকে তাদের ভূখণ্ড দাবি করার পেছনে যেসব যুক্তি ও ঐতিহাসিক তথ্য তুলে ধরছে, সেগুলোর যথার্থতা পরীক্ষা করা।

শিক্ষা দেওয়ার কথা ছিল ইহুদিদের, উলটো শিক্ষা পেল আরবরাই। প্রথম আরব-ইজরাইল যুদ্ধের পর দেখা গেল আরবদের বিপরীতে ইহুদিরা আরও শক্তিশালী হয়েছে। ইজরাইল রাষ্ট্রের ভূখণ্ড আরও বেড়েছে। ৬৭-এর ছয়দিনের যুদ্ধেও তারই ধারাবাহিকতা দেখা গেল। এর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে '৭৩-এর ইয়োম কাপুর যুদ্ধেও গোহারা হারে আরবরা। এভাবেই ইহুদি ভূখণ্ডের কলেবর বাড়তেই থাকে। ইজরাইলের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ লড়াইয়ের ডাক দিলেও আরব শাসকদের অনৈক্য, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব আর একে অন্যকে ছাড়িয়ে যাওয়ার হিংসুটে প্রতিযোগিতার বলি হয় ফিলিস্তিনিরা।

হাইস্কুলের ছাত্র থাকাকালীন আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রতি আমার একটা বিশেষ দুর্বলতার জায়গা তৈরি হয়। ইরাক-আফগান যুদ্ধ আর প্যালেস্টাইন সংকটের খবর দেখার জন্য সে সময়টাতে টিভির পর্দায় একরকম মুখিয়ে থাকতাম। স্কুলের আঙিনায় বন্ধুদের সাথে

আড্ডা হতো ইয়াসির আরাফাত, সাদ্দাম হোসেন, ওসামা বিন লাদেন, বুশ আর গাদ্দাফিকে নিয়ে। এই আড্ডার উসকানিদাতা (!) ছিল আমারই প্রিয় বন্ধু অমিত চন্দ্র পাল। প্রতিদিনই আমাকে আপডেট থাকতে হতো। কারণ, অমিতের সাথে দেখা হলেই একগাদা প্রশ্ন– নাসিরিয়া আর বসরায় কি আমেরিকানরা হারবে? সাদ্দাম কোথায় পালাল? তিকরিতে না বাগদাদে? কিরকুকের তেলের খনিগুলোর কী হবে? তালেবানরা কি আবার কাবুল দখল করে নেবে? বলা যায়, এভাবেই আন্তর্জাতিক রাজনীতির একনিষ্ঠ অনানুষ্ঠানিক ছাত্র হিসেবে আমার অভিষেক। সেই সূত্রে অনেকের মতো আমারও 'ইহুদিবাদ' সম্পর্কে জানার আগ্রহ ছিল বা আছে। কিন্তু এ নিয়ে বই লিখব, সেই ভাবনা কখনোই আসেনি।

'ইহুদিবাদ' নিয়ে বই লেখার পরামর্শটি দেন ফেসবুকভিত্তিক বইপড়ুয়াদের সংগঠন, পাঠশালার (পাঠশালা : সেন্টার ফর বেসিক স্টাডিস) সমন্বয়ক শ্রদ্ধেয় শাহাদত হোসেন। তাঁরই অনুপ্রেরণায় হাত দেই বইয়ের পাণ্ডুলিপি রচনায়। আর এই কাজটি করতে গিয়ে আমাকে গত আড়াই বছরে চার ডজনেরও বেশি বিদেশি বই, শত শত আর্টিকেল/ডকুমেন্টারি, বেশ কিছু মুভি পড়তে ও দেখতে হয়েছে। বইয়ের কাজে হাত দেওয়ার একেবারে শুরুর দিকেই গার্ডিয়ানের নূর মোহাম্মদ ভাইয়ের সাথে আলোচনা হতো। তিনি আমাকে সব ধরনের লজিস্টিক সাপোর্ট দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। নূর ভাইসহ পুরো গার্ডিয়ান পরিবারের প্রতি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা, শেষ পর্যন্ত তারা আমার অগোছালো লেখাগুলো বইয়ে রূপ দিতে পেরেছেন বলে।

বইটি রচনা করতে গিয়ে অনেকেই এই অধমকে বুদ্ধি, পরামর্শ ও তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন। আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ পাঠশালার মাহমুদুল হাসান ফয়সাল ও লিবিয়া প্রবাসী লেখক মোজাম্মেল হোসেন ত্বোহার নিকট। এ ছাড়াও পাঠশালার আসিফ আহমেদ, শারমিন আক্তার, মরিয়ম মুন্নী, তামান্না অনি, মোহসীনা মহুয়া, মেহেজাবিন মাহবুব, জহিরুল ইসলাম পলাশ, রায়হান আতাহার, কবি ওয়াসিম হক, মেহেদি আরিফ, রেসমি কাকলি, বন্ধু শরীফ, জামাল, ইমরুল, নাজমুল ও ছোটোভাই জুয়েল ও শিহাব উদ্দিনসহ যারা যারা আমাকে উৎসাহ জুগিয়েছেন– সবার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

প্রত্যেকেরই নিজস্ব দর্শন রয়েছে। লেখকদেরও। ইতিহাস রচনার সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ হচ্ছে লেখককে নিজ দর্শন/দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বেরিয়ে এসে সঠিক তথ্য প্রকাশ করে দেওয়া। বেশিরভাগ লেখকই অতীতে এটা করেননি অথবা করতে পারেননি। বাস্তবতা হলো- ইতিহাস বিজয়ীদের হাত দিয়েই তৈরি হয়। আর হেরে যাওয়া পক্ষের কথা-কর্ম নিক্ষিপ্ত হয় আস্তাকুঁড়ে। তবে এই বইটিতে নিরপেক্ষ উপস্থাপনার যথেষ্ট চেষ্টা ও উদ্যোগ ছিল। তারপরেও বইয়ের কোনো তথ্য বিভ্রান্তিকর, অসত্য ও অনুমাননির্ভর মনে হলে তার সংশোধন হোক আপনাদের পরামর্শেই। পাঠকদের তুলে ধরা ভুল-ত্রুটির সংশোধন আর নতুন নতুন তথ্য নিয়ে আসব পরবর্তী সংস্করণে। ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকুন।

১

পশ্চিম তীরের রামাল্লা থেকে প্রায় আড়াই মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমের শহর 'রাফাত'। এর ১১ কিলোমিটার দক্ষিণেই পবিত্র নগরী জেরুজালেম। ১৯৪৭-৪৯-এর দিকে ইহুদি মিলিশিয়া ও মিলিটারির হাতে যে ডজনখানেক ফিলিস্তিনি শহর ও পাঁচশোর মতো গ্রাম ধ্বংস কিংবা বেদখল হয়, তারই একটি রাফাত। প্রথম আরব-ইজরাইল যুদ্ধকালে এক অস্ত্রবিরতি (১৯৪৯) চুক্তির মাধ্যমে এই এলাকায় জর্ডানের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলেও পরবর্তী সময়ে ছয়দিনের যুদ্ধে (১৯৬৭) আবারও এর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় ইজরাইল। এই রাফাতেরই এক হতদরিদ্র পরিবারে জন্ম ইয়াহিয়া আয়াশের। সময়টা ছিল ১৯৬৬ সালের ২২ মার্চ।

রাফাত তখন কেবলই একটি গ্রাম। আয়াশের বাবা আব্দুল আল লতিফ ছিলেন সেখানকার সামান্য এক মুদি দোকানি। ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় উচ্চ শিক্ষা নিতে চেয়েছিলেন লাজুক ও শান্ত স্বভাবের আয়াশ। ভর্তি হয়েছিলেন রামাল্লার বিরজেইত ইউনিভার্সিটির (Birzeit University) ইলেকট্রিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে। সে সময় বিরজেইতের ক্যাম্পাস ছিল ফিলিস্তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের আঁতুরঘর। একসময় ইজরাইলি কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়টির একাডেমিক কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। গ্রাজুয়েশন করতে আয়াশ এবার যেতে চাইলেন জর্ডানে, কিন্তু দখলদার ইজরাইলের তরফ থেকে অনুমতি মিলল না। প্রথম ইন্তিফাদা শুরু হলে, তিনি চিঠি লিখলেন ইজ্জেদিন আল কাসেম ব্রিগেডের মার্টায়ার শাখাকে। হামাসের সশস্ত্র শাখা এটি। আত্মঘাতী হামলা চালিয়ে কীভাবে ইহুদিদের কাবু করা সম্ভব, চিঠিতে তারই ব্লু প্রিন্ট ছিল। একসময় আয়াশ জড়িয়ে গেলেন কাসেম ব্রিগেডের সঙ্গে। তার কমান্ডে নতুন উদ্যমে ইহুদি স্বার্থগুলোতে আঘাত হানতে শুরু করল মার্টায়ার শাখা।

ছদ্মবেশ ধারণে এই ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামীর ছিল বিশেষ দক্ষতা। প্রতিদিনই নতুন নতুন পোশাক আর বেশভূষায় তাকে দেখা যেত। কখনো দেখা যেত ইহুদি সেটেলারের ভূমিকায়, আবার কখনো তেলআবিবের রাস্তায় বিদেশি কূটনীতিকের বেশে। কোনো বাড়িতে এক রাতের বেশি ঘুমাতেন না। এই দুর্ধর্ষ হামাস কমান্ডার আয়াশ সম্পর্কে আইজ্যাক রবিন একবার মন্তব্য করেছিলেন–

'I am afraid, he might be sitting between us here in the Knesset.'[১]

আয়াশ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বোমা বানাতে পারতেন। সেই বোমার কতটা নিখুঁত বিস্ফোরণ সম্ভব, তাও বলে দিতেন সহযোদ্ধাদের। এ জন্যই তাকে বিশেষ উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল– 'দ্য ইঞ্জিনিয়ার'। হামাসের প্রথম আত্মঘাতী হামলাকারী ছিল রায়েদ জাকারনেহ। তার মতো আরও অনেক তরুণকে দিয়ে ইজরাইলি শিবিরে কাঁপন ধরাতে সক্ষম হয়েছিলেন আয়াশ।

---

[১]. Inside Hamas: The Untold Story of the Militant Islamic Movement, Zaki Chehab, page-55.

১৯৯৪ সালের অক্টোবরের উনিশ তারিখ। তেলআবিব স্কয়ারের কাছে এক আত্মঘাতী বোমার বিস্ফোরণ ঘটে। হামলাকারী ফিলিস্তিনি যুবক সালেহ নাজাল। তাতে ২২ ইজরাইলি নিহত ও ৪৮ জন আহত হয়। এই হামলা ইজরাইলের অস্তিত্ব ও নিরাপত্তাকে চ্যালেঞ্জের মুখে ছুড়ে দেয়। দেশটির প্রধানমন্ত্রী আইজ্যাক রবিন লন্ডন সফর সংক্ষিপ্ত করে দেশে ফিরতে বাধ্য হন। তার উপস্থিতিতে শীর্ষ গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের জরুরি বৈঠক বসে। সিদ্ধান্ত হয়– আয়াশকে যেকোনো মূল্যে সরিয়ে দিতে হবে!

৯৪-৯৫ সালের দিকে ইজরাইলের ওপর নয় দফা বোমা হামলার জন্য দায়ী করা হয় কমান্ডার ইয়াহিয়া আয়াশকে। এসব হামলায় নিহত হয় অর্ধ শতাধিক ইজরাইলি। এরপরই তাকে খতম করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত আসে। আয়াশকে হত্যার জন্য মৃত্যু পরোয়ানায় (Red page) সই করেন আইজ্যাক রবিন। অপারেশন সাকসেসফুল করার দায়িত্ব পড়ে ইজরাইলি নিরাপত্তা সংস্থা- শিনবেত কর্মকর্তা ইজরাইল হ্যাসনের (Yisrael Hasson) ওপর। হ্যাসনকে এই দায়িত্ব দেন শিনবেতপ্রধান ইয়াকভ পেরি (Yaakov Peri)। হ্যাসন অবশ্য গড়িমসি করছিলেন, তবে তার শর্ত মেনে নেওয়া হলে দায়িত্ব নিতে সে রাজি হয়ে যায়।

কী সেই শর্ত?

আয়াশ হত্যার মিশনে তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে; খোদ প্রধানমন্ত্রী কিংবা শিনবেতপ্রধানও তাতে হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না।

জবাবে শিনবেতপ্রধান হ্যাসনকে বললেন–

> 'Yisrael, the entire agency is behind you, get going and bring the head of Ayyash.'[২]

রবিনের পর প্রধানমন্ত্রী হলেন শিমন প্যারেজ। দ্বিতীয় দফায় তিনিও আয়াশের মৃত্যু পরোয়ানায় সই করলেন। এ সময় শিনবেতের নেতৃত্বে এলেন কারমি গিলন। এই গোয়েন্দা কর্মকর্তা আয়াশকে শেষ না করে দেওয়া পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। অভিযানে নামল ইজরাইলি গুপ্তচররা। আয়াশের বাবা-মা আর দুই ভাইকে বেশ কয়েকবার তুলে আনা হলো। চালানো হলো অকথ্য নির্যাতন। এক পর্যায়ে প্রায় বধির হয়ে গেলেন বাবা আব্দুল লতিফ। গ্রামের বিদ্যুৎ লাইন কেটে দেওয়া হলো, কিন্তু কোনো কাজ হলো না।

এক পর্যায়ে ইজরাইলিদের মধ্যে এই ভীতি ছড়িয়ে পড়ল, নিশ্চয়ই আয়াশের সাথে ভূত-প্রেতের কানেকশন আছে! ১৯৯৫ সালে কিছু ইজরাইলি বুদ্ধিজীবী আয়াশকে

---

২. Rise and Kill First: The Secret History of Israel's Targeted Assassinations, Ronen Bergman, page 438.

'ম্যান অব দ্য ইয়ার' ঘোষণা করলেন। কারণ হিসেবে তারা বললেন, সে ইজরাইলি জনগণ ও সরকারের ওপর প্রভাব তৈরি করতে পেরেছে। টিভি ও রেডিওতে সরগরম চলল আয়াশ নিয়ে আলোচনা। স্ত্রী আশরার স্বামী আয়াশ সম্পর্কে বললেন—

> 'আমি কারও সাথে খুব একটা দেখা করতাম না। যখন ঘুমাতাম, সব সময় মাথার কাছে হ্যান্ডগ্রেনেড ও একটা মেশিনগান রাখতাম। এসব চালানো আমি আগেই শিখেছি। যেহেতু আমাদের জীবনযাত্রা বিপদের মুখে, তাই যেকোনো ইজরাইলি রেইডের ব্যাপারে প্রস্তুত থাকতাম। জানতাম, আমার স্বামীকে ধরার জন্য ইজরাইলিরা আমাকে ব্যবহার করতে পারে। সবাইকে সন্দেহ করতাম, কেবল একজন ছাড়া। আমার স্বামীর নির্দেশেই ওই ব্যক্তিটি আমার আর আমাদের ছেলের জন্য দিনে একবার খাবার নিয়ে আসতেন।
>
> আমরা যে বাড়িতে থাকতাম, সেখানে একবার ইজরাইলি সেনারা রেইড দেয়। আত্মরক্ষার্থে চার বছরের ছেলেকে নিয়ে লাফিয়ে পড়েছিলাম। আমাদের সন্তানও ব্যাপারগুলো বুঝত। সে আমার মুখ চেপে ধরেছিল, যাতে কোনো আওয়াজ না করি; অথচ আমারই তাকে শান্ত রাখার কথা ছিল। যখন সে সমবয়সিদের সাথে খেলত, কখনোই আমাদের ব্যাপারে কোনো তথ্য দিত না।'[৫]

ইজরাইল হ্যাসন পরিচালিত আয়াশ হত্যার মিশনের নাম দেওয়া হলো— 'অপারেশন ক্রিস্টাল'। তিনি শিনবেতের ইউনিটগুলোকে নির্দেশ দিলেন, ফিলিস্তিনিদের মধ্য থেকে 'চর' (ইনফরমার) নিয়োগ দিতে, যাদের কাছ থেকে তথ্য সহায়তা পাওয়া যেতে পারে। মূল অপারেশনের দায়িত্ব দেওয়া হলো শিনবেতের বার্ড ইউনিটকে। এরা কয়েক দফা কিলিং মিশন পরিচালনা করল, কিন্তু ব্যর্থ হলো প্রতিবারই। তবে তাদের কাজটা সহজ করে দিলো এক ফিলিস্তিনি বিশ্বাসঘাতক: কামাল হামাদ।

১৯৯৬ সালের জানুয়ারি মাস। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা। জাবালিয়া ও বেইত লাহিয়া ক্যাম্পের মাঝামাঝি এক বাড়িতে অবস্থান নিয়েছেন কাসেম ব্রিগেডের নেতা আয়াশ। সাথে বন্ধু ওসামা হামাদ। ওসামা হামাদের অপর এক বাসায় যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। সেখানে আগেও বেশ কবার আত্মগোপনে ছিলেন তিনি, কিন্তু বন্ধুর ইচ্ছায় এখানেই এলেন।

দুই বন্ধু প্রয়োজনীয় আলাপ সেরে নিচ্ছেন। ইজরাইলের বিরুদ্ধে আরও নিখুঁত ও বিধ্বংসী হামলার উপায় খুঁজছে তারা। হঠাৎ বাবা-মা ও স্ত্রী-সন্তানের কথা মনে পড়ল আয়াশের। ওসামা জানালেন আগের যে বাসায় তারা লুকোতেন, সেখানে ল্যান্ডফোনে আয়াশের বাবা আব্দুল লতিফ প্রায়ই ছেলের খোঁজ করতেন। ল্যান্ডফোনে সমস্যা থাকায় একটি মোবাইল নম্বর দিয়েছেন তিনি। বলেছেন, ছেলে সুযোগ পেলে যেন তাকে কল দেয়।

---

[৫]. Inside Hamas: The Untold Story of the Militant Islamic Movement. Zaki Chehab. page-58

৫ জানুয়ারি, শুক্রবার। সকাল আটটায় ওসামা হামাদের চাচা কামাল হামাদ ওই বাড়িতে এলেন। সাথে নিয়ে এলেন একটি মোটোরোলা আলফা মোবাইল ফোন। এটা ভাতিজা ওসামার জন্য উপহার হিসেবে নিয়ে এসেছেন তিনি।

সকাল নয়টায় মোটোরোলা ফোনে একটা কল এলো। ফোনটা কানে ধরতেই ওসামা বুঝলেন আয়াশের বাবার ফোন। তিনি আইয়াশকে ডেকে ফোনটি দিলেন। বন্ধুকে বাবার সাথে নির্বিঘ্নে কথা বলার সুযোগ দিয়ে রুম ছেড়ে একটু দূরে গেলেন ওসামা। সাথে চাচা কামালও গেলেন। একা রুমে বাবার সাথে কথা বলছেন আয়াশ।

হঠাৎ মাথার ওপর দেখা গেল একটি ইজরাইলি হেলিকপ্টার।

ধুম!

বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠল চারপাশ। রুমের আসবাব পত্র ঠিকরে বেরিয়ে এলো বাইরে। চিৎকার দিয়ে দৌড় দিলেন ওসামা। রুমে এসে দেখলেন ফ্লোরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে প্রিয় বন্ধুর ক্ষত-বিক্ষত দেহ।

ওসামাকে উপহার দেওয়া ফোনটা চাচা কামালকে সরবরাহ করেছিল শিনবেত সদস্যরা। উদ্দেশ্য ছিল ওসামার কাছে ফোনটি গেলে ঘটনাচক্রে বন্ধু আয়াশও এটি ব্যবহার করতে পারে। ইজরাইলি গোয়েন্দাদের ধারণা সঠিক হলো।

আয়াশ যখন বাবার সাথে কথা বলছিল, তখন মোবাইলে লাগানো ডিভাইসের মাধ্যমে ইজরাইলি গোয়েন্দারা নিশ্চিত হয় ফোনটি এখন আয়াশের হাতেই। ফোনটিতে সংযুক্ত ছিল দূর নিয়ন্ত্রিত ট্রান্সমিটার ও ৫০ কিলোগ্রাম ওজনের বোমা।

এর রিমোর্ট কন্ট্রোল ছিল মাথার ওপরে উড়তে থাকা ইজরাইলি হেলিকপ্টারটিতে। সেখান থেকেই ঘটানো হয় বোমার বিস্ফোরণ। গুঞ্জন আছে, ইজরাইলি গোয়েন্দারা ইনফরমার কামালকে মিলিয়ন ডলার অর্থ দিয়েছিল। নিরাপত্তার জন্য তাকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল ইজরাইলের গোপন সেইফ হাউজে।

কামালের মতো গাজা, পশ্চিম তীর ও অন্যান্য আরব ভূখণ্ডেও হাজার হাজার ফিলিস্তিনি ইজরাইলের হয়ে কাজ করছে। গত তিন দশকে অন্তত ২০ হাজার ইজরাইলি এজেন্টের খোঁজ পায় ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ। এই চরদের দেওয়া তথ্যেই দমানো হচ্ছে স্বাধীনতাকামীদের। আধুনিক সময়ে ফিলিস্তিনকে ঘিরে ইহুদি-আরবদের মধ্যকার যে সংঘাত, তার ইতিহাস দেড়শো বছরের বেশি নয়। ছোটোখাটো সংঘাত-দ্বন্দ্ব হতে হতে তা বড়ো আকারে পরিণত হয়। ১৯৪৮ সালে ইজরাইল রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষণার পর থেকে তা আনুষ্ঠানিক লড়াইয়ে রূপ নেয়।

মুখবন্ধ

ইহুদিরা সবশেষ প্যালেস্টাইন ছেড়েছে বা ছাড়তে বাধ্য হয়েছে আজ থেকে দুই হাজার বছর আগে। তারা নিজেরাই এমন দাবি করে থাকে। প্যালেস্টাইনে ইহুদিরা ছিল কয়েকশো বছর, তারও আগে এদের বসবাস ছিল মেসোপটেমিয়াতে। ইহুদিরা যখন প্যালেস্টাইন ভূখণ্ড ছাড়ল, তখনও সেখানে আরও কিছু জাতির বসবাস ছিল। মানে ইহুদিরা-ই সেখানকার একক জনগোষ্ঠী নয়। মেসোপটেমিয়া থেকে প্যালেস্টাইনে এসে বসত গড়া, এরপর রোমানদের তাড়া খেয়ে বাইরের বিশ্বে ছড়িয়ে পড়া বহিরাগতদের এই দলটি দুই হাজার বছর পরে এসে দাবি করছে, তারাই প্যালেস্টাইন ভূখণ্ডের আসল মালিক! এটি তাদের জন্য স্রষ্টার দেওয়া প্রমিজল্যান্ড (প্রতিশ্রুত ভূমি)। অতীতে বসবাসের কারণে যদি প্যালেস্টাইনকে তাদের-ই ভূখণ্ড হিসেবে মেনেও নেওয়া হয়, তারপরও এমন দাবি আধুনিক রাষ্ট্রধারণার সাথে সাংঘর্ষিক। এ দাবি মানতে গেলে আজকের আমেরিকা, কানাডা, কিউবা, অস্ট্রেলিয়া এমনকী নিউজিল্যান্ডে বসবাস করা লোকজনকে তাদের ভূমির মালিকানা ছাড়তে হবে। কারণ, এরা কেউ-ই এসব অঞ্চলের আদি বাসিন্দা নন। এদের বেশিরভাগই গেছেন ইউরোপ থেকে এবং সেটা মাত্র কয়েকশো বছরের ইতিহাস। অথচ পশ্চিমের কিছু দেশ– যাদের এই ইহুদি তত্ত্ব মানলে নিজেদের অস্তিত্ব টেকে না, তারা বেআইনিভাবে প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের দাবিকে সমর্থন করছে এবং অর্থও সামরিক সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। প্যালেস্টাইনকে নিজের করে পেতে বিশ্বব্যাপী ইহুদিরা গড়ে তুলেছে গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক। প্রকাশ্য হামলায় ফিলিস্তিনিদের বাস্তুচ্যুত করা ছাড়াও তারা এ যাবৎ গুপ্ত কিলিং মিশন পরিচালনা করেছে আড়াই হাজারেরও বেশি।

প্যালেস্টাইন ভূখণ্ডে ইজরাইলরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বিশ্বজুড়ে ইহুদিদের কয়েকশো বছরের মারমুখী সন্ত্রাস, গণহত্যা, গুপ্তচরবৃত্তি এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তৎপরতা নিয়ে তরুণ সাংবাদিক ও কলামিস্ট সোহেল রানার প্রথম বই– *কিংডম অব আউটসাইডারস*। এটি মূলত রাজনৈতিক ইতিহাসের বই। ২০টি অধ্যায়ে বিভক্ত এই বই পড়তে গিয়ে আপনার কখনো মনে হতে পারে এটি ফিকশন, কখনো নন-ফিকশন আবার কখনো-বা মনে হবে আপনি থ্রিলার পড়ছেন। হিব্রু-ইহুদি সভ্যতার ইতিহাস, রোমানদের তাড়া খেয়ে ভূমধ্যসাগরের আশপাশে বিশেষ করে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়া এবং সবশেষ রুশ-জার্মানদের হাতে নির্যাতিত হয়ে

আবারও প্যালেস্টাইন এসে স্থায়ী বসতি নির্মাণের ইতিহাস ও প্রেক্ষাপট বর্ণনা করা হয়েছে সহজ ও সুন্দরভাবে। প্রসঙ্গক্রমে আলোচনায় এসেছে সুদপ্রথা, পুঁজিবাজার ও ব্যাংকিং সিস্টেমের উত্থান। ক্রুসেডার ও নাৎসিদের হাতে ইহুদি গণহত্যা, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইহুদিদের ভূমিকা। আছে হামাস-ফাতাহর স্বাধীনতা সংগ্রাম আর দুর্ধর্ষ ইহুদি গোয়েন্দাসংস্থা মোসাদের ভয়ার্ত সব অভিযানের কথা।

এটি এমন এক বই, যা রাজনীতি ও ইতিহাসের আগ্রহী পাঠকদের সমৃদ্ধ করবে। আনন্দিত করবে ফিকশনপ্রেমিকদেরও। বইটির বহুল প্রচার ও সাফল্য কামনা করছি।

শাহাদত হোসেন
অ্যাডমিন, পাঠশালা- Centre for Basic Studies

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

প্রথম আরব-ইজরাইল যুদ্ধ

'ইজরাইল হবে একটি ইহুদিরাষ্ট্র। এর ভেতরকার ফিলিস্তিনিদের গণহারে গ্রেফতার করা হবে, নতুবা বের করে দেওয়া হবে।'—ডেভিড বেনগুরিয়ান

১৫ মে, ১৯৪৮। ইহুদিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সম্মিলিত আরব দেশ। মিশর, জর্ডান, সিরিয়া, ইরাক ও লেবাননের সম্মিলিত সাঁজোয়া বহর এগোতে থাকে প্যালেস্টাইন ভূখণ্ড পুনরুদ্ধারের মিশনে। এ মিশন দখলদার রাষ্ট্র ইজরাইলকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার মিশন। ইহুদি নেতা ডেভিড বেনগুরিয়ানের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, নতুন একটা রাষ্ট্র হবেই। তার কাছে এই তথ্যও ছিল– আরবরা ইহুদিদের নয়া রাষ্ট্র মেনে নেবে না; পালটা আঘাত হানবেই। তাই আরব আক্রমণ ঠেকাতে ইহুদিরা আগে থেকেই 'অল আউট' যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে রাখে। তখনও ইহুদি নেতারা আনুষ্ঠানিক প্রতিরক্ষাবাহিনীর ঘোষণা দেননি। ইজরাইলের হয়ে সামরিক বিষয়াদি দেখভাল করছিল ইহুদি সশস্ত্র গ্রুপ 'হাগানা'। নতুন একটা অর্ডার ইস্যু করা হয়, যার কোড নাম জারজির (Zarzir)। এই অর্ডারের উদ্দেশ্য হলো– প্যালেস্টাইনের আরব প্রধানদের হত্যা করা।

আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র কিংবা বিনাশী আঘাত হানার মতো জোর প্রস্তুতি আরবদের নেই, অথচ শাসকদের আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে। এদের কান ভারী করেছে অতি উৎসাহী উপদেষ্টারা। তারা প্রচারণা চালিয়েছে– 'ইজরাইল জয় করা আরবদের জন্য মামুলি ব্যাপার।' তাই আঁটঘাট না বেঁধে অনেকটা তাড়াহুড়া করেই যুদ্ধের ময়দানে নেমেছে আরবগোষ্ঠী।

যুদ্ধ যখন অনিবার্য

জার্মানির বার্লিন ছিল ধনাঢ্য ইহুদিদের বাণিজ্যকেন্দ্র। এসব ইহুদি ব্যবসায়ীকে কেন্দ্র করেই বার্লিন পরিণত হয়েছিল জায়োনিজমের মূলকেন্দ্রে। বিপরীতে ইউরোপের কিছু অংশে বহু বছর ধরে চলে আসা অ্যান্টি সেমিটিজম প্রচারণা তখন শেকড় গাড়ছিল। কিন্তু গত শতাব্দীর ত্রিশের দশকে এসে জার্মানিতে ইহুদি-বিদ্বেষ প্রকট হতে থাকে। এক সময় মাত্রা ছড়িয়ে যায়। এরই একটি চূড়ান্ত পরিণতি 'হলোকাস্ট' (Holocaust) বা ইহুদি গণহত্যা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসিরা পরাজিত না হওয়া পর্যন্ত এই গণহত্যা থামানো যায়নি। হলোকাস্টের নেপথ্যে রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম, সমাজ-সংস্কৃতি; না স্রেফ হিটলারের ব্যক্তিগত ক্রোধ, সেই প্রশ্নে কোনো একক ইস্যুকে এখন পর্যন্ত সংকটের ভিত্তি বলে দাঁড় করানো যায়নি।

যাহোক, ইউরোপ ছেড়ে আসতে পারায় যেসব ইহুদি গণহত্যাকে এড়াতে পারলেন, তাদের বড়ো একটা অংশ এসে পৌঁছালেন প্যালেস্টাইনে; যেখানে বহু আগে থেকেই আরব জনগোষ্ঠী বসবাস করছিল। রুশ সাম্রাজ্যে বিতর্কিত 'পগরম' কর্মসূচির কারণে আগেও কিছু ইহুদি এই ভূখণ্ডে এসে থেকে গিয়েছিল। পরবর্তী বছরগুলোতে ইহুদি অনুপ্রবেশ অনেকটা নিয়মে দাঁড়িয়ে গেলে আরবদের মধ্যে অস্বস্তি বাড়তে থাকে। অস্বস্তি থেকে ক্ষোভ, আর ক্ষোভ থেকেই ধারাবাহিক আরব-ইহুদি সংঘাতের শুরু।

হামলা-পালটা হামলা, পশ্চিমা উদ্যোগে দরকষাকষি– এভাবে চলতে চলতে পঞ্চাশের দশকের ঠিক আগে একটা অন্যায্য সমাধানের পথ মেলে জাতিসংঘের তরফ থেকে।

২৯ নভেম্বর, ১৯৪৭। ১৮১ নম্বর প্রস্তাবে দ্বি-রাষ্ট্রিক সমাধানের উপায় বাতলে দেয় জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ। এই অর্থ হলো ইজরাইল ও ফিলিস্তিন স্বাধীন দুই রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। প্রস্তাবটির পক্ষে ভোট পড়ে ৩৩টি, আর বিপক্ষে ১৩টি। ১০টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি জাতিংঘের সেদিনের অধিবেশনে ভোট দেওয়া থেকে বিরত থাকে। এমন এক সময় প্রস্তাবটি নেওয়া হয়, যখন প্যালেস্টাইনের ব্রিটিশ ম্যান্ডেট সরকার ২৫ বছর পার করেছে।

প্রস্তাবের ভিত্তিতে জেরুজালেমকে আন্তর্জাতিক কর্তৃপক্ষের অধীনে নেওয়া হয়। ইজরাইলকে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য দেওয়া হয় প্যালেস্টাইনের ৫৬ ভাগ ভূমি, অথচ সে সময় তারা বাস্তবে ছয় ভাগ ভূমিরও বৈধ মালিক ছিল না। বিশ্বসংস্থার পক্ষ থেকে ফিলিস্তিনিদের প্রতি আনুষ্ঠানিক অবিচারের সূচনা এখান থেকেই।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট। তাকে অনেকেই জায়োনিস্ট হিসেবে চেনেন। বিশ্বযুদ্ধ চলমান থাকতেই রুজভেল্টের উত্তরসূরি হয়ে হোয়াইট হাউজে আসেন হ্যারি এস. ট্রুমান। ফিলিস্তিনিদের দুর্ভাগ্য যে, তিনিও আগাগোড়া জায়োনিস্ট। ইজরাইল-প্যালেস্টাইন ইস্যুতে জাতিসংঘে ১৮১ নম্বর প্রস্তাব পাসের নেপথ্যে ছিলেন প্রেসিডেন্ট ট্রুমান। জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত দেশগুলোকে প্রস্তাবের পক্ষে টানতে আর্থিক সুবিধা ও চাপ দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। ফিলিপাইন, গুয়েতেমালা, লাইবেরিয়াসহ বিভিন্ন দেশের বেশ কজন কূটনীতিক এই চাপের কথা ফাঁস করে দেন।[৪] জাতিংঘের এই প্রস্তাব ফিলিস্তিনিদের ক্ষোভকে আরও উসকে দেয়।

---

[৪]. Al-Nakba: The Palestinian catastrophe -Episode 3| Featured Documentary, Aljazeera com

ধর্মঘটের ডাক দেয় ফিলিস্তিনি স্বার্থ সংরক্ষণকারী সংস্থা-আরব হায়ার কমিটি। রাজপথে নেমে জাতিসংঘ ও ইজরাইলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে শামিল হয় হাজারো মানুষ।

সশস্ত্র প্রতিরোধের চিন্তা-ভাবনা থেকে ৩ হাজারের মতো আরবকে প্রশিক্ষণের জন্য সিরিয়ায় পাঠানো হয়। নির্বাসনে থাকা জেরুজালেমের গ্র্যান্ড মুফতি হাজি আমিন আল হোসাইনি তখন লেবাননের শরণার্থী ক্যাম্পে। তার বিশ্বাস ছিল, আরব শাসকরা শেষ অবধি ফিলিস্তিনিদের পাশে থাকবে। কিন্তু আদতে তারা কতটুকু পাশে ছিলেন, তার বিচার এখন ইতিহাসই করছে।

১৯৪৭ সালের শেষ দিকে ফিলিস্তিনি যুবকদের কয়েকটা গ্রুপ প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রশস্ত্রের জন্য কায়রো ও বৈরুতে যায়। অন্যদিকে ইহুদি সশস্ত্র গ্রুপ হাগানা, ইরগুন আর স্টার্ন গ্যাংয়ের হাজার হাজার সদস্য প্রস্তুতি নিতে থাকে আরবদের ঠেকানোর জন্য। এসব সংগঠন সমন্বয় করেন ইহুদি নেতা ডেভিড বেনগুরিয়ান। তাকে বলা হয় ফিলিস্তিনিদের জাতিগত নির্মূলের মাস্টারমাইন্ড। দ্বি-রাষ্ট্রিক প্রস্তাব পাসের মাত্র ক'মাস পরই প্যালেস্টাইন ভূখণ্ডে ব্রিটিশ ম্যান্ডেট শেষ হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সংঘাত থামানো যায়নি। আরব-ইহুদি সংঘাতকে গায়ে মাখেনি ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী। তারা বরং সংঘাত জিইয়ে রেখেই ঘরে ফেরে। তখন ব্রিটিশ ও ইহুদি নেতাদের মধ্যকার আঁতাতের নানা খবর ফাঁস হতে থাকে। শোনা যায় অন্তত দুই দফা গোপন বৈঠকে বসেন বেনগুরিয়ান ও প্যালেস্টাইনে নিযুক্ত সবশেষ ব্রিটিশ হাইকমিশনার জেনারেল স্যার এলান গর্ডন কানিংহাম।

১৯৪৮ সালের ১৪ মে। হাইফা বন্দর হয়ে সাইপ্রাসের উদ্দেশ্যে প্যালেস্টাইন ছাড়েন এলান। তার আগে জেরুজালেম থেকে উড়ে আসেন হাইফায়। ব্রিটিশ ম্যান্ডেট শেষ হওয়ার আট ঘণ্টা আগে, ১৪ মে বিকেলে তেলআবিব মিউজিয়ামে বেনগুরিয়ান ঘোষণা দেন– 'ইজরাইল এখন থেকে স্বাধীন রাষ্ট্র!' ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই নয়া রাষ্ট্র ইজরাইল মার্কিন স্বীকৃতি পেয়ে যায়। স্বীকৃতি দেওয়ার দৌড়ে পিছিয়ে থাকতে চায়নি সোভিয়েত ইউনিয়নও। দুই পরাশক্তির তাৎক্ষণিক স্বীকৃতিতে একটা বিষফোঁড়ার জন্ম নেয় আরব ভূখণ্ডে। অবশ্য পরদিন ইজরাইলকে হজম করতে হয় 'অলআউট' আরব আক্রমণ।

চূড়ান্ত যুদ্ধ

পদাতিক আর গোলন্দাজ মিলিয়ে আরবশিবিরে সৈন্যসংখ্যা ত্রিশ হাজারের মতো। বিপরীতে ইজরাইলের আছে ৩৫ হাজারেরও বেশি যোদ্ধা। এদের কেউ প্রফেশনাল, কেউ স্বেচ্ছাসেবী। কারও কারও তো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লড়াইয়েরও অভিজ্ঞতা আছে। তবে হাগানার হাতে তেমন ভারী অস্ত্র বলতে ব্রিটিশদের ফেলে যাওয়া কিংবা চুরি করা তিনটি ট্যাংক মাত্র! গোলা-বারুদ ফুরিয়ে যাওয়ায় পিছু হটতে হয় ইহুদি সেনাদের।

এ অবস্থায় আর কিছুদূর এগোলেই হয়তো প্রথম হিব্রু শহর তেলআবিব কবজায় নিতে পারত মিশরীয় সেনারা। কিন্তু সে রকম কিছু ঘটেনি, হয়তো ঘটানোর চেষ্টাও করা হয়নি। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা এর কারণ জেনে যাব।

ইজরাইল যখন ব্যাকফুটে, তখনই জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়। কিন্তু উভয় শিবিরই নিশ্চিত, সহসাই এই যুদ্ধ থামছে না। অচিরেই যুদ্ধবিরতি ভেঙে পড়বে। মিত্রদের দরবারে দুপক্ষের দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়। কারণ, এ সময় রাজনৈতিক ও সামরিক সমর্থন খুব বেশি প্রয়োজন। উভয় পক্ষই বিরতির সময়টাকে নিজেদের শক্তি সঞ্চয়ে কাজে লাগায়। ইহুদি কমিউনিস্ট পার্টির চেষ্টায় চেকোস্লোভাকিয়ার (বর্তমান চেক রিপাবলিক ও স্লোভাকিয়া) কাছ থেকে অস্ত্রের চালান আসে ইজরাইলের হাতে। রুশ প্রভাবিত সমাজতান্ত্রিক এই দেশটিতে তখন আধুনিক সব অস্ত্রের কারখানা। ইউরোপজুড়ে তখন তার আলাদা খ্যাতি। মে মাসের শেষ নাগাদ ইজরাইলের বহরে যুক্ত হয় আরও দশটি ট্যাংক, চল্লিশটিরও বেশি কামান, ২৪টি অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট/ট্যাংক গান, ৭৫টি লঞ্চার, শতাধিক মিলিটারি ট্রাক ও এপিসি। প্রথম দিকে হাগানার কোনো কমব্যাট ফাইটার জেট না থাকলেও জুনের আগেই চেকোস্লোভাকিয়া থেকে চারটা ফাইটার যুক্ত হয়। বিপরীতে আরবদের অবস্থা কী?

ইরাক, জর্ডান আর মিশরের প্রধান অস্ত্র জোগানদাতা তখন ব্রিটেন। কিন্তু জাতিসংঘের অবরোধের কারণে ১৯৪৮-এর ফেব্রুয়ারি থেকে অস্ত্র সরবরাহ কমিয়ে দেওয়া হয়। লেবানন আর সিরিয়ার সাপ্লায়ার ফ্রান্সও একই পথে হাঁটে। সবশেষ তাদের বহরে যুক্ত হয় যুক্তরাষ্ট্র। অথচ জাতিসংঘের অস্ত্র অবরোধ মানেনি চেকোস্লোভাকিয়া। চেকের শাসকগোষ্ঠী তখন ডলারের জন্য মরিয়া। তবে আরবরা অর্থ ও যোগাযোগের অভাবে চেক থেকে অস্ত্র কিনতে পারেনি।

অস্ত্র পেয়ে শক্তি ও মনোবল দুটোই বেড়ে যায় ইহুদি শিবিরে। যুদ্ধবিরতি শেষ হলে নতুন করে আরবদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা। রণাঙ্গণে এগিয়ে থাকা আরবরা এবার এক এক করে ভূখণ্ড হারাতে থাকে। এক পর্যায়ে তেলআবিব আর জেরুজালেমের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ চলে যায় ইজরাইলের হাতে।

আরবরা ভেবেছিল ইহুদিদের বিরুদ্ধে তাদের সম্ভাব্য জয় ঠেকানো অসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু এ ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো। এর প্রধানতম কারণ, ইজরাইলকে অবমূল্যায়ন করা। আরবরা রণাঙ্গনে কমসংখ্যক সেনা ও সামরিক যান পাঠিয়েছিল; অন্যদিকে সংখ্যা ও অস্ত্রের বিচারে পরিস্থিতি ছিল ইজরাইলের অনুকূলে। মিশরীয় সেনারা সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনল, 'আমাদের পর্যাপ্ত অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম দেওয়া হয়নি।'

তবে এটাই পরাজয়ের একমাত্র কারণ নয়। ইজরাইলি সেনারা আরবদের চেয়ে দক্ষ ও চৌকষ। তাদের রয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সেনা ইউনিটে কাজ করার অভিজ্ঞতা। সেখানে অনেক ইহুদি স্বেচ্ছাসেবক, পেশাদার সেনাদের বাইরে ব্রিটিশদের হয়ে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। তাদের দেওয়া হয়েছিল উন্নত সামরিক প্রশিক্ষণ। বাইরে থেকেও অনেক ইহুদি যুদ্ধে যোগ দিতে আসে। আমেরিকা, কানাডা থেকে তিনশোর বেশি লোক আসে– যাদের মধ্যে ১৯৮ জন ছিলেন বিমান ক্রু।

পরাজয়ের আরও কারণের মধ্যে রয়েছে– আরবদের রাজনৈতিক বিভাজন ও সমন্বয়হীনতা। আরব লীগ জর্ডানের শাসক আব্দুল্লাহকে আরব বাহিনীর সুপ্রিম কমান্ডার বানিয়েছিল। ধারাবাহিকভাবে ভারপ্রাপ্ত সুপ্রিম কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন দুই ইরাকি জেনারেল। প্রথমে জেনারেল সাফওয়াত ও শেষ মুহূর্তে নুর আল দীন মাহমুদকে এই পদে বসানো হয়। আরব বাহিনীর সুপ্রিম কমান্ডার আবদুল্লাহর ভূমিকা ছিল রহস্যাবৃত। আরব লীগের মহাসচিব আজাম পাশা হুংকার দিয়ে বলেছিলেন–

'ইহুদিদের সংখ্যা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাচ্ছি না। সব কয়টাকে তাড়িয়ে সমুদ্রে ফেলে দেবো।'

অথচ আবদুল্লাহর ছেলে যুবরাজ তালাল প্রকাশ্যেই ঘোষণা করে– 'আমরা পরাজিত।'

আরব ছদ্মবেশে জর্ডানের রাজপ্রাসাদে গোল্ডা মেয়ার

১০ মে, ১৯৪৮। প্রথম আরব-ইজরাইল যুদ্ধ শুরুর মাত্র কিছুদিন আগের ঘটনা। আম্মানের রাজপ্রাসাদে এক ইহুদি নারীর আগমন ঘটল। আরব ছদ্মবেশে আসা এই নারীর নাম গোল্ডা মেয়ার। বাদশাহ আব্দুল্লাহর বাইরে তাঁর এই সফরের ব্যাপারে জানতেন মাত্র গুটিকয়েক লোক। জর্ডানের বাদশাহর প্রস্তাব–

> 'আমরা আপনাদের নিয়ে একটি আরব রাষ্ট্র গড়তে চাই। তাতে আপনাদের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার থাকবে।'

মেয়ারের পালটা জবাব– 'না।'[৫]

আব্দুল্লাহ এখানে কোনো আরব রাষ্ট্র গড়ার কথা বলছেন, তা আমরা অচিরেই জানব। জর্ডানের এই শাসক আগেও মেয়ারের সাথে গোপন বৈঠক করেছেন। সেই বৈঠক হয়েছিল পূর্ববর্তী বছরের ১৭ নভেম্বর। মেয়ারের ভাষায়– 'আব্দুল্লাহ চাচ্ছেন প্যালেস্টাইনের আরব অংশ জর্ডানের সঙ্গে যুক্ত হোক। তিনি ইহুদিদের সাথে যুদ্ধ নন; সমঝোতা চান।

---

৫. Righteous victims: A History of the Zionist-Arab Conflict, 1881-1998, page-221, Benny Morris.

কথা দিয়েছেন, জর্ডানের সেনারা আরবদের সাথে মিলিত হয়ে ইহুদিদের বিরুদ্ধে লড়বে না। তবে তাকে পশ্চিম তীর দিয়ে দিতে হবে।'

তাই প্রথম আরব-ইজরাইল যুদ্ধে জর্ডানের বাদশাহর আন্তরিক অংশগ্রহণ নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। এক পর্যায়ে লিডারশিপ নিয়ে দুটি ধারা দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। একপক্ষে মিশর আর সৌদি আরব; অন্যপক্ষে জর্ডান আর সিরিয়া। ফিলিস্তিনিরাও বিভ্রান্ত– 'আরব ভাইরা কি আসলেই আমাদের উদ্ধার করতে এসেছে?'

কোনো কোনো ইতিহাসবিদ দাবি করেন– জর্ডানের বাদশাহ আব্দুল্লাহকে পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেম দিয়ে দেওয়ার টোপ, রণাঙ্গনে আরবদের থেমে যাওয়ার একটা কারণ হতে পারে। আরবদের মধ্যে জর্ডানের সেনারাই ছিল সবচেয়ে প্রফেশনাল। এই বাহিনী পরিচালনা করতেন একজন ব্রিটিশ অফিসার, জেনারেল গ্লোব পাশা। যুদ্ধে জড়ানোর আগমুহূর্তে বাদশাহ গ্লোব পাশাকে বলেন–

'ইহুদিরা শক্তিশালী, তাদের সাথে যুদ্ধে যাওয়া আমাদের ভুল হচ্ছে।'

অথচ আব্দুল্লাহর বাহিনীর সাধারণ সেনারা ইহুদিদের হারানোর ব্যাপারে ছিল অনড়। কিন্তু কমান্ডারের আচরণ তাদের ফেলে দিলো দোটানায়।

সিরিয়ার সেনারাও মোটামুটি প্রফেশনাল ছিল। কিন্তু তারা কিছুদিন আগে স্বাধীন হয়েছে। তা ছাড়া সিরিয়ার নেতারাও ছিলেন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তার ওপর সেনাসংখ্যা কম। তাই ১৯৪৮-এর যুদ্ধে তারাও ভালো পারফরম্যান্স দেখাতে পারলেন না। মিশরীয় বাহিনীর অনেকেই ছিলেন ব্রাদারহুডের স্বেচ্ছাসেবী। এদের ছিল না জুতসই প্রশিক্ষণ, কিছুদিন আগেও তারা ছিলেন কারাগারে। তারপরও যুদ্ধের শুরুতে মিশরীয় সেনারা গাজা দখলে নিয়ে খান ইউনিসে তাদের পতাকা উড়াতে সক্ষম হয়েছিল।

ইরাকি বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ও আন্তরিকতা নিয়ে প্রশ্ন না থাকলেও তাদের বলা হয়েছিল জর্ডানের কমান্ড অনুযায়ী চলতে। ফলে ইরাকিদের ইজরাইল আক্রমণ না করে পশ্চিম তীরে ডিফেন্ড করতে দেখা যায়। রণাঙ্গনে জিততে জেনারেল ও রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে সমন্বয়টা খুবই জরুরি, কিন্তু আরবদের মধ্যে ১৯৪৮ সালে সেটা দেখা যায়নি।

মধ্যস্থতা করতে এসে খুন

১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮, শুক্রবার।

জেরুজালেমের রাস্তায় সশস্ত্র ইহুদিদের টার্গেটে পড়ে জাতিসংঘের একটি গাড়িবহর। তিনটি জিপে করে জেরুজালেমের জাতিসংঘের হেডকোয়ার্টার থেকে রেহাভিয়া এলাকার দিকে

রওয়ানা হন সুইডিশ কূটনীতিক কাউন্ট ফলকি বার্নাডোট। সশস্ত্র দলটি বেন জায়ন গুইনি স্কয়ারের কাছে হাপালমাহ সড়কের মাঝ বরাবর একটি জিপ রেখে ব্যারিকেড দেয়। এর কাছে এসেই থেমে যায় জাতিসংঘের গাড়িবহর। মুহূর্তেই জিপ থেকে জাতিসংঘ স্টাফদের দিকে গুলি ছুড়ে তিন ইহুদি সন্ত্রাসী। সাথেই সাথেই সঙ্গী ফরাসি অফিসারসহ নিহত হন বার্নাডোট। এতে করে চরমভাবে ভেস্তে যায় ইজরাইল-ফিলিস্তিন শান্তি স্থাপনের আরেকটি উদ্যোগ।

বার্নাডোটকে প্যালেস্টাইনে পাঠানো হয়েছিল মধ্যস্থতাকারী হিসেবে। তাকে দিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠা করে শান্তি স্থাপন করাই জাতিসংঘের দৃশ্যমান উদ্দেশ্য। জর্ডান ও প্যালেস্টাইনে বিধ্বস্ত আরব বসতি ও শরণার্থী ক্যাম্পগুলো ঘুরে দেখেন বার্নাডোট। ইহুদি ধ্বংসযজ্ঞের ঘটনায় বেদনাহত বার্নাডোট নিজেও জেরুজালেমকে আন্তর্জাতিক কর্তৃপক্ষের অধীনে রাখার প্রস্তাব করেন। কিন্তু তার এই কার্যক্রমকে ইহুদিরা দেখে ফিলিস্তিনিদের প্রতি সহানুভূতি হিসেবে। তাই বার্নাডোটকে এর মূল্য দিতে হয় জীবন দিয়ে। ইহুদি সন্ত্রাসী গ্রুপ স্টার্ন গ্যাংয়ের (লেহি) সদস্যরা গাড়িবহরে হামলা চালিয়ে তাকে হত্যা করে। এটা ঘটে জাতিসংঘে তার অনুমোদিত প্রস্তাব পেশের পরদিন। তখন এই ইহুদি মিলিশিয়া বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন আইজ্যাক শামির। শামিরের মতো আরও অনেক ইহুদি নেতা আছেন, যারা অতীতে এ রকম গুপ্তহত্যার মিশনে জড়িত ছিলেন, কিন্তু পরবর্তী সময়ে তারাই আবার ইজরাইলের সর্বোচ্চ আসনে আসীন হন।[৬]

জেরুজালেমকে আন্তর্জাতিক শাসনে রাখার প্রস্তাব মানছিল না কোনো পক্ষই। তার ওপর ঘটে বার্নাডোট হত্যাকাণ্ড। এমতাবস্থায় উভয়পক্ষকে অস্ত্র বিরতিতে আসার তাড়া দেয় জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়। বার্নাডোটের হত্যাকাণ্ডের পর মধ্যস্থতার দায়িত্ব পান তার ডেপুটি মার্কিন কূটনীতিক রালফ বানচ। তার দূতিয়ালিতে ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইজরাইল ও মিশরের মধ্যে অস্ত্র বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এরপর মার্চে লেবানন ও জর্ডানের সাথে এবং জুলাইতে সিরিয়ার সাথে অস্ত্র বিরতি চুক্তি হয়। এরপর ইজরাইল পায় জাতিসংঘের সদস্যপদ। নিরাপত্তা পরিষদ তার ৬৯ নম্বর প্রস্তাবে ইজরাইলকে একটি শান্তিপূর্ণ দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এই শান্তি প্রক্রিয়ার জন্য রালফেরও কপাল খুলে যায়। তিনি পান নোবেল শান্তি পুরস্কার।

'৪৭-এর নভেম্বর থেকে '৪৯ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত ছয় হাজার ইহুদি নিহত হয়। অন্যদিকে ফিলিস্তিনি নিহত হয় ১৩ হাজারের মতো। আহত হয় আরও প্রায় ত্রিশ হাজার। ইজরাইলিরা এখনও বলছে, জাতিসংঘ যে দ্বি-রাষ্ট্রিক সমাধানের পথ দেখিয়েছিল,

---

[৬]. Al-Nakba: The Palestinian catastrophe -Episode 4| Featured Documentary, www.aljazeera.com.

তা যদি ফিলিস্তিনিরা মেনে নিত, তাহলে ফিলিস্তিন এবং ইজরাইল নামের দুটি স্বাধীন দেশ এখন পাশাপাশি অবস্থান করত। কিন্তু এ রকম একটি অন্যায্য রায় মানতে ফিলিস্তিনিরা কি বাধ্য? ১৯৪৮ সালের যুদ্ধে আরবদের হেরে যাওয়ার ফলাফল হিসেবে আরও কিছু এলাকা দখল নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে টিকে যায় ইজরাইল।

মালিকদের তাড়িয়ে ভূমি দখলে বহিরাগতরা

আরবদের সাথে ইহুদিদের যখন লড়াই চলছিল, তখন ইজরাইলের দখল করা এলাকাগুলোতে চলছিল উচ্ছেদ অভিযান। অবশ্য এই অভিযান যুদ্ধের আগেই শুরু হয়েছিল। অনেকেই এটাকে প্রফেশনাল যুদ্ধ না বলে বলছেন সিভিল ওয়ার। ইহুদি সেনারা পাঁচশোর মতো গ্রাম ধ্বংস করে দখলে নেয়। এমনই একটি গ্রাম 'সাফুরিয়া'-যার অবস্থান নাজারেত থেকে ছয় কিলোমিটার দূরে।[৭] ইজরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বছরে গ্রামটিতে হানা দেয় ইহুদি মিলিটারিরা। কৃষিজমি আর বসতিগুলো দখলে নিয়ে বের করে দেওয়া হয় ভূমির মালিকদের। মাত্র এই একটি গ্রাম থেকেই ঘরছাড়া হয় ৫ হাজারের মতো ফিলিস্তিনি। নিজেদের ভিটেমাটিতে আর কখনোই ফিরতে পারেননি তারা; ফিরে পাননি ফসলি জমির মালিকানাও। ইজরাইলি হামলার মুখে সাফুরিয়ার আরব বাসিন্দাদের পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো পথ খোলা ছিল না। ভূমিহারা অনেকেই নাজারেতের দিকে চলে যান।

এক

নাজারেত পবিত্র এক এলাকা। যিশু খ্রিষ্ট বেথেলহেমে জন্ম নিলেও এখানেই তার শৈশব কাটান। এ কারণে তাকে বলা হতো 'নাজারেতের শিশু'। ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার আগে জেরুজালেমের সাইয়ুম পাহাড়ের একটি ভবনে ১২ জন শিষ্যকে সঙ্গে নিয়ে শেষ আহার করেছিলেন যিশু। ইতিহাসে এই আহার 'দ্য লাস্ট সাপার' হিসেবে পরিচিত।

নাজারেত জলপাই চাষের জন্য বিখ্যাত। পবিত্র নগরী হওয়ায় বেন গুরিয়ান এখানে রক্তপাত চাননি। তাই গণহত্যার পরিবর্তে এখানে ব্যাপক মাত্রায় তাড়িয়ে দেওয়ার কৌশল নেন তিনি।

১৯৪৮ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ইহুদি আন্ডারগ্রাউন্ড বাহিনী পালমাখ ও হাগানার যোদ্ধারা হাইফার কাছের কাসুরিয়া গ্রামে হামলা চালায়। এই হামলায় যারা নেতৃত্বে দেন, তাদেরই একজন আইজ্যাক রবিন। এই রবিনই পরবর্তী সময়ে ইজরাইলের প্রধানমন্ত্রী হন। কাসুরিয়া থেকে হাজারখানেক ফিলিস্তিনিকে বের করে দেওয়া হয়। তখন আব্দুল কাদের আল হোসাইনি নামে জেরুজালেমে এক ক্যারিশম্যাটিক আরব নেতা ছিলেন।

---

৭. 'A place I do not recognise': Palestinians mark 70 years of Israeli injustice. 19 April 2018, middle east eye.

তিনি দামেস্কে যান অস্ত্র সহায়তার জন্য, কিন্তু তাকে ফিরতে হয়েছে খালি হাতে। ইজরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাসখানেক আগে ৬ এপ্রিল ফিলিস্তিনিদের নিরস্ত্র করে রাখার জন্য আরব লীগকে দায়ী করে একটি চিঠি লিখেন আব্দুল কাদের। পরে বাপ-দাদার জমি বেচে অস্ত্র কিনে লড়েন দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে। ১৯৩৬ সালে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আরব বিদ্রোহের সময় নেতৃত্ব দেওয়ার অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর। একদল যোদ্ধা নিয়ে ইহুদিদের প্রতিরোধ করতে গিয়ে নিহত হন লড়াইয়ের ময়দানে।

দ্বি-রাষ্ট্রিক প্রস্তাবনা অনুযায়ী আরবরা যেসব এলাকা পাওয়ার কথা ছিল, সেগুলো খুব সহজেই দখল করতে থাকে ইহুদি যোদ্ধারা। ১৯৪৮ সালের ৯ এপ্রিল ভোরে জেরুজালেমের নিকটবর্তী গ্রাম দেইর ইয়াসিনে হামলা চালায় ইহুদি সশস্ত্র গ্রুপ ইরগুন ও স্টার্ন গ্যাং সদস্যরা। এই হামলায় নারী ও শিশুসহ শতাধিক আরবকে হত্যা করা হয়। কারও কারও মতে, এখানে নিহতের সংখ্যা আড়াইশোর কম না। এসব ঘটনায় ব্রিটিশরা যে খুশি ছিল– এমনটা বলাও কঠিন। তবে তারা এ ব্যাপারে টু শব্দও করেনি। হয়তো তারা ভেবেছিল, শেষদিকে এসে এসব বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানো অনাবশ্যক ব্যাপার। শেষ কয়েক বছরে ব্রিটিশ ম্যান্ডেট সরকার এমনভাবে প্যালেস্টাইন শাসন করে, তাতে তাদের ভাবটা এমন ছিল– আশপাশে যত কিছুই ঘটুক, তা দেখতে নেই। এই নীরবতা ইহুদিদের এজেন্ডা বাস্তবায়নে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেছিল। ম্যান্ডেট শেষ হওয়ায় ব্রিটিশ আর্মি যেসব এলাকা থেকে সরে যাচ্ছিল, ধাপে ধাপে সেগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিচ্ছিল সশস্ত্র ইহুদিরা।

১৮ এপ্রিল তাইবেরিয়াস ছেড়ে যায় ব্রিটিশ সেনারা। যাওয়ার আগে তারা ৫ হাজার আরব বাসিন্দাকে জোরপূর্বক অন্যত্র সরিয়ে নেয়। পরদিনই ইহুদি সেনারা শহরটির দখল নেয়। একইভাবে ২১ এপ্রিল হাইফা ছেড়ে যায় ব্রিটিশরা। ওইদিনই হাজারো হাগানা সদস্য শহরটিতে ঢুকে পড়ে। দুদিনের সড়কযুদ্ধে ৬০ আরব যোদ্ধা মারা যায়। বাকিরা শহর ছেড়ে চলে যায়। ফলে ৫০ হাজার আরব হাইফা থেকে উচ্ছেদ হয়। এপ্রিলের শেষদিকে হাইফার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেয় ইহুদিরা। বন্দর নগরী হাইফা ছিল কেবলই আরবদের। এখানেই বসবাস করতেন ফিলিস্তিনের জাতীয় কবি মাহমুদ দারবিশ। শহরটিতে এখনও অনেক আরব বসবাস করেন, কিন্তু বেশিরভাগকেই দেখা হয় দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে।

হাইফার পর টার্গেট করা হয় উপকূলীয় শহর জাফাকে। ইজরাইলি থাবায় ফিলিস্তিনিরা ইতোমধ্যেই হারিয়েছে ১১টি শহর। ১৯৪৭-৪৯-এর নাকবাতে হত্যা করা হয়েছে ১৩ হাজার (বাস্তবে আরও বেশি) ফিলিস্তিনিকে। যে ১১টি শহর হাতছাড়া হয়েছে, এগুলোর একটি বন্দর নগরী জাফা। জাফার জাবালিয়াতে আরব আর ইহুদিদের মধ্যে একটা লড়াই হয়েছিল, যার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মুহিবা খুরশিদ নামের এক নারী।

১৯৪৮ সালের মে মাসের মধ্যভাগে জাফার পতন ঘটে। ১৭ হাজার বাসিন্দাকে সরিয়ে নেওয়া হয়, আর বাকি পুরুষদের ডিটেনসন সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়। ইহুদিরা আররদের লাইব্রেরিগুলো তছনছ করে বইপত্র লুটে নিয়ে যায় জেরুজালেমের হিব্রু ইউনিভার্সিটিতে।[৮]

প্যালেস্টাইনের সবচেয়ে সমৃদ্ধ শহর বলা হতো জাফাকে। এটি ছিল শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র। শহরটিতে ছিল রেললাইন ও বিদ্যুৎ সুবিধা। জাফায় উৎপাদিত হতো পৃথিবী বিখ্যাত কমলালেবু। ইউরোপের বার্লিন, লন্ডন আর প্যারিসের মতো শহরগুলিতে এই কমলালেবুর ছিল বিশেষ চাহিদা।[৯] তখন ফিলিস্তিনে কাজ করতে যেতেন জর্ডান, সিরিয়া, মিশর আর ইয়েমেনের নাগরিকরা। ফিলিস্তিনিরা রপ্তানি শুরু করেছিল উসমানীয় শাসনামলে। তারা প্রতিবেশী আরব শহর ও তুরস্কের ইস্তাম্বুলে গম, কটন, খাদ্যশস্য রপ্তানি করত।

যেসব ফিলিস্তিনি প্রথম আরব-ইজরাইল যুদ্ধে নাজারেতের অদূরে পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে পেরেছিলেন, তাদের বংশধররা আজও সেখানে আছেন। কিন্তু নিজেদের ভিটেমাটিতে নয়; আশ্রয় মিলেছে শরণার্থী শিবিরে। লুকিয়ে থাকা সেসব ফিলিস্তিনি আর তাদের পরবর্তী প্রজন্মকে এখন ইজরাইলে দেখা হয় দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে। এদের জীবনযাত্রা গাজার শরণার্থী শিবিরে থাকা বাসিন্দাদের মতোই। ইজরাইলের ভেতরে থাকা অন্তত এক-চতুর্থাংশ ফিলিস্তিনির দিন কাটছে শরণার্থী হিসেবে। রাষ্ট্রীয়ভাবে ইজরাইল কখনোই এসব তথ্য প্রকাশ করে না কিংবা বৈষম্যের অভিযোগ স্বীকার করে না।

দুই

ইহুদি হামলায় বাস্তুহারাদের একজন ফিলিস্তিনের জাতীয় কবি মাহমুদ দারবিশ। বন্দরনগরী আকরে তার জন্ম। জায়গাটি এখন ইজরাইলের দখলে। ইজরাইলের দৃষ্টিনন্দন আরেক বন্দরনগরী হাইফার দশ মাইলের মধ্যেই আকরের অবস্থান। প্রথম আরব-ইজরাইল যুদ্ধের সময় বসতভিটা গুঁড়িয়ে দেওয়া হলে মাহমুদরা পালিয়ে যান লেবাননে। সেখানকার একটি শরণার্থী ক্যাম্পেই আশ্রয় মেলে তাদের। মাহমুদদের তাড়িয়ে তাঁর জন্মস্থানেই গড়ে তোলা হয় ইহুদি বসতি। গ্রামটি যে একসময় আরবদের ছিল, সেই চিহ্ন একেবারে মুছে ফেলা হলো। অবশ্য যুদ্ধের পরের বছরই সীমান্ত পেরিয়ে পার্বত্য এলাকা গ্যালিলির জাদিদায় আত্মীয়দের আশ্রয়ে চলে আসে কবি মাহমুদের পরিবার। একসময় যুবক মাহমুদ যোগ দেন কমিউনিস্ট পার্টিতে।

---

৮. Al-Nakba: The Palestinian catastrophe -Episode 3| Featured Documentary, al Jazeera.com

৯. Lost cities of Palestine: Haifa, Nazareth, and Jaffa| Al Jazeera World.

রাজনীতির পাশাপাশি মন বসান লেখালেখিতেও। কবি ও লেখক হিসেবে দ্রুতই তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। হাইফায় এসে ১৯৬৪ সালে লিখলেন আলোড়ন সৃষ্টিকারী কবিতা– 'Identity Card.'

'Record!
I am an Arab
And my identity card number is fifty thousand
I have eight children
And the ninth is coming after the summer
will you be angry?'

এই কবিতা ইজরাইলের ভেতরে-বাইরে বসবাসকারী আরব তরুণদের হৃদয়ে প্রচণ্ড রকমের ঝাঁকুনি দেয়। অচিরেই বসত-ভিটা হারানো ফিলিস্তিনি তরুণদের দ্রোহের প্রতীক হয়ে উঠেন কবি মাহমুদ। ইজরাইল সরকার সেসময় অ-ইহুদিদের একটি আলাদা পরিচয়পত্র দিত; সেখানে তাদের পরিচয় হিসেবে ইজরাইলি বা ফিলিস্তিনি কোনোটাই উল্লেখ থাকত না। তাদের একমাত্র পরিচয়– আরব। এর প্রতিবাদেই লেখা হয়েছিল 'আইডেনটিটি কার্ড' কবিতাটি। এই কবিতা লেখার অপরাধে মাহমুদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়। বেশ কয়েকবার আটকও করা হয় থাকে। গৃহবন্দি ছিলেন অনেকদিন। মহান কবি মাহমুদ দারবিশ ২০০৮ সালের আগস্টে যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসে মৃত্যুবরণ করেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইহুদিবাদ

'সম্ভবত ৫ বছর অথবা নিশ্চিতভাবেই ৫০ বছরের মধ্যে আমি একটি ইহুদি রাষ্ট্র বানাতে পারব।'—থিওডর হার্জেল

ইহুদিবাদের ধারণা

প্রথম আরব-ইজরাইল যুদ্ধ শেষে দেখা যায় প্রায় সাড়ে সাত লাখ ফিলিস্তিনি নিজ ভূখণ্ড থেকে বিতাড়িত। এমন অবস্থায়ও তামাম দুনিয়ার ইহুদিদের প্যালেস্টাইন ভূখণ্ডে এসে বসতি গড়ার আমন্ত্রণ জানানো হয়। বাইরের ইহুদিরা যাতে নির্ঝঞ্ঝাটে স্থায়ী হতে পারে, সেই পথ পরিষ্কার করতে যুদ্ধের কয়েক বছরের ব্যবধানে ইজরাইলি পার্লামেন্ট নেসেটে 'ল অব রিটার্ন' নামে একটি আইন পাস করা হয়। ইউরোপ ছাড়াও আফ্রিকা মহাদেশ; বিশেষ করে তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া, মরক্কো, ইথিওপিয়া ও রুয়ান্ডা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে ইহুদি এলো। বড়ো হলো ইজরাইল রাষ্ট্রের মানচিত্র ও জনসংখ্যা। ধর্মকে ব্যবহার করে প্যালেস্টাইন ভূখণ্ডে ইহুদিদের নিয়ে আলাদা একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার যে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, সেটাই জায়োনিজম বা ইহুদিবাদ।

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাতে জায়োনিজমের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে–

> 'Zionism, Jewish nationalist movement that has had as its goal the creation and support of a Jewish national state in Palestine, the ancient homeland of the Jews .'

সরল বাংলায়– ইহুদিবাদ হলো জাতীয়তাবাদী এক আন্দোলন; যার প্রধানতম উদ্দেশ্য প্যালেস্টাইন ভূখণ্ডে একটি ইহুদিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। বিভিন্ন উৎস গ্রন্থগুলোতে জায়োনিজমের উৎপত্তিস্থল বলা হয়েছে ইউরোপকে। আর যে পটভূমির ভিত্তিতে ইহুদি জাতীয়তাবাদের উত্থান, তারও কারণ ইউরোপ। অথচ ইউরোপে কোনো ইহুদি রাষ্ট্র গড়ে উঠেনি! কেন এমনটা হলো এর কারণ আমরা খুঁজব।

প্রয়াত ফিলিস্তিন নেতা ইয়াসির আরাফাত এক ইতালীয় সাংবাদিককে বলেছিলেন–

> 'ইহুদিদের আবাসভূমি দেওয়ার জন্য আপনাদের (ইউরোপীয়) যখন এতই উদ্বেগ, তাহলে আপনাদের ভূমি-ই দিন। দয়া করে আমাদের ভূমি দিতে বলবেন না। শত শত বছর ধরে আমরা এখানে বাস করে আসছি। আপনাদের ঋণ পরিশোধের জন্য আমরা এই ভূমি দেবো না।'[১০]

ইহুদিবাদের প্রেক্ষাপট

ইহুদিবাদের মূল কারণ কী? কেনই-বা ইহুদিনের জন্য আলাদা একটি রাষ্ট্র গঠন করতে হবে বা করা হয়েছে? সবচেয়ে বেশি ইহুদির বসবাস যেখানে ছিল, সেই ইউরোপ-আফ্রিকা বাদ দিয়ে প্যালেস্টাইন ভূখণ্ডে ইজরাইল রাষ্ট্র গড়ে তোলা হলো কেন? এসব প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে আমাদের ঘুরে আসতে হবে ইতিহাসের বিভিন্ন বাঁকে।

ইহুদিদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট স্রেফ একটি বা দুটি ঘটনায় তৈরি হয়নি। ধারাবাহিক কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ও নির্মম ঘটনা ইহুদিদের ঐক্যবদ্ধ করে চরমপন্থার দিকে নিয়ে গেছে। যদিও ইউরোপে বঞ্চনার শিকার এসব ইহুদি প্রকৃত দোষীদের দায়মুক্তি দিয়ে চড়াও হয়েছেন মুসলমানদের ওপর, আরব ফিলিস্তিনিদের ওপর। তাই এ ব্যাপারে বিস্মিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। ইহুদিরা নিজেরাই দাবি করে থাকেন তারা ব্যাবিলনীয় ও রোমানদের দ্বারা নির্যাতিত ও নির্বাসিত হয়েছেন। মিশরের ফারাওদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছেন, খ্রিষ্টান ক্রুসেডারদের হাতে গণহত্যার শিকার হয়েছেন। মধ্য ও আধুনিক সময়ে এসে অস্ট্রিয়া, রুমানিয়া, হাঙ্গেরি, ইতালি, নাজিবাদী জার্মান শাসকশ্রেণি ও রাশিয়ার জারদের দ্বারা নির্যাতন-নিপীড়ন ও গণহত্যার শিকার হয়েছেন। তবুও তারা চড়াও হচ্ছেন মুসলিম ও আরবদের ওপর।

আধুনিক ইউরোপে ইহুদি নির্যাতনের তথ্য অস্বীকার করা নিঃসন্দেহে অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু তারা মুসলমানদের হাতে নির্যাতিত হয়েছেন বা গণহত্যার শিকার হয়েছেন– এমন ইতিহাস বিরল; বরং মুসলিম শাসকদের অধীনেই ইহুদিরা অধিকতর নিরাপদ ছিলেন। এমন প্রমাণ পাওয়া যায় আন্দালুস (স্পেন) ও অটোমান সাম্রাজ্যে। যদিও প্রাচীনকালের বিশেষ করে ব্যাবিলনীয়দের হাতে ইহুদি নির্যাতন ও বিতাড়নের ইতিহাস কেবল বাইবেলকেন্দ্রিক। সমসাময়িক কোনো ইতিহাসের বইয়ে এর উল্লেখ পাওয়া যায় না। তার ওপর বাইবেলের সম্পাদনা ও সংকলন নিয়েও আছে নানান প্রশ্ন। তাই নির্যাতনের এই ইতিহাস একেবারে উড়িয়ে দেওয়া না গেলেও বিতর্কের বাইরে নয়। কিন্তু ইহুদিরা এই বিতর্কিত ইতিহাস ইউরোপ-আমেরিকার জায়োনিস্টদের মদদে প্রতিষ্ঠা করেছে। প্যালেস্টাইনের আজকের দুর্দশা সেই ইতিহাসেরই পরিণতি।

---

[১০]. Interview with History, মূল লেখক ওরিয়ানা ফালাচি। অনুবাদ : আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু, অনুবাদ পৃষ্ঠা-১১০

ছিন্নমূল ইহুদিরা অটোমান ভূখণ্ডে বসবাসের সুযোগ পেয়েছিলেন এবং আন্দালুসে যখন মুসলিমরা ক্ষমতায় ছিলেন, তখনও ইহুদিরা সেখানে বাধাহীনভাবেই বসবাস করেছেন। খ্রিষ্টানদের হাতে আন্দালুসের ইসলামি সালতানাতের পতনের সাথে সাথে ইহুদিদেরও দুর্ভাগ্যের যাত্রা শুরু হয়। এরপর থেকে তাদের ছুটতে হয়েছে বিভিন্ন অজানা গন্তব্যে। সেই ইহুদিদের-ই একটা অংশই নিয়েছিল প্যালেস্টাইনের পবিত্র ভূমিতে।

ফরাসি আর্মির গোপন তথ্য জার্মানদের হাতে

১৮৯৪ সাল। ফরাসি সেনাবাহিনীতে তোলপাড় শুরু হয় একটি ঘটনায়। এক ইহুদি ক্যাপ্টেন আলফ্রেড ড্রেফিউজ কিছু গোপন দলিল জার্মানদের হাতে তুলে দেন। শত্রুদের হাতে সেনাবাহিনীর গোপন তথ্য পাচার-ফরাসি আইনে ভয়ংকর অপরাধ! তাই দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয় ড্রেফিউজের বিরুদ্ধে।[১১] সামরিক আদালত আজীবনের জন্য তাকে ফরাসি গায়ানার ডেভিলস আইল্যান্ডে নির্বাসনে পাঠায়। এমন গুরুতর অভিযোগের না ছিল কোনো সাক্ষী, না ছিল শক্ত কোনো প্রমাণ। তাই মামলার কার্যক্রম ঝুলে থাকে ১০ বছর ধরে। ১৯০৪ সালে বেসামরিক আদালতে তার আবার বিচার শুরু হয় । এর দুই বছর পর ড্রেফিউজ অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পান। মুক্তির পর তাকে আবার ফিরিয়ে নেওয়া হয় সেনাবাহিনীতে।

ড্রেফিউজ প্রথমে মেজর হিসেবে অবসরে গেলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তাকে পুনরায় লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। ১৮৫৯ সালে জন্ম নেওয়া এই সেনা কর্মকর্তা লোকচক্ষুর অন্তরালে ১৯৩৫ সালের ১২-ই জুলাই প্যারিসে মারা যান। ড্রেফিউজের ঘটনা বিশ্বের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে থাকা ইহুদিদের মধ্যে ক্ষোভ সঞ্চার করে। কারণ, তারা ড্রেফিউজের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগকে দেখেছিল ইউরোপীয়দের ইহুদিবিদ্বেষ হিসেবে।

যদিও ফরাসি বিপ্লব ইহুদিদের উন্নত জীবনের সন্ধান দিয়েছিল এবং সেখানে তারা অন্যদের মতোই নাগরিক অধিকার ভোগ করতে পেরেছিল।

আধুনিক ইউরোপে ইহুদিবাদ উত্থানের প্রাথমিক পটভূমি তৈরি হয় ড্রেফিউজের এই ঘটনা থেকেই। তবে এই ঘটনাকেই একমাত্র কারণ বলা যাচ্ছে না। এর আগে-পরে ঘটেছে আরও কিছু ঘটনা; যার ফলাফল আজকের 'ইজরাইল'।

দৃশ্যপটে ইহুদি নেতা হার্জেল

থিওডর হার্জেল। একজন ইহুদি সাংবাদিক ও লেখক। জার্মান ও ফ্রেঞ্চ ভাষায় তার বেশ ভালোই দখল ছিল। ড্রেফিউজের ঘটনা যখন ঘটে, তখন হার্জেল ছিলেন ভিয়েনা-

---

[১১]. মধ্যপ্রাচ্য সংঘাত : বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম সাখাওয়াত হোসেন (অব.), পৃষ্ঠা-৫৪

ভিত্তিক পত্রিকা *Neue Freie Presse*-এর প্যারিস প্রতিনিধি। তিনি সংবাদটি কাভার করেন। এ ঘটনা তাকে ভাবিয়ে তোলে। কারণ, ইউরোপ হার্জেলের সাথেও ভালো আচরণ করেনি। যে বছর ড্রেফিউজের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়, এর দুই বছর পর (১৮৯৬) হার্জেলের একটি বই প্রকাশিত হয়। হার্জেল বইটি লিখেন হিব্রু ভাষায় *(Der Judenstaat)*, যার ইংরেজি নাম *The Jewish State*। তিনি এই বইয়ে স্বাধীন ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কিছু গাইডলাইন তুলে ধরেন।

অবশ্য স্বতন্ত্র আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে হার্জেলের আগেও বেশ কজন ইহুদি নেতা সরব ছিলেন। এদেরই একজন ছিলেন মার্ক্সবাদী জার্মান ইহুদি চিন্তাবিদ মোজেস হেস। তিনি তার *Rome and Jerusalem* (১৮৬২) বই-এ ইহুদিদের মুক্তির উপায় হিসেবে প্যালেস্টাইনে ফিরে যাওয়ার কথা বলেছেন। ইহুদি ধর্মযাজক হিরশ কালিশারও প্যালেস্টাইনকে নিজেদের পূর্ব পুরুষের ভিটা বলে দাবি করেন। পূর্বসূরিদের আলাদা আবাসভূমির এই চিন্তাকে রাজনৈতিক রূপ দেন তাদেরই উত্তরসূরি হার্জেল। এ জন্য তাকে বলা হয় আধুনিক জায়োনিজমের প্রবক্তা। মজার ব্যাপার হলো, ধর্মাশ্রয়ে গড়ে উঠা ইহুদি রাষ্ট্র ইজরাইল যার আন্দোলনের ফসল, তিনি নিজেই ধার্মিক ইহুদি ছিলেন না। ইউরোপের সাংবাদিক ও লেখক পাড়ায় হার্জেলের পরিচিতি ছিল একজন নাস্তিক হিসেবে।

কিছুটা ইজরাইলঘেঁষা ইতিহাসবিদ ব্যানি মরিস ইজরাইল-ফিলিস্তিন সংঘাত নিয়ে বেশকিছু বই লিখেছেন। *রাইটাস ভিকটিমস (Righteousvictims: A History of the Zionist-Arab Conflict, 1881-2001)* নামের এক বইয়ে মরিস দাবি করেছেন, হার্জেল কোনো ধরনের লোভ থেকে জায়োনিজম প্রতিষ্ঠা করেননি; বরং সমগ্র ইউরোপজুড়ে ইহুদিদের ওপর যে নিপীড়ন-নির্যাতন চলছিল, তার সমাধান টানার জন্যই তিনি এটা করেছেন। হার্জেল মূল অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন ড্রেফিউজের ঘটনা থেকেই। মরিস লিখেছেন–

> 'নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও ড্রেফিউজকে মুক্তি দেওয়া হয়নি; বরং তাকে পাঠানো হয়েছিল নির্বাসনে। ইউরোপজুড়ে ইহুদিদের ওপর যে নির্যাতন-নিপীড়ন চলছিল, এ থেকে পরিত্রাণ পেতে বাইবেলে বর্ণিত প্রতিশ্রুত ভূখণ্ডে ফিরে যাওয়া ছাড়া তাদের অন্য কোনো বিকল্প ছিল না।'

যারা ইহুদিবাদ সমর্থন করে থাকেন, তাদের বক্তব্য হলো–

> 'একটি জাতি তার ভূখণ্ডের ভেতরে একই ধরনের মানুষগুলোকে রাখার যেমন অধিকার রাখে, তেমনি সেই সীমানার ভেতরে ভিন্ন জাতির লোকদেরও বের করে দেওয়ার অধিকার রাখে!'

এ রকম থিউরি বা বিশ্বাস আধুনিক রাষ্ট্র ধারণার একেবারেই বিপরীত। কারণ, আধুনিক রাষ্ট্র সব ধর্ম, জাতি-উপজাতির সহাবস্থানকে স্বীকৃতি দেয়। জায়োনিস্টদের কথা হলো–

'যদি জার্মান একটি জাতি হতে পারে, ফরাসি একটি জাতি হতে পারে, তাহলে শুধু ইহুদি ধর্মাবলম্বীদের নিয়েও একটি জাতি গঠিত হতে পারে।' বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ইহুদিরা বিশ্বাস করত– যদি তারা কেবল ঈশ্বরের আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে পারে, তাহলে ঈশ্বর 'ল্যান্ড অব ক্যানানকে' আদি হিব্রুদের জন্য অর্থাৎ আব্রাহাম ও তার বংশধরদের জন্য বরাদ্দ করার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন।[১২]

হার্জেল মারা যান ১৯০৪ সালে। ভিয়েনায় বাবার সমাধির পাশেই তাকে সমাহিত করা হয়। ইজরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরে তার দেহাবশেষ ইজরাইলে ফিরিয়ে আনা হয়। নতুন করে সমাহিত করা হয় জেরুজালেমের নিকটবর্তী একটি পাহাড়ে। পরবর্তী সময়ে সেই পাহাড়টির নামকরণ করা হয়– মাউন্ট হার্জেল। এরপরে আরও অনেক ইহুদি সৈনিককে এখানে সমাহিত করা হয়। ফলে একসময় এই এলাকাটি পরিচিতি পায় 'মিলিটারি সেমিট্রি' হিসেবে।

প্যালেস্টাইন ইহুদিদের নয়

এক

ইহুদিদের ইতিহাস এবং রাষ্ট্র হিসেবে ইজরাইলের জন্ম-প্রক্রিয়া বেশ জটিল ও বিতর্কিত। এই বিতর্কের পেছনের কারণ হলো– ইহুদি ইতিহাসের বেশিরভাগই পুরোনো বাইবেল (হিব্রু বাইবেল/ওল্ড টেস্টামেন্ট) আশ্রিত। এই বাইবেলের সংকলন কারা করেছেন, কারা সম্পাদনা করেছেন, এ নিয়ে আছে ব্যাপক প্রশ্ন। (দ্য ইনভেনশন অব দ্য জিউস পিপল, শ্লোমো স্যান্ড)

ইহুদিদের দাবি, তারা সেই জাতিগোষ্ঠীর সরাসরি উত্তরাধিকার, যারা মিশর থেকে সাইনাই (পশ্চিমারা সিনাইকে সাইনাই বলে থাকে) হয়ে কেনানে/ক্যানানে ফিরে এসেছিল। তারাই স্রষ্টার একমাত্র মনোনীত সম্প্রদায় (Chosen people)। স্রষ্টা তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন– দুধ ও মধুর দেশে (বর্তমান ইজরাইল) তারা শান্তিতে বসবাস করবে।

এখানেই গড়ে উঠেছিল রাজা ডেভিড ও সলোমানের সাম্রাজ্য। পরে এরা দুই দফা নির্বাসনের শিকার হন। দ্বিতীয় দফা নির্বাসনের পর থেকে ইহুদিরা ছড়িয়ে পড়েন মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্তে। কিন্তু তারা বিশ্বাস করতেন, ঈশ্বর প্রতিশ্রুত ভূমিতে (প্রমিজল্যান্ড) একদিন তারা (অথবা তাদের উত্তরসূরিরা) ফিরবেনই। সেই হিসেবে তারা বিশ্বাস করেন– আজ যে সকল ইহুদি ইজরাইলে বসবাস করছেন, তারা দুই হাজার বছর আগে এই ভূমিতে আবাস গড়ে তোলা হিব্রু সম্প্রদায়েরই বংশধর।

---

[১২]. Destiny Disrupted: A History of the World Through Islamic Eyes. মূল লেখক : তামিম আনসারি। অনুবাদ : আলী আহমাদ মাবরুর, অনুবাদ পৃষ্ঠা-৩৭৩

কিন্তু ইহুদিদের বর্ণিত এই ইতিহাস গ্রহণ করার মতো পর্যাপ্ত দলিল নেই। বাইবেলের পুরোনো অংশ (ওল্ড টেস্টামেন্ট) ছাড়া সমসাময়িক অন্য কোনো ইতিহাসের বইয়ে প্রাচীনকালের ইহুদি নির্বাসনের কোনো রেফারেন্স নেই। নেই প্রত্নতাত্ত্বিক কোনো প্রমাণও। এ ছাড়া, বাইবেল নিজেও বিতর্কিত। কেননা, তাতে বারবার পরিবর্তন আনা হয়েছে। লেখক বুলবুল সরওয়ার তার *স্বপ্নভ্রমণ জেরুসালেম* বইয়ে লিখেছেন–

> ‘বাইবেলের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা তার পরিবর্তন। যখন সে যার পাল্লায় পড়ে– সে যত শক্তিমান, তত তার চেঞ্জ। ইহুদিদের হাতে বোনা পবিত্র গ্রন্থের অর্ধেক তারা (খ্রিষ্টানরা) ধার নিয়েছে বড়ো ভাই থেকে; বাকি অর্ধেক মনের মাধুরী মিশিয়ে লিখেছে যিশুখ্রিষ্টের মৃত্যুর বেশ পরে; যা আবার হাদিসের মতো যাচাই-বাছাই করার চেয়ে ঠিকঠাক করা হয়েছে সমকালীন চার্চ, সম্রাটের ইচ্ছা ও উচিতের দোহাই দিয়ে।’

অথচ ইহুদিদের এসব দাবির বিরোধিতা করতে গেলে বাধে বিপত্তি। যিনি এই ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে চান, তাকেই আখ্যা দেওয়া হয় অ্যান্টিসেমিটিক বা ইহুদিবিদ্বেষী হিসেবে। সেমেটীয়দের মধ্যে ইহুদি ছাড়াও আরব, ইথিওপীয় ও অ্যাসিরীয়রা অন্তর্ভুক্ত থাকলেও জায়োনিস্টরা এই টার্মটাকে ব্যাপকমাত্রায় ব্যবহার করেন কেবল ইহুদিদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষমূলক আচরণ হিসেবে। বহু বছরের চেষ্টায় এটাকে রাজনৈতিক রূপ দেওয়া হয়েছে।

দুই

ইজরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর গত সাত দশক ধরে ইহুদি সম্প্রদায়ের বিতর্কিত ইতিহাস ও বিকাশকে বিরাট উচ্চতায় তোলা সম্ভব হয়েছে কেবল পশ্চিমের জায়োনবাদীদের তৎপরতার বলেই; অথচ এই ইতিহাসের বড়ো অংশই কল্পিত ও ভুয়া। হিব্রু বাইবেল অনুসারে– ১৩৬ খ্রিষ্টাব্দে রোমানরা তাড়িয়ে দেওয়ার আগে ইহুদিদের বসবাস ছিল প্যালেস্টাইন ভূখণ্ডে। খ্রিষ্টের জন্মের চোদ্দোশো বছর আগে থেকেই ইজরাইলের বংশধররা (ইহুদিরা হজরত ইয়াকুব (আ.)-কে ইজরাইল বলে থাকে) সেখানে বসবাস করত। ‘রোমানরা ইহুদিদের তাড়িয়ে দেওয়ার পর ইজরাইলের নাম হয় সিরিয়া প্যালেস্টিনা। এরপরই আরবরা সেখানে বসবাস করা শুরু করেন।’ এই তথ্য ইহুদিদের দেওয়া। তারা এই ইতিহাস মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছেন।

এবার একটু অন্যভাবে দেখা যাক। ইহুদিদের দাবি অনুযায়ী প্যালেস্টাইন থেকে তাদের বিতাড়িত হওয়ার বয়স দুই হাজারের কিছু বেশি। এর আগে তারা ৫শত বছর ধরে প্যালেস্টাইনে ছিল। তারা যখন প্যালেস্টাইন ছাড়ল, তখনও সেখানে এদুমাইত ফিলিস্তাইন, মোআবাইত, হিট্টাইট ও আমেরাইত গোত্রের বসবাস ছিল। এসব গোত্র কিন্তু প্যালেস্টাইন ছাড়েনি। ইহুদিরা যেহেতু দুই হাজার বছর পরে এসে প্যালেস্টাইনকে

নিজেদের বলে দাবি করতে পারছে, তাহলে সাতশো বছরেরও বেশি সময় ধরে শাসন করা স্পেনকেও মুসলমানরা নিজেদের বলে দাবি করতেই পারে! ইউরোপ কি তা মানবে? 'মুসলমানরা ছিল স্পেনে অনুপ্রবেশকারী'– এই যুক্তিতে যদি স্পেনের ওপর মুসলমানদের দাবি খারিজ হয়ে যায়, তাহলে ইহুদিদের দাবিও খারিজ হতে বাধ্য। কারণ, তারাও প্যালেস্টাইনে এসেছিল মেসোপটেমিয়া থেকে।

বর্তমানের আমেরিকা কিংবা ওশেনিয়া মহাদেশ কারা গড়ে তুলেছে? আধুনিক আমেরিকার ইতিহাস কয়েকশো বছরের মাত্র। মোটেও তা সাতশো বছরের বেশি নয়। ইউরোপের লোকজনই সেখানে গিয়ে বসতি গড়েছে। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসীদের মেরে কেটে-কুটে সাফ করেছে কারা? রেড ইন্ডিয়ানরাই-বা এখন কোথায়? বর্তমানের যারা আমেরিকা, কানাডার মূল স্রোতে আছে, তারাও ইউরোপীয় অনুপ্রবেশকারী। আদি বাসিন্দারা যদি কোথাও থেকে বেরিয়ে এসে দাবি করে– 'এই ভূখণ্ড আমাদের, তোমরা বহিরাগত। দূর হও।' মার্কিনিরা, কানাডীয়রা বোধ হয় বিনা বাক্য ব্যয়ে তা মেনে নেবে! নেবে কি?

আজকের অস্ট্রেলিয়া বা নিউজিল্যান্ডও গড়া হয়েছে বাইরের লোকদের দিয়ে। ইউরোপের লোকজন ভারতবর্ষে বাণিজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে এলেও অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে তারা গেছে বসতি গড়তে। এখন তারা মিলিয়ে গেছে মূলস্রোতে। ইহুদিরা যদি দুই হাজার বছর আগে ছেড়ে আসা কোনো ভূখণ্ডকে নিজেদের বলে দখল করে নিতে পারে এবং এটা যদি ইউরোপ-আমেরিকার চোখে বৈধ হয়, তাহলে আজকের আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের বাসিন্দাদেরও উচিত অন্যত্র চলে যাওয়া। কারণ, তাদের বসবাসের ইতিহাস কয়েকশো বছরের মাত্র।

তিন

একসময় প্যালেস্টাইন এলাকা উসমানীয় (পশ্চিমের ভাষায় অটোমান) সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। তাদের নিয়োগ করা আরব গভর্নররাই এই ভূখণ্ড শাসন করতেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর অটোমানদের পতন হওয়ার আগ পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত ছিল। ব্রিটিশরা আরব ও ইহুদিদের নানান টোপ দিয়ে তাদের হয়ে যুদ্ধে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানায়। আঞ্চলিক শাসকদের (গভর্নর) ফুঁসলানো হয় অটোমান সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে। ব্রিটিশদের সেই কূটকৌশল সফল হয়। অটোমানরা যুদ্ধে আষ্টেপিষ্ঠে জড়িয়ে পড়ে। তাই ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে যে সংঘাত-সংঘর্ষ এখনও পরিলক্ষিত হচ্ছে, তাতে ব্রিটিশদের দায় এড়ানোর সুযোগ নেই।

২০০২ সালে ডিউক ইউনিভার্সিটির সাবেক বিজনেস প্রফেসর বার্নাড অভিষাই *(Bernard Avishai) The Tragedy of Zionism : How its Revolutionary past Haunts Israeli Democracy'* নামে একটি বই লিখেন। সেখানে উল্লেখ করা হয়–

> 'বিশ্বজুড়ে ইহুদিবাদ আন্দোলনের পক্ষে রাজনৈতিক সমর্থন জোগাতে বেলফোর ঘোষণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ব্রিটিশরা ইহুদিদের পক্ষ অবলম্বন করেছিল। কারণ, তারা অটোমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নিজেদের সেনাকে প্যালেস্টাইন ভূখণ্ডে রাখতে চেয়েছিল। তাই বেলফোর ঘোষণাকে ইহুদিরা নিজেদের বিজয় হিসেবে দেখলেও আরবরা দেখেছিল ব্রিটিশদের বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে। এ ঘোষণার দুবছর আগে ব্রিটিশরা আরবদের কথা দিয়েছিল– তারা যদি অটোমানদের হটাতে ব্রিটিশদের সহায়তা করে, তাহলে প্যালেস্টাইন ভূখণ্ড তাদেরই থাকবে।'

আরবরা শেষ পর্যন্ত কথা রেখেছিল, কিন্তু ব্রিটিশরা তাদের হতাশ করল।

কানাডার ট্রেন্ট ইউনিভার্সিটির দর্শনের অধ্যাপক Michael Neumann; যার বাবা ছিলেন একজন জার্মান ইহুদি শরণার্থী, তিনি মনে করেন– বেলফোর ঘোষণা ছিল পুরো প্যালেস্টাইন দখলে নেওয়ার একটি প্রাথমিক প্রক্রিয়া। তবে ইহুদি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ এফ্রেইম কার্শ (Efraim Karsh) এবং তেলআবিব বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক খেইম গানস (Chaim Gans) ভিন্ন যুক্তি ও মত দেখিয়েছেন। এফ্রেইম কার্শ বিশ্বাস করেন– বেলফোর ঘোষণায় কোনো ইহুদি রাষ্ট্র গঠিত হয়নি। তার মতে– ব্রিটিশদের সহযোগিতায় 'জায়োনিস্ট মুভমেন্ট' হয়নি; যাকে প্যালেস্টাইনের দখলদারিত্ব ইহুদিদের হাতে চলে যাওয়ার জন্য দায়ী করা হয়। তিনি বরং একধাপ এগিয়ে বলছেন, তুর্কি নিয়ন্ত্রণ চলে যাওয়ার পর প্যালেস্টাইনের কোনো অস্তিত্বই ছিল না!

এই ইতিহাসবিদের তথ্য–

> 'প্যালেস্টাইনের তখন একক ভৌগোলিক কোনো অস্তিত্ব ছিল না। এটি অটোমানদের দুটি প্রদেশের অংশবিশেষ ছিল; যার একটি অংশ উত্তরে বৈরুতের সাথে সংযুক্ত ছিল। অপর অংশের সংযোগ ছিল দক্ষিণে জেরুজালেমের সঙ্গে। ওই এলাকায় ইহুদিদের সংখ্যা বাড়ে মূলত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়।' (The Arab-Israeli Conflict: The Palestine War 1948)

এফ্রেইম কার্শের এসব যুক্তির ব্যাপারে অনায়াসেই আপত্তি তোলা যেতে পারে। তিনি বলছেন, অটোমানরা চলে যাওয়ার পর প্যালেস্টাইন আদৌ কোনো ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র ছিল না। তার এই বক্তব্য আমরা মেলাতে পারি আরব বসন্তপরবর্তী লিবিয়া কিংবা সিরিয়ার সাথে। বর্তমানে দেশ দুটিতে ঐক্যবদ্ধ বা একক সরকার নেই। বিভিন্ন শহর বিভিন্ন বাহিনী বা নেতৃত্বের অধীনে। এফ্রেইম-এর যুক্তি অনুযায়ী– আলাদা আলাদা নেতৃত্ব জারি থাকলে তাকে একক ও ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র বলা যায় না। তাহলে কি লিবিয় বা সিরীয়রা তাদের ভূখণ্ডের মালিকানার বৈধতা হারিয়েছেন? তৃতীয় পক্ষ চাইলেই কি সেখানে ভূখণ্ডের মালিকানা দাবি করতে পারবেন?

ইহুদি ইতিহাসবিদ ইলান পাপ্পে স্পষ্টতই মনে করেন, ইজরাইল রাষ্ট্রের জন্মই হয়েছে জোর-জবরদস্তির মাধ্যমে। তার উত্থান হয়েছে জাতি বৈষম্যের ভিত্তিতে। ইজরাইলে জন্ম নেওয়া পাপ্পে বলেন, জায়োনিস্টরা একটা ইহুদি রাষ্ট্র বানাতে চেয়েছিল। আর এটা করতে গিয়ে তারা অর্ধেক ফিলিস্তিনিকে বের করে দিয়েছে, অর্ধেক নগর ও গ্রাম ধ্বংস করেছে। আর নিঃসন্দেহে ইহুদিদের এমন কাজ Ethnic cleansing-এর একটি শক্ত প্রমাণ হিসেবে থেকে গেছে। ইউরোপে শিক্ষকতায় নিয়োজিত থাকা পাপ্পে জানান, ইহুদি চরমপন্থি সংগঠন হাগানার মিশনই ছিল ফিলিস্তিন জাতিকে নিশ্চিহ্ন করা।

প্রথম আরব-ইজরাইল যুদ্ধের সময় প্যালেস্টাইনের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ ছিল ইহুদি। এদের দখলে ছিল সাত ভাগ জমি (ইলান পাপ্পের মতে)। কী করে এমন একটি সংখ্যালঘু জাতি একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের সংখ্যাগুরুদের তাড়ানোর চিন্তা করে? বর্ণ বিদ্বেষ বা জাতিবিদ্বেষ না থাকলে এটা হতে পারে? পাপ্পে মনে করেন– যে জোর-জবরদস্তির মাধ্যমে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে ফিলিস্তিনিদের তাড়ানো হয়, সেই উগ্র আচরণ জায়োনিস্টরা এখনও ছাড়তে পারেনি। ইজরাইল রাষ্ট্র দিনের পর দিন প্যালেস্টাইনে ভূমির আসল মালিকদের প্রতি ফ্যাসিস্ট আচরণ করে চলছে। এটা ঠিক যে, ইউরোপে অত্যাচারের কারণে ইহুদিদের জন্য একটা আলাদা ভূখণ্ডের প্রয়োজন বড়ো করে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু তারা এমন একটি ভূখণ্ডকে নিজেদের প্রমিজল্যান্ড বলে দাবি করে বসল, যেখানে আগে থেকেই আরবরা বসবাস করে আসছিল। কাজেই একে 'প্রমিজল্যান্ডের' চেয়ে 'স্টোলেনল্যান্ড' (চুরি করা ভূমি) বলাই যুক্তিযুক্ত।

জায়োনিজমের পক্ষে ইহুদিরা কতগুলো মিথকে ফ্যাক্ট হিসেবে দাঁড় করিয়েছে। এর মধ্যে প্রধানতম মিথটি হলো– Palestine was a land without people, waiting for people without land. এই দাবি কোনোভাবেই কি মেনে নেওয়া সম্ভব? ইহুদিদের আলাদা ভূমি ছিল না সত্য, কিন্তু প্যালেস্টাইন কি আদৌ কোনো জনশূন্য ভূমি ছিল? সেখানে বহু বছর ধরে আরবরা ছিল। তাদের আলাদা সংস্কৃতি, অর্থনীতি, শাসনতন্ত্র ছিল। ইজরাইল তাদের স্কুলগুলোর পাঠ্যবইয়ে এ রকম আরও অনেক মিথলজি যুক্ত করে বিকৃত ইতিহাস বাচ্চাদের শেখাচ্ছে। আধুনিক সময়ে এসে তারা আরও একটি মিথলজি প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছে। তা হলো– 'ফিলিস্তিন মানে গাজা আর পশ্চিম তীর।' বাস্তবতা হচ্ছে– অদূর ভবিষ্যতে এই দুই ভূখণ্ড নিয়েই হয়তো ফিলিস্তিনিদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে।[১৩]

---

[১৩]. Ilan pappe: the Myth of Israel
- Hardtalk speaks to Israeli historian, Ilan Pappe, BBC
- 1948; A different story, part1/ 2, Lecture by Professor Ilan Pappe, November30, 2012, bern Switzeerland.
- Ten Myths about Israel, Ilan pappe.
- প্যালেস্টাইনের বুকে ইজরাইল। আসাদ পারভেজ, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
- Israeli Exceptionalism:The destabilizing logic of Zionism, M Shahid Alam.

ইহুদি কারা, সব ইহুদি কি জায়োনিস্ট

ইহুদি শব্দটির বহুবচন ইহুদিম। এটি মূলত হিব্রু শব্দ। সেমেটিক ধর্মগুলোর মধ্যে সবচেয়ে পুরোনো ধর্ম; যাকে ইংরেজিতে বলা হয় জুডাইজম (Judaism)। 'ইহুদি' শব্দটাতে যতটা না ধর্মীয় পরিচয় প্রকাশ পায়, তার চেয়ে বেশি প্রকাশ পায় জাতিগত পরিচয়। তাই ইংরেজিতে ইহুদিদের পরিচয় দেওয়া হয় ethnoreligious group হিসেবে। এর অর্থ-আলাদা জাতি। তাদের সবারই অভিন্ন ধর্ম-জুডাইজম।

হাজার হাজার বছর আগে উত্তর-পশ্চিম মেসোপটেমিয়া (বর্তমান ইরাক ও কুয়েত) ও ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলে বসতি স্থাপনকারী ইহুদিরা এখনকার মতো একেশ্বরবাদী ছিল না। তখন তাদের পরিচয় ছিল হিব্রু। হিব্রু শব্দের অর্থ নদীর অন্য তীরের মানুষ। মেসোপটেমিয়া শত-সহস্র বছর আগে থেকেই টাইগ্রিস-ইউফ্রেতিস (দজলা-ফোরাত) নদী বিধৌত ভূখণ্ড ছিল। তাই তাদের এই নামে অভিহিত করা হয়। এই হিব্রুরা ছিল যাযাবর। তারা পাহাড়-পর্বত, গ্রহ-নক্ষত্র, গাছ-পালার উপাসনা করত।

কালের বিবর্তনে হিব্রুরা লেভান্ত বা সিরিয়া-প্যালেস্টাইনে এসে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে। একপর্যায়ে তারা ভাগ হয়ে যায় তিনভাগে। এদেরই একটি ভাগ এক সময়ে এসে 'ইহুদি' নামে পরিচিতি, পায়। ইহুদিদের ধর্ম 'জুডাইজম'; আর চেতনা 'জায়োনিজম'। মানে দুটোর মধ্যে কিছু ধারণাগত পার্থক্য রয়েছে। প্রথমটার সাথে সম্পর্ক ধর্মের। আর দ্বিতীয়টার সাথে রাজনীতির।

ইজরাইল রাষ্ট্রের ইহুদি সমর্থকরা তো বটেই, কোনো অ-ইহুদি ব্যক্তিও যদি আরবদের ভূমি দখল করে ইজরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ধারণাকে সমর্থন করেন, প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করেন এবং তাদের নিরাপত্তা নিয়ে ভেবে থাকেন, তাহলে তাকেও জায়োনবাদী বা জায়োনিস্ট বলা যেতে পারে। তাই ইজরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে কথা বলে থাকেন, এমন খ্রিষ্টানরাও জায়োনিস্ট হিসেবেই পরিচয় লাভ করেন। তাদের আরও সুনির্দিষ্ট করে বলা হয় 'খ্রিশ্চিয়ান জায়োনিস্ট'। অনুরূপভাবে একজন হিন্দু বা মুসলিমও যদি ইজরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ধারণা সমর্থন করেন, তবে তিনিও জায়োনিস্ট হতে পারেন!

জায়োনিজম শব্দটা এসেছে 'জায়োন' থেকে। জায়োন হলো জেরুজালেমের একটি টিলা; আমরা অতি ছোটো আকারের পাহাড়কে যে রকম নাম দিয়ে থাকি।[১৪] ইহুদিদের কাছে এটি পবিত্রতম জায়গা। জায়োন শব্দ দিয়ে জেরুজালেম বা (সিটি অব ডেভিড) দাউদ নগরীকে বোঝানো হয়। অবশ্য এখনকার জেরুজালেম আর দাউদ নগরীর মধ্যে আয়তনগত পার্থক্য আছে। সে সময়ের দাউদ নগরী আকারে বেশ ছোটো ছিল।

---

[১৪]. Hamas: A Beginner's Guide, Khaled Hroub, page-33

বিশ্বব্যাপী জায়োনিজমের যে আন্দোলন চলছে বা অতীতে হয়েছে, তার প্রধানতম উদ্দেশ্য হলো 'জেরুজালেম' পুনরুদ্ধার করা। আরও বিস্তৃত আকারে বললে– ইহুদিরা যে ভূখণ্ডকে 'প্রমিজল্যান্ড' হিসেবে দাবি করে আসছে, তা পুরোপুরি দখলে (অক্যুপাই করা) নেওয়াই জায়োনবাদের উদ্দেশ্য। তবে ইহুদিদের সবাই জোরপূর্বক ভূমি দখল করে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ধারণা সমর্থন করেন না। ফলে সব ইহুদিকে জায়োনিস্ট বলা যাবে না। পশ্চিমে বসবাস করা ইহুদিদের একটি অংশ অনেক আগে থেকেই ইজরাইলি জবরদখলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে আসছেন। ইহুদিদের মধ্যেও কেউ কেউ আছেন, যারা ইজরাইল বয়কট আন্দোলন (বিডিএস)-এর প্রতি ইতিবাচক কিংবা সমর্থক। ইজরাইলের ভেতরে বসবাস করা ধার্মিক ইহুদিদের অনেককেই বিভিন্ন সময়ে জায়োনিজমের প্রতিবাদ করতে দেখা গেছে।

ছবি : জায়োনিজমের প্রতিবাদে সড়কে ইজরাইলের কয়েকজন ইহুদি[১৫]

বিশ্বে ইহুদি জনসংখ্যা প্রায় দেড় কোটির মতো (১ কোটি ৪৪ লাখ)। প্রাচীন এই ধর্মের অনুসারীদের সংখ্যা কম হলেও হোয়াইট হাউজসহ বিশ্বের পাওয়ার হাউজগুলোতে রয়েছে তাদের সরব উপস্থিতি। বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পররাষ্ট্রনীতিতে জায়োনিস্টরা বেশ ভালোই ভূমিকা রাখছেন। ট্রাম্পের উপদেষ্টা জন বোল্টন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পিও ও জামাতা জ্যারেড কুশনার-তিনজনই কট্টর জায়োনিস্ট। ইহুদিবাদ কায়েমে তাদের রয়েছে শক্তিশালী অবস্থান। ইজরাইলের ৯০ লাখ জনসংখ্যার মধ্যে ইহুদির সংখ্যা ৬৫ লাখের কিছু বেশি। এই সংখ্যা বিশ্বের মোট ইহুদির ৪৪ শতাংশ।

[১৫]. Jewish population grows to 14.411 million, April 4, 2017, www.israelnationalnews.com)

এ ছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রে ৫৭ লাখ (৩৯%), ফ্রান্সে চার লাখ ৬০ হাজার, কানাডায় ৩ লাখ ৮৮ হাজার, যুক্তরাজ্যে ২ লাখ ৯০ হাজার, আর্জেন্টিনায় ১ লাখ ৮১ হাজার, রাশিয়ায় ১ লাখ ৮০ হাজার, জার্মানিতে ১ লাখ ১৭ হাজার এবং অস্ট্রেলিয়াতে প্রায় ১ লাখ ১৩ হাজার ইহুদি বসবাস করে।

হিব্রু ভাষা

ইসলাম, খ্রিষ্টান ও ইহুদি; এই তিনটি সেমেটিক ধর্ম বা ইবরাহিমি ধর্ম নামে পরিচিত। কারণ, এই তিন ধর্মের প্রবর্তকরা ছিলেন ইবরাহিম (আ.)-এর আদর্শের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তিন ধর্মের অনুসারীরাই হজরত ইবরাহিম (আ.)-কে তাদের পূর্বপুরুষ হিসেবে মানেন। ইহুদিরা বলে থাকে, ২১০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ইবরাহিম মেসোপটেমিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। স্রষ্টার নির্দেশে তিনি মেসোপটেমিয়া থেকে কেনানে আসেন, কিন্তু কেনানে তার নিজস্ব কোনো ভূমি ছিল না। আজকের ইজরাইল যেখানে গড়ে তোলা হয়েছে, এটি সেই কেনানের বেশিরভাগ জায়গার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। একসময় জায়গাটি জুডা (জুদা) কিংবা জুডিয়া নামে পরিচিত ছিল।

ইবরাহিম (আ.)-এর প্রধান দুই ছেলে ইসমাইল ও ইসহাক। এই দুই ছেলের বংশধররাই বনি ইসমাইল (মুসলমান)ও বনি ইসরাইল (ইহুদি) নামে পরিচিত। দ্বিতীয় স্ত্রী হাজেরার (আগার/হাগার) ঘরে জন্ম নিয়েছিলেন ইবরাহিমের প্রথম সন্তান ইসমাইল। ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী ইবরাহিম ও ইসমাইল হলেন হজরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর পূর্বপুরুষ। আর ইবরাহিম (আ.)-এর প্রথম স্ত্রী সারার ঘরে জন্ম নিয়েছিলেন ইসহাক (আ.) বা আইজ্যাক। তাঁর ছেলে ছিলেন ইয়াকুব (আ.) বা জ্যাকব। এই ইয়াকুবকে ইহুদিরা নাম দেয় ইজরাইল। কেনই-বা এই নামকরণ তারও প্রেক্ষাপট আছে– এই আলোচনা থাকছে আরও পরের দিকে।
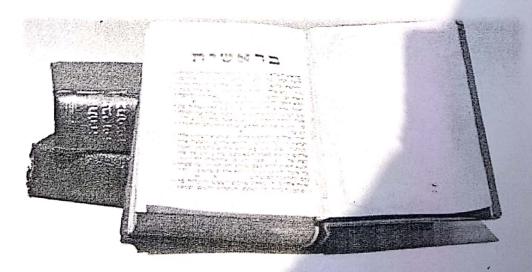
ছবি : হিব্রু বাইবেল।

আদি ইহুদিরা কথা বলত হিব্রু ভাষায়। সেই হিসেবে এটি একটি সেমিটিক ভাষা। তবে একটা সময় পর তারা আর হিব্রু ভাষায় কথা বলেনি। হিব্রু ভাষার জায়গা দখল করে নেয় 'আরামাইক' নামের ভিন্ন একটি ভাষা। অবশ্য হিব্রুতেই তারা প্রার্থনা করত। এরই মাঝে পেরিয়ে যায় দেড় সহস্রাধিক বছর; কারও কারও মতে দুই হাজার বছর। প্রার্থনার বিষয়টাকে বাদ দিলে এই দীর্ঘ সময়ে বলা যায়- হিব্রু ছিল প্রায় মৃত একটি ভাষা। তবে বর্তমান ইজরাইলে ভাষাটাকে নতুন করে জীবন দেওয়া হয়েছে। কারণ, ইহুদিদের দৃষ্টিতে এই হিব্রুই হচ্ছে 'পবিত্র ভাষা'।

১৮৮১ সালে এলিয়েনজার বিন ইয়াহুদা (Eliezer Ben-Yehuda) মৃত হিব্রুকে নতুন জীবন দান করার কাজে নেমে পড়েন। এলিয়েনজারসহ ইহুদি জায়োনবাদী সংস্থাগুলো সিদ্ধান্ত নেয়, তাদের সাংগঠনিক ভাষা হবে হিব্রু। ফলে বিংশ শতকের প্রথমদিকে হারানো যৌবন ফিরে পায় হিব্রু। প্যালেস্টাইনের ইহুদি সমাজে তা চালু হয় পুরোদমে। এরপর অনেকে নিজের নাম বদলে হিব্রুতে নাম রাখতে শুরু করেন। এদেরই একজন ভেডিড বেনগুরিয়ান, যিনি ছিলেন ইজরাইলের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। আগে তার নাম ছিল ডেভিড গ্রিন, পরে গ্রিনের জায়গায় বসে বেনগুরিয়ান। তেলআবিব হয়ে উঠে প্রথম হিব্রুভাষী শহর। এ পর্যায়ে ইজরাইলের রাষ্ট্রভাষাই হয়ে যায় হিব্রু।

মুসলমানদের পবিত্র ভাষা আরবি আর ইহুদিদের পবিত্র ভাষা হিব্রু। দুটোই ডান দিক থেকে বাম দিকে লেখা হয়। বর্তমান হিব্রু লিপির উদ্ভবকাল ধরা হয় খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতককে। এর আদি উৎস হিসেবে গণ্য করা হয় প্রাচীন মিশরীয় চিত্রলিপি হায়ারোগ্লোফিককে।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রমিজল্যান্ড

'Palestine was a land without people, waiting for people without land.'—*ইহুদি মিথ*

জ্যাকব'স ল্যাডার ড্রিম

প্রমিজ ল্যাণ্ড বা প্রতিশ্রুত ভূমির ব্যাপারটা বুঝতে হলে আমাদের কিছুক্ষণ ঘুরে আসতে হবে প্রাচীন আরব দুনিয়ায়– বর্তমানকালে পশ্চিমের চোখে যা 'মিডল ইস্ট' নামে পরিচিত।

যিশুখ্রিষ্টের জন্মের প্রায় সতেরোশো বছর আগের কথা। তখন ইহুদি শব্দটিরই প্রচলন হয়নি।

'বিরশেবা' (বর্তমান ইজরাইলের একটি শিল্পনগরী, যা জেরুজালেম থেকে শতাধিক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত) মরু অঞ্চল থেকে রওনা হন এক ব্যক্তি। গন্তব্য তাঁর 'হারান'। মা পাঠিয়েছেন, যাবেন মামার কাছে। হারানে পৌঁছে কিছুটা ক্লান্ত হয়ে পড়েন তিনি। একটু জিরিয়ে নেওয়া প্রয়োজন। পাশে বড়োসড়ো একটা পাথর দেখে পিঠ ঠেকিয়ে বসলেন। আরেকটু আরামের জন্য পাথরে মাথা রেখে গা এলিয়ে দিলেন। নিমিষেই চোখে ঘুম নেমে এলো। হারিয়ে গেলেন গভীর ঘুমের রাজ্যে। অদ্ভুত এক স্বপ্ন এসে ঘিরে ধরল তাকে। সে এক ঐতিহাসিক স্বপ্ন। ঘুম ভেঙে গেল তাঁর।

ঘুম থেকে উঠে আগন্তুক এই জায়গার নাম রাখলেন 'বেথেল'। হিব্রুতে 'বেথ' শব্দের অর্থ– ঘর, আর 'এল' অর্থ– স্রষ্টা/আল্লাহ। তাই বেথেল শব্দের অর্থ 'আল্লাহর ঘর'। এই বেথেল থেকেই বর্তমান প্যালেস্টাইনের একটি শহরের নামকরণ করা হয় বেথেলহেম। পরবর্তী সময়ে এই শহরেই জন্ম নেন হজরত ঈসা (আ.)।

ইহুদি বর্ণনা অনুযায়ী, ৪০ বছর বয়সে রেবেকা নামক এক নারীকে বিয়ে করেন হজরত ইসহাক। রেবেকা জমজ পুত্রসন্তানের জন্ম দেন; তাদেরই একজন হজরত ইয়াকুব (আ.)।

বলছিলাম তাঁরই স্বপ্নের কথা। ইয়াকুব (আ.) স্বপ্নে দেখেন, পৃথিবী থেকে একটি সিঁড়ি (ল্যাডার) ওপরে উঠে গেছে। সেই সিঁড়ি দিয়ে উঠানামা করছেন নুরের ফেরেশতারা। আল্লাহ তাকে বললেন–

> 'শিগগিরই আমি তোমার ওপর বরকত নাজিল করব। তোমার সন্তান-সন্তদি বৃদ্ধি করে দেবো। তোমাকে ও তোমার উত্তরসূরিদের এই মাটির মালিক করে দেবো।'[১৬]

এই স্বপ্নই 'জ্যাকবস ল্যাডার ড্রিম' নামে পরিচিত। ইহুদিরা যে প্রমিজল্যান্ডের দাবি করে থাকে, তার প্রতিশ্রুতি সেই স্বপ্নের মাধ্যমেই হজরত ইয়াকুব (আ.) পান।

হজরত ইয়াকুব (আ.) অঙ্গীকার করলেন, নিরাপদে পরিবারের কাছে ফেরত যেতে পারলে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ বেথেল-এ আল্লাহর জন্য একটি ইবাদতখানা নির্মাণ করবেন। এ জন্য পাথরের ওপর এক ধরনের বিশেষ তরল পদার্থ দিয়ে জায়গাটা চিহ্নিত করে রাখলেন তিনি। পরবর্তী সময়ে ঠিক এখানেই গড়ে উঠে বায়তুল মুকাদ্দাস।

ইয়াকুব থেকে ইসরাইল

হারানের বাসিন্দাদের কাছে মামা লাবানের খোঁজ করছেন ইয়াকুব (আ.)। পথেই দেখা হয়ে যায় মামাতো বোন রাহেলার সাথে। তিনি ভেড়ার পাল নিয়ে ইয়াকুব (আ.) দিকেই আসছেন। রাহেলা তাকে বাড়িতে নিয়ে যান। মামা লাবানের কাছেই মাসখানেক থেকে যান হজরত ইয়াকুব। এক পর্যায়ে ছোটো মেয়ে রাহেলাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়ে ইয়াকুব (আ.)। তিনি তার মামাকে বললেন– 'এ জন্য মোহরানা হিসেবে প্রয়োজনে আমি সাত বছর আপনার কাজ করতে রাজি আছি।'

এরপর একদিন একটি ভোজের আয়োজন করা হলো। ভোজ শেষে বড়ো মেয়ে লাইয়াকে নিয়ে লাবান এলেন ভাগনে ইয়াকুব (আ.)-এর কাছে।

হারানের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী বড়ো মেয়ের আগে ছোটো মেয়ের বিয়ে দেওয়া সম্ভব ছিল না। ইয়াকুব (আ.)-কে তার মামা বললেন–

> 'তুমি আগে একে বিয়ে করো। এরপর আরও সাত বছর কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিলে রাহেলাও আগামী সপ্তাহেই তোমার হবে।'

ইয়াকুব (আ.) এই মোহরানাও মানলেন। মামার কথা অনুযায়ী লাইয়াকে বিয়ে করার এক সপ্তাহ পর বিয়ে করলেন রাহেলাকে। দুজনের মোহরানা অনুযায়ী (৭+৭) ১৪ বছর

---

[১৬]. নবিদের কাহিনি (প্রথম খণ্ড), মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল গালিব, পৃষ্ঠা-১৭০

মামার বাড়িতে ভেড়া-দুম্বা চড়ালেন ইয়াকুব (আ.)। ইবরাহিমি শরিয়তে দুই বোন একত্রে বিয়ে করা জায়েজ ছিল। পরে হজরত মুসা (আ.)-এর শরিয়তে এটা নিষিদ্ধ করা হয়।[১৭] ইয়াকুবের ঘরে ১২ পুত্রসন্তান জন্ম নেয়। এর মধ্যে দুজন রাহেলার গর্ভের; হজরত ইউসুফ/জোসেফ ও বেনিয়ামিন/বেঞ্জামিন। ইহুদিরা বিশ্বাস করেন, বেনিয়ামিনের জন্ম দিতে গিয়ে রাহেলা মারা যান।

ইহুদি ইতিহাস অনুযায়ী– যমজ ভাই ঈসের আক্রমণের ভয়ে একরাতে জব্বোক নামের এক নদী পেরিয়ে অন্য পাড়ে স্ত্রী-সন্তানদের রেখে আসেন ইয়াকুব (আ.)। হঠাৎ কোথা থেকে এক লোক এসে তাঁর সাথে লড়াই শুরু করে দেয়। লোকটি ইয়াকুব (আ.)-এর রানের জোড়ায় সজোরে আঘাত করে বসে, এতে ইয়াকুবের রানের হাড় সরে যায়। আগন্তুক জিজ্ঞেস করেন– 'তোমার নাম কী?'

'ইয়াকুব।'

লোকটি বলল– 'এখন থেকে ইয়াকুবের নাম হবে ইসরাইল, যার অর্থ যিনি আল্লাহর দাস বা বান্দা।'

এরপর উরশালিম নামক এলাকায় পৌঁছান ইয়াকুব (আ.)। সেখানে শত ভেড়ার বিনিময়ে এক টুকরো জমি কিনে তাতে একটি ইবাদতখানা নির্মাণ করেন। এটিই আজকের বাইতুল মুকাদ্দাসের মূল ভিত্তিভূমি। আর এই ইবাদতখানা সেই জায়গায় নির্মাণ করা হয়, যেখানে তিনি বিশেষ ধরনের তরল পদার্থ দিয়ে চিহ্নিত করে রেখেছিলেন।

স্ত্রী রাহেলার ঘরে জন্ম নেওয়া শিশু ইউসুফ (আ.) ছিলেন খুবই সুদর্শন। তিনি বাবা ইয়াকুবের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। বাবার এই ভালোবাসা বাকি ১০ সৎভাইকে ঈর্ষান্বিত করে তুলল। ভাইয়েরা চক্রান্ত করলেন। একদিন শিশু ইউসুফকে নিয়ে গেলেন মেষ চড়াতে। মূলত এটা ছিল বাহানা। ভাইরা ইউসুফকে একটি কুয়ার মধ্যে ফেলে দিলেন। পরে কাঁদতে কাঁদতে পিতার কাছে গিয়ে বললেন–

> 'আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করতে গিয়েছিলাম এবং ইউসুফকে রেখেছিলাম আসবাবপত্রের কাছে। অতঃপর তাকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে। আপনি তো আমাদের বিশ্বাস করবেন না; যদিও আমরা সত্যবাদী।' সূরা ইউসুফ : ১৭

ইউসুফের বানোয়াট রক্তমাখা জামাও দেখালেন বাবাকে। কিন্তু ইয়াকুব (আ.) তাঁর পুত্রদের কথা কখনোই বিশ্বাস করতে পারেননি।

---

[১৭]. নবিদের কাহিনি (প্রথম খণ্ড), মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল গালিব, পৃষ্ঠা-১৭১

দাস বালক থেকে মিশরের উজির

কোথাও কোথাও উল্লেখ আছে, ইউসুফ তিন দিন কুয়াতে ছিলেন। আবার কেউ কেউ দাবি করে থাকেন– সকালে নিক্ষেপের পর বিকেলেই আরব ব্যবসায়ীদের একটি কাফেলা কুয়া থেকে তাকে উদ্ধার করে। যাহোক, এরা ইউসুফকে নিয়ে হাজির হলো দাস বাজারে। মানুষ কেনা-বেচার সেই হাটে সুদর্শন ইউসুফকে কিনতে রীতিমতো প্রতিযোগিতা লেগে গেল বিত্তশালী খরিদ্দারদের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত তাকে কিনতে পারল প্রভাবশালী এক ব্যক্তি। তিনি হলেন– আজিজে মিশর। এটি কোনো নাম নয়, উপাধি। এর অর্থ মিশরের প্রধান সেনাপতি। ধনাঢ্য এই ব্যক্তি মিশরের সেনাবাহিনীর প্রধানের পাশাপাশি ছিলেন একজন উজির। ইতিহাসে পুতিফার নামেও তিনি উল্লেখিত। বাইবেলে পুতিফারকে মিশর শাসকের নিরাপত্তাকর্মীদের প্রধান বলা হয়েছে। আজিজে মিশরের প্রাসাদেই বেড়ে উঠতে থাকলেন ইউসুফ। পুতিফারের স্ত্রী জুলেখার মিথ্যা অভিযোগে একবার তাকে জেলে যেতে হলো। অথচ ইউসুফ-জুলেখার মধ্যে প্রেম ছিল, এমন মিথ্যা তথ্য হাজির করে নানান কল্পকাহিনি বানানো হয়েছে যুগে যুগে। এখনও তৈরি হচ্ছে সিনেমা, ডকুমেন্টারি ও সিরিয়াল।

মিশরের ফেরাউন একবার এক স্বপ্ন দেখলেন। সেই ঘটনা পবিত্র কুরআনে এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

> 'আমি স্বপ্ন দেখলাম সাতটি মোটাতাজা গাভিকে সাতটি শীর্ণ গাভি খেয়ে যাচ্ছে এবং সাতটি সুবজ শীষ ও অন্যগুলো শুষ্ক। হে পরিষদবর্গ! তোমরা আমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলো, যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যায় পারদর্শী হয়ে থাকো। তারা বলল– "এটা কল্পনাপ্রসূত স্বপ্ন, এরূপ স্বপ্নের ব্যাখ্যা আমাদের জানা নেই।"' সূরা ইউসুফ

রাজ দরবারের সরাব (মদ) পরিবেশক; যাকে একবার ফেরাউনকে বিষক্রিয়ায় হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে কারাগারে পাঠানো হয়েছিল, তিনি এগিয়ে এসে দিলেন স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারীর খোঁজ। তার মনে পড়ে গেল জেলে থাকাকালিন ইউজারসিফ (পুতিফারের প্রাসাদে এই নামেই বেড়ে উঠেছিলেন হজরত ইউসুফ) নামের এক কয়েদি তাঁর স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিয়েছিল– সে মুক্তি পেয়ে পুনরায় ফেরাউনের সরাব পরিবেশক হবে! এই ব্যাখ্যা হুবহু ফলেছিল। ফেরাউনকে যখন এই ঘটনা বলা হলো, তখন তিনি ইউসুফ (আ.)-এর সন্ধানে রাজ কারাগারে লোক পাঠালেন।

ইউসুফ স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিলেন–

> 'তোমরা সাত বছর উত্তমরূপে চাষাবাদ করবে। অতঃপর যা কাটবে, তার মধ্যে সামান্য পরিমাণ খাবে, অবশিষ্ট শস্য শীষসহ রেখে দেবে।

> এরপর আসবে দুর্ভিক্ষের সাত বছর। তোমরা এদিনের জন্য যা রেখেছিলে তা খেয়ে যাবে, কিন্তু অল্প পরিমাণ ব্যতীত, যা তোমরা তুলে রাখবে। এরপরেই আসবে এক বছর, এতে মানুষের ওপর বৃষ্টি বর্ষিত হবে এবং এতে তারা রস নিঙরাবে।'

ইউসুফের কারাগারে যাওয়ার কারণ নতুন করে তদন্ত করা হলো। কারামুক্ত করে বানানো হলো ফেরাউনের একান্ত সহচর। রাষ্ট্রীয় কোষাগারের দায়িত্বও তুলে দেওয়া হলো তাঁর কাঁধে। একসময় দাসবালক ইউসুফ হলেন মিশরের উজির; পেলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বও!

সাত বছর মিশরে অনেক শস্য ফলল। এই বছরগুলোতে পুরো মিশর সাম্রাজ্য ঘুরে চাষাবাদ তদারক করলেন ইউসুফ। উদ্বৃত্তের পুরোটাই জমা করা হলো বিশেষ গুদামে। এরপর শুরু হল ৭ বছরের খরা। এর প্রভাব পড়ল আশপাশের ভূখণ্ডেও। দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রতিবেশী রাজ্যসমূহ থেকে দলে দলে লোকেরা মিশরে আসতে শুরু করল। ইয়াকুব (আ.)-এর আবাসভূমি কেনানও দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসে পতিত হলো। ফলে ইয়াকুব (আ.)-এর পরিবারেও দেখা দিলো খাদ্যাভাব। তারা জানতে পারলেন, মিশরের উজির অত্যন্ত সৎ ও দয়ালু। তিনি কম দামে এক উট পরিমাণ খাদ্যশস্য অভাবী ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরণ করছেন। ইয়াকুব (আ.) তাঁর পুত্রদের মিশর থেকে খাদ্যশস্য নিয়ে আসার জন্য পাঠালেন।

একদিন ১০ জন লোক এলেন মিশরে। ফেরাউনের দরবারে পৌঁছতেই তাদের চিনতে পারলেন ইউসুফ। এরা সেই ১০ ভাই, যারা তাকে অন্ধকূপে ফেলে দিয়েছিল! ইউসুফ তাদের প্রয়োজনীয় শস্য দিতে বললেন। কৌশলে তাদের কাছ থেকে ভাই বেনিয়ামিনের খোঁজও নিলেন।

ইউসুফ ভাইদের বললেন–

> 'পরেরবার তোমাদের ছোটো ভাইটাকে নিয়ে আসবে, না হলে এক দানাও শস্য পাবে না।'

পবিত্র কুরআনে এ ঘটনাকে এভাবে বলা হয়–

> 'অতঃপর ইউসুফ যখন তাদের রসদ প্রস্তুত করে দিলো, তখন বলল– "তোমাদের বৈমাত্রেয় ভাইকে আমার কাছে নিয়ে এসো। তোমরা কি দেখছ না যে, আমি মাপ পূর্ণভাবে দিয়ে থাকি এবং মেহমানদের উত্তম সমাদর করে থাকি? কিন্তু যদি তোমরা তাকে আমার কাছে না আনো, তবে আমার কাছে তোমাদের কোনো বরাদ্দ নেই এবং তোমরা আমার নিকট পৌঁছাতে পারবে না।"'

বনি ইসরাইলিদের মিশর গমন

মিশর থেকে উট বোঝাই শস্য নিয়ে স্বদেশে ফিরেছেন ১০ ভাই। বাবা ইয়াকুব (আ.)-কে এসে ছেলেরা বলছেন–

> 'ছোটোভাই বেঞ্জামিন/ বেনিয়ামিনকে পরেরবার সাথে করে নিয়ে যেতে হবে, অন্যথায় ফেরাউনের উজির আর শস্য দেবেন না! '

একসময় মিশর থেকে আনা শস্য ফুরিয়ে যায়। ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা প্রস্তুতি নিচ্ছেন। যাবেন মিশর, আনতে হবে শস্য। কিন্তু অভিজ্ঞ ও বেদনাহত বাবা ইয়াকুব (আ.) কিছুতেই তাঁর ছোটো ছেলেকে এই দলের সাথে যেতে দেবেন না। কারণ, ইউসুফকে তারা দেখে রাখতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ইয়াকুব (আ.) রাজি হন, তবে শর্ত দিলেন যেকোনো মূল্যে বেনিয়ামিনকে ফেরত আনতে হবে। ইয়াকুব (আ.)-এর সন্তানেরা মিশরে পৌছালে তাদের সম্মানে ভোজসভার আয়োজন করা হলো। সবাইকে বলা হলো জোড়ায় জোড়ায় বসতে। ১১ ভাইয়ের ১০ জন জোড়ায় জোড়ায় বসলেন, কিন্তু জোড়া ছাড়া রয়ে গেলেন বেনিয়ামিন। ইউসুফ আর বেনিয়ামিন বসেন একসঙ্গে।

সেই রাত্রে বেনিয়ামিনকে এক কক্ষে ডেকে নিয়ে ইউসুফ (আ.) বলেন– 'আমিই তোমার হারানো ভাই।' অবশ্য ইউসুফের পরামর্শে এই কথা গোপন রাখে বেনিয়ামিন। পরদিন যখন শস্যের বস্তা উটের পিঠে উঠানো হচ্ছিল, তখন ইউসুফ (আ.)-এর আদেশে একজন গোপনে রাজার সোনার কিংবা রুপার ওজনপাত্র শস্যের থলেতে ঢুকিয়ে দেয়। ইউসুফের ভাইয়েরা কেনানের পথে রওনা হলেন। কিন্তু প্রধান ফটকে তাদের আটকে দেওয়া হলো। পাহারাদাররা চিৎকার করে বলে উঠলেন– 'তোমরা চোর!'

ভাইয়েরা বিস্মিত! তারা বললেন–

> 'আল্লাহর কসম! তোমরা তো জানো, আমরা অনর্থ ঘটাতে এখানে আসিনি। আমরা কখনো চোরও ছিলাম না।' সূরা ইউসুফ : ৭৩

তাদের জিজ্ঞেস করা হলো– 'যদি তোমরা মিথ্যাবাদী হও, তবে যে চুরি করেছে তোমাদের আইনে তার শাস্তি কী?'

ভাইদের জবাব– 'যার সম্পদ চুরি করা হয়েছে, তার দাস হয়ে থাকতে হবে চোরকে। আমরা এভাবেই শাস্তি দিই।'

রাজার সোনার ওজনপাত্র খুঁজে পাওয়া গেল বেনিয়ামিনের থলেতে। তখন অন্য ১০ ভাই বলে উঠলেন– 'এ চুরি করতে পারে, তার ভাইটাও (ইউসুফ) চোর ছিল!'

এরা আসলে জানতই না, সেই ভাই এখানেই আছে এবং তাঁর পরিকল্পনাতেই এমনটা করা হয়েছে!

নিয়ম মাফিক এখন বেনিয়ামিনকে রেখে যেতে হবে, কিন্তু বাবাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতির কথা মনে পড়েছে বড়ো ভাইদের। তারা অনুরোধ করল, বেনিয়ামিনের পরিবর্তে আরেকজনকে রেখে দেওয়া হোক, কিন্তু ইউসুফ তাতে রাজি নন। সবচেয়ে বড়ো ভাই ইয়াহুদা তখন রয়ে গেলেন, বাকি ভাইদের কেনানে পাঠিয়ে দিলেন বাবাকে ব্যাপারটা জানানোর জন্য। এদিকে, ইউসুফও বেনিয়ামিনকে জানিয়ে দিলেন, এটা তারই পরিকল্পনা। ইউসুফকে হারিয়ে কাঁদতে কাঁদতে প্রায় অন্ধই হয়ে গিয়েছিলেন বাবা ইয়াকুব (আ.)। এবার আরেক সন্তানের এমন খবর শুনে মুষড়ে পড়লেন তিনি।

পেটের তাড়নায় ইউসুফের ভাইয়েরা আবার মিশরে এলেন। ইউসুফ এবার নিজের পরিচয় আর লুকালেন না। ষড়যন্ত্রকারী ভাইদের ক্ষমা করে দিলেন।

হজরত ইয়াকুব (আ.)-কে মিশরে নিয়ে আসা হলো– সাথে ইউসুফ (আ.)-এর মাকেও আনা হয়েছিল, এটা কুরআনে উল্লেখ আছে, সূরা ইউসুফ-৯৯। যদিও বাইবেল অনুসারে, ইউসুফের মা তখন জীবিত ছিলেন না। ইয়াকুব (আ.)-এর পুরো পরিবার আবার একত্রিত হলো। ফেরাউনের সাথেও পরিচয় হলো তাদের। এরপর থেকেই মিশরে বসবাস শুরু করল ইয়াকুব (আ.)-এর পরিবার। ইউসুফসহ ইয়াকুব (আ.)-এর এই ১২ পুত্রের মিশরে অভিবাসী জীবন থেকেই পরবর্তী সময়ে ইহুদিদের ১২ গোত্রের সূত্রপাত। এরাই বনি ইসরাইল বা ইসরাইলের সন্তান।

পিরামিড কাদের তৈরি

রাজপ্রাসাদে বেশ চিন্তিত ফেরাউন। ভাবছেন, এই বুঝি মিশর সাম্রাজ্য বনি ইসরাইলিদের হাতে চলে গেল! মিশরের রাজপরিবারের দয়ায় খেয়ে-পরে বেঁচে থাকা ভিনদেশিরা আজ মর্যাদা-প্রতিপত্তিতে বাদশাহকেও ছাড়িয়ে যেতে বসেছে। না, বনি ইসরাইলিদের আর এগোতে দেওয়া যায় না। কেন না, সিংহাসনই হুমকিতে পড়ে গেছে!

ইয়াকুব (আ.)-এর বংশধরদের দেওয়া সব সুযোগ-সুবিধা কেড়ে নিল রাজপরিবার। তাদের আবদ্ধ করা হলো দাসত্বের শৃঙ্খলে। ইজরাইলের বংশধরদের ওপর নির্যাতন-নিপীড়নের ইতিহাস এখান থেকেই শুরু।

ফেরাউন দ্বিতীয় রামিসেস দ্য গ্রেট তার বাণিজ্যিক শহরগুলো তৈরিতে বনি ইসরাইলি ক্রীতদাসদের কাজে লাগালেন। দাস হিসেবে তাদের ওপর নির্যাতন-নিপীড়ন বাড়তেই থাকল। পিরামিড তৈরির জন্য বিশাল বিশাল পাথর বয়ে আনা এবং বাড়িঘর ও রাস্তা-ঘাট নির্মাণের কাজে তাদের ব্যবহার চলতে থাকল।

ইতিহাসের জনক হেরোডোটাস দাবি করে গেছেন, মিশরের ফেরাউনরা ইহুদি দাসদের দিয়েই পিরামিড তৈরি করেছে। পঞ্চাশের দশকে নির্মিত হলিউডের 'দ্য টেন কমান্ডমেন্টস'

মুভিতে দেখানো হয়েছে কীভাবে চাবুক মেরে মেরে ইহুদি দাসদের দিয়ে পিরামিড বানানো হয়। ১৯৭৭ সালে ইজরাইলি নেতা মেনাখেম বেগিন মিশরে গিয়ে একই দাবি করেন; যদিও এ নিয়ে ভিন্নমত আছে। ইতিহাস গবেষকদের কেউ কেউ বলেন– ইহুদি দাস নয়; বরং দিনমজুরদের দিয়েই পিরামিড তৈরি করা হয়েছে। অতি আধুনিক সময়ে এসে 'এক্সোডাস : গডস অ্যান্ড কিংস'-এর মতো মুভি তৈরি হচ্ছে আর এসবে দেখানো হচ্ছে ইজরাইলি জাতির ওপর মিশরের শাসকগোষ্ঠীর নির্যাতন-নিপীড়ন।

ফেরাউন স্বপ্ন দেখছেন– 'বায়তুল মুকাদ্দাসের দিক থেকে এক অগ্নিশিখা এসে মিশরের বাড়িঘর ও কিবতিদের (কিবতিরা ছিল আদি বাসিন্দা, মিশরের মূল অধিবাসী। ফেরাউন ছিল মিশরের কিবতি বংশীয় শাসকদের উপাধি) সকলকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিলো, কিন্তু মিশরে থাকা বনি ইসরাইলিদের কোনো ক্ষতি করল না।'[১৮]

ভীত-সন্ত্রস্ত ফেরাউন জেগে উঠলেন। স্বপ্নের ব্যাখ্যা পেতে রাজদরবারে ডেকে আনা হলো দেশের নামি-দামি জ্যোতিষী ও জাদুকরদের। মিশর শাসককে তারা এক ভয়ংকর তথ্য দিলেন– 'শিগগিরই বনি ইসরাইলে এক পুত্র সন্তান জন্ম নেবে এবং তারই হাতে মিশরবাসী ধ্বংস হবে কিংবা ফেরাউন ধ্বংস হবেন।'

মিশরের ক্রুদ্ধ অধিপতি এবার তার সেনাদের নির্দেশ দিলেন ইজরাইলিদের নবজাতক সকল পুত্রসন্তানকে নদীতে (নীলনদ) ফেলে হত্যা করতে, তবে স্রষ্টার ইচ্ছায় প্রাণে বেঁচে গেলেন এক শিশু। তিনিই হজরত মুসা (আ.)। ইহুদিরা তাকে মোশী বা মোজেশ বলে ডাকেন। ইহুদি ধর্মের প্রবর্তক ধরা হয় হজরত মুসা (আ.)-কে। তাঁর ওপরই নাজিল হয় বড়ো চার আসমানি কিতাবের একটি– তাওরাত বা তৌরিত। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় তোরাহ।

শত্রুর সঙ্গে বসবাস

নবজাতক সব পুত্রসন্তানকে হত্যা করতে হবে; এটি ছিল ফেরাউনের ডিক্রি। এর মধ্যেই বনি ইসরাইলি পরিবারে জন্ম নিল শিশু মুসা (আ.)। সন্তানকে বাঁচাতে দাইয়ের সহায়তায় শিশুটিকে লুকিয়ে ফেললেন মা। তিন মাস লুকিয়ে রাখা সম্ভব হলো। এরপর একটি ঝুড়িতে শিশুটিকে রেখে নীলনদের মধ্যে একটা নলখাগড়ার ঝোঁপে ভাসিয়ে রাখলেন মা। ফেরাউনকন্যা নীলনদের এদিক দিয়েই নিয়মিত গোসল করতেন। সখীদের নিয়ে গোসল করতে এলে তার নজরে পড়ল পানিতে ভাসতে থাকা ঝুড়িটি। সখিরা ঝুড়িটিতে ফুটফুটে একটা শিশু দেখতে পেল। শিশুটিকে দেখে মায়া হলো রাজকুমারীর। শিশুর বড়ো বোন পাশেই দাঁড়িয়েছিল– শেষ পর্যন্ত কী হয় দেখার জন্য।

[১৮]. নবিদের কাহিনি (দ্বিতীয় খণ্ড), মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল গালিব, পৃষ্ঠা-১৫

কী করবেন এই অবুঝ শিশু নিয়ে? রাজকন্যা যখন এমন চিন্তায় মশগুল, তখনই তার পাশঘেঁষে দাঁড়ায় শিশুটির বড়ো বোন। বললেন, তিনি এমন একজন মহিলাকে চেনেন, যে রাজকুমারীর হয়ে শিশুটিকে লালন-পালন করতে পারবেন। মুসা বোন মূলত তাঁর মায়ের কথাই বলছিলেন। এইভাবে শিশুটিকে তাঁর মায়ের কাছেই দেওয়া হলো। ফেরাউনকন্যা শিশুটির নাম রাখলেন মোশে (হিব্রু) বা 'মোজেশ।' আরবিতে মোশের উচ্চারণ মুসা। হিব্রুতে শব্দটির অর্থ ছিল 'তুলে আনা'। পানি থেকে বাচ্চা মুসাকে তুলে আনার কারণেই এই নামকরণ বলে জানা যায়।

রাজপ্রাসাদে প্রিন্স হিসেবেই বেড়ে উঠলেন মোজেশ। একবার গোশেন নামের এক এলাকায় গিয়ে হঠাৎ দেখতে পেলেন, মিশরীয় এক লোক বনি ইজরাইলের এক দাসকে মারছে। ক্রুদ্ধ হয়ে মুসা (আ.) অত্যাচারী ব্যক্তিটিকে ঘুষি মারলেন, এতে লোকটি মারা গেল। যদিও তাকে হত্যা করা মুসার উদ্দেশ্য ছিল না। খুনের দায়ে মুসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে গ্রেফতারের নির্দেশ এলো। পালিয়ে গিয়ে মুসা (আ.) আশ্রয় নিলেন মাদায়েন (হিব্রুতে মিদিয়ান) নামক স্থানে। হিব্রু ইতিহাস অনুযায়ী সেখানকার যাজক ছিলেন জেথরো (তিনি হজরত শোয়াইব আ.)। প্রায় দশ বছর পর এই যাজকের কন্যা সাফুরাকে (হিব্রুতে সিফোরাহ) বিয়ে করে তাদের সাথেই বসবাস শুরু করলেন মুসা (আ.)। এরপর থেকে শ্বশুরের মেষপাল দেখাশোনা করতেন তিনি। এদিকে পিতা-মাতা, ভাই-বোন সবাই রয়েছে মিশরে। তাই স্ত্রী-পরিবার নিয়ে মুসা বের হলেন মিশরের পথে। মিশর সীমান্তবর্তী সিনাই (ইংরেজিতে সাইনাই আর আরবিতে সিনা) পর্বতে এসে পৌঁছালেন তিনি। সেখানেই স্রষ্টার সাথে কথা হলো তাঁর। পেলেন নবুয়ত। এই জায়গাটিই আমাদের কাছে তুর পাহাড় নামে পরিচিত।

মিশরে ফিরেছেন মুসা। ভাই আরোনকে (হজরত হারুন আ.) সাথে নিয়ে ফেরাউনের দরবারে এসে দাবি তুলছেন– 'দাসত্ব থেকে ইজরাইলিদের মুক্তি দিতে হবে, নতুবা অলৌকিক ক্ষমতাবলে (মুজেজা যা আল্লাহ তাকে দিয়েছিলেন) মিশরের ক্ষতি করা হবে।' ফেরাউনের দরবারে পরপর কয়েক দফা অলৌকিক ঘটনা দেখালেন মুসা (আ.)-এর। তারপরও ফেরাউনের মন গলল না।

একবার মিশরের সব নদীর জল রক্তে পরিণত হলো। সারা দেশ কখনো ব্যাঙে, কখনো মশায়, কখনো বা উকুনে ভরে দেওয়া হলো। পশুর মৃত্যু ঘটানো হলো, পঙ্গপাল দিয়ে দেশ ঢেকে ফেলা হলো। সারা মিশরকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করা হলো, তবুও ফেরাউন তার অবস্থান থেকে নড়ল না। তাওরাত অনুযায়ী এভাবে মোট দশটি গজব নেমে এসেছিল মিশরের ওপর। এই দশ অভিশাপ বা গজব ইংরেজিতে 'মিশরের প্লেগ' নামে পরিচিত। সবশেষ অভিশাপ হিসেবে ফেরাউনসহ সকল মিশরীয়র প্রথম সন্তানের মৃত্যু ঘটানো হলো। এইবার সন্তান হারানো মিশরের শাসক মুসা (আ.)-এর প্রস্তাবে রাজি হলেন।

বনি ইজরাইলিদের নিয়ে কেনানের পথে মুসা (আ.)-এর যাত্রা শুরু হলো। বহু দূরের পথ পাড়ি দিয়ে সঙ্গীদের নিয়ে এসে পৌঁছলেন লোহিত সাগরের তীরে, কিন্তু বিপদ ধেয়ে আসছে। পিছু পিছু এলো ফেরাউন ও তার সৈন্যদল। ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন ইয়াকুব (আ.)-এর বংশধররা। স্রষ্টার দেওয়া অলৌকিক ক্ষমতাবলে হাতের লাঠি পানিতে ছোঁয়ালেন মোজেশ। উঁচু পাহাড়ের মতো দুই পাশে দাঁড়িয়ে গেল জলরাশি। মাঝখান দিয়ে তৈরি হলো রাস্তা। দলবল নিয়ে নিরাপদেই অপর তীরে পৌঁছালেন হজরত মুসা (আ.)। সেনাদের নিয়ে সাগরের মাঝখানের রাস্তা দিয়ে মুসা (আ.)-কে অনুসরণ করছিল ফেরাউন। সব সেনা যখন লোহিত সাগরের বুকে, ঠিক তখনই সাগর ফিরে গেল তার পুরোনো চেহারায়। পানিতেই ডুবে মরল ফেরাউন ও তার বাহিনী। দলবল নিয়ে মুসা (আ.) এসে পৌঁছলেন সিনাই-এর মরু প্রান্তরে। এখানে ৪০ বছর ধরে যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়াল বনি ইসরাইলরা। ৪০ বছর পর সিনাই পর্বতের পাদদেশে স্রষ্টার সাথে আবার সাক্ষাৎ হলো মুসা (আ.)-এর। সেই সাক্ষাতে স্রষ্টার সাথে সন্ধি হলো তাঁর।

হজরত মুসা (আ.)-এর মাদিয়ানে অবস্থানকালে মারা যায় ফেরাউন দ্বিতীয় রামিসেস। মুসা (আ.)-এর পরবর্তী ঘটনাগুলো ঘটে রামেসিসের উত্তরাধিকারী (ভাতিজা) মারনেপতাহর রাজত্বকালে। তিনিই মুসা (আ.)-কে তাড়া করতে গিয়ে সসৈন্যে ডুবে মারা যান লোহিত সাগরে। ১৯০৭ সালে তার মমি আবিষ্কৃত হয়। সিনাই উপদ্বীপের পশ্চিম তীরে জাবালে ফেরাউন নামে একটি ছোটো পাহাড় আছে। এখানেই ফেরাউনের লাশ পাওয়া যায় বলে জনশ্রুতি আছে। এই মরদেহ এখনও রাখা আছে কায়রো মিউজিয়ামে।

টেন কমান্ডমেন্টস

হিব্রু বাইবেল বা ওল্ড টেস্টামেন্ট অনুযায়ী হজরত মুসা (আ.) সিনাই পর্বতে দৈববাণী লাভ করেন। এই দৈববাণী ১০টি মূল্যবান নির্দেশনা বা টেন কমান্ডমেন্টস (Ten Commandments) নামে পরিচিত। ১৯৫৬ সালে হজরত মুসার (আ.)-এর জীবনী নিয়ে একটি মুভি নির্মিত হয়, যার নাম দেওয়া হয় 'The Ten Commandments।' যাহোক, ইহুদিদের জন্য এই ১০টি নির্দেশনা হলো জীবন পরিচালনার মূল ধর্মীয় অনুশাসন। সেগুলো হলো–

১. জিহোভা একমাত্র দেবতা, তারই ইবাদত করতে হবে।
২. মূর্তিপূজা করা যাবে না।
৩. অকারণে ঈশ্বরের নামে শপথ করা যাবে না।
৪. একদিন সকল কাজকর্ম বন্ধ রেখে ধর্মীয় ইবাদতে মশগুল থাকতে হবে (এই নির্দেশনার ভিত্তিতে শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ইহুদিরা সব কাজ বন্ধ রেখে স্রষ্টার আরাধনা করে থাকে)।

৫. পিতা-মাতাকে সম্মান করতে হবে।
৬. কাউকে হত্যা করা যাবে না।
৭. পবিত্র জীবনযাপন করবে, কোনো অবৈধ যৌন সম্পর্ক করা যাবে না।
৮. চুরি করা যাবে না।
৯. মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া যাবে না।
১০. পরের ধন-সম্পত্তিতে লোভ করা যাবে না।

যাযাবর জীবন

মুসা (আ.) তাঁর অনুসারীদের নিয়ে শাম দেশের (তখনকার সময় কেনান, সিরিয়া, আজকের লেবানন ও জর্ডানকে একত্রে শাম দেশ বলা হতো) উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে নির্দেশ পেলেন– জিহাদ করে আদি বাসস্থান কেনান দখল করতে হবে। সমগ্র শামে তখন ছিল আমালেকাদের রাজত্ব। এই আমালেকারা ছিল আদ বংশের লোক, একেকজন বিশালদেহী ও দুর্ধর্ষ প্রকৃতির। নবি মুসা (আ.)-এর মাধ্যমে আল্লাহ বনি ইসরাইলিদের আগাম বিজয়ের সুসংবাদ দিলেন, তবুও তারা জিহাদে যেতে রাজি হলেন না। আল্লাহর অবাধ্যতার শাস্তিস্বরূপ মিশর ও শামের মধ্যবর্তী তিহ প্রান্তরে (রেফিদিমে) তারা প্রায় ৪০ বছর একরকম অবরুদ্ধ জীবনযাপন করলেন। এখানে মুসা (আ.)-এর অনুসারীরা কয়েক দফায় হামলারও শিকার হলেন।

মুসা (আ.) তাদের নিয়ে লোহিত সাগর পাড়ি দিয়ে জর্ডান নদীর (কেউ কেউ অবশ্য লিতানি নদীর কথা বলে থাকেন) তীর পর্যন্ত এলেন, কিন্তু নদী পেরিয়ে কেনানে পা রাখতে পারলেন না, তার আগেই মারা যান। তবে কোথাও কোথাও জর্ডান নদী পেরিয়ে আরিহা নামক স্থানে শিবির স্থাপন করার কথা উল্লেখ আছে। তবে তিনি যে কেনানে পৌছাতে পারেননি, এ বিষয়ে দ্বিমত নেই। ইহুদি ধর্মের প্রবতর্ক প্রতিশ্রুত ভূমিতে পৌছাতে পারেননি।

পরবর্তী সময়ে ইহুদিরা জশুয়ার নেতৃত্বে কেনান বা প্যালেস্টাইনে এলেন খ্রিষ্টপূর্ব ১২০০ সালের দিকে। জশুয়া একে একে জয় করলেন পার্বত্য অঞ্চল, নেগেভ, নিম্নভূমি ও পাহাড়ি এলাকা। বাইবেল অনুসারে জশুয়ারা জেরুজালেম, হেবরন ও জেরিকোসহ ৩০টি রাজ্য দখল করেন। কোনো রাজাকেই তারা জীবিত রাখেননি।

এরপর বনি ইসরাইলের ১২ গোত্রের সবাইকে কেনানের একটি করে অংশ দেওয়া হলো। যশুয়া বহু রাজ্য জয় করলেও তাড়িয়ে দিতে পারলেন না জেরুজালেমে বসবাসরত জেবুসিতদের।[১৯] এই জেবুসিতরা হজরত দাউদ (আ.)-এর সময়েও জেরুজালেম ছাড়েননি

[১৯]. Jerusalem: One City, Three Faiths, Karen Armstrong, অনুবাদ মোহাম্মদ হাসান শরীফ, অনুবাদ পৃষ্ঠা-৪৯, অন্যধারা প্রকাশনী।

কিংবা তাদের তাড়ানো সম্ভব হয়নি। অথচ এর দুই পাশের দুই ভূখণ্ড– ইজরাইল ও জুদা নিয়ে দাউদ (আ.) গড়েছিলেন ঐক্যবদ্ধ রাজ্য।

ইহুদিদের অত্যাচারিত হওয়ার ইতিহাস যেমন সত্য, তেমনি সত্য তাদের দখলদারিত্বের ইতিহাস ও গণহত্যার সাথে সম্পৃক্ততার তথ্যও। ইহুদিদের বাকি ১০ গোত্র কেনানীয়দের সাথে সামাজিক ও বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে তুলল। এইভাবে একপর্যায়ে তারা আসল পরিচয় হারিয়ে স্থানীয়দের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল।

এই যখন ইহুদিদের অবস্থা, তখন স্রষ্টা তাদের মাঝে একজন বিচারক পাঠালেন। এই বিচারকদের কেউ কেউ নবির মর্যাদাও পেলেন। ইহুদিরা বারবার স্রষ্টাকে অস্বীকার করল, বারবার স্রষ্টার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল; স্রষ্টাও বারবার তাদের ক্ষমা করে দিলেন। সবশেষ বিচারক হিসেবে আসলেন শ্যামুয়েল। শ্যামুয়েল তার দুই পুত্রকে বীরশেবাতে বিচারক নিযুক্ত করলেন। কিন্তু দুর্নীতি, অনিয়মসহ নানান কারণে তাদের মেনে নিতে পারল না ইহুদিসমাজ। তারা শ্যামুয়েলকে তাগাদা দিতে থাকল বিচার ব্যবস্থার জন্য একজন রাজা ঠিক করে দেওয়ার জন্য। পরে স্রষ্টার আদেশে বীরজোদ্ধা সৌলকে রাজা নিয়োগ দিলেন শ্যামুয়েল। এভাবেই ইহুদি ইতিহাসে নবি বা বিচারকের পরিবর্তে রাজার আগমন ঘটল। রাজা সৌল ছিলেন বেঞ্জামিন গোত্রের। কেনানের আগের যেকোনো রাজার চেয়ে অনেক বড়ো ভূখণ্ড শাসন করেছিলেন তিনি।

সৌল ইজরাইলিদের ওপর নিজের রাজত্ব মজবুত করলেন। বিভিন্ন যুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের হারিয়ে ইহুদিদের রক্ষা করলেন। হারিয়ে দিলেন আমালেকাদেরও। এভাবে প্রায় ২০ বছর রাজত্ব চালিয়ে গেলেন তিনি।

একদিন সৌলের রাজদরবারে তরুণ ডেভিডকে (দাউদকে) নিয়ে এলো শ্যামুয়েল। সৌল সবকিছু দেখে তাকে বর্ম বহনকারী হিসেবে নিয়োগ দিলেন। একবার ফিলিস্তিন ও ইজরাইলিদের মধ্যে যুদ্ধ বাধল। ফিলিস্তিনিরা সৌলের বাহিনীকে হটাতে ইলাহ উপত্যকার দিকে এগিয়ে গেল, কিন্তু পথেই তাদের থামিয়ে দিলো সৌল ও তার বাহিনী। ফিলিস্তিনিরা নিয়ে এসেছিল 'গোলিয়াথ' নামক বিশালদেহী এক ব্যক্তিকে। তিনি ছিলেন ছয় হাত লম্বা। তার মাথার শিরোস্ত্রাণ ও শরীরের বর্ম– দুটোই ছিল ব্রোঞ্জের তৈরি। যুদ্ধ শুরু হলো। ফিলিস্তিনিরা প্রস্তাব করল উভয় পক্ষের দুই সেরা যোদ্ধা মুখোমুখি হবে। তাদের জয়-পরাজয় দিয়েই নির্ধারিত হবে যুদ্ধের ভাগ্য। রাজা সৌল ঘোষণা দিলেন, গোলিয়াথকে যে হত্যা করতে পারবে, তার সাথে নিজ কন্যা মিচেলের বিয়ে দেওয়া হবে।

গোলিয়াথকে মোকাবিলার সিদ্ধান্ত নিলেন ডেভিড। যুদ্ধ শুরু হলে গোলিয়াথের কপালে ছোটো পাথর দিয়ে সজোরে আঘাত করলেন তিনি। অকস্মাৎ পাথরের আঘাতে মাটিতে

লুটিয়ে পড়লেন ছয়হাত লম্বা গোলিয়াথ। দাউদ পলকেই শিরোশ্ছেদ করে ফেললেন গোলিয়াথের। শর্ত অনুযায়ী যুদ্ধে হেরে গেল ফিলিস্তিনিরা। এই বীরত্বের পর সৌলের বাহিনীতে দ্রুত পদোন্নতি পেলেন ডেভিড।

এই রণাঙ্গন আইন জালুতের প্রান্তর নামে পরিচিত। এখানেই ১২৬০ সালে মঙ্গোলদের কচুকাটা করে মিশরের মুসলিম শাসক সাইফুদ্দিন কুতুজের সেনারা।

রাজা ডেভিডের অভিষেক

খ্রিষ্টপূর্ব ১০১০ সালে ফিলিস্তিনিরা পুনরায় জুডায়/জুদায় অভিযান চালাল। মাউন্ট গিলবোয়ার যুদ্ধে পরাজিত হলো রাজা সৌল। তার ছেলে জোনাথনও এতে নিহত হলো। পরে পুত্রশোকে আত্মহত্যার পথ বেছে নিল সৌল।

এই গোলযোগপূর্ণ সময়ে জুদার দক্ষিণের গোত্রগুলো ডেভিডকে রাজা ঘোষণা করল। রাজা হয়ে হেবরনকে রাজধানী ঘোষণা করলেন ডেভিড। অন্যদিকে, জুডার উত্তরের (ইজরাইল) গোত্রগুলো সৌলের একমাত্র জীবিতপুত্র ইসবোথহেথকে রাজা ঘোষণা করল। এইভাবে জেরুজালেমের প্রাচিন আদিবাসী জেবুসিতদের দুই পাশে গড়ে উঠল দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী রাজ্য। বহু বছর ধরে লড়াই চলল তাদের মাঝে। এক যুদ্ধে নিহত হলো ইসবোথহেথ, ফলে উত্তরের ইহুদি গোত্রগুলোও ডেভিডকে রাজা হিসেবে মেনে নিল। জুডা ও ইজরাইলি ভূখণ্ড চলে এলো ডেভিডের দখলে। দুই ভূখণ্ডের ক্ষমতা পেয়ে বাসিন্দাদের বিভাজন কাটিয়ে তাদের এক কাতারে নিয়ে এলেন তিনি।

হেবরনকে সাত বছর রাজধানী রাখার পর নতুন রাজধানী হিসেবে জেরুজালেমকে ঘোষণা করা হলো। ডেভিডের ৪০ বছরের শাসনামলের মধ্যে বাকি ৩৩ বছর রাজধানী হিসেবে জেরুজালেমই টিকে রইল।

জেরুজালেম ছিল মরিয়াহ পর্বতের একটি সুরক্ষিত দুর্গ। সৌলের রাজধানী গিবিত্তন, হেবরন ও শিলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে জেরুজালেম শহর। পুরোনো হিসেবে গিবিত্তন থেকে তিন মাইল দক্ষিণে, হেবরন থেকে ২৮ কিলোমিটার উত্তরে এবং শিল থেকে ৪১ কিলোমিটার দক্ষিণে জেরুজালেম শহরের অবস্থান। এখানে বসবাস করত জেবুসিত (সেবুসিত) গোষ্ঠী। তাদের হটিয়েই জেরুজালেম দুর্গ দখল করেন ডেভিড (হজরত দাউদ আ.)। তবে তাঁর জেরুজালেম শহর জয়ের ব্যাপারটি অস্পষ্ট ও অপূর্ণাঙ্গ।

তিনি কি জেবুসিতদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন? সম্ভবত না। জেরুজালেম জয় করলেও নগররাষ্ট্রের অধিবাসীদের তিনি তাড়িয়ে দেননি, তবে বাইবেলে এটা বলা নেই– তিনিই নগরীটি জয় করেছেন। একদল ইতিহাসবিদের মতে– তিনি জায়নের দুর্গটি

(জেরুজালেম দুর্গ) জয় করেন এবং সেখানে বসবাস করেন। জেরুজালেমকে তখন জেবুসিতদের পার্শ্বদেশ বলা হতো। সেই হিসেবে এটা বলা সম্ভব, সেই সময়ে জায়নের দুর্গ ও জেরুজালেমকে আলাদা করে দেখা হতো।

জেরুজালেমের অধিবাসীদের জায়গায় ইহুদিদের (জিহোভাবাদীদের) স্থলাভিষিক্ত করার কোনোও রেফারেন্স নেই। ফলে ডেভিড যদি জেরুজালেম জয় করেও থাকেন, তাহলে এই দাবিই অধিকতর যুক্তিযুক্ত, তিনি জেবুসিতদের তাড়িয়ে দেননি; রেখে দিয়েছিলেন। শেষ জেবুসিত রাজা অরুনাহকে নগরীর বাইরে মাউন্ট জায়ানের উপকণ্ঠে তার স্টেটে রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তা ছাড়া বাইবেলও বলছে– জেবুসিত ও জুদাবাসী তখনও নগরীতে পাশাপাশি বসবাস করছিল।[২০] অর্থাৎ ডেভিড/হজরত দাউদ (আ.) জেরুজালেমের আদিবাসীদের তাড়িয়ে অবৈধ বসতি স্থাপনে ইহুদিদের উৎসাহ দেননি।

দাউদ (আ.) জেরুজালেম নগরীর নতুন নাম দিলেন 'সিটি অব ডেভিড' বা 'দাউদ নগরী, তখনকার জেরুজালেম আয়তনে ছিল বেশ ছোটো; মাত্র ১৫ একর। একই সময়ে ব্যাবিলন শহরের আয়তন ছিল প্রায় আড়াই হাজার একর। ১৫ একরের দাউদ নগরীতে দুই হাজারের বেশি লোকের ঠাঁই হতো না।

দাউদ (আ.) বিভিন্ন উপজাতিকে একত্রিত করে দাউদ রাজ্য নামে একটি বহু জাতীয় ফেডারেশন গড়লেন। জেরুজালেমের দেয়াল মেরামত করে তাতে স্থাপন করলেন 'আর্ক অব দ্য কোভেন্যান্ট' (স্রষ্টার পক্ষ থেকে পাঠানো একটি বাক্স)। বলা হয়ে থাকে, দাউদ (আ.) পরবর্তী সময়ে এমন এক রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন, যার বিস্তৃতি ছিল লেবানন থেকে মিশর পর্যন্ত এবং পূর্ব দিকে আজকের জর্ডান ও সিরিয়া পর্যন্ত।

১৯৯৩ সালে ইজরাইলের উত্তরাঞ্চলে খ্রিষ্টপূর্ব নবম শতকের একটি লিপি পাওয়া যায়। এতে জুডার রাজাদের ডেভিডের বংশধর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে স্পষ্ট হয়– তিনি ছিলেন জুডা রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, যা দাউদ রাজ্য নামেও পরিচিত ছিল।

দাউদ জেরুজালেম নগরী সম্প্রসারণ করতে থাকলেন। সরকারি কর্মকর্তা, শিল্পী ও সৈন্যদের থাকার জায়গা করলেন। শহরটি সম্প্রসারণ করতে গিয়ে ভেঙে ফেললেন এর পুরোনো প্রাচীরগুলো। তারপর জিহোভার অনুসারীদের জেরুজালেমে নিয়ে এলেন, কিন্তু তিনি টেম্পল নির্মাণ করে যেতে পারেননি।

---

[২০]. Jerusalem: One City, Three Faiths, Karen Armstrong, অনুবাদ মোহাম্মদ হাসান শরীফ, অনুবাদ পৃষ্ঠা-৬৮, ৬৯, অন্যধারা প্রকাশনী।

হজরত সুলাইমান (আ.) ও রহস্যময় 'আর্ক অব দ্য কোভেন্যান্ট'

দাউদ (আ.)-এর পর রাজা হলেন তাঁর পুত্র হজরত সুলাইমান (আ.)। মৃত্যুর আগে সুলাইমান (আ.)-কে 'মরিয়াহ' পর্বতে একটি ঘর নির্মাণের আদেশ দিয়ে যান দাউদ (আ.)। বাবার নির্দেশমতো একটি সুন্দর রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করলেন সুলাইমান (আ.)। সেখানে স্থাপন করা হলো– মুসা (আ.) কর্তৃক নির্মিত প্রজ্জলিত বাতিদান। এই প্রাসাদকেই ইহুদিরা দেবতা জিহোভার প্রাচীনতম মন্দির বা ফার্স্ট টেম্পল মনে করে থাকে।[২১] এটি 'টেম্পল অব সলোমন' নামেও পরিচিত।

হিব্রু বাইবেল অনুযায়ী, টেম্পল ছিল ঈশ্বরের নিজের ঘর। সুলাইমান (আ.)-এর হাতে তৈরি হওয়া এই ঘর ছিল লম্বায় একশো ৮০ ফুট, প্রস্থে ৯০ ফুট আর উচ্চতায় ৫০ ফুট।[২২] তবে এটি লম্বায় ২০৭ ফুট বলেও কোথাও কোথাও উল্লেখ আছে। খাঁটি সোনা দিয়ে ঘরের ভেতরের অংশ মুড়ে দেওয়া হয়। কথিত আছে, মিশর থেকে ইহুদিরা আসার চারশো ৮০ তম বর্ষে হজরত সুলাইমান (আ.) এই ঘর নির্মাণের কাজ শুরু করেন।

সাত বছর ধরে চলল নির্মাণকাজ। নির্মাণের সকল কাজ শেষ হলে আগের জায়গা থেকে এনে সেখানে স্থাপন করা হলো 'আর্ক অব দ্য কোভেন্যান্ট' (Ark of The Covenant). এই আর্ক অব দ্য কোভেন্যান্ট মূলত একটি সিন্দুক বা বাক্স, যা একাশিয়া বা বাবলা কাঠের তৈরি। সিন্দুকটি স্রষ্টার পক্ষ থেকে পাঠানো। হিব্রু বাইবেল অনুসারে– এর ভেতরে রাখা আছে সৃষ্টিকর্তার ১০টি অনুশাসনের বাণী (টেন কমান্ডমেন্টস)সম্বলিত দুটি প্রস্তরখণ্ড। সিনাই পর্বতে টানা ৪০দিন থাকার পর সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে মুসা (আ.) আর্ক অব দ্য কোভেন্যান্ট তৈরির নির্দেশ পান। এটিকে ইসরাইলের সৌন্দর্য নামেও অভিহিত করা হয়। পুরো বাক্সের ভেতর ও বাইর সোনার পাত দিয়ে মোড়ানো। ইহুদি ইতিহাস অনুযায়ী– তাদের লেভাই নামক গোত্র এটি বহন করত। আর্ক অব দ্য কোভেন্যান্ট লম্বায় আড়াই ফুট এবং উচ্চতা ও প্রশস্তে দেড় ফুট। এটি বহন করার জন্য রয়েছে দুটি হাতল। মঙ্গলের আশায় যুদ্ধক্ষেত্রেও এই আর্ক বহন করে নিয়ে যাওয়া হতো বলে ইহুদি ইতিহাসে জানা যায়।

কিন্তু সুলাইমান (আ.)-এর স্থাপন করা আর্ক অব দ্য কোভেন্যান্ট এখনও সেখানে রয়েছে কি না, এ নিয়ে রয়েছে গভীর রহস্য। কারও কারও মতে– ব্যাবিলন সম্রাট নেবুচাদনেজার যখন সলোমনের মন্দির ধ্বংস করেন, তখন তিনি আর্ক অব দ্য কোভেন্যান্ট সাথে করে নিয়ে যান। আবার কেউ কেউ দাবি করেন, হজরত সুলাইমান (আ.) এই সিন্দুকটির ধ্বংসাত্মক ক্ষমতার কথা বুঝতে পেরে মন্দির থেকে গোপনে সরিয়ে নিয়ে ডেড-সির কাছে

---

[২১]. Rick Steves' The Holy Land: Israelis and Palestinians Today, Nov 7, 2014.

[২২]. The First Temple -Solomon's Temple -Jewishvirtual Library, https://www. jewishvirtuallibrary.org/the-first-temple-solomon-s-temple

কোনো এক গুহায় লুকিয়ে রাখেন। আবার এটাও বলা হয়ে থাকে– সুলতান সালাউদ্দিন আইয়ুবির সময় নাইট টেম্পলার যোদ্ধারা সিন্দুকটি জেরুজালেম থেকে আয়ারল্যান্ডে নিয়ে যায়।

কিন্তু এসব দাবির পক্ষে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তাহলে এটি কোথায় আছে? কিংবা বাস্তবেই কি 'আর্ক অব দ্য কোভেন্যান্ট' বলতে কিছু ছিল? পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারায় বলা আছে–

> 'বনি-ইজরাইলিদের নবি আরও বললেন, তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে একটা সিন্দুক আসবে, যেন তোমাদের মনে সন্তুষ্টি আসে। তাতে থাকবে মুসা, হারুন (মুসার ভাই) এবং তাঁদের সন্তানবর্গের পরিত্যক্ত কিছু সামগ্রী। সিন্দুকটিকে বয়ে আনবে ফেরেশতারা। তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাকো, তাহলে এতে তোমাদের জন্য নিশ্চিতই পরিপূর্ণ নিদর্শন রয়েছে।' সূরা বাকারা : ২৪৮

তার মানে সিন্দুকের ব্যাপারটি মিথ্যে বলে উড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ নেই। তবে গুরুত্বপূর্ণ হলো– এই সিন্দুকটি অর্থাৎ 'আর্ক অব দ্য কোভেন্যান্ট' এখন কোথায়? অনেকেই বিশ্বাস করেন, জেরুজালেমের ফার্স্ট টেম্পলের তলদেশের কোনো এক গুপ্ত কুটুরিতে এটি লুকায়িত অবস্থায় আছে; এখন পর্যন্ত এই বক্তব্যেরও সত্যতা যাচাই করে দেখা সম্ভব হয়নি। ইহুদিরা এর অস্তিত্ব প্রমাণে বহুবার খোঁড়াখুঁড়ি করেছে এবং এ কাজ অব্যাহত রাখার ঘোষণাও দিয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

জেরুজালেম ও বাইতুল মুকাদ্দাস

'জেরুজালেম ছাড়া ইজরাইল আত্মাহীন একটি দেহ।'

—এলহানান লেইব লিওনসকি।

শান্তির শহর

ইসলামের তৃতীয় সম্মানজনক শহর জেরুজালেম। প্রথম সম্মানজনক শহর মক্কা, যেখানে আছে মসজিদুল হারাম। দ্বিতীয় সম্মানজনক শহর মদিনা। আল্লাহ এই শহরটি সম্মানিত করেছেন মসজিদে নববি দ্বারা। আর জেরুজালেমকে সম্মানিত করা হয়েছে বায়তুল মুকাদ্দাস দ্বারা। এই জেরুজালেমের মূল আকর্ষণ এখন দুটি– ডোম অব দ্য রক আর সেপালচার গির্জা।

শত শত বছরের পুরোনো নগরী জেরুজালেমের অবস্থান জুডিয়া পাহাড়ি এলাকার মালভূমিতে। এই পাহাড়ি এলাকার অবস্থান ভূমধ্যসাগর আর মৃত সাগরের মাঝখানে। ভূমধ্যসাগর থেকে জেরুজালেমের দূরত্ব ১৬২০ কিলোমিটারেরও বেশি আর মৃতসাগর বা ডেড-সি থেকে পবিত্র এই নগরীর দূরত্ব মাত্র ৩৩ কিলোমিটার। ইহুদি বর্ণনা অনুযায়ী– জেরুজালেম প্রায় পুরোপুরি ধ্বংস হয় দুইবার। প্রথমবার ব্যাবিলন সাম্রাজ্যের হাতে, দ্বিতীয়বার রোমানদের হাতে। কেনানের আদিবাসীরা জেরুজালেমকে 'উরুসালিমা' বা শালিমের শহর বলত। এই শালিম ছিল তাদের এক দেবতা। হিব্রুতে শালিম শব্দের অর্থ শান্তির শহর। আরবিতে এ শহরকে কুদস বলা হয়।

দাউদ (আ.)-এর সময়ে যে ক্ষুদ্র জেরুজালেম ছিল, এখন তা আয়তনে অনেক বেড়েছে। ধাপে ধাপে এই নগরীকে বড়ো করা হয়। বর্তমানে শহরটির আয়তন দাঁড়িয়েছে ১২৫ বর্গকিলোমিটার, যেখানে বসবাস করছে ৯ লাখের মতো মানুষ। পুরোনো জেরুজালেমকে এখন বলা হয় 'ওল্ড সিটি', যার আয়তন প্রায় এক বর্গকিলোমিটার।

অটোমান সুলতান সুলেমান খান পুরোনো শহরের চারপাশে দেয়াল তুলে দিয়েছিলেন, জুড়ে দিয়েছিলেন এখানে প্রবেশের আটটি ফটক। তাঁর বাবা সুলতান প্রথম সেলিমের আমলেই শহরটির নিয়ন্ত্রণ পেয়েছিল অটোমানরা, সেটা ১৫১৭ সালের ঘটনা। তার আগের বছর বর্তমান সিরিয়ার আলেপ্পোর কাছে মামলূকদের হারিয়েছিলেন সেলিম। জেরুজালেম তখন ছিল এই মামলুকদের নিয়ন্ত্রণে। শহরটিতে পৌঁছালে সুলতান সেলিমের হাতে 'ডোম অব দ্য রক' ও আল আকসা মসজিদের চাবি তুলে দেওয়া হয়। সুলতান সুলেমানের নির্দেশে পুরোনো জেরুজালেমের দেয়াল চল্লিশ ফুটের মতো উঁচু করা হয়, চওড়া করা হয় আট ফুটেরও বেশি।

ডোম অব দ্য রক।

পুরোনো জেরুজালেম বা ওল্ড সিটি ঐতিহ্যগতভাবে চার ভাগে বিভক্ত : আর্মেনীয়, ইহুদি, খ্রিষ্টান ও মুসলিম অংশ।[২৩] এগুলোর মধ্যে মুসলিম মহল্লা হলো সবচেয়ে বড়ো ও জনবহুল। শহরের উত্তর-পূর্ব কোণের এই অংশে মুসলমানদের পাশাপাশি ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের বসবাস আছে। শহরের উত্তর-পশ্চিম অংশে আছে খ্রিষ্টান মহল্লা। পূর্বে দামাস্কাস গেইটে মুসলিম মহল্লার সাথে এর সীমানা রয়েছে। ইহুদি মহল্লাটি অবস্থিত শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে। খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম শতক থেকে এখানে ইহুদিরা ধারাবাহিকভাবে বসবাস করে আসছে বলে দাবি করা হয়ে থাকে। চারটি অংশের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম হলো আর্মেনীয় মহল্লা। আর্মেনীয়রা খ্রিষ্টান হলেও এদের ধর্ম পালনে ভিন্নতা রয়েছে। এখানে আর্মেনীয়দের সংখ্যা হাজারেরও কম।

---

২৩. Rick Steves' The Holy Land: Israelis and Palestinians Today, Nov 7, 2014.

জর্ডানের প্রস্তাবে ১৯৮১ সালে ওল্ড সিটিকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে ঘোষণা করে ইউনেস্কো।[২৪] খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দে রাজা ডেভিড জেরুজালেমকে তার রাজ্যের রাজধানী বানান। আর তার পুত্র সলোমন/হজরত সুলাইমান (আ.) খ্রিষ্টপূর্ব ৯৫৭ অব্দে সেখানকার টেম্পল মাউন্ট এলাকায় ফার্স্ট টেম্পল বা প্রথম উপাসনালয়ের (জিহোভা মন্দির-হিব্রু বাইবেল মতে) নির্মাণকাজ শেষ করেন। ইহুদিরা বলছে, এ জায়গাই এখন বাইতুল মুকাদ্দাস কম্পাউন্ড নামে পরিচিত।

মক্কার মসজিদুল হারামের মতো ওল্ড সিটির 'টেম্পল মাউন্ট' কমপ্লেক্সটিও মুসলমানদের কাছে পরিচিত হারাম শরিফ নামে। উমাইয়া শাসনামল থেকেই এখানে রয়েছে তিনটি ঐতিহাসিক স্থাপনা মসজিদুল আকসা, ডোম অব দ্য রক এবং ডোম অব দ্য চেইন। 'ডোম অব দ্য রক'-এর পাশে 'ডোম অব দ্য চেইন'-এর মতো আরও আছে 'ডোম অব প্রফেট' ও 'ডোম অব অ্যাসেনশন।' রকের পরেই সেখানকার সবচেয়ে বড়ো গম্বুজ চেইন। ডোম অব দ্য রকের মতো এরও নির্মাতা খলিফা আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান। এই যে টেম্পল মাউন্ট এলাকা, তার সবকিছু দেখাশোনা করে থাকে ইসলামি ওয়াকফ ট্রাস্ট, যার সদর দফতর জর্ডানে।[২৫]

বায়তুল মুকাদ্দাস বহু বছর মুসলমানদের প্রথম কিবলা ছিল। নবুওয়তের দশম বছরে মক্কায় নামাজ ফরজ হওয়া থেকে শুরু করে মদিনায় হিজরত করার পর দীর্ঘ ১৬ মাস পর্যন্ত মহানবি (সা.) ও সাহাবিরা এদিকে ফিরেই নামাজ আদায় করতেন, যতক্ষণ না পবিত্র কুরআনে কাবার দিকে কিবলা পরিবর্তনের নির্দেশ আসে।[২৬] খ্রিষ্টপূর্ব ৫৮৬ সালে ব্যাবিলনীয়রা ধ্বংস করে দেয় ফার্স্ট টেম্পল।[২৭] ইহুদিয়া প্রদেশের পারস্য অঞ্চলের গভর্নর জেরুবাবেলের পৃষ্ঠপোষকতায় খ্রিষ্টপূর্ব ৫১৬ সালে একই জায়গায় নির্মিত হয় সেকেন্ড টেম্পল। কিন্তু ইহুদি-রোমান যুদ্ধের পরিণামে আবার ৭০ খ্রিষ্টাব্দে রোমানদের হাতে ধ্বংস হয় এই উপাসনালয়। ইহুদি ভবিষ্যদ্‌বাণী অনুযায়ী– এখানেই নির্মিত হবে থার্ড টেম্পল বা তৃতীয় উপাসনালয়।

মুসলমানদের প্রথম কিবলা বায়তুল মুকাদ্দাস। আরবিতে 'বায়তুল মুকাদ্দাস' হিসেবে পরিচিতি লাভের অনেক আগেই হিব্রুতে পবিত্র এই উপাসনালয়কে 'বেইত হা-মিকদাস' (Bayit Ha-Miqdosh) নামে ডাকা হতো। 'মিকদাস' মানে 'পবিত্র' আরবিতে যা মুকাদ্দাস বা আল-মাকদিস। বেইত মানে 'ঘর', আরবিতে এটিই 'বাইত'।

---

[২৪]. ব্রিটানিয়া ডটকম

[২৫]. স্বপ্নভ্রমণ জেরুসালেম, বুলবুল সরওয়ার, পৃষ্ঠা-১২ থেকে ১৬

[২৬]. জেরুজালেম বিশ্ব মুসলিম সমস্যা, ড.ইউসুফ আল কারজাভি, অনুবাদ, মাওলানা মুহাম্মদ শামাউন আলী। পৃষ্ঠা-৯

[২৭]. www.jewishvirtuallibrary.org

টেম্পল মাউন্টে 'বাইতুল মুকাদ্দাস'-এর কাঠামোগত অস্তিত্ব এখন নেই। ঘরটি না থাকলেও ঘরের পবিত্রতা এখনও আছে, যে কারণে এ জায়গাটিই এখন পরিচিতি পেয়ে গেছে 'বাইতুল মুকাদ্দাস' নামে। মানে এই সময়ে বাইতুল মুকাদ্দাস বলতে নির্দিষ্ট কোনো কাঠামোকে বোঝানো হচ্ছে না। সেই হিসেবে আমরা যাকে মসজিদুল আকসা বলছি, তার সাথে বায়তুল মুকাদ্দাসের ধারণাগত পার্থক্য আছে, কিন্তু বায়তুল মুকাদ্দাসই মসজিদুল আকসা– এটা বহুল প্রচলিত বিষয়।

মসজিদুল আকসা

পবিত্র কুরআনের বনি ইসরাইল সূরার প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে–

> 'পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি নিজ বান্দাকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখাতে রাত্রিবেলায় ভ্রমণ করিয়েছেন মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত– যার চারপাশে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি।'

এই আয়াত থেকেই এসেছে মসজিদুল আকসার নাম।

মসজিদুল আকসার অর্থ 'দূরের মসজিদ।' যে রাতের কথা পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, সে সময় বাইতুল মুকাদ্দাস বা সেই উপাসনালয়; যা হজরত সুলাইমান (আ.)-এর হাতে নির্মিত হয়েছিল, তা ধ্বংসপ্রাপ্তই ছিল-এটা ইতিহাসের তথ্য। তবে এলাকাটি ঘেরাও করে রাখা হয়েছিল দেয়াল দিয়ে। পবিত্র এই জায়গায় প্রবেশের জন্য ছিল অনেকগুলো দরজা; ছিল পূর্ববর্তী নবিদের ব্যবহার করা জায়গার স্মৃতিচিহ্ন। বনি ইসরাইলের প্রথম আয়াতেই উল্লেখ আছে– 'যার চারপাশে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি' অর্থাৎ একটি 'এলাকা'-র কথাই বলা আছে। আর আশীর্বাদপুষ্ট পবিত্র এলাকা বলতে 'টেম্পল মাউন্ট' এলাকাই আছে সেখানে। হাদিস ও কুরআনে একে মসজিদ বলা হয়েছে। কারণ, এটি ছিল সিজদার স্থান।

ইসলাম ধর্মের বিধান অনুযায়ী সবশেষ নবি হজরত মুহাম্মদ (সা).-এর মক্কা থেকে জেরুজালেমের রাত্রিভ্রমণকে 'ইসরা' বলা হয় (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত-১)। বাইতুল মুকাদ্দাস এলাকায় তিনি নামাজ আদায় করেন। পরবর্তী সময়ে উমর (রা) খলিফা থাকার সময় ৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর প্রতিনিধি আবু উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ জেরুজালেম জয় করেন। সেনাপতি আবু উবায়দাহ হচ্ছেন সেসব ব্যক্তিদের একজন, যাদের জীবিত থাকা অবস্থায় জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন প্রিয় নবি মুহাম্মাদ (সা.)।[২৮]

---

[২৮]. ওমর, রাফিক হারিরি, পৃষ্ঠা-২৭৮

হজরত উমর (রা.) বায়তুল মুকাদ্দাসের খ্রিষ্টানদের সাথে সন্ধি করেন এবং সেখানে প্রবেশ করেন। পবিত্র মিরাজের রাতে রাসূল (সা.) ঠিক যেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছিলেন, ইসলামের দ্বিতীয় খলিফাও সেই দরজা দিয়েই প্রবেশ করেন। সেখানে একটি চার্চ ছিল। হজরত উমরকে খ্রিষ্টানদের পক্ষ থেকে ওই চার্চে নামাজ পড়ার জন্য আহ্বান জানান বাইজেন্টাইন সম্রাটের প্রতিনিধি পেত্রিয়ার্ক সোফ্রোনিয়াস। সোফ্রোনিয়াস একই সঙ্গে ছিলেন আর্চবিশপ ও জেরুজালেমের শাসক। বিশপের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেননি উমর (রা.)। লেখক বুলবুল সরওয়ার লিখেছেন–

> ‘উমর (রা.) কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন– “এটা তো গির্জার অংশ, তাই না বিশপ?”
>
> “জি, হ্যাঁ।”
>
> “তাহলে আমি একটু সামনে যাই।”

সোফ্রোনিয়াস মনে কষ্ট পেলেন। নতুন ধর্মের নেতা তার ধর্মকে তুচ্ছ করছে। অথচ তারা দাবি করে যিশু তাদেরও নবি। তাহলে এদের তিনি যতটা সত্য ভেবেছিলেন, আসলে এরা ততটা সত্যাশ্রয়ী নয়!

নামাজ শেষ করে উমর ডাকলেন বিশপকে। বললেন– “আমি যদি আজ আপনার গির্জায় নামাজ পড়ি, তাহলে কি হবে জানেন?”

হতবুদ্ধি সোফ্রোনিয়াস মাথা নেড়ে অপারগতা জানালেন।

“তাহলে এই হবে– আগামীর মুসলমানরা পৃথিবীর যে শহরকে অধিকার করবে, সেখানকার গির্জাকেই মসজিদ বানিয়ে ফেলবে। তারা উদাহরণ দেবে আমাকে এবং আমি সেই পাপের বোঝা মাথায় নিলে আল্লাহর কাছে মুক্তি পাব না।”’[২৯]

খ্রিষ্টানরা বিশ্বাস করে যিশুখ্রিষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন, এখানকারন একটি জায়গায়। সেই জায়গাতেই এখন দাঁড়িয়ে আছে Church of the Holy Sepulchre বা হলি সেপালচার গির্জা। ক্রুশবিদ্ধের পর যিশুর নিথর দেহ রাখা হয় তারই পাশের একটি গুহায়। খ্রিষ্টানরা যেসব কারণে জেরুজালেমকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে, তার একটি কারণ এই গির্জা ও যিশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ঘটনা। এ ছাড়া এই নগরীর অদূরে বেথেলহেমে জন্ম নিয়েছিলেন যিশুখ্রিষ্ট।

---

[২৯]. স্বপ্নভ্রমণ জেরুজালেম, বুলবুল সরওয়ার, পৃষ্ঠা-৫৬

চার্চ অব্য দ্য হলি সেপালচার, ছবি উইকিপিডিয়া

হজরত উমর (রা.) চার্চের বাইরে এসে যেখানে নামাজ পড়েছিলেন, সেখানে একটি মসজিদ বানানো হয়, আর তার নাম দেওয়া হয় 'মসজিদে উমর'। বাইজেন্টাইনদের কাছ থেকে মুক্ত করে উমর (রা.) এই এলাকাটিতে ইহুদিদের পুনর্বাসনের জায়গা করে দেন। ৭০টি ইহুদি পরিবারকে নিয়ে আসা হয় এখানে, যারা বসবাস করছিলেন শহরের বাইরে। ইহুদিরা দাবি করে থাকে, এসব ইহুদি রোমানদের দ্বারা জেরুজালেম থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন।

টেম্পল মাউন্ট কমপ্লেক্সের ভেতরে পবিত্র বাইতুল মুকাদ্দাস নামের এলাকাতেই হজরত উমর (রা.) ছোট্ট একটি নামাজঘর নির্মাণ করেন। পরবর্তী সময়ে এটিকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মসজিদে রূপ দেন উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান। আব্দুল মালিক ডোম অব দ্য রক ও ডোম অব দ্য চেইনেরও নির্মাতা। তাঁর পুত্র খলিফা আল ওয়ালিদ শেষ করেন মসজিদটির নির্মাণকাজ। এটিই মসজিদুল আকসা; মিরাজের রাত্রে পবিত্র বাইতুল মুকাদ্দাসের ভেতরে যেখানে নবি (সা.) নামাজ আদায় করেন। খলিফা ওয়ালিদের আমলেই মুসলমানরা স্পেন (৭১১সালে) জয় করে, যার নেতৃত্বে ছিলেন বার্বার সেনাপতি তারিক বিন জিয়াদ। খলিফা ওয়ালিদ যখন মসজিদটির নির্মাণকাজ শেষ করেন, তখন তার আকার বর্তমানের তুলনায় বড়ো ছিল। ৭৫০ সালে আবু আল আব্বাসকে খলিফা ঘোষণা করা হয়। উমাইয়ারা উৎখাত হয়, শুরু হয় আব্বাসীয় আমল। আব্বাসের পর তার ভাই আল মনসুর হন খলিফা।

৭৪৬ সালের ভূমিকম্পে মসজিদুল আকসা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়। তার আট বছরের মাথায় খলিফা মনসুর সেটি পুনর্নির্মাণ করেন। ১০৩৩ সালে আরেক দফা ভূমিকম্পের মুখে মসজিদটি ধ্বংস হয়ে যায়। দুবছর পর শিয়া ফাতিমি সপ্তম খলিফা আলি আজ-জাহির আবারও সে জায়গায় মসজিদটি নির্মাণ করেন। তিনি যে সীমানা অনুযায়ী মসজিদটি বানিয়েছিলেন, আজকের মসজিদুল আকসা ঠিক ততটুকু জায়গার ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে।

আব্বাসীয় শাসক খলিফা হারুন অর রশিদের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে মামুন, খলিফা হয়ে টেম্পল মাউন্টে নতুন নতুন ফটক তৈরি করেন। তিনিই ইরাকে বিখ্যাত বায়তুল হিকমা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। একাদশ শতকে প্রথম ক্রুসেড অভিযানে জেরুজালেম দখল করার পর মসজিদুল আকসাকে প্রাসাদ হিসেবে ব্যবহার করে ইউরোপের খ্রিষ্টানরা। তারা এর একটা অংশ পশুশালা ও রঙ্গমঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করত। সুলতান সালাউদ্দিন আইয়ুবি (পশ্চিমে সালাদিন নামে পরিচিত) এ কারণেই পরবর্তী সময়ে মসজিদের দুই পাশের কিছু অংশ ছেঁটে দিয়েছিলেন। সোনালি গম্বুজের যে মসজিদটি (ডোম অব দ্য রক) আমাদের সামনে দৃশ্যমান; ক্রুসেডাররা সেটিকে ব্যবহার করত চার্চ বা গির্জা হিসেবে। তখন এরা মসজিদটিকে ডাকত Temple of the Lord (ঈশ্বরের উপাসনালয়) নামে। মসজিদুল আকসাকে তারা বলত Temple of Solomon।

ডোম অব দ্য রক

সোনালি গম্বুজের যে স্থাপনাটিকে 'ডোম অব দ্য রক' বলা হয়, আরবিতে সেটিই 'কুব্বাতুস সাখরাহ।' কুব্বাহ হলো গম্বুজ আর সাখরাহ হলো পাথর। উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিক ৬৯১ সালে এটি নির্মাণ করেন। তিনি এটা ঠিক সে জায়গাতেই নির্মাণ করেন, যেখানে ইহুদিদের সেকেন্ড টেম্পল বা দ্বিতীয় বাইতুল মুকাদ্দাস রোমানরা ধ্বংস করে দিয়েছিল। সেকেন্ড টেম্পল গুঁড়িয়ে দিয়ে সেখানে জুপিটারের মন্দির বানিয়েছিল রোমানরা।

'সাখরাহ' বা যে পাথরের কথা এখানে বলা হচ্ছে, সেটি পুরো টেম্পল মাউন্টের সবচেয়ে পবিত্র জিনিস। কথিত আছে– এ পাথরের ওপর ভর রেখেই হজরত মুহাম্মাদ (সা.) ঊর্ধ্বগমন করেছিলেন মিরাজের রাতে। ইহুদিদের দৃষ্টিতে এটি 'ফাউন্ডেশন স্টোন।' এখানেই 'হোলি অফ দ্য হোলিজ'-এর অবস্থান বলে বিশ্বাস করা হয়। যেখানে রাখা ছিল বা আছে 'আর্ক অব দ্য কোভেন্যান্ট।' মাটি থেকে দেড় মিটার ওপরে থাকা নীলচে ফাউন্ডেশন স্টোনের দিকেই ইহুদিরা প্রার্থনা করে। এটিই তাদের আদি কিবলা। কুর্দি বীর সালাহ উদ্দিন আইয়ুবি ১১৮৭ সালে জেরুজালেম জয় করার পর 'ডোম অব দ্য রকের ওপরের 'ক্রুশ' নামিয়ে সেখানে 'ক্রিসেন্ট' সংযুক্ত করেন। জর্ডানের বাদশাহ হোসেন ১৯৯৩ সালে তাঁর একটি বাড়ি বিক্রি করে পাওয়া অর্থ দিয়ে ৮০ কেজি সোনা কিনে দান করে দেন ডোম অব দ্য রকের জন্য।[৩০]

---

৩০. স্বপ্নভ্রমণ জেরুজালেম, বুলবুল সরওয়ার, পৃষ্ঠা-১২

টেম্পল মাউন্টের বাইতুল মুকাদ্দাস এলাকা ঘিরে রাখা দেয়ালের নির্মাণকাজ শুরু করেছিলেন জুডার রাজা হেরোড দ্য গ্রেট। সে দেয়ালের একটি অংশ হলো 'ওয়েইলিং ওয়াল।' রোদন প্রাচীর বা কান্নার দেয়াল। স্থানীয়ভাবে এটা পরিচিত 'কোটেল' হিসেবে। আর পুরো দেয়ালটি ওয়েস্টার্ন ওয়াল নামে পরিচিত। এই দেয়ালেরই আরেক নাম 'বুরাক দেয়াল', নবি মুহাম্মদ (সা.) বুরাক নামের যে প্রাণীর পিঠে চড়ে উর্ধ্বগমন করেছিলেন বলে বলা হয়ে থাকে, সেটি এই দেয়ালেই বেঁধে রাখা হয়েছিল।

ফটো : ওয়েইলিং ওয়াল

হজরত সুলাইমান (আ.) বাইতুল মুকাদ্দাস নির্মাণ করলেও এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন ইয়াকুব (আ.)। এটিই পরবর্তী সময়ে সুলাইমান (আ)-এর হাত ধরে পূর্ণতা পায়; যার বিস্তারিত আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

এ যাবৎ আলোচনা অনুযায়ী এটা স্পষ্ট যে, মসজিদুল আকসা বলে যে স্থাপনা আজ আমাদের কাছে পরিচিত, হজরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর সময়ে তার অস্তিত্ব ছিল না। আবার বাইতুল মুকাদ্দাস–যা ইহুদি বর্ণনা মোতাবেক 'জিহোভা উপাসনালয়'– তাও ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় প্রাচীরের ভেতরে তার কাঠামোগত অস্তিত্ব ছিল না; যদিও এ জায়গাটিকে বোঝাতে হাদিসে মসজিদুল আকসা বলেই সম্বোধন করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

যুগে যুগে ইহুদি বিদ্বেষ-বিতাড়ন

'তলোয়ারের মাধ্যমে তাদের (আরব ফিলিস্তিনিদের) বহিষ্কার করতে আমাদের অবশ্যই প্রস্তুত থাকতে হবে। যেমনটা আমাদের পূর্বপুরুষরা করত।'
—ইজরাইল জাংগওয়েল

বিশ্বাসঘাতকতা, অতঃপর....

মুসলমানদের হাতে ইহুদি নির্যাতনের ইতিহাস অনেকটাই বিরল। বিপরীতে প্রাচীন ব্যাবিলনীয়, রোমান, ফারাও, হেলেনিক কিংবা খ্রিষ্টানদের হাতে ইহুদি নির্যাতন ও বিতাড়নের ভুরি ভুরি উদাহরণ ইহুদিদের কাছে আছে। খ্রিষ্টের জন্মের আগে ও পরে ইউরোপজুড়ে ইহুদি বিতাড়নের অসংখ্য উদাহরণ আছে। অবশ্য নির্যাতনের এমন অনেক উদাহরণই ইহুদিদের নিজেদের দেওয়া।

পুরোনো বাইবেল মতে– ব্যাবিলনীয়দের কারণেই 'ডায়াসপোরা' বা নির্বাসিত জীবন শুরু হয় ইহুদিদের। ব্যাবিলনের সম্রাট নেবুচাদনেজার দ্য সেকেন্ড, জেরুজালেম আক্রমণ করেছিলেন রাজা জেদেকিয়া/সেদেকিয়ার বিশ্বাসঘাতকতার কারণে। সেটা খ্রিষ্টপূর্ব ৫'শ ৮৬ অব্দের ঘটনা। নেবুচাদনেজার ইতিহাসে বেশি আলোচিত ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যান (ঝুলন্ত বাগান) তৈরির জন্য। সম্রাজ্ঞীর অনুপ্রেরণায় তিনি এই উদ্যান তৈরি করেছিলেন খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দের দিকে। কথিত আছে– ভূমি থেকে ৮০ ফুট উচ্চতায় এই বাগান তৈরি করতে কাজ করেছিল ৪ হাজারের মতো শ্রমিক। ব্যাবিলনের এই সম্রাট, জেদেকিয়াকে জুডার সিংহাসনে বসিয়েছিলেন ৫৯৭ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে। জেদেকিয়া ব্যাবিলন সম্রাটকে নিয়মিত কর পরিশোধ করে টানা ১১ বছর ধরে রাজ্য পরিচালনা করেন।

একসময় বিদ্রোহ করে বসেন জেদেকিয়া। এই বিদ্রোহে মিশরীয়রা তাকে সমর্থন ও সহযোগিতা করে। বেইমানকে শাস্তি দিতে ব্যাবিলনীয় বাহিনী শুরুতে জেরুজালেম অবরোধ করে। আট মাস ধরে ঘেরাও করে রাখা হয় পবিত্র নগরী। একসময় প্রাচীর ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়ে ব্যাবিলন সেনারা। পলায়নরত জেদেকিয়াকে ধরে আনা হয়।

তার সামনেই হত্যা করা হয় ছেলেদের। বিশ্বাসঘাতকতার কারণে চোখ তুলে নেওয়া হয় তার। এ অবস্থাতেই তার বাকি জীবন কাটে ব্যাবিলনের কয়েদখানায়। নেবুচাদনেজারের ক্ষোভের আগুনে পুড়ে ইহুদিদের আবেগের শহর জেরুজালেম। ইহুদিদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী– এই যুদ্ধে হাজার হাজার ইহুদি ধর্মবিশ্বাসীর মৃত্যু হয়, গণহারে ধর্ষণের শিকার হন নারীরা। জুডা চলে যায় ব্যাবিলন সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণে।

এভাবেই শুরু হয় ইহুদি জাতির দুঃখ-দুর্দশার জীবন। এতদিন মন্দির ও আচার-আচরণকেন্দ্রিক ইহুদি জীবনযাপনের যে ধারা চলছিল, তাতে ছেদ ঘটল। ইহুদিরা শুরু করল তাওরাতকেন্দ্রীক জীবনব্যবস্থা। খ্রিষ্টপূর্ব ৫'শ ৮৬ থেকে চারশো সাল অবধি এই ১৮৬ বছরে ব্যাবিলনে বসবাসকারী ইহুদি লেখক, নকলবিদ ও ধর্মযাজকরা মুসা (আ.)-এর পাঁচটি পুস্তিকা (ফাইভ বুকস অব মোজেস) সংগ্রহ করে তা সংশোধন করেন। আরবিতে এর অপরিবর্তিত অংশটি তাওরাত কিতাব হিসেবে পরিচিতি পায়।

জুডা থেকে যে ৩৫ হাজার ইহুদিকে বন্দি করে ব্যাবিলন নিয়ে যাওয়া হয়, তাদের প্রতি সম্রাট সদয় ছিলেন। ব্যাবিলনে তাদের জন্য ভালো ঘর তৈরি করে দেওয়া হলো, চাষবাসের জমিও তারা পেল; এমনকী জুডা থেকে ইহুদিদের ব্যাবিলন নিয়ে আসার সময় তাদের সঙ্গে থাকা স্বর্ণালংকারও কেড়ে নেওয়া হয়নি। তবে এর বিপরীত বক্তব্যও আছে।

ইহুদিদের পুনরায় জেরুজালেমে ফেরা

ব্যাবিলনে ৭০ বছরের নির্বাসন শেষে ৬'শ কিলোমিটার মরুময় পথ পাড়ি দিয়ে আবার জেরুজালেমে ফেরেন ইহুদিরা। এরই মধ্যে তাদের সংখ্যা বেড়ে হয় দ্বিগুণ। ৪২ হাজারের মতো ইহুদি এ সময় জেরুজালেম ফেরেন। যদিও প্রায় সমান সংখ্যক ইহুদি থেকে যান ব্যাবিলনে। ইহুদিরা জেরুজালেমে ফিরে শহরটির প্রাণ খুঁজে পায়নি। কারণ, বহিরাগতদের হানায় এরই মধ্যে জেরুজালেম পরিণত হয়েছিল পরিত্যক্ত এক নগরীতে। এটি আর বাসযোগ্য ছিল না। ধ্বংসপ্রাপ্ত জিহোভা মন্দিরের গা থেকে ধাতব পাত আর দুর্লভ সব পাথর খুলে নিয়েছে মরু ডাকাতরা।

ব্যাবিলনের পর জুডা যখন পারস্য সাম্রাজ্যের অধীনে আসে, তখন এই যুদ্ধবিধ্বস্ত ভূখণ্ডকে পুনর্গঠন করাই পারস্য শাসকদের জন্য কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। বাবার মৃত্যুর পর ৫'শ ৫৯ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে পারস্যের রাজা হন দ্বিতীয় সাইরাস। ব্যাবিলন জয় করে সাইরাস ইহুদিদের ফিরিয়ে আনেন জেরুজালেমে। তবে তাঁর আমলে ইহুদিরা পায়নি স্বাধীনতা। জুডা পরিণত হয়েছিল পারস্যের আশ্রিত রাজ্যে।

জুডা জয়ের পরের বছরে একটি ডিক্রি জারি করেন সাইরাস। পশ্চিমে 'সাইরাস দ্য গ্রেট' নামে পরিচিত এই পারস্য অধিপতি বলেছিলেন– ইয়াকুবের ঈশ্বরের জন্য

জেরুজালেমে তিনি একটি ঘর বানাতে চান। এ জন্য কিছুসংখ্যক ইহুদিকে জেরুজালেমে পাঠাতে চেয়েছিলেন সম্রাট।

পূর্ণ স্বাধীনতা না দিলেও ইহুদিদের অপছন্দের তালিকায় ছিলেন না সাইরাস। তিনি মানুষের অধিকার সংবলিত একটি দলিল তৈরি করেন, যেটি মানবজাতির প্রথম মানবাধিকার চার্টার নামে স্বীকৃতি পেয়েছিল। এই সনদের একটি অনুলিপি রাখা আছে নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদরদপ্তরের প্রবেশপথে। জাতিসংঘ চার্টার বা সনদে সাইরাসের চার্টারের কিছুটা প্রভাব থেকে গেছে।

ব্যাবিলন জয়ের পরেই জিহোভা মন্দির সংস্কারে হাত দিতে চান সাইরাস। আরও যেসব উপাসনালয় ছিল, সেগুলোতেও আর্থিক অনুদান দিয়ে সংস্কারে ভূমিকা রাখেন তিনি। ইহুদিদের পবিত্র পাত্র, যেটি ব্যাবিলন আক্রমণের সময় হারানো গিয়েছিল, সাইরাস সেটি উদ্ধার করেন এবং জেরুজালেমে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।[৩১]

কিন্তু জিহোভা মন্দির সংস্কারে হাত দিলেও বিভিন্ন পক্ষের বাধা ও অনীহায় তা শেষ করতে পারেননি সাইরাস। মন্দির সম্পূর্ণ সংস্কার হয়ে আগের চেহারায় ফিরে আসে ৫'শ ১৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে দারিয়ুস পারস্যের সম্রাট হলে। তাঁর আমলে পারস্য সাম্রাজ্যে কোনো ধর্ম বা বর্ণবিদ্বেষ ছিল না বলে ইহুদি ইতিহাসে দাবি করা হয়েছে। তিনি একক ওজন ও একক মুদ্রাব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন।

একসময় জেরুজালেম নগরীর দুর্দশার খবর যায় পারস্যের রাজধানী সুসায়। এতে সেখানে বসবাসকারী ইহুদিদের মধ্যে কষ্টের সঞ্চার হয়। নেহেমিয়া নামে পারস্য সাম্রাজ্যে এক অভিজাত ইহুদি ছিলেন। তিনি ছিলেন পারস্য সম্রাটের মদ পরিবেশক। সম্রাটের অনুমতি নিয়ে রাজধানী সুসা থেকে জেরুজালেমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন নেহেমিয়া।[৩২] তাঁর সাথে নগরীতে ঢুকে একদল সৈন্য। জেরুজালেমে বড়ো পরিসরে সংস্কার শুরু হয়। প্রাচীর দিয়ে ঘিরে ফেলা হয় পবিত্র নগরী; বানানো হয় সদর দরজা।

নেহেমিয়া জেরুজালেমে এসে সুদের ভয়াবহতা টের পান। কিছু ইহুদি সুদখোর ঋণের সুদ দিতে ব্যর্থ হওয়ায় গরিবদের ছেলেমেয়ে ও তাদের আঙুর বাগান দখল করে নিচ্ছিল। তিনি সুদপ্রথার বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। আর তা করতে গিয়ে সমাজের উচ্চশ্রেণির বিরোধিতার মুখে পড়েন। নেহেমিয়া প্রবাসী সব ইহুদিদের ঘরে ফেরার আহ্বান জানালেন। পারস্য রাজ দরবারের ইহুদিবিষয়ক মন্ত্রী ছিলেন এজরা।

---

[৩১]. বিশ্বায়ন, ইতিহাস ও গতিধারা, বদরুল আলম খান, পৃষ্ঠা ৫৬-৫৭

[৩২]. Jerusalem: One City, Three Faiths, Karen Armstrong, অনুবাদ, মোহাম্মদ হাসান শরীফ, অনুবাদ পৃষ্ঠা-১৩৫

সম্রাট দ্বিতীয় আরটেক্সেররেক্সের সময়ে তিনি আসেন জুদায়। এজরা চাইলেন জেরুজালেমে জনবসতি বাড়াতে। তাঁর উদ্যোগে হাজারখানেক ইহুদি পরিবার জেরুজালেমে আসতে রাজি হলো। তাদের বসবাসের জায়গা দেওয়া হলো, চাষবাসের জমিও পেল।

সংস্কারের পর জিহোভা মন্দিরটি টিকে ছিল প্রায় ৬শ বছর। তার আগে মন্দিরবিহীন ৭০ বছরে ইহুদি ধর্মীয় চেতনায় নানা পরিবর্তন আসে। মন্দিরে তিনবেলা প্রার্থনার পরিবর্তে মন্দিরের বাইরে নির্দিষ্ট ভবন ও জনপদে তিনবেলা গণপ্রার্থনার ব্যবস্থা চালু হয়। এ সময় ইহুদিরা ভাগ হয়ে যায় বিভিন্ন মতবাদে।[৩৩]

মহাবীর আলেকজান্ডারের পারস্য জয়

খ্রিষ্টপূর্ব ৩৩২ (মতান্তরে ৩৩৩) সালে সম্রাট তৃতীয় দারিয়ুসকে হটিয়ে পারস্য জয় করেন মেসিডোনিয়ার সম্রাট মহাবীর আলেকজান্ডার। নতুন কিছু অঞ্চল দখল করে প্রতিষ্ঠা করেন নতুন গ্রিক সাম্রাজ্য। তাঁর সময় থেকেই গ্রিক ইতিহাসকে বলা হয় হেলেনীয়/হেলেনিক। পারস্যের পর মিশরও নিয়ে নেন হাতের মুঠোয়। আলেকজান্ডারের সম্মানে মন্দির নির্মাণ করে মিশরীয়রা। সেইসঙ্গে একটি শহরের নামকরণ করা হয় 'আলেকজান্দ্রিয়া।' নিজের সাম্রাজ্যে ৭০টির মতো শহর গড়ে তুলেছিলেন এই গ্রিক সম্রাট।

খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৩ সালের জুনে আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর স্ত্রী রোকসানা ও তাদের পুত্রসন্তান তাঁরই সেনাপতি কাসান্দারের হাতে নিহত হয়। গ্রিক সাম্রাজ্য ভাগ হয়ে যায় চারভাগে। অ্যান্টিগোনাসের ভাগে পড়ে সিরিয়া, ব্যাবিলন ও মধ্য এশিয়া। কাসান্দার পান মেসিডোনিয়া ও গ্রিস, লাইসিমাক্লাস পান থ্রেস ও বাইথেনিয়া। আর প্রথম টলেমির ভাগে পড়ে মিশর, জুডিয়া/জুডা ও আরব অঞ্চল।

১৯৮ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত টলেমিদের অধীনেই থাকে জুডা। সেলুসিড রাজা তৃতীয় অ্যান্টিওকাস পঞ্চম টলেমির কাছ থেকে জুডার দখল নিয়েছিলেন। তার ছেলে চতুর্থ অ্যান্টিওকাস রাজা হন ১৭৫ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে। অ্যান্টিওকাস চাইলেন তাদের নিজস্ব কালচার (হেলেনীয়) ইহুদিদের ওপর চাপাতে। জেরুজালেমের ইহুদিরা হেলেনবাদকে সহিংস ও সামরিক তন্ত্র হিসেবে মনে করতে থাকে। নতুন রাজস্বনীতি চালু করেন অ্যান্টিওকাস। ইহুদিদের প্রতি আদেশ জারি করেন, উৎপাদিত শস্যের এক-তৃতীয়াংশ কর হিসেবে রাজার ভান্ডারে জমা দিতে। তিনি প্রথা ভেঙে জেরুজালেম মন্দিরের শীর্ষ পুরোহিত নিযুক্ত করেন জ্যাসন নামে তারই অনুগত এক ব্যক্তিকে। জ্যাসন হেলেনীয় কালচার চালু করার পক্ষে রাজাকে সমর্থন জোগান। তার কাছে তাওরাত ছিল অর্থহীন। তিনি চাইতেন, লোকজন গ্রিক জীবনযাত্রা গ্রহণের মাধ্যমে বৃহত্তর দুনিয়ার স্বাধীনতা ভোগ করুক।

---

[৩৩]. প্যালেস্টাইনের বুকে ইজরাইল, আসাদ পারভেজ, পৃষ্ঠা-৪৭।

এই হেলেনিক কালচার ছিল সেক্যুলার। এটি মন্দির ও প্রাসাদ উভয় থেকে ছিল নিরপেক্ষ। তবে একটা সময় পরে কোনো এক মতানৈক্যের কারণে জ্যাসনকে সরিয়ে মন্দিরের প্রধান পুরোহিত করা হয় মেনেলাসকে। জেরুজালেমে মন্দিরের কাছেই একটি জিমনেসিয়াম তৈরি করা হয়। ইহুদি যুবক থেকে শুরু করে মন্দিরের পুরোহিত সবাই জিমে যাওয়া শুরু করে। এই জিমনেসিয়ামে তরুণদের হেলেনবাদী আদর্শে প্রশিক্ষিত করা হতো, তারা গ্রিক সাহিত্য অধ্যয়ন করত, কঠোর দৈহিক ও শারীরিক পরিশ্রম করত, ইনডোর খেলাধুলায় অংশ নিত।[৩৪] অনেকেই নগ্ন, অর্ধনগ্ন হয়ে শরীরচর্চা ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে থাকে।

এতে ভীতি ছড়িয়ে পড়ে ধার্মিক ইহুদিদের মধ্যে। স্থানীয় ইহুদিদের অনেকেই নতুন সংস্কৃতিকে প্রলুব্ধকারী হিসেবে চিহ্নিত করেন, কিন্তু পারছিলেন না তা ঠেকাতে। অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায়– কিছু ইহুদি যুবক পুরুষাঙ্গে সুন্নতের ক্ষত মুছে ফেলতে গ্রিক শল্যবিদকে দিয়ে অপারেশন করিয়ে নেয়। মূলধারার বা ধার্মিক ইহুদিরা এগুলো ভালোভাবে নেননি। তারা রুষ্ট হন অ্যান্টিওকাসের ওপর। ইহুদিদের একটি অংশ শান্তিপূর্ণভাবে গ্রিকদের বিরোধিতা করে। আরেকটি অংশ হাতে তুলে নেয় অস্ত্র। গ্রিকবিরোধী এসব ইহুদি পাহাড়ে পাহাড়ে বুনো জানোয়ারের মতো বসবাস করতেন। তারা শিশুদের খতনার পক্ষে প্রচারণা চালাতে থাকেন। পরবর্তী সময়ে ইহুদিদের একটি অংশের মাধ্যমে গ্রিক সংস্কৃতির বিরুদ্ধে হাসমোনিয়ান বিপ্লব সাধিত হয়। এরাই জেরুজালেমে জিমনেসিয়াম বন্ধ করে দিয়েছিল।

মন্দিরের পরিবর্তে সিনাগগ, বলির পরিবর্তে প্রার্থনা!

ক্ষমতার উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বের সুযোগে খ্রিষ্টপূর্ব ৬৩ অব্দে জুডায় ঢুকে পড়ে রোমানরা। রোম অধিপতি চেয়েছিলেন এখানে একটি দুর্গ নির্মাণ করতে। কারণ, পার্থিয়ানদের চোখ পড়েছিল ব্যাবিলন আর মেসোপটেমিয়ার দিকে।[৩৫] জুডায় রোমান সেনাদের হামলা ঠেকাতে গ্রামে গ্রামে ইহুদি জাতীয়তাবাদী দল গঠন করা হয়। অন্যদিকে ইহুদি বিদ্রোহ ঠেকাতে কমান্ডার পম্পেই ম্যাগনাস (ইতিহাসে পম্পেই দ্য গ্রেট নামে পরিচিতি)-এর নির্দেশে বিশাল রোমান বাহিনী প্যালেস্টাইনে ঝটিকা অভিযান চালায়। রোমানদের তীব্র আক্রমণে ভেঙে পড়ে বিদ্রোহীদের প্রতিরোধ। নিহত হয় অসংখ্য ইহুদি। চালানো হয় ব্যাপক লুটপাট। ক্রুশবিদ্ধ করা হয় জুডার বহু ইহুদিকে।

---

৩৪. Jerusalem: One City, Three Faiths, Karen Armstrong, অনুবাদ, মোহাম্মদ হাসান শরীফ, অনুবাদ পৃষ্ঠা-১৫১

৩৫. The Jewish Revolt Against Rome, An overview of the origins and buildup leading to the Jewish revolt against Roman rule in Judea in the 1st century CE.

রোমানরা ইহুদিদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয় অসহ্য খাজনা। ইহুদি অধ্যুষিত শহরগুলো জ্বালিয়ে দিয়ে হাজারো ইহুদিকে বেচে দেওয়া হলো দাস বাজারে। এই যুদ্ধ প্রথম রোমান-ইহুদি যুদ্ধ নামে পরিচিত।

তবে রোমানদের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে ইহুদিদের বড়ো ধরনের বিদ্রোহ হয় ৬৬ থেকে ৭০ খ্রিষ্টাব্দে। এতে লক্ষাধিক মানুষ নিহত ও বন্দি হয়। জিহোভা মন্দির বা সলোমন নির্মিত ঘরটি ধ্বংস করা হয়। রোমান বাহিনীর হাতে ঘরটি ভেঙে গেলেও কোনোমতে রক্ষা পায় দেয়ালটি। এই দেয়াল আজ ইহুদিদের কাছে কান্নার দেয়াল বা 'দ্য ওয়েলিং ওয়াল' নামে পরিচিত।[৩৬] ইহুদিরা এই দেয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে স্রষ্টার উদ্দেশ্যে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

ইহুদি বর্ণনা অনুযায়ী– জেরুজালেম রোমান দখলে যাওয়ার পর পালিয়ে যাওয়া জীবিত ইহুদিরা দ্রুতই ছড়িয়ে পড়ে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে। এই সময়টাতে দজলা নদীর তীরে বর্তমান ইরাক ও পার্থিয়ান (ইরান)শহরগুলোতে কয়েক হাজার ইহুদি বসবাস করত। আরব ভূখণ্ড ছাড়িয়ে আফ্রিকার ইথিওপিয়া পর্যন্ত চলে যায় ইহুদিরা। বর্তমান তুরস্কের মানিসা (সাবেক সার্ডিস) ও ইজমিরসহ বিভিন্ন জায়গায় ইহুদি কলোনি গড়ে ওঠে। তাদের পোশাক-আশাক, খাদ্যাভ্যাস, সুন্নতপ্রথা ও মূর্তিপ্রজা-বিদ্বেষ অন্যদের বিশেষ করে রোমানদের শত্রুতে পরিণত করে। ছড়িয়ে পড়া ইহুদিদের ফের অদৃশ্য সুতায় গেঁথে আনার প্রয়াস চলে।

একসময় ছিন্নমূল ইহুদিদের অপরিহার্য বন্ধনসূত্র হয়ে দাঁড়ায় ধর্মীয় আইন-কানুন। এই কানুন অবিকৃত রাখার দায়িত্ব পড়ে সিনাগগের ওপর। জিহোভা মন্দির বা সেকেন্ড টেম্পল ধ্বংসের ঘটনা ইহুদি ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। এই মন্দিরের পরিবর্তে সিনাগগ হয়ে উঠে ইহুদি জীবনধারার কেন্দ্র। এতদিন পুরোহিত-কেন্দ্রিক যে ধর্মব্যবস্থা তাদের ছিল, তা এখন রাবাইদের/রাব্বিদের নিয়ন্ত্রণে আসে। প্রধান পুরোহিতের স্থলাভিষিক্ত হন রাবাই। বলির পরিবর্তে আসে প্রার্থনা।

রোমের একগুঁয়েমি ও রাজনৈতিক অদূরদর্শিতায় ১১৫-১৬ খ্রিষ্টাব্দে মিশর, সাইপ্রাস, সিরিন (বর্তমান লিবিয়া) ও মেসোপটেমিয়ায় নতুন করে শুরু হয় ইহুদি বিদ্রোহ। ১১০ খ্রিষ্টাব্দেও একবার ইহুদি বিদ্রোহ হয়েছিল। সবশেষ বিদ্রোহে (১৩২-১৩৬ সাল) নেতৃত্ব দেন সিমনবার কখবা[৩৭]। রোমানদের সমুদ্রে কাবু করতে প্রথমে গ্যালিলি অঞ্চল দখল করেন তিনি। জেরুজালেম অবরোধ দিয়ে রোমানদের বের হতে বাধ্য করেন সিমন,

---

[৩৬]. 66 AD: Was the Great Jewish Revolt Against Rome a Preventable Tragedy? Graham Land, 30 Jul 2018. www.historyhit.com.

[৩৭]. Was the Bar Kokhba Revolt the Start of the Jewish Diaspora? Graham Land, 09 Aug 2018. www.historyhit.com.

তার সহায়তায় ছিল রাবাইরা। জুডা থেকে রোমানদের তাড়াতে অ-ইহুদিরাও সিমনের বাহিনীতে যোগ দেয়। জেরুজালেম দখল করে সিমন জিহোভার মন্দির নির্মাণে আবার উদ্যোগী হন। তবে তিনি জেরুজালেম শাসন করেছিলেন মাত্র চার বছর। দীর্ঘ আড়াই বছরের লড়াই শেষে ১৩৫ খ্রিষ্টাব্দে রোমানদের কাছে পরাস্ত হয় তার বাহিনী। বিদ্রোহীদের নির্মমভাবে হত্যা করে রোমান সম্রাট হাড্রিয়ানের (ল্যাটিন নাম পাবলিয়াস অ্যালিয়াস হাড্রিয়ানাস অগাস্টাস) সেনারা। অসংখ্য ইহুদিকে দাস হিসেবে বিক্রি করা হয়।

ইহুদি ধর্মের প্রতি হাড্রিয়ানের কোনো ভালোবাসা ছিল না। এটি তার কাছে খুবই সেকেলে মনে হতো। তাই জেরুজালেমে নিষিদ্ধ হয় ইহুদি ধর্ম। রোমান দেবতা জুপিটার ও দেবী ভেনাসের মন্দির তৈরি হয় পবিত্র এই শহরটিতে। বছরের একটি দিন মাত্র জিহোভার ভগ্ন দেয়ালের সামনে চোখের জল ফেলার অনুমতি দেওয়া হয় ইহুদিদের। জেরুজালেমের নাম পালটে রাখা হয় এলিয়া ক্যাপিটোলিনা। রাবাইদের ধর্মপ্রচার ও শাস্ত্র ব্যাখ্যা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। আর এসব নির্দেশনা অমান্যকারীদের জন্য জারি করা হয় মৃত্যুদণ্ডের বিধান।

ইহুদি ইতিহাসের রক্ষাকবচ 'বাইবেল'!

জিভোহা মন্দির ধ্বংস ও ইহুদিদের নিজ ভূখণ্ড ছেড়ে আফ্রিকা, এশিয়া ও ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ার এই যে ইতিহাস, তা কেবলই বাইবেল-কেন্দ্রিক। অথচ এই বাইবেল কে বা কারা সংকলন করেছিল, কারা সম্পাদনা করেছিল, এ নিয়ে রয়েছে তুমুল বিতর্ক।[৩৮] বিতর্কিত পুরোনো বাইবেলের রেফারেন্স দিয়েই বলা হচ্ছে– ইহুদিরা জুডা থেকে বিতাড়িত হয়েছিল, স্রষ্টা তাদের এই ভূখণ্ডের মালিক হিসেবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আসলেই কি ইহুদিরা জুডা থেকে বিতাড়িত হয়েছিল? নাকি এটি কোনো মিথ? এসব প্রশ্নের জুতসই জবাব মেলে না ইহুদিপন্থি ইতিহাসবিদদের কাছ থেকে। কারণ, বাইবেল ছাড়া তখনকার কোনো ইতিহাসের বইয়েই তার রেফারেন্স নেই।

কার্থেজীয় সাম্রাজ্যে দক্ষিণ স্পেনের শহরগুলোতে বেশ ইহুদি প্রভাব ছিল। পরে যখন রোমানরা এলো, তাদের সাথেও সুসম্পর্ক টেকাতে পেরেছিল স্পেনের ইহুদিরা। ওই সময়ে কৃষিকাজ করা ছাড়াও ইহুদিরা ঝুঁকেছিল নানারকম পেশায়। তবে বিপত্তি দেখা দিলো ক্যাথলিক রোমান শাসনকালে। রোমান ক্যাথলিকরা ইহুদিদের দেখত বিপজ্জনক জাতি হিসেবে। ইহুদি ও অন্যান্য ধর্মের লোকদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কে জড়াতে পারত না খ্রিষ্টানরা। পারত না একই সঙ্গে আহার করতে। এই পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছিল রোমান ক্যাথলিক চার্চ থেকে নিষেধাজ্ঞা জারি করার মাধ্যমে।

---

৩৮. The Invention of the Jewish People, Shlomo Sand, page 31-35.

পঞ্চম শতকে স্পেন ও পর্তুগাল থেকে রোমানদের তাড়িয়ে জার্মানির বর্বর জাতি ভিসিগথরা (Visigoth) আইবেরীয় উপদ্বীগের দখল নিলে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয়। ভিসিগথরা ছিল আরিয়ানীয় খ্রিষ্টান, যার প্রতিষ্ঠাতাকে ধর্মদ্রোহী হিসেবে মনে করে রোমান ক্যাথলিক চার্চ। সেই হিসেবে আরিয়ানি খ্রিষ্টান আর রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যে চলছিল বিবাদ।[৩৯] ভিসিগথরা আইবেরীয় উপদ্বীপে হানা দিয়েছিল পিরেনিজ (Pyrenees) পবর্তমালা পেরিয়ে। তারা টলেডোতে স্থাপন করে রাজধানী শহর। এরা কথা বলত লাতিন ভাষায়, কিন্তু দ্রুতই অভ্যস্ত হতে পেরেছিল রোমান সংস্কৃতিতে।

ভিসিগথদের প্রতাপে প্রথম দিকে ঠিক জাঁকিয়ে বসতে পারেনি রোমান ক্যাথলিক চার্চ। এরা রোমের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রভাবকে একরকম ধসিয়ে দেয়। এসব কারণেই স্পেনে কয়েক শতাব্দী ধরে ইহুদিরা স্বস্তিতে থাকতে পেরেছে। ভিসিগথরা ইহুদিদের সম্মান করত এই ভেবে– ইহুদিরা সভ্যতার অপরিহার্য অংশ। কিন্তু এই ভিসিগথরাও চড়াও হলো ইহুদিদের ওপর, যখন ৫৮৭ খ্রিষ্টাব্দে ভিসিগথ শাসক রিকার্ড ক্যাথলিক খ্রিষ্টান হয়ে গেলেন।

ক্যাথলিক ধর্মমতকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন রিকার্ড। ফলে স্পেন চলে যায় গোঁড়া ধর্মীয় শাসনের অধীনে। এই ক্যাথলিকরা অন্য ধর্মের প্রতি অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। চড়াও হয় ইহুদিদের ওপর। ইহুদিরা এতদিন ধরে যে ধর্মান্তকরণ কার্যক্রম চালিয়ে আসছিল, তা এখন আইন করে নিষিদ্ধ করে দেন রিকার্ড। ইহুদিরা খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণে অস্বীকার করলে ভিসিগথ শাসক সিসেবুত ইহুদিদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে তাদের নির্বাসনে পাঠানোর আইন করেন। শাসকগোষ্ঠীর চাপে ইহুদিদের একটি অংশ খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে স্পেনের সমাজে টিকে থাকতে বাধ্য হয়। ইহুদিদের কীভাবে আইন করে ধর্মান্তকরণ করা যায়, সেই পথ খুঁজতে রাজধানী টলেডোতে নিয়মিতই বসতে থাকে গথিকরাজের পরামর্শ পরিষদের বৈঠক। ৬২০ খ্রিষ্টাব্দে ইহুদি-অইহুদি, মিশ্র বিবাহজাতদের খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়। ভিসিগথ রাজা ইহুদিদের উদ্দেশ্যে নির্দেশ জারি করেন–

> ‘হয় খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করো, নয়তো স্পেন ছাড়ো!’

ফলে কিছু ইহুদি গল (রোমান আমলে গল বলতে বোঝানো হতো ফ্রান্স, লুক্সেমবার্গ, বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ড ও উত্তর ইতালি নিয়ে গঠিত উত্তর ইউরোপের একটি অংশকে) ও আফ্রিকার দিকে পালিয়ে যায়। ৬১২ থেকে ৬২০ সালের মধ্যে ৯০

---

[৩৯]. ইহুদিকথা, অমিতাভ সেনগুপ্ত, পৃষ্ঠা, ৫০ থেকে ৫৮, ৭৬-৮১

হাজারের মতো ইহুদি ধর্মান্তরিত হয় বা হতে বাধ্য হয়।[৪০] এসব ধর্মান্তরিত ইহুদিদের মুচলেকা দিতে হয় যে, তাদের পরিবার বা গোষ্ঠীর কোনো সদস্য পুনরায় ইহুদি হওয়ার চেষ্টা করলে তাদের পাথর ছুড়ে কিংবা পুড়িয়ে মারতে বাধ্য থাকবেন তারা। কোনো রাজ দরবারের কর্মচারী ইহুদিদের ধর্ম পালনে সাহায্য করলে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের নির্দেশ দেওয়া হয়। ইহুদিদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান, বার্ষিক উৎসব ও বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়। কোনো ইহুদি সন্তান খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণে রাজি না হলে তাকে শাস্তিস্বরূপ একশো বেত্রাঘাত ও ধনসম্পদ কেড়ে নেওয়া হয়।

৬৮১ খ্রিষ্টাব্দে ভিসিগথ শাসকের পরামর্শক পরিষদ সিদ্ধান্ত নেয়, ইহুদিরা হয় খ্রিষ্টান হবে আর নাহয় দেশ ছাড়বে। এই পরিষদ ধারাবাহিকভাবে ইহুদিদের ব্যবসা-বাণিজ্য হতে বঞ্চিত করার সিদ্ধান্ত নেয়। এভাবে নতুন নতুন কানুন জারি করে স্পেনে ইহুদিদের জীবনযাত্রা বিষিয়ে তোলা হয়। ক্ষুব্ধ ইহুদিরা সিদ্ধান্ত নেয় জিব্রাল্টার প্রণালির অপর পাড়ে থাকা উত্তর আফ্রিকার বার্বারদের সহায়তায় ভিসিগথ শাসন উপড়ে ফেলবে, কিন্তু পরিকল্পনাটি জেনে যায় শাসকগোষ্ঠী। এরপর নির্যাতনের মাত্রা আরও কয়েকগুণ বেড়ে যায়।

ভিসিগথ শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল আরও অনেকেই। এমনই একজন অভিজাত খ্রিষ্টান হুলিয়ান। এই ব্যক্তি ছিলেন সবশেষ ভিসিগথ শাসক রডারিকের একজন সামন্তরাজা। তিনি ইফরিকিয়ার (লিবিয়া ও আলজেরিয়ার অংশ-বিশেষ) শাসক মুসা বিন নুসায়েরকে আমন্ত্রণ জানালেন স্পেন জয়ের। স্পেনে তখন চলছে অরাজক পরিস্থিতি। সুযোগটি লুফে নেন ৬৯৮ সালে গভর্নরের পদে বসা মুসা। বিদ্রোহী হুলিয়ান ছাড়াও ভিসিগথদের অধীনে থাকা দুর্ভাগা ভূমিদাস, দারিদ্র্যে জর্জরিত প্রজা ও নির্যাতিত ইহুদিগণ একজন ত্রাণকর্তার অপেক্ষায় ছিলেন।

তারিক বিন জিয়াদের স্পেন জয়

উত্তর আফ্রিকার যে অংশে তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া আর মরক্কো পড়েছে, আরবরা এর নাম দিয়েছে মাগরিব অঞ্চল। লিবিয়া ও মৌরিতানিয়াকেও মাগরিবের অংশ ধরা হয়। এই মাগরিবে বার্বার নামে একটা খ্রিষ্টান জাতি ছিল। তবে বাইজেন্টাইন খ্রিষ্টানরা যে ধাঁচের ধর্ম পালন করত, বার্বাররা তা পছন্দ করত না। এ কারণে উমাইয়ারা যখন ইসলামের বাণী নিয়ে মাগরিবে পৌঁছায়, তখন বার্বাররা খ্রিষ্টধর্ম ছাড়তে দেরি করেনি। এই বার্বারদেরই একজন তারিক বিন জিয়াদ।

---

[৪০]. মুসলিম স্পেনের রাজনৈতিক ইতিহাস, এস.এম. ইমামউদ্দিন, পৃষ্ঠা-৩২।

স্পেনের নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের ত্রাণকর্তা হিসেবে দেখা দেন জিয়াদ। তিনি ছিলেন ইফরিকিয়ার গভর্নর মুসা বিন নুসাইয়ের-এর একজন ক্রীতদাস। তারিককে আজাদ (মুক্তি) দিয়ে বানানো হয় তাঞ্জিয়ার গভর্নর ও সেনাপতি। ৭১১ সালে স্পেনে অভিযানের দায়িত্ব পড়ে তাঁর ওপর।

৩০০ আরব আর ৭ হাজার বার্বার সৈন্যের একটি দল নিয়ে উত্তর আফ্রিকা থেকে যাত্রা শুরু করেন তারিক। ২৬ এপ্রিল জিব্রাল্টার প্রণালি অতিক্রম করে স্পেনের পার্বত্য অঞ্চলে ঢুকে পড়ে মুসলিম সেনারা। এই স্থান আজও 'জাবাল আত-তারিক' বা তারিকের পর্বত নামে পরিচিতি পাচ্ছে। পরে তারিকের দলে যোগ দেয় মুসার পাঠানো আরও কয়েক হাজার আরব সেনা। যে পার্বত্য অঞ্চলে মুসলিম সেনারা অবস্থান নেয়, সেখানে সৈন্যদের উদ্দেশ্যে এক ঐতিহাসিক ভাষন তারিক বিন জিয়াদ বলেন–

> 'হে আমার সৈন্যরা! কোথায় পালাবে তোমরা? তোমাদের পেছনে সাগর, সামনে শত্রু। তোমাদের সামনে রয়েছে অগণিত শত্রু, আর জীবন বাঁচানোর জন্য তোমাদের কাছে রয়েছে শুধু তলোয়ার। ... এবং মনে রেখ, এই অসাধারণ যুদ্ধে আমিই সবার সামনে থাকব।'

তারিকের ভাষণ শুনে উজ্জীবিত সেনারা ঝাঁপিয়ে পড়ে রডারিকের বিশাল বাহিনীর ওপর। গথিকরাজ রডারিকের লাখখানেক সৈন্যকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে স্পেনের শহরগুলো দখল করতে শুরু করে আরব ও বার্বাররা। একের পর এক শহর দখলে মুসলিম সেনাদের স্বাগত জানায় ইহুদিরা। গ্রানাডা, মালাগা ও রাজধানী টলেডো মুসলমানদের দখলে আসে। ইহুদি-মুসলিমরা একজোট হয়ে শহরগুলো পাহারা দেয়। এভাবেই ইউরোপে ইহুদি ও মুসলমানদের সোনালি যুগ শুরু হয়। পরে মুসলিম শাসিত অঞ্চলটির নাম হয় আল আন্দালুস, একসময় কর্ডোভাকে করা হয় তার রাজধানী। মুসলমান শাসিত স্পেনে ইহুদিরা যে অনেক শান্তিতে ছিলেন, তার বড়ো প্রমাণ হলো– তৎকালীন বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা থেকে আন্দালুস অভিমুখে ইহুদিদের ঢল নেমেছিল।

৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে উমাইয়া খিলাফতের অবসান হয়। বাগদাদের ক্ষমতায় বসে আব্বাসীয়রা। এই আব্বাসীয়দের হাত থেকে বেঁচে যাওয়া ২০ বছরের উমাইয়া রাজপুত্র আব্দুর রহমান পালিয়ে আন্দালুসে চলে আসেন। ৭৫৫ খ্রিষ্টাব্দে আব্দুর রহমান আল-আন্দালুসকে ঘোষণা করেন স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে। ইউরোপের বুকে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রথম স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র, যার রাজধানী করা হয় কর্ডোভাকে। দামেস্ক আর বাগদাদের সঙ্গে শুরু হয় অঘোষিত ইসলামি সাংস্কৃতিক যুদ্ধ। প্রথম আব্দুর রহমান শাসক হওয়ার পর ইউরোপ, মরক্কো, ব্যাবিলন আর আরব অঞ্চল থেকে আরও ইহুদি স্পেনে চলে আসে। অমিতাভ সেনগুপ্ত তার *ইহুদিকথা* বইতে লিখেছেন–

'তিনশো বছরের মুসলিম শাসনে (যদিও স্পেনে মুসলিম শাসন টিকে ছিল ৭শ বছরের মতো) স্পেনের ইহুদিরা পেয়েছে নির্বিচারে খুন না হওয়ার ভরসা, সামান্য হলেও আইনি সুবিধা, ভ্রমণের অধিকার এবং ভিসিগথদের ভেঙে দেওয়া সিনাগগ তৈরির অনুমোদন। বিনিময়ে স্পেনকে ইহুদিরা দিয়েছে সমকালীন দুনিয়ার সেরা বিজ্ঞানসম্মত ভেষজ ও চিকিৎসা পদ্ধতি। বেশ কিছুসংখ্যক ইহুদি রাজদরবারে রাজা, রাজপুত্রদের পরামর্শদাতা হিসেবে নিযুক্ত হয়। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হাসাইদ ইবনে শাপ্রুট এবং স্যামুয়েল ইবনে নাগ্রেলার নাম। সমকালীন বিশ্বে খ্যাতনামা শাপ্রুট কর্ডোভার খলিফার উজির ছিলেন। গ্রানাডার রাজার উজির ছিলেন স্যামুয়েল।'

হয় ধর্মান্তরিত হও, নতুবা মৃত্যু বেছে নাও

তাবুতে পায়চারি করছেন কায়ি গোত্রের প্রধান দুন্দার বে। ভাতিজা ওসমান বে-কে নিয়ে তার দুশ্চিন্তার শেষ নেই। গাজি আরতুগ্রুল মারা যাওয়ার পর কায়িদের নেতৃত্বের ভার পড়েছিল ছোটো ভাই দুন্দার-এর কাঁধে। ক্যাসেলের খ্রিষ্টানদের সাথে সমঝোতা করে নির্ঝঞ্ঝাট চলার পক্ষে তিনি, আর ভাতিজা ওসমান বে চায় জিহাদ। বাবার মতোই ক্রুসেডারদের সাথে যেকোনো আপসের বিরোধী ওসমান। তাবুতে ফেরার পথে ক্যাসেলের একদল মুখোশধারী ওসমান বে ও তার সহযোদ্ধা আইবার্সের পথ অবরোধ করে দাঁড়ায়। ওসমান বে জীবিত ফিরলেও শহিদ হন আইবার্স। কায়িদের তাবুতে লাশ ফিরলে চিন্তিত হয়ে পড়েন দুন্দার বে। ভাতিজা ওসমান বে-কে উদ্দেশ্যে করে বলেন–

'দল থেকে আলাদা হয়ো না। দলচ্যুত হলে শিকারীরা আক্রমণের সুযোগ পেয়ে যায়।'

এটি জনপ্রিয় তুর্কি সিরিয়াল 'কুরুলুস ওসমান'-এর একটি দৃশ্য।

এখানে দলচ্যুত হওয়া বলতে কাফেলার সাথে না থেকে ভিন্নপথে যাওয়াকে বোঝানো হয়েছে। ঐক্যবদ্ধ থাকতে বলা হয়েছে। অনৈক্যের কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন সময়ে মুখ থুবড়ে পড়েছিল ইসলামের অগ্রযাত্রা। যে কায়ি গোত্রের কথা এখানে বলা হচ্ছে, তারাই পরবর্তীকালে গড়ে তুলেছিলেন অর্ধ ইউরোপব্যাপী অটোমান সাম্রাজ্য। ওসমান বে ছিলেন তার প্রথম সুলতান।

অনৈক্য আর ক্ষমতার লোভের কারণে আন্দালুসকে খ্রিষ্টানদের হাতে তুলে দিতে হয়েছিল মুসলমানদের। ১১ শতকের শুরুর দিকে আন্দালুসের উমাইয়াদের মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে ব্যাপক দ্বন্দ্ব ও সংঘাত ছড়িয়ে পড়ে। এদের কেউ কেউ ঘরের শত্রু ঠেকাতে ডেকে আনে উত্তরের খ্রিষ্টানদের। একসময় কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা ভেঙে গিয়ে আন্দালুস বিভক্ত হয়ে ২২টি তাইফের (নগররাষ্ট্রের) জন্ম হয়।

সেনাপতি তারিক বিন জিয়াদের স্পেন জয়ের ৫শ বছর পেরিয়ে গেছে। ১২১২ সালে আদর্শ ও লক্ষ্যচ্যুত মুসলমানদের তাড়াতে ক্রসেডার বাহিনী ঢুকে পড়ে স্পেনে। তারা আবার ইহুদি নিধনযজ্ঞে মেতে ওঠে। তবে প্রতিবেশী খ্রিষ্টানরা কিছু কিছু জায়গায় ইহুদিদের রক্ষা করতে সক্ষম হয়। ১৩৯১ সালে পর্তুগালের ইহুদিদের বলা হলো- 'হয় ধর্মান্তরিত হও, নতুবা মৃত্যু বেছে নাও।' এই সময়ে অনেক ইহুদি ধর্মান্তরিত হয় বা হতে বাধ্য হয়। আইবেরিয়া উপদ্বীপে (স্পেন, পর্তুগাল, এন্ডোরা এবং ফ্রান্সের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত) ইহুদিদের অবজ্ঞার চোখে দেখা হতো। তাদের বলা হতো মাররানো বা শুয়োর।

এ সময় দেড় থেকে তিন লাখের মতো ইহুদি ধর্মান্তরিত হয়। চাপের মুখে ধর্মান্তকরণের এমন নজির বিশ্বে দ্বিতীয়টি আছে বলে জানা যায়নি। তবে ধর্মান্তরিত হলেও লুকিয়ে লুকিয়ে প্রার্থনা করত ইহুদিরা। একসময় ডমিনিকান খ্রিষ্টানরা ইহুদিদের ওপর অত্যাচার বাড়িয়ে দেয়। ষড়যন্ত্রকারী অপবাদ দিয়ে তাদের বেঁধে পুড়িয়ে মারা হয়, সম্পত্তি জবরদখল করা হয়। বহু ইহুদি এ সময় প্রাণভয়ে স্পেন ছেড়ে উত্তর আফ্রিকায় পাড়ি জমায়।

আলহামরা ডিক্রি

১৪৬৯ সাল। স্পেনে সব হারিয়ে মুসলমানদের হাতে টিকে আছে মাত্র একটি নগররাষ্ট্র- গ্রানাডা। ইউরোপের খ্রিষ্টান নেতারা গুরুত্বপূর্ণ এক রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিলেন। বাদবাকী মুসলমান ও ইহুদিদের তাড়াতে হলে স্পেনের বড়ো দুই খ্রিষ্টান রাজ্য ক্যাস্তিল ও অ্যারাগনকে এক করতে হবে। ঐতিহাসিক এক বিয়ের মধ্য দিয়ে এই ঐক্যের কাজটি সেরে ফেললেন খ্রিষ্টানরা। বিয়ের পিঁড়িতে বসেন ক্যাস্তিলের রানি ইসাবেলা ও অ্যারাগনের রাজা ফার্দিনান্দ। অনেকে বলে থাকেন এই বিয়ে আসলে ক্রুসেডেরই অংশ। ১৪৯২ সালের দোসরা জানুয়ারি রাজা-রানির কাছে মুসলিম শাসনের সবশেষ স্মৃতিচিহ্ন 'আলহামরা' প্রাসাদের চাবি তুলে দেন গ্রানাডার সর্বশেষ মুসলিম শাসক সুলতান আব্দুল্লাহ। এখানেই শেষ হয় আন্দালুস পর্ব। রানি ইসাবেলা ও রাজা ফার্দিনান্দ স্পেনের মুসলিম অঞ্চল (গ্রানাডা) দখল করলে অন্তত ৫ হাজার ইহুদিকে পুড়িয়ে মারা হয়।

১৪৯২ সালের ৩১ মার্চ রাজা-রানি স্পেনের ইহুদিদের বহিষ্কারের হুকুম দেন। জারি করেন 'আলহামরা ডিক্রি'। এই ডিক্রির দু-চার লাইন এ রকম-

> 'রাষ্ট্রীয় ফরমানবলে আমাদের রাজধানী, নগরসমূহ, গঞ্জ, গ্রাম, লোকালয় এবং আন্দালুসের প্রতি ইঞ্চি জমি ও পানি থেকে তোমাদের উচ্ছেদ করা হলো। আগামী চার মাস অর্থাৎ জুলাই মাসের শেষ দিবসের সূর্যাস্তের পরে তোমাদের যেখানে যাকে পাওয়া যাবে- শিরোশ্ছেদ করা হবে এবং এটা করা হবে আন্দালুসের স্বার্থেই।'[৪১]

---

[৪১]. স্বপ্নভ্রমণ জেরুজালেম, বুলবুল সরওয়ার, পৃষ্ঠা-১৮৮, ১৮৯

এই ফরমানের ফলে আইবেরিয়া উপদ্বীপ একসময় ইহুদিশূন্য হয়ে যায়। এদিকে রানি ইসাবেলার অনুদান আর জাহাজে করে অভিযানে বেরিয়ে পড়েন ইতালির নাবিক কলম্বাস। তার এই অভিযানকেও অনেকে দেখে থাকেন ক্রুসেডের অংশ হিসেবে। তবে এই অভিযানেও কলম্বাসের সাথে কয়েকজন ইহুদি নাবিক ছিলেন। কলম্বাস ভারত আবিষ্কার করতে গিয়ে ভুলক্রমে পৌঁছে যান ওয়েস্ট ইন্ডিজ এলাকায়। কারও কারও মতে– তিনি আসলে নেমেছিলেন আজকের কিউবাতে। সেখানে কলম্বাসরা আদিবাসীদের গণহত্যায় মেতে ওঠে। কলম্বাসের দলটি সাথে করে নিয়ে গিয়েছিল বাইবেল, ক্রুশদণ্ড আর বন্দুক। তাদের সাথেই ইউরোপ থেকে সেখানে পৌঁছে যায় ম্যালেরিয়া ও বসন্তের জীবাণু। এই জীবাণুতে আক্রান্ত হয়ে কয়েক বছরের ব্যবধানে ৯৫ শতাংশ আদিবাসী বিলুপ্ত হয়ে যায়।[৪২]

ক্রুসেডারদের হাতে ইহুদি গণহত্যা

এক

এখন যে ইউরোপ আমরা দেখছি, তা থেকে আগের ইউরোপ বিশেষ করে দশম-একাদশ শতকের ইউরোপ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তৃণমূলে ছিল দরিদ্রতার কালো ছায়া। এর ব্যতিক্রম ছিল পূর্বে। বাইজেন্টাইন আর এশিয়া-আফ্রিকার মুসলিম শাসিত এলাকাগুলো ছিল কৃষি, অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ। ইউরোপের সমাজ ছিল সামন্তবাদী। ক্রুসেডের পেছনে এই সামন্তবাদ যে বড়ো ধরনের ভূমিকা রেখেছে, এ নিয়ে অতটা আলোচনা হয়নি বা হচ্ছে না।

অনেক ইউরোপীয় কৃষিকাজে যুক্ত ছিল, কিন্তু তাদের ভূমির কোনো মালিকানা ছিল না। ভূমির মালিকানা ছিল সমাজের মাত্র এক শতাংশ লোকের হাতে। ব্যারন, কাউন্ট ও ডিউক উপাধিধারীরা জমিগুলোতে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করতেন। ইউরোপের এসব ভূমিতে যাদের বাধ্যতামূলকভাবে চাষাবাদ করতে হতো, তাদের বলা হতো ভূমিদাস।[৪৩] জমির মালিকানা পরিবর্তন হলেও ভূমিদাসদের চাষাবাদ ছাড়ার উপায় ছিল না। এইভাবে বাধ্যতামূলক চাষাবাদ তাদের জীবন বিষিয়ে তুলেছিল।

একপর্যায়ে শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়া ভূমি-দাসরা রোগাক্রান্ত হতে থাকে, এ যেন নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে নিজেকে ঠেলে দেওয়া। বলা যায়, একধরনের মিলিটারি অটোক্রেসি। অথচ সামন্তপ্রভুরা বিলাসী জীবনযাপন করত। তারা বসবাস করত আলিশান ভবনে। ভূমিগুলো দেখাশোনা করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় নাইটদের নিয়োগ দেওয়া হতো।

---

[৪২]. আধো ঘুমে ক্যাস্ট্রোর সঙ্গে, শাহাদুজ্জামান, পৃষ্ঠা-১৫

[৪৩]. Shock: The First Crusade and the Conquest of Jerusalem। The Crusades: An Arab Perspective Ep1, Al Jazeera English documentary

এদের প্রয়োজন ছিল অর্থ। ফলে নাইটদের ডাকাতি আর লুটপাটে এক ধরনের যুদ্ধাবস্থার মধ্যে পড়ে যায় ইউরোপ। এর মধ্যে কে হবেন ইউরোপের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা? পোপ না রাজা? এ নিয়ে শুরু হয় রাজনীতি ও ধর্মের মধ্যে গৃহবিবাদ। কিন্তু ইউরোপে শুরু হওয়া নৈরাজ্য ঠেকানো দরকার ছিল। পোপের অফিস চাইল এর অবসান করতে, কিন্তু তা সম্ভব হলো না। তাই নাইট যোদ্ধাদের ইউরোপের বাইরে লড়াইয়ে পাঠানোর চিন্তা আসে পোপের মাথায়, এতে সমস্যাটি ডাইভার্ট করে নিয়ে যাওয়া যাবে অন্য ভূখণ্ডে। আর এই ডাইভার্টটা করতে হবে ধর্মের দোহাই দিয়ে; তাহলে সবাই অন্য কোনো চিন্তা করবে না- সেটা কোথায়? চোখ পড়ে মুসলিম সম্রাজ্যের জেরুজালেমের ওপর। ইউরোপের চোখে যারা পবিত্র নগরী জেরুজালেম দখল করে আছে, লড়াই হবে তাদের বিরুদ্ধে। উদ্ধার করতে হবে যিশুখ্রিষ্টের সমাধি। এমন ভাবনা থেকেই ক্রুসেড ধারণার উৎপত্তি।

অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ মুসলিমরা ছিল গোষ্ঠী ও রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত। ইউরোপের ধর্মীয় নেতারা সুযোগ খুঁজল এখানেই। ৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যেই একক খলিফার পরিবর্তে মুসলিম বিশ্বে দাঁড়িয়ে গেল তিন খলিফা। বাগদাদে আব্বাসীয়, মিশরে ফাতেমি আর স্পেনের আন্দালুসে বাগদাদ থেকে বিতাড়িত উমাইয়ারা। তবে মুসলমানদের মধ্যে সে সময় মূল দ্বন্দ্বটা ছিল আব্বাসীয় ও ফাতেমিদের মধ্যে। কারণ, এটা ছিল শিয়া-সুন্নির দ্বন্দ্ব।

তখনকার আব্বাসীয় খলিফা ছিলেন সেলজুকদের হাতের পুতুল। তিনি পরিণত হলেন নামমাত্র শাসকে। রাষ্ট্রের মূল চালিকাশক্তি ছিল সেলজুক নিয়ন্ত্রিত মন্ত্রী ও অমাত্যগণ। এর দায় এড়াতে পারেন না আব্বাসীয়রাও। কারণ, আব্বাসীয় শাসকরাই সেনাবাহিনীতে বেশি বেশি করে আরবদের চেয়ে তুর্কিদের নিয়োগ দেওয়া শুরু করেছিলেন। এই তুর্কি সেনারাই একসময় গলার ফাঁস হলো। মুসলিম বিশ্বের আর্মি দখলদার শক্তিতে পরিণত হলো। সেলজুকরা তুঘরিল বে-এর নেতৃত্বে আব্বাসীয় খিলাফতের ম্যান্ডেট নেওয়ার পর, খলিফা পদটি মূলত অলংকার হিসেবে পড়ে থাকল। খলিফা থাকলেন বটে, কিন্তু হয়ে পড়লেন দন্তহীন বাঘ। এই তুঘরিল বে–কে বলা হয় সেলজুক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।

'সেলজুক' নামের এই জনগোষ্ঠী দশম শতকের দিকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। পরের শতকে তারা নিজেদের আদি আবাসভূমি ছেড়ে চলে আসে পারস্যের (বর্তমান ইরান) খোরাসানে। সেলজুকরা পারস্য সংস্কৃতি ধারণ করে এবং বর্তমান আফগানিস্তানের হিন্দুকুশ থেকে শুরু করে এশিয়া মাইনর এবং মধ্য এশিয়া থেকে পারস্য পর্যন্ত তুর্কি-পারস্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। জনপ্রিয় তুর্কি সিরিয়াল 'দিরিলিস আরতুগ্রুলে' এই সেলজুকদের আংশিক শাসন দেখানো হয়েছে।

বাগদাদে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে বাইজেন্টাইন ভূখণ্ডের দিকে নজর দিলো সেলজুকরা। ক্রমেই বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা হাতছাড়া হতে থাকল। ১০৭১ সালে মানজিকার্টের যুদ্ধে জিতে বাইজেন্টাইন রাজধানী কনস্টান্টিনোপলের দোরগোড়ায় পৌঁছে যায় সেলজুক বাহিনী। সেলজুকরা সম্রাট রোমান দিওজেনিসকে বন্দি করল।

এবার ইউরোপের সহায়তা চাইলেন বাইজেন্টাইন উত্তরাধিকারী। পোপ সপ্তম গ্রেগরি যুদ্ধের জন্য মানসিকভাবে একরকম প্রস্তুতই ছিলেন। আরবদের কাছে 'দ্য হলি শয়তান' নামে পরিচিত গ্রেগরির সামনে একটি পবিত্র যুদ্ধ শুরুর সুযোগ দেখা দিলো। গ্রেগরি বলতে লাগলেন— 'মুসলমানরা জোর করে যিশুখ্রিষ্টের সমাধি দখল করে রেখেছে, এটা এবার উদ্ধার করতে হবে।'

কিন্তু যুদ্ধের জন্য প্রয়োজন ছিল জনসাধারণের বৈধতা। সে সময় ইউরোপে অনেকেই, এমনকী বিশপদের কেউ কেউ পরিপূর্ণ লেখাপড়া জানতেন না। কাজেই তাদের মধ্যে মুসলিমবিদ্বেষী প্রপাগান্ডা ছড়ানো সহজ ছিল। ১০৮৫ সালে মারা যান গ্রেগরি। তিন বছর পর (১০৮৮) নতুন পোপের দায়িত্ব পান উচ্চাভিলাসী দ্বিতীয় আরবান। আরবানকে ওই শতকের সবচেয়ে বিপজ্জনক পোপ বলা হয়ে থাকে। ১০৯৫ সালের নভেম্বরে পোপ আরবান ফ্রান্সে এক সমাবেশে পবিত্র যুদ্ধের ঘোষণা দেন। তিনি বলেন— 'নাস্তিক, বিধর্মী ও পৌত্তলিকদের কাছ থেকে যিশুখ্রিষ্টের সমাধি উদ্ধার করতে হবে।' অবশ্য, পোপ সেদিন একবারের জন্যও মুসলমান বা ক্রুসেডের নাম নেননি। তিনি এটিকে বলেছেন পবিত্র যুদ্ধ। পোপ ঘোষণা দেন—

> 'পবিত্র ভূমি পুনরুদ্ধারে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে, এটাই স্রষ্টার ইচ্ছা।'

যেহেতু গরিবরা ধর্মের প্রতি সহানুভূতিশীল, তাই পোপের ঘোষণা ম্যাজিকের মতো কাজ করল। সমাবেশে আসা লোকজন লাল ফিতা কেটে বুকে বাঁধল। এভাবেই শুরু হলো ক্রুসেড যাত্রা।

বুড়ো যাজক পিটার দ্য হারমিট; যিনি ফ্রান্স ও ইতালির রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে এতদিন মানুষকে ক্রুসেডে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, তার নেতৃত্বে ইউরোপের কৃষক, শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের একটি দল ১০৯৬ সালে বাইজেন্টাইন রাজধানী কনস্টান্টিনোপলে এসে পৌঁছায়। এরা সিলভারে প্রলেপ দেওয়া বাইজেন্টাইনের চকচকে গির্জাগুলো দেখে অভিভূত হয়ে যায়। বাইজেন্টাইন সেনাদের অভিজাত পোশাক-আশাকও তাদের আকৃষ্ট করে। ক্রুসেডারদের দলটি তাই বাইজেন্টাইন গির্জা ও বাসাবাড়িতে হানা দিতে শুরু করে। বিরক্ত সম্রাট আলেক্সিস কমনেনস সেনাদের মাধ্যমে এসকর্ট দিয়ে এই দলটিকে এশিয়া মাইনরের দিকে পাঠিয়ে দিলেন। বসফরাস পেরিয়ে ক্রুসেডারদের দল ঢুকে পড়ল সেলজুক এলাকায়। এরা হেঁটেই রওনা হলো জেরুজালেমের পথে।

দুই

১০৯৬ সালের ২১ অক্টোবর।

আগে থেকে ওত পেতে থাকা সেলজুক সেনারা ঝাঁপিয়ে পড়ল ক্রুসেডারদের এই আনাড়ি দলটির ওপর। ২০ হাজার সদস্যের বেশিরভাগই জবাই হলো সেলজুকদের তলোয়ারের নিচে।

এই দলটির পরেই ইউরোপ থেকে আসছিল অভিজাতদের নেতৃত্বে আরেকটি দক্ষ ও সুসংগঠিত বাহিনী। তাদের হাতেই পতন হয় জেরুজালেম শহরের। এই অভিজাত ক্রুসেডারদের নেতৃত্ব দিয়েছিল গডফ্রে, বল্ডউইন ও র‍্যামন দ্য ফোর্থের মতো ইউরোপীয় শাসকরা। এরা কনস্টান্টিনোপলে পৌঁছলেও বসন্তের আগে তাদের এশিয়া মাইনরে ঢুকতে দেননি বাইজেন্টাইন সম্রাট আলেক্সিস। মুসলমানদের কাছ থেকে কোনো শহর দখল করা গেলে তা বাইজেন্টাইনকে হস্তান্তর করতে হবে– এমন শর্তে এশিয়া মাইনরে প্রবেশ করার অনুমতি পায় ক্রুসেডাররা। বসফরাস পেরিয়ে তারা দখল করে নেয় সেলজুক রাজধানী-সিটি অব নাইসি। দলটি জেরুজালেমে পৌঁছে ১০৯৯ সালের ৭ জুন। পাঁচ সপ্তাহের অবরোধের পর ১৪ জুলাই তারা জেরুজালেমে প্রবেশ করে। জেরুজালেম দখলের পর প্রায় দশ দিন ধরে চলে গণহত্যা। তাদের গণহত্যা থেকে রক্ষা পায়নি মুসলমান, ইহুদি এমনকী আগে থেকে শহরটিতে বাস করা আরব খ্রিষ্টানরাও।

এর আগে ১০৭১ সালের ২৬ আগস্ট মানজিকার্টের (তুরস্কের পূর্বাঞ্চলীয় একটি এলাকা) যুদ্ধে আলপ আরসালানের নেতৃত্বে সেলজুকরা বাইজেন্টাইনের সেনাদের হটিয়ে দিয়েছিল। ১০৭৮ সালের মধ্যেই জেরুজালেমসহ বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় এলাকার অনেক জায়গা সেলজুকদের দখলে চলে এসেছিল। অভিযোগ আছে, সেলজুকরা খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের জন্য জেরুজালেমের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল।

ক্রুসেডের পেছনে ধর্মীয় দিক তো অবশ্যই, এ ছাড়াও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণও ছিল। শুধু জেরুজালেম দখল করাই ইউরোপের ক্রুসেডারদের উদ্দেশ্য ছিল না। যে সময় এই ধর্মযুদ্ধ শুরু হয়, তখন ইউরোপের চোখে শত্রু ছিল বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য, যারা রোমান সাম্রাজ্য থেকে পৃথক হয়ে কনস্টান্টিনোপলকে নিজেদের রাজধানী ঘোষণা করেছিল। বিভিন্ন জার্মান জাতিগোষ্ঠী ও শাসকদের ধারাবাহিক হামলায় বহু আগেই রোমান সাম্রাজ্যের পতন হলেও বাইজেন্টাইন টিকে ছিল ১৪৫৩ সাল পর্যন্ত। তাদের পাশাপাশি ইসলামি খিলাফতও ছিল ক্রুসেডারদের চোখে শত্রু। বাইজেন্টাইনের সঙ্গে পশ্চিমের রোমান সাম্রাজ্যের বিরোধের কারণ ছিল ধর্ম। তারা যে ধরনের ধর্ম পালন করত, তা ইউরোপের ক্যাথলিক ধর্মচর্চা থেকে ছিল ভিন্ন। সেখানে চার্চ বলতে বোঝাতো গ্রিক অর্থডক্স চার্চকে। ইউরোপের মতো বাইজেন্টাইনরা লাতিন ভাষা ব্যবহার করত না। ভাষাগত পার্থক্য ছাড়াও তাদের মধ্যে ছিল আরও নানা ধরনের বিশ্বাসগত পার্থক্য। সময়ের সাথে সাথে ব্যবধান আরও তীব্র হয়।

বাইজেন্টাইনের সাথে বিরোধের অন্যতম রাজনৈতিক কারণ পোপের একটি ঘোষণা। ৮'শ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন পোপ আকস্মিকভাবে ফ্রান্সের সম্রাট সারলেমনকে রোমের সম্রাট ঘোষণা করেন। ইউরোপের তুলনায় ধনী ও উন্নত বাইজেন্টাইনকে পাশ কাটিয়ে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ায় রোমের সঙ্গে তারা ধর্মীয় সম্পর্ক ছেদ করে। সে সময় থেকে ক্যাথলিক ধর্মচর্চায় দুটি ধারার জন্ম হয়। ভ্যাটিকেন চেয়েছিল বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যকে

পোপের ক্ষমতাবলয়ে আনতে; পরে অবশ্য ভ্যাটিকেন আর পোপ বিভেদ ঘুচিয়ে খ্রিষ্টানদের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে তোলার ডাক দেন মুসলমানদের বিরুদ্ধে। ক্রুসেডের পেছনে অর্থনৈতিক কারণও ছিল। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে আন্তঃদেশীয় বাণিজ্যপথের নিয়ন্ত্রণ মুসলমানদের হাতে থাকায় ক্ষতির মুখে পড়েছিল ইউরোপের অর্থনীতি। তাই এই ভূমধ্যসাগর নিয়ন্ত্রণ করাটাও ইউরোপের জন্য প্রয়োজন হয়ে দেখা দিয়েছিল।

ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ পরিচালিত হয় প্রধানত চারটি অভিযানে (১০৯৫-১২৯৬)। প্রথম অভিযানটি শুরু হয় ১০৯৬ সালে, যা শেষ হয় ১০৯৯ সালে। এসব অভিযানের মূল উদ্দেশ্যে ছিল– মুসলমানদের কাছ থেকে জেরুজালেম দখল করা।

বুড়ো সন্ন্যাসী পিটার; যিনি ইউরোপের পথে পথে ক্রুসেডের পক্ষে ক্যাম্পেইন করেছিলেন, তাঁর মতে–

> 'পৃথিবীর সব সমস্যার মূল হলো মুসলমানদের জেরুজালেম দখল করে রাখা।'

তাকে সামনে রেখেই রটানো হয়– প্যালেস্টাইনে মুসলিমরা খ্রিষ্টানদের অকথ্য নির্যাতন করছে। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে মূর্তি উপাসক বলেও অভিযুক্ত করা হয়। এই প্রোপাগান্ডাকে পুঁজি করে পশ্চিম ইউরোপের (বিশেষ করে ফ্রান্স ও জার্মানি) সামন্তপ্রভু, কৃষক, ভূমিদাস ও নাইটরা ঐক্যবদ্ধ হলো। প্রায় ৮০ হাজার লোক আক্রমণের জন্য ক্রুশদণ্ড তুলে নিল, এদের বেশিরভাগই ছিল দরিদ্র। তাদের ছিল না প্রয়োজনীয় কোনো সামরিক প্রশিক্ষণ। প্রথম দলটি ইউরোপ থেকে কনস্টান্টিনোপল হয়ে জেরুজালেমের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলো। পথের দূরত্ব বা বিপদাপদের বিষয়টি তারা আমলেই নিল না।

ইউরোপীয় খ্রিষ্টানদের এই দলটি রাইন নদী পেরিয়ে হাঙ্গেরি ও বুলগেরিয়ায় প্রবেশ করে। পথেপথে তারা অসংখ্য ইহুদিকে হত্যা করে অর্থ-সম্পদ লুটে নেয়। বহু ইহুদিকে জোর করে খ্রিষ্টান বানানো হয়। অবশ্য, এই খ্রিষ্টানরাও পালটা হামলার শিকার হয়। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা এসব খ্রিষ্টানদের একাংশ স্থানীয়দের হাতে খুন হয়। এই দলে থাকা কৃষক-শ্রমিকদের যে অংশটি তুরস্ক পর্যন্ত পৌঁছাতে পেরেছিল, তারা সেলজুকদের অ্যামবুশের মুখে পড়ে বিনাশ হয়ে গিয়েছিল।

১০৯৬ সালের প্রথম অভিযানের সময় রাইন উপত্যকায় ১২ হাজার ইহুদিকে হত্যার অভিযোগ উঠে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে। ইউরোপের রাইন ও দানিয়ুব অঞ্চলের ইহুদি সম্প্রদায় একরকম নির্মূল হয়ে যায় ফরাসি ধর্মযোদ্ধাদের হাতে। প্রধানত ফরাসি নাইট ও সেনাদল নিয়ে গঠিত প্রথম ক্রুসেড ইউরোপীয় ইহুদিদের জীবনে আমূল পরিবর্তন আনে; বদলে যায় খ্রিষ্টান ও ইহুদি সম্প্রদায়ের পারস্পরিক দৃষ্টিভঙ্গি। পরবর্তী বছরগুলিতে ফ্রান্সে ইহুদিদের বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্বেষ তৈরি হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আধুনিক ইউরোপে ইহুদি গণহত্যা

'আমি যদি জানতাম জার্মানির সব ইহুদি শিশুকে ইংল্যান্ডে স্থানান্তর করে বাঁচানো সম্ভব কিংবা তাদের ইজরাইলে এনে অর্ধেকও বাঁচানো সম্ভব, তাহলে আমি দ্বিতীয়টিই বেছে নিতাম। কারণ, আমরা শুধু ওই শিশুদের রক্ষার জন্যই দায়বদ্ধ নই; বরং ইহুদিদের ঐতিহাসিক জবাবদিহিতার দায়ও আমাদের রয়েছে।'—বেনগুরিয়ান

রাশিয়ার পগরম কর্মসূচি এবং প্রথম ও দ্বিতীয় আলিয়া

রুশ সাম্রাজ্যে ইহুদি নিধন কর্মসূচিকে বলা হতো পগরম (Pogrom), যার অর্থ ধ্বংস করা। সেখানে প্রথম পগরমের ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করা হয় ১৮২১ সালে বন্দরনগরী ওডেশার একটি ঘটনাকে। ওডেশা বর্তমানে ইউক্রেনের মালিকানাধীন কৃষ্ণসাগরের একটি বন্দর। এখানে রুশদের পাশাপাশি ছিল গ্রিক, ইহুদি ও ইউক্রেনীয়দের বসবাস। সে সময় একজন গ্রিক অর্থডক্সের হত্যাকাণ্ডকে ঘিরে ১৪ জন ইহুদিকে হত্যা করা হয়েছিল। এ ধরনের পগরম ধারাবাহিকভাবেই সাম্রাজ্যজুড়ে ঘটতে থাকে। ১৮২১ সালের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত চলা পগরমে ৪০ জন ইহুদি খুন হয়।

১৮৮১ সালে রুশ সম্রাট দ্বিতীয় আলেকজান্ডার নিহত হলে গুজব ছড়িয়ে পড়ে- এর পেছনে ইহুদিদের হাত আছে! এই ধারণা থেকেই তৃতীয় আলেকজান্ডার ক্ষমতায় বসেই শুরু করেন ইহুদি নিধনযজ্ঞ। পগরম বিস্তৃত পরিসরে গুরুত্ব পায় তখনই। পশ্চিমের গণমাধ্যমে রুশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে লেখালেখি হতে থাকে। তারা রুশ শাসকগোষ্ঠীকে ইহুদি নির্যাতনের জন্য অভিযুক্ত করতে থাকে। ওডেশা এলাকার বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ইহুদি ছাত্ররা গড়ে তোলে আত্মরক্ষামূলক সংস্থা; শুরু হয় প্রতিবাদ-প্রতিরোধ।

১৮৮২ সালে May Law নামে এক আদেশ জারি করে রুশ কর্তৃপক্ষ। এই আদেশের মাধ্যমে ইহুদিদের বসতি স্থাপন ও চলাফেরা নিয়ন্ত্রণ করা শুরু হয়। তাদের নির্দিষ্ট শহর ও নির্দিষ্ট আবাসিক এলাকার মধ্যে থাকতে বলা হয়। ব্যাবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ১৮৮১ থেকে ১৮৮৪ এই চার বছরে রুশ সাম্রাজ্যে প্রায় দুইশো পগরম সংঘটিত হয়।

১৮৮৭ সালে রাশিয়ার বিদ্যালয়গুলোতে ইহুদি শিক্ষার্থী ভর্তিতে কোটা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। এর কয়েক বছরের মধ্যেই ইহুদি আইনজীবীদের জন্য কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়।

ইহুদিরা তাদের পরিবার ও সম্পদ রক্ষায় হাতে অস্ত্র তুলে নিলে ১৯০৩ থেকে ১৯০৬ সালের মধ্যে আরেক দফা পগরম হয়। এতে দুই হাজারের মতো ইহুদি নিহত হয়। ১৮৮১ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন পগরমের কারণে ২০ লাখের মতো ইহুদি রুশ সাম্রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে যায়। এদের বেশিরভাগ যায় যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে। আরেকটা অংশ আসে ১৮৮২ সালে প্যালেস্টাইনের দিকে। এই আগমনকে প্রথম আলিয়া বলে থাকে ইহুদিরা। তখন ফিলিস্তিনে ইহুদিদের সংখ্যা ছিল ২৫ হাজার। এদের দুই-তৃতীয়াংশই বাস করত জেরুজালেমে। পগরমের কারণেই ইহুদি নেতাদের কেউ কেউ পরবর্তী সময়ে রুশ বিপ্লবে জড়ান বলে প্রচার আছে। রুশ (বলশেভিক) বিপ্লবের তিন কান্ডারির একজন লিও ট্রটস্কি। লেলিন-স্ট্যালিনের সহযোদ্ধা ট্রটস্কি সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের রেড আর্মির প্রতিষ্ঠাতা। ১৯০৪ সাল থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত আরও অনেক ইহুদি ফিলিস্তিনে আসে, যা দ্বিতীয় আলিয়া নামে পরিচিত। ১৯১৪ সাল মানে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু নাগাদ ফিলিস্তিনে ইহুদির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৮৫ হাজার, যা তখনকার ফিলিস্তিনের মোট জনসংখ্যার দশ ভাগেরও বেশি।

নাৎসি জামানায় ইহুদিদের জীবন

আধুনিক ইউরোপ ইহুদিদের জন্য মৃত্যুপুরী ছিল নাৎসিদের জামানায়। নাৎসিরা জার্মানির ক্ষমতায় বসেই কমিউনিজম ও ইহুদিবাদের বিরুদ্ধে চড়াও হয়। ইউরোপ জুড়ে খোলা হয় হাজার হাজার ক্যাম্প ও ঘেটো (আলাদা ঘর, যেখানে কেবল ইহুদিদেরই রাখা হতো)। একটা সময় পরে এই ক্যাম্পগুলোই রূপ নেয় টর্চার সেলে। জার্মানি ছাড়াও যেসব ভূখণ্ড নাজিরা সাময়িক সময়ের জন্য দখল করতে পেরেছিল, সেখানেও একই কায়দায় চলে ইহুদি নিধন।

জার্মানিতে ইহুদি গণহত্যার যে রেকর্ড, আধুনিক সময়ে এর চাইতে ভয়ংকর 'একক গণহত্যার' রেকর্ড আর কোথাও নেই। তবে অতীতে এ রকম একক গণহত্যার রেকর্ড আরও আছে, যা ঘটেছে ত্রয়োদশ শতকে মধ্য এশিয়াতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে। দুর্ধর্ষ মোঙ্গল বাহিনী বুখারা, সমরখন্দ, নিশাপুর, খোরাসান, উরগঞ্জ আর তিরমিজে লাখো মুসলমানকে হত্যা করে মাথার খুলি দিয়ে পিরামিড বানিয়েছিল।

আধুনিক জার্মানিতে ইহুদি গণহত্যার নেতৃত্বে ছিলেন অ্যাডলফ হিটলার, যিনি নিজেও জন্মসূত্রে জার্মান নন। তার জন্ম অস্ট্রিয়াতে। অথচ এই ব্যক্তিটি ইতিহাসের জঘন্যতম

জার্মান জাতীয়তাবাদের ডাক দিয়েছিলেন। তার এই উগ্র জাতীয়তাবাদের দর্শন লাখো ইহুদির জীবন কেড়ে নিয়েছিলেন, দেশছাড়া হয়েছিলেন কমিউনিস্টরা। ইহুদিদের প্রতি হিটলারের কেন এই বিদ্বেষ, এ নিয়ে আলোচনা করা হবে। তবে প্রথমে নাৎসি জামানার দমন-নিপীড়ন ও গণহত্যার চিত্র খোলাসা করা যাক।

হিটলারের ফাঁদ

ক্ষমতায় এসেই হিটলার চিন্তা করলেন কমিউনিস্টদের দমন করবেন, ধ্বংস করবেন কিংবা জার্মানি থেকে তাড়িয়ে দেবেন, কিন্তু এ জন্য তো প্রেক্ষাপট দরকার! কমিউনিস্ট খেদানোর উছিলা কী হতে পারে!

জার্মানিতে কমিউনিস্টদের মিছিল-মিটিং নিষিদ্ধ করা হলো। কেন করা হলো? হিটলার ভাবছেন, এতে উত্তেজিত হয়ে তারা বিপ্লবের চেষ্টা করবে, নাশকতা শুরু করবে। তার প্রতিক্রিয়ায় নাৎসীবাহিনী রাষ্ট্রে অশান্তি সৃষ্টির অভিযোগ এনে কমিউনিস্টদের সমানে পিটিয়ে গারদখানায় ঢোকাবে। কমিউনিস্টরা হিটলারের এই ফাঁদে পা দেয়নি। নাৎসি নেতা পড়লেন মহাবিপাকে। একি! কমিউনিস্টরা তো ফাঁদে পা দিচ্ছে না! এবার নাৎসিরা নতুন চাল চালল। সেটা কীরকম?

১৯৩৩ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি। সন্ধ্যা সাতটা। জার্মান পার্লামেন্ট রাইখস্টাগ পুড়ছে। ঘটনাস্থলে এসেছেন হিটলার, সাথে তার প্রচারমন্ত্রী জোসেফ গোয়েবলস ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হেরমান গোয়েরিং। গোয়েরিং-এর অভিযোগ– 'এটা কমিউনিস্টদের কাজ। আমরা অনেকদিন ধরে এ রকম কিছুই সন্দেহ করছি।' কিছুক্ষণ পরই ঘটনাস্থলে পৌঁছান হিটলারের গোপন পুলিশ বাহিনী– গেস্টাপোর প্রধান রুডলফ ডাইলস। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গেস্টাপো প্রধানকে নির্দেশ দিলেন– 'কমিউনিস্ট বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে। অতএব, নাশকতাকারীদের পাকড়াও করুন।'

এভাবেই কমিউনিস্টদের দমনের বা তাড়ানোর পথ তৈরি করে নিল তারা। কমিউনিজম আন্দোলনের সাথে ইহুদিদের অনেকের যোগসূত্র ছিল। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে– ১৯১৭ সালে রাশিয়াতে যখন বলশেভিক বিপ্লব হয়, তখন তাতে অনেক ইহুদি নেতা যোগ দিয়েছিলেন। সুতরাং জার্মানিতে কমিউনিজম ইস্যু আর অন্যসব দ্বন্দ্ব রূপ নিল ইহুদিবিরোধী ক্ষোভে।

এরপর কী হলো? ব্যাস, ইহুদি হটাও!

নাৎসিদের একটা প্রচার মেশিন ছিল। এই মেশিনের নাম গোয়েবলস। হিটলারের প্রচারমন্ত্রীর দায়িত্বে থাকা এই ব্যক্তি ভুয়া তথ্য ছড়িয়ে দিতে এতটাই সিদ্ধহস্ত ছিলেন যে,

তাকে আজও অপপ্রচারের উদাহরণ হিসেবে টানা হয়। এই অপপ্রচারের কায়দা-কানুন গোয়েবলস রপ্ত করেছিলেন মার্কিন বিজ্ঞাপন থেকে। তো এই মেশিন প্রায় নিয়ম করেই কিছু শব্দবোমা ছাড়ত যেমন : ষড়যন্ত্রকারী, অপশক্তি, দেশদ্রোহী... ইত্যাদি।

এই শব্দগুলো বেশ কাজে দিত কমিউনিস্ট আর ইহুদিদের দমাতে। গণহত্যার বৈধতা প্রতিষ্ঠা করতে এর চেয়ে জুতসই শব্দ আর হতেই পারে না। হিটলার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর আগে-পরে জার্মানি, পোল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, লাটভিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, নেদারল্যান্ডস আর ফ্রান্সে কনসেনট্রেশন এবং ক্যাম্প এক্সটার্মিনেশন ক্যাম্প খুলে হলোকাস্টের মতো যে জঘন্য ঘটনার অবতারণা করেন, তা গণমানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করার সব চেষ্টাই করা হয়েছে প্রচারযন্ত্রের মাধ্যমে। রাষ্ট্র জোর গলায় বলেছে, এটা জায়েজ!

১৯৩৯ সালের পহেলা সেপ্টেম্বর পোল্যান্ড আক্রমণ করে দখলে নেন হিটলার। এর মধ্য দিয়েই শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। নাৎসিরা ইউরোপে থাকা ১ কোটি ১০ লাখ ইহুদিকে শেষ করে দেওয়ার চূড়ান্ত পরিকল্পনা (একে বলা হয় ফাইনাল সলিউশন) হাতে নেয়। শুরুর দিকে কয়েক হাজার পোলিশ (পোল্যান্ডের নাগরিক) ও ইহুদিকে হত্যা করা হয়। এরপর তাদের সহায়-সম্পত্তি নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে নেয় জার্মানরা।

হিটলারের আমলে জার্মানির বেসরকারি এসএস (S.S-Schutzstaffel) বাহিনীর ছিল ব্যাপক প্রভাব। বেশিরভাগ ক্যাম্পের নিরাপত্তা এরাই দিত। ওপরের নির্দেশ পেয়ে সব বয়সি ইহুদিদের ধরে ধরে হত্যা করা শুরু করে এসএস-এর সদস্যরা। ১৯৪০ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি অসউইটজ/আউশউইৎসের বিশাল উন্মুক্ত জায়গায় একটি ইহুদি বন্দিশিবির খোলার পরিকল্পনা হাতে নেয় জার্মান শাসকশ্রেণি। এর কার্যক্রম শুরু হয় একই বছরের ১৪-ই জুন। ইতিহাসে এটি কুখ্যাত Auschwitz Concentration camp নামে সর্বাধিক পরিচিত। কথিত আছে, হিটলারের বন্ধু ও ক্যাম্পটির কমান্ডার রুডলফ হেস নিজের তত্ত্বাবধানে এখানে ২৫ লাখ ইহুদিকে হত্যা করে। অনাহারে রেখে একই বন্দিশিবিরে হত্যা করা হয় আরও ৫ লাখ ইহুদিকে। এভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ইউরোপে ৬০ লাখের মতো ইহুদি খুন হয়; যদিও এই তথ্য নিয়ে বিতর্ক আছে। Concentration Camp, Detention Centre ও ঘেটো (ghetto) মিলিয়ে ৪০ হাজারের ওপরে বন্দিশিবির খোলা হয়েছিল। আমরা এবার দেখতে চাই, জার্মানরা গণহত্যার এই আয়োজন ঠিক কোন তরিকায় সম্পন্ন করেছিল।

হিটলারের পাশে বন্ধু রুডলফ হেস, ছবি-ইন্টারনেট

জার্মানি যখন 'জেনোসাইড স্টেট'

হিটলারকে অফিসিয়ালি জার্মানির ফুয়েরার ও রাইখ চ্যান্সেলর ঘোষণা করা হয় ১৯৩৪ সালে। ইহুদি নিধন থেকে শুরু করে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার যত প্রকল্প তিনি হাতে নিয়েছিলেন, সব কয়টিতেই যুক্ত করা হয়েছিল আমলাদের। গণহত্যার মাধ্যমে থার্ড রাইখ (জার্মানিতে হিটলারের জমানা এখনও এ নামেই পরিচিত) কার্যত পরিণত হয় একটি 'জেনোসাইড স্টেটে।' ১৯৩৩ সালে তার ক্ষমতায় আসার বছরেই আইন পেশা ও সরকারি চাকরিতে নিষিদ্ধ হয়ে যান ইহুদিরা। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নাগরিকদের জন্মসংক্রান্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করে রাখত। আর এই কারণে খুব সহজেই ইহুদি, অ-ইহুদি আলাদা করা সম্ভব হতো। অর্থ মন্ত্রণালয় বাজেয়াপ্ত করত ইহুদিদের সম্পত্তি। জার্মান প্রতিষ্ঠানগুলোকে বলে দেওয়া হয়– 'ইহুদিদের চাকরিতে নেওয়া যাবে না, যারা আছে তাদের বরখাস্ত করো।' পরে ১৯৩৫ সালের নুরেমবার্গ আইন অনুযায়ী ইহুদিদের দেওয়া হয় দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকের মর্যাদা। এর কয়েক বছর পর দেখা যায়, ব্যাবসা-বাণিজ্য ও বিচারকাজসহ বিভিন্ন পেশায় ইহুদিরা একরকম নিষিদ্ধ হয়ে গেছে।[৪৪]

---

[৪৪]. Black Earth: The Holocaust as History and Warning, Timothy Snyder, page-42

এমনকী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকেও এই নির্দেশনার বাইরে রাখা হয়নি। জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ইহুদি শিক্ষার্থী ভর্তি করাতে বারণ করা হয়। আর যেসব ইহুদি আগে থেকেই ভর্তি ছিলেন, তাদের ডিগ্রি ছাড়াই বলা হয়– 'তোমরা বেরিয়ে যাও।' চাকরি হারাতে থাকেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইহুদি শিক্ষকরাও। হিটলারের প্রশাসন গণহত্যার প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করে জার্মান ওষুধ কোম্পানিগুলোকেও। এগুলোর মধ্যে শুরু হয় এক ধরনের নির্মম ও অসুস্থ প্রতিযোগিতা। এরা ক্যাম্পে রাখা ইহুদি বন্দিদের ওপর ড্রাগ টেস্ট করা শুরু করে। কেউ কেউ ক্রিমেটোরিয়া (লাশ পোড়ানোর চুল্লি) তৈরির টেন্ডার দাখিলের প্রতিযোগিতায় নামে।

কোনো ইহুদিকে বন্দিশিবিরে ঢোকানোর সাথে সাথে তার সব ব্যক্তিগত সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া হতো। এসব সম্পত্তির তালিকা তৈরি করে পাঠানো হতো নাৎসি সরকার বরাবরে। ইহুদি আর কমিউনিস্ট ছাড়াও সাধারণ যাযাবর, রোমানি (জিপসি), পোলিশ, সমকামী ও সোভিয়েত যুদ্ধবন্দিরা নাৎসিদের গণহত্যার শিকার হয়। সব মিলিয়ে এই সংখ্যাটা প্রায় এক কোটি ১০ লাখ; যদিও সংখ্যাটি নিয়ে আছে বিতর্ক। জার্মানি ও জার্মানির অধিকৃত ভূখণ্ডে ৪২, ৫০০ ক্যাম্পের একটি নেটওয়ার্ক ব্যবহার করা হয় গণহত্যার এই বিশাল কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়ন করতে।

একটা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এই গণহত্যাগুলো সম্পন্ন করা হয়। সেটা কীরকম? জার্মান সরকার আইন করেছিল যাতে ইহুদিদের বেসামরিক সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ইহুদিপাড়া তথা ঘেটো গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়। ১৯৪১ সালে যখন পোল্যান্ডসহ পূর্ব ইউরোপের নতুন নতুন ভূখণ্ড জার্মানি দখল করে নেয়, তখন Einsatzgruppen নামে বিশেষায়িত একটি প্যারামিলিটারি বাহিনী ব্যবহার করে দুই লাখ ইহুদি ও রাজনৈতিক কর্মীকে হত্যা করা হয়। হিটলারের ক্রোধের শিকার এসব লোককে মালবাহী ট্রেনে করে এক্সটার্মিনেশন ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হতো। তাদের অনেকে পথে মারা যেতেন বা মারা হতো। বাকিদের হত্যা করা হতো গ্যাস চেম্বারে ঢুকিয়ে। এই গণহত্যা চলে ১৯৪৫ সালের এপ্রিলে ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত।

ইহুদিরা বিচ্ছিন্নভাবে কোথাও কোথাও প্রতিরোধ করতে চেয়েছে, কিন্তু রাষ্ট্রশক্তির সাথে কি আর পেরে উঠা যায়? হলোকাস্ট চলার সময়ে ইহুদিদের সশস্ত্র প্রতিরোধের একটি উদাহরণ হলো– ১৯৪৩ সালের জানুয়ারিতে সংঘটিত ওয়ারশো ঘেটো অভ্যুত্থান। সামান্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে চার সপ্তাহ ধরে এরা নাৎসি বাহিনীকে ঘেটোর ধারের কাছে ঘেঁষতে দেয়নি। ২০ হাজার থেকে ৩০ হাজার ইহুদি লড়াই করে, কিন্তু সহসাই এই প্রতিরোধ ভেঙে যায়। ফ্রান্সের ইহুদিরাও অস্ত্র হাতে নিয়ে সে দেশে বড়ো ধরনের প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তারা নাৎসি ও ফরাসি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আলাদা আলাদা গেরিলা অপারেশন চালায়। ইউরোপে হলোকাস্টের বিরুদ্ধে এ ধরনের অন্তত শতাধিক সশস্ত্র ইহুদি অভ্যুত্থানের কথা জানা যায়, কিন্তু এসব করেও গণহত্যা ঠেকানো যায়নি।

ইজরাইলি ইতিহাসবিদ ইয়াহুদ বাউয়ার মনে করেন– 'হলোকাস্টের মৌলিক প্রণোদনা পুরোপুরি আদর্শগত। এর শেকড় নাজিদের কাল্পনিক অলীক জগৎ, যেখানে ধরে নেওয়া হয়েছিল– পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণে নিতে একটি আন্তর্জাতিক ইহুদি চক্রান্ত চলছে।' তার এই বক্তব্যের প্রমাণ মেলে হিটলারের নিজ লেখাতেই। এ বিষয়ে আরও পরের দিকে বিস্তারিত আলোচনা থাকছে।

ইহুদি গণহত্যা ছিল একেবারে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের সিদ্ধান্ত। এর আগে কোনো দেশের সরকার কিংবা ক্ষমতাশালী নেতা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেননি যে, একটি সুনির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর সব বয়সের নারী-পুরুষ, শিশু ও অপ্রাপ্তবয়স্কদের সমূলে নিঃশেষ করে দিতে হবে। জার্মানির বাইরে দখল করে নেওয়া পোল্যান্ডে হত্যা করা হয়েছিল ৩০ লাখ ইহুদি আর সোভিয়েত ইউনিয়নে ১০ লাখ। ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস, গ্রিস, বেলজিয়াম ও যুগোস্লাভিয়াতে হত্যা করা হয় আরও সহস্রাধিক ইহুদি।

১৯৪২ সালের ২০ জানুয়ারি বার্লিনের শহরতলি ওয়ানসিতে একটি সম্মেলনের আয়োজন করে নাৎসিরা। সম্মেলনের আয়োজকদের নিয়ত ছিল ইহুদি সমস্যার (নাৎসিরা ইহুদিরকে সমস্যা হিসেবে দেখতো) চূড়ান্ত সমাধান টানা। তারই অংশ হিসেবে সিদ্ধান্ত নেয়, ইউরোপের ইহুদিদের পোল্যান্ডে বিতাড়িত ও হত্যা করতে হবে। নাজিরা চেয়েছিল– ব্রিটেন ও ইউরোপের সব নিরপেক্ষ দেশ যেমন : আয়ারল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, সুইডেন, পর্তুগাল ও স্পেনে ইহুদি প্রশ্নের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি (ফাইনাল সল্যান) করে ফেলতে। আর ওয়ানসি কনফারেন্সেই এই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে যায়।

এক্সটার্মিনেশন ক্যাম্প ও কনসেনট্রেশন ক্যাম্প

নাৎসিরা এক্সটার্মিনেশন ক্যাম্প ও কনসেনট্রেশন ক্যাম্পকে আলাদাভাবে বোঝাত। হলোকাস্টের প্রথমদিকে ইহুদিদের আনা হতো কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে। সেখানে তাদের মারা হতো নির্যাতন চালিয়ে, কখনো-বা ক্ষুধার্ত রেখে। আর এক্সটার্মিনেশন ক্যাম্প বা ডেথ ক্যাম্পের কাজই ছিল গণহত্যা চালানো। ১৯৪২ সালের দিক থেকে ইহুদিদের এক্সটার্মিনেশন ক্যাম্পে পাঠানো শুরু হয়। এই ক্যাম্পে প্রথমে গুলি করে মারা হতো। পরবর্তী সময়ে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে খুনের রীতি অনুসরণ করা হয়, কিন্তু তাতেও তৃপ্ত হতে পারছিল না নাৎসিরা। কীভাবে কম সময়ে অধিক হারে খুন করা সম্ভব হবে, এমন ভাবনা থেকেই নেওয়া হয় গ্যাস চেম্বার স্থাপনের প্রকল্প। এইভাবে হত্যাকাণ্ড চালাতে সময় লাগত সর্বোচ্চ বিশ মিনিট। কেউ কেউ এর আগেই মারা যেতেন।[৪৫] চেম্বারগুলোতে গ্যাস হিসেবে ব্যবহার করা হতো কার্বন মনোক্সাইড।

---

[৪৫]. 9 Things You Should Know About Auschwitz and Nazi Extermination Camps, JANUARY 27, 2015, Joe Carter.

ইহুদিদের গণহারে গ্যাসচেম্বারে ঢুকিয়ে হত্যা করার ঘটনা ছিল এক নির্মম উদাহরণ, যা ইতিহাসে এর আগে কখনো ঘটেনি। সবচেয়ে ভয়ংকর এক্সটার্মিনেশন ক্যাম্পগুলো গড়ে তোলা হয়েছিল– অসউইটজ, চেলমনো, জাসেনোবাক, মাজদানেক, মালি ট্রস্টেনেটস, সবিবর আর ট্রেবলিঙ্কাতে।

ইহুদিদের প্রতি হিটলারের এত আক্রোশ কেন

হিটলার জার্মানির চ্যান্সেলর হন ১৯৩৪ সালের দোসরা আগস্ট। এরপর শুরু হয় থার্ড রাইখের জামানা। ভিয়েনাতে থাকার সময় দুটি বিপদ আঁচ করতে পারেন হিটলার। নিজের আত্মজীবনী মাইনক্যাম্পে তিনি লিখেন–

> 'আমি জাতির অস্তিত্বের পক্ষে দুটো বিপদ উপলব্ধি করতে পারি। একটা হলো– মার্কসইজম, আরেকটা হলো জুডাইজম।'

হিটলার মনে করতেন, মার্কসইজম হলো জনসাধারণকে ধোঁকা দেওয়ার এক অতি উত্তম পদ্ধতি। তিনি রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবকে দেখেছেন ইহুদি প্রজেক্ট হিসেবে। আর পূর্ব ইউরোপের ইহুদি ও তাদের সোভিয়েত মদদদাতাদের তাড়িয়ে জার্মানিকে গ্লোবাল পাওয়ারে রূপ দিতে চেয়েছেন এই উগ্র জাতীয়তাবাদী জার্মান চ্যান্সেলর।[৪৬]

হিটলার ইহুদিদের সম্পর্কে বলেন–

> 'স্মরণাতীত কাল থেকে ইহুদিরা খুব ভালো করে জানে, কী করে মিথ্যা এবং মিথ্যা অপবাদকে চরমভাবে কাজে লাগাতে হয়। তাদের নিজেদের অস্তিত্বই কি চরম মিথ্যার ওপরে নয়? বলা হয়ে থাকে তারা ধর্মীয় জাতি, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে দেখতে গেলে আদৌ কি ইহুদিরা একটি জাতি? তা যদি সত্যি হয়, তবে কী জাতি?'

ইহুদিদের প্রতি কেন বিগড়ে গিয়েছিলেন হিটলার? এ নিয়ে বেশ কয়েকটি কথা প্রচলিত আছে; যদিও এসবের পক্ষে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য-প্রমাণ অন্তত আমার কাছে নেই। কিশোর বয়সে হিটলার ছবি আঁকতে পছন্দ করতেন, এটা আমরা তার আত্মজীবনী থেকেই জানতে পারি। তার বিশেষ দুর্বলতা ছিল ভূগোল আর ইতিহাসের প্রতি; ছিলেন ভালো বক্তাও। কথিত আছে, হিটলার ভিয়েনার একটি আর্ট স্কুলে বেশ কয়েকবার ভর্তি হতে চেয়েছিলেন; যেখানে ইহুদিরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ, কিন্তু তিনি সেখানে ভর্তি হতে পারেননি কিংবা ভর্তি হতে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন। এ জন্য ইহুদিবিদ্বেষ তৈরি হয় তার মনে। এই তথ্য যে একেবারেই অবিশ্বাস্য ও ভ্রান্ত, তা হিটলারের মাইনক্যাম্প পড়লেই স্পষ্ট হওয়ার কথা।

---

[৪৬]. Black Earth: The Holocaust as History and Warning, Timothy Snyder, page-24.

একটা গল্প জানা যায়, হিটলারের মা মারা যান ১৯০৭ সালে একজন ইহুদি চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসারত অবস্থায়। এটিও তার মনে ইহুদিবিদ্বেষ ছড়ায়। এই তথ্যও বিশ্বাস করার মতো পর্যাপ্ত দলিল নেই। হিটলার নিজে এটা কোথাও উল্লেখ করেছেন কি না তা জানা যায়নি। তবে মায়ের মৃত্যুর পরবর্তী সময়েই যে হিটলারের হৃদয়ে ইহুদিবিদ্বেষ গড়ে উঠে, তা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন।

লেখক অগাস্ট কুবিজেক হিটলারের বাল্যবন্ধু ছিলেন, তিনি *The young Hitler I knew* বইতে লিখেছেন–

> ‘১৬ বছর বয়সে অস্ট্রিয়ায় থাকার সময় ইহুদিকন্যা স্টেফানিকে ভালোবাসতেন হিটলার, কিন্তু স্টেফানিকে কখনো তা বলেননি। একসময় এক আর্মি অফিসারের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যায় স্টেফানির। সেই আর্মি ছিল ইহুদি। এখান থেকেই তৈরি হয় ইহুদিবিদ্বেষ।’

মূলত হিটলার ইহুদিদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন মানতে পারেননি, এটাই আসল কথা। তিনি দেখলেন, জার্মানিতে বসে ইহুদিরা দেশটির ব্যাবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করছে। তারা মিডিয়াসহ বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে এগিয়ে গেছে। হিটলার লিখেন–

> ‘আমার অভিযোগের পরিমাণও বাড়তে থাকে, যখন দেখি সাংবাদিকতায়, সংস্কৃতিতে, সাহিত্যে আর নাটকে ওদের (ইহুদিদের) কার্যকলাপের বহর। বিজ্ঞাপনগুলোতে খালি রংচঙেরই মোড়ক। কেউ যদি সেই বিজ্ঞাপনগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে, তবে দেখতে পাবে– লেখক হিসেবে যার নাম বিশেষভাবে ঘোষণা করা হয়েছে, সে একজন গোঁড়া ইহুদি। এভাবেই একটা সংক্রামক ব্যাধি ধীরে ধীরে জনসাধারণের ভেতরে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রাচীনকালের কালো প্লেগের থেকেও এ রোগ অনেক বেশি তীব্র।’

হিটলার পরিষ্কারভাবেই ধারণা রাখতেন, পৃথিবীকে ইহুদি নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার একটা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র চলছে। বিষয়টি তিনি অনেকের সাথে শেয়ারও করেছেন। ইহুদিরা ভাবত অথবা এখনও ভাবছে, তারাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি। অন্যদিকে, হিটলারের দৃষ্টিতে জার্মানরা সুপিরিয়র। তাই বিশ্বকে শাসন করবার অধিকার কেবল তাদেরই; ইহুদিদের নয়। এই দুই জাতিগোষ্ঠীর উগ্র জাতীয়তাবাদের এমন সাংঘর্ষিক চিন্তাই চূড়ান্তভাবে একটা গণহত্যার প্লট তৈরি করে দেয়।

সপ্তম অধ্যায়

ইজরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আনুষ্ঠানিক পরিকল্পনা

'আরবরা হচ্ছে অসভ্য জাতি, যারা জন্তুর মতো বসবাস করে এবং তাদের আশপাশে কী হচ্ছে এ নিয়ে কোনোও খোঁজখবর রাখে না।'—আহাদ হাম

বেজেল সম্মেলন; অতঃপর...

রাইন নদীর তীরের দৃষ্টিনন্দন সুইস শহর বেজেল। এখানে এসে মিশেছে ফ্রান্স, জার্মানি ও সুইজারল্যান্ডের সীমান্ত। এই বেজেলে দুইশোর মতো ইহুদি নেতা বসেছেন এক সম্মেলনে। তারিখটা ১৮৯৭ সালের ২৯ আগস্ট। পৃথিবীর ঠিক কোন জায়গায় ইহুদিদের জন্য আলাদা একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব, সম্মেলনের আলোচ্যসূচি সেটাই। এশিয়া, আফ্রিকা কিংবা দক্ষিণ আমেরিকার যেকোনো জায়গায় ইহুদিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব আসতে থাকে। তবে শেষতক প্যালেস্টাইন ভূখণ্ডকেই চূড়ান্ত বিচারে সম্ভাব্য ইহুদিরাষ্ট্র হিসেবে গ্রহণ করা হয়। ১৯৭ জন ইহুদি প্রতিনিধি সর্বসম্মতভাবে এই সিদ্ধান্ত দেন। তবে তারা 'রাষ্ট্র' শব্দটি ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকেন। এর পরিবর্তে 'আবাসভূমি' শব্দটি গুরুত্ব পায়। সম্মেলনের আয়োজকদের একজন থিওডর হার্জেল, তাকে সভাপতি করে গঠন করা হয় ওয়ার্ল্ড জায়োনিস্ট অর্গানাইজেশন। অবশ্য, হার্জেলও প্রথম দিকে চেয়েছিলেন আফ্রিকার মোজাম্বিক কিংবা কঙ্গোতে ইহুদি আবাসভূমি গড়তে।

বেজেল সম্মেলনের আগে ও পরে নানা বিকল্প ভূখণ্ড বাছাইয়ের প্রস্তাব আসে। ইউরোপের নেতারাও তেমন কিছু প্রস্তাব নিয়ে আসেন। কিন্তু এসব প্রস্তাবনার পেছনে ছিল দায় এড়ানোর চেষ্টা, বলা যায় এক ধরনের রসিকতাও। কারণ, দুই-একটি বাদ দিলে তাদের প্রস্তাবিত বিকল্প সব ভূখণ্ডই ছিল ইউরোপের বাইরে, অথচ ইহুদিদের রক্তের ঋণ শোধ করার দায় ইউরোপের। কারণ, ইহুদিরা সেখানেই গণহত্যার শিকার হয়েছে বেশি।

ইহুদি ধনকুবের রথসচাইল্ড ও থিওডর হার্জেল নিজেদের মধ্যে এসব প্রস্তাবনা নিয়ে আলোচনা করেন। এ সময় ব্রিটিশ উপনিবেশ সেক্রেটারি ছিলেন জোসেফ চেম্বারলিন।

তার কাছে প্রস্তাব যায় প্যালেস্টাইন বাদ দিয়ে সাইপ্রাস অথবা মিশরের সাইনাই এলাকায় জমির বন্দোবস্ত করে দিতে, যাতে সেখানে একটি ইহুদিরাষ্ট্র তৈরি করা সম্ভব হয়। মিশরের ব্যাপারে আপত্তি ছিল না চেম্বারলিনের, কিন্তু বাধ সাধেন তার দেশের প্রধানমন্ত্রী। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী আর্থার জেমস বেলফোর (পরবর্তী সময়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী) তা বাতিল করে দেন।

বেলফোর নিয়ে আসেন আরও দুটি বিকল্প প্রস্তাব : আফ্রিকার কেনিয়া কিংবা উগান্ডাতে ৫ হাজার বর্গমাইলের মতো জায়গা দেওয়া হবে। হার্জেল উগান্ডাতে ইহুদিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবনা একরকম মেনেই নিয়েছিলেন, কিন্তু এই মতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায় অন্যসব ইহুদি নেতা। উগান্ডায় ইহুদিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্রাথমিক সম্মতি ছিল খেইম ওয়াইজম্যানেরও। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসি নেতা অ্যাডলফ হিটলার সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের আগে ইহুদিদের মাদাগাস্কার দ্বীপে নির্বাসনে পাঠানোর পরিকল্পনা করেছিলেন। প্রতিবেশী পোল্যান্ডও তার দেশের ইহুদিদের সেখানে পাঠাতে চাইল। অবশ্য, নিজ দেশের নাগরিকদের বাধায় মাদাগাস্কারে ইহুদি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন করেনি পোলিশ সরকার।

সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী একমাত্র রাজনীতিবিদ, সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল লিবিয়ায় ইহুদিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেছিলেন। ১৯৪০ সালে রুশ নেতা জোসেফ স্ট্যালিন ক্রিমিয়াতে ইহুদিদের থাকতে দিতে চেয়েছিলেন। এ ছাড়া বর্তমান আলাস্কা, সাবেক প্রুসিয়া (বর্তমান জার্মানি), ইরাক এমনকী দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনাসহ অন্তত ৩০টি জায়গায় ইহুদি বসতি গড়ার প্রস্তাব এসেছিল, কিন্তু সব ছেড়ে দিয়ে প্যালেস্টাইনেই কেন ইহুদি বসতি গড়ে উঠল?

ইজরাইল ও আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করা Chaim Gans দাবি করেছেন–

> 'জায়োনিস্ট মুভমেন্টের মূল লক্ষ্য হচ্ছে– ইহুদিদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। আর বেলফোর ঘোষণা কেবল সে অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে।'

এই অধ্যাপক আরও দাবি করেছেন–

> 'সিনিয়র ইহুদি নেতারা পুরো প্যালেস্টাইনের দখল নিতে চাননি; তারা চেয়েছিলেন ইহুদিদের জন্য একটা নিরাপদ আবাসস্থল। বেজেলে প্রথম যে ইহুদি সম্মেলন হয়, তার অফিসিয়াল লক্ষ্য ছিল– প্যালেস্টাইনে একটি নিরাপদ বসতি গড়ে তোলা, যাতে ইহুদিরা বাধাহীনভাবে বসবাস করতে পারে।'

তিনি আরও বলেন–

> '১৯৩০-এর দশকে ইহুদিরা চরমপন্থার দিকে ঝুঁকতে থাকে। কারণ, জার্মানিতে ইহুদিদের ওপর দমন-নিপীড়ন চলছিল। জার্মানিতে ফ্যাসিজমের উত্থান, পোল্যান্ডে অ্যান্টি সেমিটিজম প্রচারণা আর প্যালেস্টাইনে আরব বিদ্রোহ (১৯৩৬-১৯৩৯) ইহুদিদের জন্য আলাদা একটি রাষ্ট্র গঠনের দাবি জোরদার করে তোলে।'

যদি বেলফোর ঘোষণার পর ইহুদিবিরোধী দমন-নিপীড়ন না হতো, তাহলে হয়তো আলাদা কোনো ইহুদিরাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজন পড়ত না বা ইজরাইল রাষ্ট্রের জন্ম হতো না– এটাই বলতে চেয়েছেন Chaim Gans।

আরবরা কি অসভ্য জাতি

প্যালেস্টাইন ভূখণ্ডে রাষ্ট্র গড়ার সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় নেমেছিল ইহুদিদেরই আরেকটা অংশ, তবে সংখ্যায় এরা ছিল নগন্য। বিপরীতে বেশিরভাগ ইহুদি নেতাই ছিলেন আগ্রাসী। কালচারাল জায়োনিজমের প্রবক্তা হিসেবে পরিচিত আহাদ হাম আরবদের কোনো পালটাই দিতে চাননি। তার মতে–

> 'আরবরা হচ্ছে অসভ্য জাতি, যারা জন্তুর মতো বসবাস করে এবং তাদের আশপাশে কী হচ্ছে এ নিয়ে কোনোও খোঁজখবর রাখে না।'

ইহুদিরা বিশ্বাস করতেন–

> 'আরবরা কোনো জাতিই না। তাদের ভূমির সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। কোনো জাতীয় পরিচয় নেই, কোনো জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষাও নেই। তারা যেহেতু কোনো জাতি না, অতএব তাদের কাছ থেকে ভূমির মালিকানা কেড়ে নেওয়া যায়!'

ব্যাপারটা অদ্ভুত না? শত শত বছর ধরে প্যালেস্টাইন ভূখণ্ডে একই সমাজ, সংস্কৃতি ও ভাষাকে ঘিরে যাদের বসবাস, তাদের বলা হলো– 'এরা কোনো জাতিই না!'

থার্ড রাইখের সময় ইউরোপজুড়ে যে ইহুদি গণহত্যা চলে, সে কারণেই তাদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রশ্নটি বেশ শক্তপোক্তভাবে সামনে চলে আসে। জার্মানির নেতৃত্বে ইহুদি নিধন হয়েছে– পোল্যান্ড, ইতালি, স্পেন, বেলজিয়াম, এমনকী রাশিয়াতেও। এই গণহত্যার মুখে ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে আটকেপড়া ইহুদিরা খুঁজতে থাকে নিরাপদ আশ্রয়স্থল। এদের কেউ কেউ আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে চলে যায়, কিন্তু বিরোধিতার মুখে যুক্তরাষ্ট্রও অভিবাসীদের জন্য কোটা নির্ধারণ করে দেয়।

ফলে এই ইহুদি অভিবাসীদের গন্তব্য হয় প্যালেস্টাইন, যা তাদের কথিত 'প্রতিশ্রুত ভূমি।' ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের যন্ত্রণায় বিধ্বস্ত আরবে ইহুদিরা আবির্ভূত হয় উটকো ঝামেলা হিসেবে।

ইউরোপ থেকে আসা এসব ইহুদি শুরুর দিকে জোর করে আরবদের কোনো জমি দখল করেনি সত্য। তারা স্থানীয়দের কাছ থেকে জমি কিনে বসতি গড়ছিলেন। কিন্তু যেই জমিগুলো তারা কিনে নিচ্ছিলেন, এগুলোর বেশিরভাগ মালিকই সে সময় উপস্থিত ছিলেন না। এদের অনেকেই তখন দামেস্ক, লেবানন বা প্যারিসে ছিলেন। যে সময়ের কথা এখানে বলা হচ্ছে, সে সময় লেবানন ও সিরিয়া ছিল ফরাসি ম্যান্ডেটের অধীন। মালিকদের অনুপস্থিতিতে এই কেনাবেচা হওয়ায় জমি কেনার প্রক্রিয়া নিয়েই রয়েছে বিতর্ক। একই ঘটনা আলজেরিয়াতেও ঘটেছিল। ফরাসি অভিবাসীরা সেখানে জমি কিনেছিল এবং নিজেদের মতো করে আলাদা একটা অর্থনীতি চালু করেছিল। একসময় ফরাসিরাই সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যায়।[৪৭] প্যালেস্টাইনেও তা-ই হয়েছে!

৩.রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ইহুদি কূটনীতি

আরব প্রতিরোধের মুখে কূটনৈতিক উপায়ে সংকটের সমাধান টানতে চাইলেন ইহুদি নেতারা। তারা সেসব আরব জাতীয়তাবাদীদের কাছে সাহায্য চেয়ে দেন-দরবার করতে থাকলেন, যারা পতিত আব্বাসীয় শাসন ফিরিয়ে আনার স্বপ্ন দেখছিলেন। আরব জায়োনিস্টরা নেতাদের বলে– আফ্রিকার মরক্কো থেকে ইরাক পর্যন্ত আরব সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার বৃহত্তর স্বার্থে ফিলিস্তিন ভূখণ্ডকে বিসর্জন দিতে। আরব শাসকদের কানে ঢোকানো হলো– 'আরব সভ্যতার ঐতিহাসিক কেন্দ্রগুলো হলো বাগদাদ, দামেস্ক ও কায়রো; ফিলিস্তিন কিছুই নয়!' জায়োনিস্টরা আরও বলতে লাগল– যদি প্রাচীন আরব সাম্রাজ্য ফিরে পাওয়া যায়, তাহলে ফিলিস্তিন হারানোর বিষয়ে আরবরা কেন ইহুদিদের সাথে দ্বন্দ্বে জড়াবে?

ইহুদিদের এমন কৌশল বেশ কাজে দেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯১৯ সালে ফ্রান্সের ভার্সাই কনফারেন্সে (শান্তি সম্মেলন) খেইম ওয়াইজম্যান, আরব নেতা ফয়সালকে ইহুদিদের হাতে প্যালেস্টাইন ভূখণ্ড ছেড়ে দিয়ে অটোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার প্ররোচনা দেন। সেই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ীরা। ওয়াইজম্যান চেয়েছিলেন, ফয়সাল প্যালেস্টাইনের ইহুদিদের ঐতিহাসিক স্বীকৃতি দিক- যাতে এখানে ৪০ থেকে ৫০ লাখ ইহুদি থাকতে পারে। এর বিপরীতে প্যালেস্টাইনের

---

[৪৭]. Destiny Disrupted: A History of the World Through Islamic Eyes, Tamim Ansary, অনুবাদ আলী আহমদ মাবরুর, অনুবাদ পৃষ্ঠা-৪১৫)

ইহুদিরা ফয়সালের জাতীয়তাবাদী চেতনা বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। ওয়াইজম্যানের ইচ্ছাপূরণে সম্ভাব্য সবকিছু করার আশ্বাস দেন ফয়সাল। এমনকী এই ঘোষণাও দেন– আরবদের আন্দোলন আর জায়োনিস্টদের আন্দোলন একই ধরনের। এসব নিয়ে ১৯১৯ সালের তেসরা জানুয়ারি চুক্তি সই করেন ফয়সাল ও ওয়াইজম্যান![৪৮]

আরব সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের শর্তে আমির ফয়সাল ইহুদিদের সঙ্গে সমঝোতা করেন ঠিকই, কিন্তু এই চুক্তি বেশিদিন টেকাতে পারেননি; বরং আরব নেতাদের চাপের মুখে চুক্তি সইয়ের কথা অস্বীকার করে বসেন। তার বাবা শরিফ হোসেনও খুব সম্ভবত চুক্তিতে অসন্তুষ্ট ছিলেন। এ জন্য ফয়সাল ধীরে ধীরে নিজেকে গুটাতে থাকেন। তিনি বলতে থাকেন, মুসলিম বা খ্রিষ্টান সরকারের অধীনে ইহুদিদের স্বাগতম। কিন্তু তারা যদি সার্বভৌমত্ব দাবি করে বসে, তাহলে অন্য সম্প্রদায়ের সাথে তাদের সংঘাত শুরু হবে।

ইহুদিরা সিদ্ধান্তে এলো– সহিংসতা ছাড়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। কারণ, আরবরা স্বেচ্ছায় প্যালেস্টাইন ভূখণ্ড ছাড়বে না। রুশ বংশোদ্ভূত ইহুদি লেখক, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ ভ্লাদিমির জিভ জাবোতিনসকি ১৯২৩ সালে লিখেন–

> 'যতক্ষণ আরবদের মধ্যে উজ্জ্বল আশা থাকবে, ততদিন তারা এলিয়েন সেটেলারদের (বাইরে থেকে আসা ইহুদি) বাধা দেবে, ইজরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় বাধা দেবে। ইহুদিদের যদি সফল হতে হয়, তাহলে আরবদের স্বপ্ন-সাধ গুঁড়িয়ে দিতে হবে। যদি আরবদের চুপ রাখা না যায়, তাহলে ইহুদিরা পরাজিত ও নিঃশেষ হয়ে যাবে।'

জাবোতিনসকি প্যালেস্টাইনের ম্যান্ডেট, ব্রিটিশদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে পোল্যান্ডের হাতে দিয়ে দেওয়ারও দাবি তুলেছিলেন।[৪৯]

জায়োনিস্ট সেটেলাররা বিশ্বাস করত, ফিলিস্তিনিদের সরাতে শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। ইজরাইল জাংগওয়েল বলেছিলেন–

> 'তলোয়ারের মাধ্যমে তাদের বহিষ্কার করতে আমাদের অবশ্যই প্রস্তুত থাকতে হবে, যেমনটা আমাদের পূর্বপুরুষরা করত।'[৫০]

উসমানীয় সাম্রাজ্যের ওপর ইহুদিদের চাপ

সুইজারল্যান্ডের বেজেলে প্রথমবারের মতো যে বিশ্ব ইহুদি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে বিশ্বের সব ইহুদি নেতাদের একটি একক প্লাটফর্মে (ওয়ার্ল্ড জায়োনিস্ট অর্গানাইজেশন)

---

৪৮. Righteousvictims: A History of the Zionist-Arab Conflict, 1881-1998, Benny Morris, page-80.
৪৯. Black Earth: The Holocaust as History and Warning, Timothy Snyder, page-59
৫০. The Dark Side of Zionism: The Quest for Security through Dominance, Baylis Thomas.page-12.

নিয়ে আসতে পেরে খোশমেজাজে বাড়ি ফিরেছিলেন হার্জেল। কারণ, এতদিন প্যালেস্টাইন ভূখণ্ডে ইহুদিরাষ্ট্র গড়ার যে পরিকল্পনা নিয়ে তিনি এগোচ্ছিলেন, তাতে জোরালো সমর্থন পাওয়া গেছে। বেজেল সম্মেলনেই প্রায় ঠিক হয়ে যায়, প্যালেস্টাইন-ই হবে ইহুদিদের চূড়ান্ত আবাসভূমি (বেশিরভাগ ইহুদি নেতা সেটাই চাচ্ছিলেন)। এরপর এই কল্পিত রাষ্ট্রের পক্ষে প্রোপাগান্ডা চলতে থাকল, বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ইহুদিদের এক কাতারে নিয়ে আসার আয়োজন ঘটা করে শুরু হলো।

ইহুদিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য হার্জেলদের প্রয়োজন ছিল ইউরোপের নেতাদের সমর্থন। আর এ সুযোগটাই লুফে নেয় জার্মানি ও ফ্রান্সের মতো দেশগুলো। এরা আগে থেকেই ইহুদিদের ইউরোপ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার একটা উপায় খুঁজছিল। হার্জেল জানতেন, উসমানীয় সুলতানের ওপর জার্মান সম্রাটের প্রভাব রয়েছে। তাই ১৮৯৮ সালের অক্টোবরে তিনি দেখা করেন জার্মান কাইজার দ্বিতীয় উইলহেইম/উইলিয়ামের সঙ্গে। পরের মাসে জার্মান সম্রাটের কাছে আবারও যান হার্জেল। একসময় জার্মান সম্রাট উসমানীয় খলিফা সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদের কাছে ইহুদিরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব দেন।

স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় খলিফার ওপর আগে থেকেই ইহুদিদের চাপ ছিল। তিনি তাদের ফিরিয়ে দিয়েছেন প্রতিবারই। খলিফা বিভিন্ন ফরমান জারি করে প্যালেস্টাইনে ইহুদি আগমন ঠেকানোর চেষ্টা করেন। বিশেষ করে কর্নেল থমাস অ্যাডওয়ার্ড লরেন্স বারবার চেষ্টা করেন, যাতে ওই ভূখণ্ডে ইহুদি আগমন মেনে নেওয়া হয়। কিন্তু খলিফা চাচ্ছিলেন প্যালেস্টাইন বাদে সাম্রাজ্যের অন্য কোথাও বসবাস করুক তারা। ফিলিস্তিনে ইহুদি আগমন ঠেকাতে রউফ পাশার নেতৃত্বে একদল তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করেন খলিফা আব্দুল হামিদ।

ইহুদি আগমনের পেছনে বিদেশিদের হাত রয়েছে, এমনটা আঁচ করতে পেরে ১৮৯২ সালের ২৯ শে জুলাই তাদের আগমন নিষিদ্ধ করে একটি ফরমান জারি করা হয় এবং তা বিদেশি মিশনগুলোকে জানিয়ে দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে হার্জেল প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের নিয়মিত অনুপ্রবেশ চেয়ে খলিফার নিকট আবেদন করেন। তিনি ইংল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, জার্মানি, আমেরিকা এবং কিছু তুর্কি লোকজনকে লবিস্ট হিসেবে কাজে লাগান। কিন্তু তাতে ব্যর্থ হয়ে উসমানীয় সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি কামনা করতে থাকেন এই ইহুদি নেতা। হার্জেল বলেন–

> 'ওসমানি খিলাফতের বিলুপ্তি সাধন কিংবা একে খণ্ড-বিখণ্ড করাই ইহুদিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার একমাত্র সমাধান। সুলতান/খলিফা যদি ইহুদি দাবি ও প্রস্তাব মেনে নেন, তাহলে আমরা তাকে বিরাট আর্থিক সহায়তা দেবো। তিনি আমাদের জন্য একখণ্ড জমিন ছেড়ে দেবেন, যার মূল্য তার কাছে তেমন কিছুই নয়।' (হার্জেল ডায়েরি, ১৩ জুলাই, ১৮৯৬)

হার্জেলের এই প্রস্তাবের জবাবে কড়া কথা শুনিয়ে দেন আব্দুল হামিদ। সেই কথাও ডায়েরিভুক্ত করেছেন হার্জেল। অটোমান খলিফার উদ্ধৃতি নিজের ডায়েরিতে হার্জেল উল্লেখ করেছেন এই ভাবে–

> 'আমি দেশের এক বিঘা জমিও বিক্রি করার ক্ষমতা রাখি না। কেননা, তা আমার নয়; আমার জনগণের। আমার জনগণ রক্ত ঝরিয়ে এই সাম্রাজ্য অর্জন করেছে। আমি কাউকে এর সামান্যতম অংশ দিতে পারি না। ইহুদিরা তাদের বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার নিয়েই থাকুক। যদি সাম্রাজ্য ভাগ হয়ে যায়, তাহলে ইহুদিরা বিনা পয়সায় ফিলিস্তিন পেয়ে যাবে। আর আমাদের লাশের ওপরই সাম্রাজ্য ভাগ হবে।' (হার্জেল ডায়েরি, ১৯-শে জুলাই, ১৮৯৬)[৫১]

অটোমান শাসকের কাছে দেন-দেরবার করার পাশাপাশি পশ্চিমের রাজনৈতিক সহায়তা চেয়েছিল ইহুদিরা। তারা জার্মান সম্রাটের পাশাপাশি ইতালির রাজা, ব্রিটিশ উপনিবেশ সেক্রেটারি জোসেফ চেম্বারলিন এবং পোপ পঞ্চম বেনেডিক্টের কাছে ধরনা দিয়েছিলেন। হার্জেল ইতালিকে বোঝান, প্যালেস্টাইনে একটি ইহুদিরাষ্ট্র গঠিত হলে এটা ইতালির সাম্রাজ্যের পক্ষেই যাবে। মধ্যপ্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদ বাড়াতে এটা আউটপোস্ট হিসেবে কাজ করবে। তিনি ব্রিটিশদের বোঝান, সুয়েজ খালের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে এটা আউটপোস্ট হিসেবে কাজ করবে আর ব্রিটিশ জাহাজগুলো ভারত মহাদেশ অভিমুখে যেতে নিরাপত্তা পাবে। একইভাবে পোপকে তিনি বোঝান, জেরুজালেমে রুশ অর্থডক্সদের আগমন ঠেকানো যাবে ইহুদিরাষ্ট্র গড়ার মাধ্যমে।

---

[৫১]. জেরুজালেম বিশ্ব মুসলিম সমস্যা, ডক্টর ইউসুফ আল কারজাভি, বাংলায় অনুবাদ মাওলানা মুহাম্মদ শামাউন আলী, পৃষ্ঠা-৫৯

অষ্টম অধ্যায়

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও বেলফোর ডিক্লারেশন

'ইহুদি ব্যতীত প্যালেস্টাইনের অন্য বাসিন্দাদের অন্য কোথাও সরিয়ে নিতে হবে, আমরা অবশ্যই এ জায়গাটির দখল নেবে।' –মেনাখেম উশিষকিন

জার্মানির উত্থান

বিসমার্কের নেতৃত্বে জার্মানি তখন পরাশক্তি হওয়ার দৌড়ে অনেকটাই এগিয়ে গেছে। ১৮৯৮ সালে ক্ষমতায় বসা উচ্চাকাঙ্ক্ষী কাইজার দ্বিতীয় উইলহেইম/উইলিয়াম চাইলেন ইউরোপের বাইরেও সাম্রাজ্য স্থাপন করতে। 'জার্মান জাতি অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ' –এই প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিল তখন; ঠিক বর্তমান সময়ে যেমন ইহুদিরা নিজেদের শ্রেষ্ঠ ভেবে থাকে। শ্রেষ্ঠত্বের প্রচারে জাতীয়তাবাদের উগ্রতা ছড়িয়ে পড়ে জার্মানদের মাঝে। এদিকে রাশিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাসও অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যে প্রভাব বিস্তার করতে চাইলেন। কারণ, সার্বিয়ায় জার্মান উপস্থিতি রাশিয়ার জন্য ছিল উদ্‌বেগের ব্যাপার। অবশ্য, জার দ্বিতীয় নিকোলাসের আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল, তা হলো– তার সাম্রাজ্যে যে কম্যুনিস্ট আন্দোলন চলছে, তা থেকে জনগণের দৃষ্টি ভিন্নখাতে নিয়ে যাওয়া।

ইউরোপে জার্মানদের টেক্কা দেওয়ার মতো আরেকটা শক্তি ছিল ব্রিটেন। নৌ-শক্তির জোরে সে সময় অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথগুলোতে ব্রিটিশদের ছিল একাধিপত্য। নৌ-শক্তির আর্শীবাদেই তারা বিশ্বজুড়ে স্থাপন করতে পেরেছিল ঔপনিবেশিক শাসন। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা উপনিবেশের কারণে একক পরাশক্তিতে পরিণত হয় ব্রিটিশরা। আর এই উপনিবেশ স্থাপন আর বাণিজ্যকে ঘিরে ফ্রান্স আর ব্রিটেনের মধ্যে ছিল ঐতিহাসিক শত্রুতা। কিন্ত জার্মানির সামরিক উচ্চাভিলাষ আর নৌ-শক্তিতে এগোনোর চেষ্টা ব্রিটেনকে ভাবিয়ে তোলে। অচিরেই ফ্রান্সের পরিবর্তে ব্রিটেনের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখা দেয় জার্মানরা। এ সময় প্রায় পতনের মুখে থাকা অস্ট্রো-হাঙ্গেরি ও অটোমান সাম্রাজ্য জার্মানির সাহায্যে হারানো ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার স্বপ্ন দেখতে থাকে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা...

২৮ জুন, ১৯১৪। সামরিক বাহিনী পরিদর্শনের জন্য সারায়েভো সফরে আসেন অস্ট্রিয়ার যুবরাজ আর্চডিউক ফ্রাঞ্জ ফার্দিনান্দ। ছয় সদস্যের একটি ঘাতকদল ফার্দিনান্দের পিছু নেয়। এরা একটি সার্ব জাতীয়তাবাদী গ্রুপের সদস্য। যেই রাস্তা ধরে যুবরাজের গাড়িবহর যাওয়ার কথা, সেই রাস্তার পাশেই অবস্থান নেয় ঘাতক দল। গাড়িবহর এগোতে থাকলে প্রথমে একটি গ্রেনেড ছুড়ে মারা হয়, তবে তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। আশেপাশের কিছু মানুষ তাতে আহত হয়। এরপরও এগোতে থাকে ফার্দিনান্দের গাড়িবহর।

গাড়ির গতি বেশি থাকায় ঘাতকদলটির দ্বিতীয় দফার হত্যাচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। প্রায় ঘণ্টাখানেক পর যুবরাজ ফার্দিনান্দ ফিরছিলেন সারায়েভো হাসপাতাল থেকে। এবার ভিন্ন একটি পথে চলছে যুবরাজের গাড়িবহর। সেই পথেও ওত পেতেছিল সার্বিয়ান উগ্র জাতীয়তাবাদী সংগঠন 'দ্য ব্ল্যাক হ্যান্ড'-এর এক সদস্য– 'গ্যাভ্রিলো প্রিন্সিপ'। প্রিন্সিপের পিস্তলের গুলিতে খুন হন হাবসবুর্গ (অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান) সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার ফার্দিনান্দ। এ হত্যাকাণ্ডের বিচারে সার্বিয়াকে কিছু শর্ত বেঁধে দেয় অস্ট্রিয়া।

২৩ জুলাই সার্বিয়ান সরকারের কাছে এক দীর্ঘ চরমপত্র পাঠায় অস্ট্রিয়া। তাতে বলা হয়– হ্যাবসবুর্গবিরোধী সব প্রকাশনা নিষিদ্ধ করতে হবে। সকল সার্ব জাতীয়তাবাদী সংগঠনকে দমন করতে হবে। যে সকল সার্বিয়ান কর্মকর্তা ও জেনারেল সার্ব জাতীয়তাবাদীদের প্রতি সহানুভূতিশীল, তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। এমনকী তাদের নামের তালিকা অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সরকারকে পাঠাতে হবে। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে এই চরমপত্রের উত্তর দেওয়ার জন্যও সার্বিয়া সরকারকে তাগাদা দেওয়া হয়।

ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব অ্যাডওয়ার্ড গ্রে-এর মতে, এই চরমপত্র ছিল একটি স্বাধীন দেশ কর্তৃক অন্য একটি স্বাধীন দেশকে পাঠানো সবচেয়ে ভয়ংকর দলিল। সার্বিয়া সব শর্ত মানতে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে ২৮ জুলাই যুদ্ধের ডাক দেয় অস্ট্রিয়া। জার্মান সম্রাট অস্ট্রিয়ার পক্ষ নেন। অস্ট্রিয়ার সার্বিয়া আক্রমণের পরপরই জার্মানি, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি ও বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে ফ্রান্স ও রাশিয়া যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এভাবেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরু।

যুদ্ধের একপর্যায়ে নিরপেক্ষ দেশ হিসেবে সে সময়ে পরিচিত বেলজিয়াম আক্রমণ করে জার্মানি। এর প্রতিক্রিয়ায় জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ব্রিটেন। বেলজিয়ামের হয়ে ফরাসিদের আক্রমণ করত জার্মানরা। যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে পুরো ইউরোপে, যা চলে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত। যুদ্ধের প্রথমদিকেই যোগ দেয় রাশিয়া। জার্মানরা ফরাসিদের ভালোভাবেই মোকাবিলা করছিল, কিন্তু ব্রিটেন যুদ্ধে যোগ দিলে জার্মানির বিপদ বেড়ে যায়। অন্যদিকে, বিশ্বযুদ্ধের মধ্যেই ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লব হয়, তাই যুদ্ধ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয় রাশিয়া।

এরই মধ্যে তিন বছর ধরে চলা যুদ্ধে এবং শীতকালে রাশিয়ার অভ্যন্তরে আক্রমণ করে ব্যাপক ক্ষতির শিকার হয় জার্মান সেনাবাহিনী। এদিকে ফ্রান্স ও ব্রিটেনকে রসদ জোগান দেওয়ার অভিযোগে জার্মান সাবমেরিন সাতটি মার্কিন জাহাজ ডুবিয়ে দেয়। এর ফলে যুদ্ধে যোগ দেয় যুক্তরাষ্ট্রও। সম্মিলিত আক্রমণে পরাজয় নিশ্চিত হয় জার্মানির। প্রথম বিশ্বযুদ্ধেই সাবমেরিনের প্রথম ব্যবহার দেখা যায়, ব্যবহার হয় ট্যাংকের।

যুদ্ধে জার্মানির পক্ষে লড়েছিল অটোমানরা। তখন অটোমান সুলতান ছিলেন পুতুলসদৃশ। সাম্রাজ্যের মূল ক্ষমতা ছিল তিন পাশার হাতে এরা হলেন– আনোয়ার পাশা (এনভার পাশা), তালাত পাশা ও জামাল পাশা। আনোয়ার পাশা ছিলেন যুদ্ধমন্ত্রী ও সেনাবাহিনীর চিফ অব জেনারেল স্টাফ। তিনিই মূলত তুর্কি ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করতেন। আনোয়ারের চাপ আর চেষ্টায় জার্মানির দলে ভিড়েছিলেন অটোমান সুলতান পঞ্চম মেহমেত।

১৯১৪ সালের ১১ নভেম্বর আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ ঘোষণা করেন সুলতান। ধর্মমন্ত্রীর দায়িত্বে থাকা জামাল পাশা নিজেও চাননি জার্মানির পক্ষে লড়তে। তিনিসহ আরও কিছু মন্ত্রী নিরপেক্ষ অথবা মিত্রপক্ষের পক্ষে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ক্ষমতা সব আনোয়ার পাশার হাতে। পরের বছর পহেলা ফেব্রুয়ারিতে তুর্কি সেনানায়ক জামাল পাশা ১২ হাজার সৈন্য নিয়ে সুয়েজ খাল এলাকায় ব্রিটিশ বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। এই আক্রমণ হিতে বিপরীত হয়। ব্রিটিশরা প্রতিরোধ গড়ে তোলে, রণাঙ্গন ছেড়ে পালায় অটোমান সেনারা। এর মধ্য দিয়েই মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটিশদের শক্ত ভিত্তি দাঁড়িয়ে যায়।

১৯১৪ সালের ২৩ (কারও কারও মতে– ১৪ তারিখ) নভেম্বর সমগ্র মুসলিম জাহানকে মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে জিহাদে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানায় তুরস্ক, কিন্তু খুব একটা কাজ হয়নি তাতে। হেজাজ গভর্নর শরিফ হোসেন নিষ্ক্রিয় থাকেন। কারণ, তিনি দেখালেন, লোহিত সাগরে অবস্থান নেওয়া ব্রিটিশ নৌ-বাহিনী হেজাজ অবরোধ করে প্রতিশোধ নিতে পারে। তুর্কিদের ডাক দেওয়া জিহাদে যোগ দেননি ইবনে সৌদও। তিনিও কারণ দেখালেন, পারস্য উপসাগরে থাকা ব্রিটিশ বাহিনী তার বাহিনীর ওপর হামলা করে বসতে পারে। শুধু ইয়েমেনের শাসক ইমাম ইয়াহিয়া ছাড়া কাউকে পাশে পায়নি অটোমানরা। আফ্রিকাতে লিবিয়া ও সুদান ছাড়া আর কোথাও জিহাদে সাড়া জাগানো যায়নি।

দামেস্ক প্রটোকল

যুদ্ধ শুরুর আগে শরিফ হোসেনের ওপর বিরক্ত তুর্কি সরকার কেন্দ্রীয় শাসন সুদৃঢ় করতে ১৯১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে হেজাজে নতুন গভর্নর পাঠায়। ক্ষুব্ধ শরিফ তার দ্বিতীয় পুত্র আব্দুল্লাহকে গোপনে মিশরে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাই কমিশনার লর্ড কিচেনারের কাছে পাঠিয়ে দেন। কিচেনারকে আব্দুল্লাহ হুঁশিয়ার করেন, তুর্কি সরকারের পদক্ষেপে আরবরা বিদ্রোহ করতে পারে। আর যদি আরবরা শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহে জড়ায়,

তাহলে ব্রিটিশরা যেন তাকে রাজনৈতিক ও সামরিক সহযোগিতা দেয়। আরবদের প্রতি ব্রিটিশদের সহানুভূতির কথা জানালেও আব্দুল্লাহকে তাৎক্ষণিক কোনো প্রতিশ্রুতি দেননি লর্ড কিচেনার। কারণ, তখনও তুরস্ক আর ব্রিটেনের মধ্যে ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক।

অবশ্য ব্রিটিশদের আরব নীতিতে পরিবর্তন এসেছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরুর পর। লর্ড কিচেনার ততদিনে ব্রিটেনের যুদ্ধমন্ত্রী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা আর যুদ্ধে তুরস্কের যোগদানের সম্ভাবনায় নয়া পরিস্থিতির তৈরি হয়। শরিফ হোসেনের সামনে ছিল দুটি অপশন। প্রথমত, তুর্কি সরকারের অনুগত থাকা অথবা বিদ্রোহ করে আরবদের দীর্ঘ দিনের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন করা।

পুত্রদের নিয়ে আলোচনায় বসেন শরিফ। তার তৃতীয় পুত্র ফয়সাল চেয়েছিলেন, প্রথম অপশনটি বেছে নিতে। তার ধারণা ছিল– আরবরা বিদ্রোহের জন্য যথে প্রস্তুত না। এ ছাড়া সিরিয়ার ওপর ফ্রান্সের, আর ইরাকের দক্ষিণাঞ্চলের দিকে ব্রিটেনের রয়েছে লোলুপ দৃষ্টি। ফলে যেকোনো অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতি ইরাক-সিরিয়ার ভবিষ্যৎ ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেবে। কিন্তু ফয়সালের বড়ো ভাই আব্দুল্লাহ বিদ্রোহের পক্ষেই মত দেন। তার মতে– সম্ভাব্য স্বাধীনতা অর্জনের এই সুযোগটি হাতছাড়া করা ঠিক হবে না।

আব্দুল্লাহ চাইলেন বিষয়টিতে ব্রিটিশদের সাথে আলাপ-আলোচনা করতে। ব্রিটিশদের কাছ থেকে বিদ্রোহের সিগন্যাল পেলেও তাদের বাবা শরিফ হোসেন কোনো পক্ষেই গেলেন না। তিনি চেয়েছিলেন সিরিয়াসহ অন্যান্য আরব অঞ্চলের মানুষের মনোভাব জেনে সিদ্ধান্ত নিতে। পাশাপাশি কিচেনারের সাথে আলোচনার পথ খোলা রেখে গ্রহণ করেন সময়ক্ষেপণের কৌশল।

কায়রোর ব্রিটিশ প্রতিনিধি মারফত কিচেনারের নিকট পত্র পাঠান শরিফ, এতে ব্রিটেনের সাথে একটি সমঝোতায় পৌঁছার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন তিনি। চিঠিতে এও জানান, মুসলিম বিশ্বে তার বিশেষ মর্যাদার কারণে এই মুহূর্তে বিদ্রোহ করতে পারবেন না। জবাবে ফিরতি টেলিগ্রামে কিচেনার তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শরিফের সহযোগিতা চান। বিনিময়ে প্রতিশ্রুতি দেন, ব্রিটিশ সরকার তাকে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা ও বৈদেশিক আক্রমণ ঠেকাতে প্রয়োজনীয় সাহায্য দেবে, হেজাজের গ্র্যান্ড শরিফ হিসেবে নিয়োগ দেবে।

এর আট মাস পর আরব জাতীয়তাবাদীদের মনোভাব জানতে ছেলে ফয়সালকে দামেস্কে পাঠান শরিফ। দামেস্ক সফরের পর তুরস্কের ব্যাপারে তার আগের যে অবস্থান ছিল, তা থেকে সরে আসেন ফয়সাল। আরবরা তুর্কি শাসনের প্রতি ক্ষোভ জানায়। আল ফাতাত ও আল আহাদ নামের দুটি গুপ্ত সংগঠন; যারা আগে থেকেই তুরস্ক আর আরবদের মধ্যকার সমঝোতার বিরুদ্ধে ছিল, তারা ফয়সালের কাছে বিদ্রোহ করার দাবি জানায়।

আল ফাতাত ও আল আহাদ ছিল আরব জাতীয়তাবাদীদের সংগঠন। অটোমানবিরোধী কর্মকর্তা ও অটোমান মিলিটারিতে কাজ করা সৈন্যদের নিয়ে এসব সংগঠন গড়া হয়েছিল। দামেস্ক, বাগদাদ, মসুলসহ আরব বিশ্বের বিভিন্ন শহরে এদের শাখা খোলা হয়েছিল।

জাতীয়তাবাদী এসব সংগঠনের আশঙ্কা ছিল– তুরস্ক যুদ্ধে হারলে এ অঞ্চলে ইউরোপীয়দের প্রতিপত্তি বাড়বে। তাই তারা চেয়েছিল মিত্রশক্তির পক্ষে লড়াইয়ের আগেই আরব স্বাধীনতা নিশ্চিতের বিষয়টি ফয়সালা করে ফেলতে। ব্রিটিশদের হয়ে লড়ার জন্য তারা কিছু শর্ত জুড়ে দেয়, যা খসড়া আকারে প্রস্তুত করা হয়। এটি দামেস্ক প্রটোকল নামে পরিচিত। ১৯১৫ সালের ২৩ মে এই খসড়া তুলে দেওয়া হয় ফয়সালের কাছে। এই প্রটোকলের বিষয়বস্তু নিম্নরূপ–

১. ব্রিটেন আরব ভূখণ্ডের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেবে।

২. ক্যাপিচুলেশন প্রথা অনুযায়ী প্রাপ্ত বিদেশিদের সব সুযোগ-সুবিধা বিলুপ্ত করা হবে।

৩. ব্রিটেন ও প্রতিষ্ঠিত আরব রাজ্যের/ স্বাধীন ভূখণ্ডের মধ্যে একটি প্রতিরক্ষাবিষয়ক চুক্তি সই হবে।

৪. স্বাধীন আরব রাজ্যে ব্রিটেনকে অর্থনৈতিক অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

এই প্রটোকলের ভিত্তিতেই ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বেশ কয়েক দফা পত্র চালাচালি করেন হোসেন। ১৯১৫ সালের জানুয়ারিতে মিশর ও সুদানের হাইকমিশনার হয়ে (কিচেনারের স্থলাভিষিক্ত) কায়রোতে আসেন স্যার হেনরি ম্যাকমোহন। তিনিও অটোমান সাম্রাজ্য ভাঙার ষড়যন্ত্র অব্যাহত রাখেন। হোসেন আর ম্যাকমোহনের মধ্যেই হয় পত্র চালাচালি। শেখ মোহাম্মদ ইবনে আরিফ ইবনে উরাইফান নামের এক বাহকের মাধ্যমে এই পত্র যোগাযোগ রক্ষা করতেন হোসেন।

এসব পত্র চালাচালির মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রস্তাবিত আরব রাজ্যের সীমানা নির্ধারণ। কিছু এলাকা ছাড় দিয়েই তিনি ব্রিটিশদের সাথে সমঝোতা করেন, তবে সীমানা চূড়ান্ত না করেই ১৯১৬ সালের ৫ জুন অটোমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ডাক দেন শারিফ হোসেন। অবশ্য বিদ্রোহের প্রাক্কালে অটোমান শাসকগোষ্ঠীকে কিছু শর্ত দিয়েছিলেন তিনি। আরব রাজনীতিকদের মুক্তি, আরব অংশের স্বায়ত্তশাসন ও হাশিমাইতদের (হাশেমি) হেজাজের উত্তরাধিকার না মানা পর্যন্ত আনোয়ার পাশার চাপের কাছে নতি স্বীকার করবেন না বলে জানিয়ে দেন। কনস্টান্টিনোপল থেকে কোনো রেসপন্স না আসায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে তিনি হেজাজের তুর্কি অবস্থানে হামলা চালান।

লরেন্স অব অ্যারাবিয়া

'সবাই স্বপ্ন দেখে, কিন্তু সবার স্বপ্ন সমান হয় না। যারা রাতে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে, তারা দিনেরবেলা কর্মক্ষেত্রে গিয়ে নিজের স্বপ্নকে অসার জ্ঞান করে। কিন্তু যারা দিনেরবেলা স্বপ্ন দেখে, তারা ভয়ানক প্রকৃতির মানুষ! তারা চোখ খোলা রেখে স্বপ্ন দেখে এবং সে অনুযায়ী কাজ করে চলে, সফল হয়; যেমনটা আমি করেছি!' টি. ই. লরেন্স (সেভেন পিলারস অব উইজডম বই থেকে নেওয়া)

এক

১৯১৭ সালের জুলাই মাস। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছে। অটোমানদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে মধ্যপ্রাচ্য। আরব-দুনিয়া ভাগ হয়ে যাচ্ছে স্থানীয় প্রভাবশালী গোত্রগুলোর মধ্যে। নয়া আরব সাম্রাজ্য গড়ার বাসনায় বিদ্রোহের ডাক দেওয়া হাশেমি নেতা শরিফ হোসেন ঘোড়া হাঁকিয়ে বেড়াচ্ছেন হেজাজের মরুভূমির ভেতর। আদা আল তায়ির নেতৃত্বে আরব বিদ্রোহীদের একটি দল আকস্মিক হামলা চালিয়ে তুর্কিদের কাছ থেকে নিয়ে নেয় আকাবা বন্দরের দখল। এই যুদ্ধে আরবদের সাথে ছিলেন টি.ই লরেন্স নামের এক ব্রিটিশ কর্মকর্তা।

ভালো আরবি বলতে পারতেন লরেন্স। বেশিরভাগ সময় আরব বেদুইনদের পোশাকেই তাকে দেখা যেত। লরেন্সকে আমরা তুলনা করতে পারি বর্তমান ইজরাইলের মুস্তারেবিন গোয়েন্দা বাহিনীর এজেন্টদের সাথে, যাদের খাওয়া-পরা ও কথাবার্তায় আরব সাজিয়ে আরবদের পেছনেই লাগিয়ে দেওয়া হয়।

কিশোর বয়সেই লরেন্সের মাথায় প্রত্নতত্ত্বের ভূত চেপে বসে। এ ছাড়া মধ্যযুগের নাইট সম্প্রদায়ের বীরত্বের ইতিহাস তাকে মুগ্ধ করত। অক্সফোর্ডে পড়ার সময় কাছাকাছি চার্চগুলোতে প্রায়ই চলে যেতেন লরেন্স, সংগ্রহ করতেন পুরাকীর্তি ও এ সংক্রান্ত তথ্য। এক বন্ধুকে সাথে নিয়ে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা নাইট টেম্পলগুলোতে গিয়ে সংগ্রহ করতেন মূল্যবান ধ্বংসাবশেষ এবং তথ্য-উপাত্ত। ১৯০৯-১০ সালের দিকে শত শত মাইল হেঁটে সিরিয়ার ক্রুসেডার দুর্গগুলোতে ছুটেছেন একই কারণে।[৫২]

প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক গবেষণার স্বার্থে লরেন্স শিখেছিলেন একাধিক ভাষা। অনর্গল বলে যেতে পারতেন ফরাসি, জার্মান, তুর্কি, গ্রিক আর ল্যাটিন ভাষা। সবশেষ লেবাননের বৈরুতে গিয়ে শিখে নেন আরবিও। ভাষা শিক্ষার পাশাপাশি আরবদের শিল্প-সংস্কৃতি নিয়ে করেছেন বিস্তর গবেষণা। আরবদের কাছে টানতে এই ইংরেজ কর্মকর্তা নিজের পোশাক-পরিচ্ছদেও আনেন আমূল পরিবর্তন। পরতেন আরবদের ঢঙে লম্বা জুব্বা।

---

[৫২]. Lawrence of ArabiaÕs War: The Arabs, The British and The Remaking of the Middle East in WWI, Neil Faulkner, page-199.

যাই হোক, আরবি ভাষা ও সংস্কৃতিতে বিশেষ দক্ষতার কারণেইটি ই লরেন্সকে দেওয়া হয় 'লরেন্স অব অ্যারাবিয়া' উপাধি। ১৯৬২ সালে তার জীবন ও কর্মের ওপর বানানো হয় 'লরেন্স অব অ্যারাবিয়া' নামের একটি সিনেমা। সিনেমাটি তৈরি হয় *সেভেন পিলার্স অব উইজডম* বই অবলম্বনে।

দুই

যেসব আরব গোত্র নিজেদের বংশের নামে রাজতন্ত্র চালু করতে চেয়েছিল, তাদের মধ্যে দুটো পরিবার ছিল খুবই প্রভাবশালী; একটি হলো ইবনে সৌদ পরিবার, যারা ওয়াহাবি চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত। অন্যটি হাশিমাইত বা হাশেমি পরিবার (শরিফ হোসেনের পরিবার)। হাশিমাইতরা দীর্ঘদিন ধরে হেজাজ (মক্কা) শাসন করে। তারা চেয়েছিল পতিত আব্বাসীয় সাম্রাজ্য ফিরিয়ে আনতে। নবম শতকে উমাইয়াদের হটিয়ে দিয়ে এই হাশিমাইতরাই আবু আল আব্বাসকে সিংহাসনে বসিয়ে আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেছিল।

ব্রিটিশ গোয়েন্দারা সৌদি প্রধানের সাথে দেখা করে অটোমানদের ওপর আঘাত হানার জন্য সহায়তা চাইলেন। বিরাট অঙ্কের অর্থের প্রলোভনও দেওয়া হলো। সৌদিপ্রধান ইবনে সৌদ প্রস্তাবে রাজি হলেন। তিনি ভেবেছিলেন– যুদ্ধে যদি আরবরা তুর্কিদের কোনো ক্ষতি করতে পারে, তাহলে এর ফসল সৌদির ঘরেও যাবে।

অন্যদিকে, হাশিমাইত গোত্রের প্রধান হোসেন ইবনে আলি (অটোমান কতৃক নিযুক্ত কাবা শরিফের রক্ষণাবেক্ষণকারী বা গভর্নর। তার উপাধি ছিল শরিফ, সে হিসেবে তার আরেক নাম ছিল শরিফ হোসেন। এই ব্যক্তি শরিফ উপাধি ব্যবহার করতেন। কারণ, এর মাধ্যমে বোঝাতেন– তিনি মহানবি হজরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর নিজ গোত্র বনু হাশিমের বংশধর) ওরফে শরিফ হোসেন মক্কা শাসনের দায়িত্ব পেলেও চেয়েছিলেন আরও বেশি ক্ষমতা। এই ব্যক্তি ইরাক থেকে আরব সাগর পর্যন্ত বিশাল এক আরব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার (আব্বাসীয় সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা) স্বপ্নে বিভোর ছিলেন। তার স্বপ্ন বাস্তবায়নে ব্রিটিশদের কাছ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল।

ব্রিটিশ বাহিনীর 'আরব ব্যুরো অব ফরেন অফিসার' থেকে টি.ই লরেন্সকে ঠিক করা হয় বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য। কারণ, তার চেয়ে ভালোভাবে আরবদের সাথে মিশতে পারেনি কোনো ব্রিটিশ নাগরিকই। অটোমানদের বিপরীতে লরেন্স নিজেও আরবদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন।

হাশিমাইত আর সৌদ-উভয় গোষ্ঠীকে নিয়েই খেলেতে লাগল ব্রিটিশরা। দুই পক্ষের সাথেই রাখা হলো গোপন যোগাযোগ, কিন্তু এই দুই প্রভাবশালী গোত্র ব্রিটিশদের এমন চালাচালি টেরই পেল না। উভয় পক্ষকেই দেওয়া হয়েছিল অভিন্ন আশ্বাস; মূলা ঝোলানো হয়েছিল আরব ভূখণ্ড শাসনের। স্বাধীন একটি সাম্রাজ্যের লোভে অটোমানদের প্রভাব মোকাবিলায় উভয় গোত্রই ব্রিটিশদের হয়ে লড়ল।

অথচ, বিশাল আরব অঞ্চল আসলে কারা শাসন করবে, এ নিয়ে কোনোও মাথাব্যথা ছিল না ব্রিটিশদের। তারা চেয়েছিল অটোমানদের দুর্বল করতে, যাতে জার্মানদের পরাজয়ের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়।

তিন

বিদ্রোহীদের প্রধান নেতা ছিলেন শরিফ হোসেনের ছেলে মক্কার আমির ফয়সাল। বেশ কিছু যাযাবর উপজাতি গোষ্ঠীকে নিয়ে লরেন্স পৌঁছে যান ফয়সালের কাছে। ফয়সাল তাকে নিজের উপদেষ্টা করে নেন। লরেন্সের পরামর্শেই শক্তিশালী অটোমান বাহিনীর বিরুদ্ধে আরবরা বেছে নেয় গেরিলা আক্রমণের কৌশল। মদিনার মরুভূমির বুক চিরে চলে যাওয়া হেজাজ রেলওয়ের একটি ট্রেন লুট করেই তিনি অটোমান সাম্রাজ্যে প্রথম আঘাত হানেন। এই রেলওয়ে ছিল অটোমানদের অস্ত্র ও খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের প্রধান মাধ্যম।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে ব্রিটিশরা যখন আরব গোত্রগুলোকে অটোমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে উসকে দিচ্ছিল, তখন পর্দার অন্তরালে চলছিল আরেক ষড়যন্ত্র। দুই ইউরোপীয় কূটনীতিক মার্ক সাইকস ও জর্জ পিকট গোপনে তৈরি করছিলেন একটি ম্যাপ। তারা ঠিক করতে চেয়েছিলেন, যুদ্ধ শেষে মিত্রপক্ষ এই বিশাল ভূখণ্ড কীভাবে ভাগ-বাটোয়ারা করবেন! কীভাবেই বা অঞ্চলটির নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখবেন, শাসন পরিচালনা করবেন।

১৯১৬ সালের ৫ জুন মক্কায় লাল পতাকা উড়িয়ে নিজেকে আরব বাদশাহ ঘোষণা করলেন শরিফ হোসেন। এই বিদ্রোহ ব্রিটিশ সেনাদের জন্য ছিল পোয়াবারো। আরবদের স্বাধীনতা পাইয়ে দেওয়া নয়; বরং তাদের উদ্দেশ্য ছিল অটোমান সাম্রাজ্যের বিভক্তি এবং আরব ভূখণ্ড মিত্রশক্তির মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করা, ছিল ইহুদি ইস্যুও।

মিত্রশক্তির কাছ থেকে অস্ত্র সহায়তা পেলেন শরিফ হোসেন। লড়তে শুরু করলেন ইসলামি সালতানাতের বিরুদ্ধেই। এই সুযোগে সুয়েজ খাল চলে গেল ব্রিটিশ বাহিনীর কবজায়। ১৯১৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন ভূখণ্ড ছাড়তে বাধ্য হয় অটোমানরা। পালটে গেল মধ্যপ্রাচ্যের ক্ষমতা কাঠামো, রাজনৈতিক দৃশ্যপট; পরিবর্তন এলো মানচিত্রেও। ছোটো হয়ে এলো অটোমানদের দুনিয়া।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল

এক

যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই জার্মানিকে ঠেসে ধরার ছক কষতে থাকে তার ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্রান্স ও ব্রিটেন। মিত্রপক্ষের বিজয় যখন সুনিশ্চিত, তখনই প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ ঘোষণা করেন ব্রিটিশ যুদ্ধনীতি। যুদ্ধের জন্য জার্মানিকে একতরফাভাবে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেয়েছিলেন জার্মানরা শাস্তি পাক, কিন্তু এই সময়ে

মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন প্রতিশোধমূলক ধারণার বিপরীতে নিয়ে আসেন উদারবাদের ধারণা। ১৯১৮ সালের ৮ জানুয়ারি মার্কিন কংগ্রেসে দেওয়া ভাষণে (নিজের সপ্তম স্টেট অব দ্য ইউনিয়ন ভাষণ) ১৪ দফা ঘোষণা উল্লেখ করে উইলসন বলেন, যুদ্ধের পরে বিশ্বরাজনীতির ভাগ্য, বিজয়ী রাষ্ট্রগুলোর ইচ্ছে অনুসারে হবে না, ন্যায়নীতির আলোকে নয়া বিশ্বব্যবস্থা গড়ে উঠবে।

উইলসনের মনের কথা যাই হোক, মার্কিন প্রেসিডেন্টের এমন প্রকাশ্য ঘোষণায় ভরসা পায় জার্মানি। মেনে নেয় যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্ত। কিন্তু উড্রো উইলসন চাচ্ছিলেন গণতান্ত্রিক জার্মানির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে। স্বভাবতই বিদায় হয় জার্মান রাজতন্ত্র। ১৯১৮ সালের ২৭ অক্টোবর পদ ছাড়েন জার্মান কাইজার দ্বিতীয় উইলহেইম। অবশ্য, কাগজে-কলমে তিনি জার্মানির সম্রাট ছিলেন ৯ নভেম্বর পর্যন্ত। উড্রো উইলসনের ইচ্ছানুযায়ী জার্মানিতে এলো গণতন্ত্র।

যুদ্ধ সমাপ্তির পরের বছর ১২ই জানুয়ারি ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের ভার্সাই রাজপ্রাসাদে কথিত শান্তি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এটি ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ী রাষ্ট্র ও তাদের দোসরদের মিলনমেলা। সম্মেলনে যোগ দেয় মিত্রপক্ষের সাথে থাকা ২৭টি দেশ। আরও যোগ দেয় ব্রিটেনের পক্ষ হয়ে অটোমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করা আরব ও ইহুদি নেতারা। ইহুদি নেতা খেইম ওয়াইজম্যান ও আরব বিদ্রোহী নেতা শরিফ হোসেনের ছেলে ফয়সালও যোগ দেন শান্তি সম্মেলনে।

বহু আলাপ-আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের পর ভার্সাই রাজপ্রাসাদে চুক্তি সই হয় ১৯১৯ সালের ২৮ জুন; যদিও ভার্সাই চুক্তি কার্যকর ধরা হয় পরের বছরের ১০ জানুয়ারি থেকে। শান্তি সম্মেলনে যোগ দেওয়ার নিমন্ত্রণ না পেলেও মিত্রপক্ষের চাপিয়ে দেওয়া এই চুক্তি মেনে নিতে হয় জার্মানিকে।

ভার্সাই সম্মেলনকে বলা হয় পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক সম্মেলন। সম্মেলনে মূল ভূমিকা রাখেন চারটি দেশের চার নেতা (বিগ ফোর)। এরা হলেন- যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড লয়েড জর্জ, ফরাসি প্রধানমন্ত্রী জর্জ ক্লেমেনশো ও ইতালির প্রধানমন্ত্রী ভিটোরিও অর্লান্ডো। সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন ফরাসি প্রধানমন্ত্রী।

দুই

ইউরোপে জার্মানির দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্রান্স ও ব্রিটেনের মূল লক্ষ্য ছিল জার্মানিকে রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল করে দেওয়া। ভার্সাই সন্ধি অনুযায়ী জার্মানির শিল্পপ্রধান সার অঞ্চল হাতছাড়া হয় এবং গুরুত্বপূর্ণ রাইন অঞ্চল থেকে জার্মান সেনাদের সরে যেতে হয়। দেশটির ২৫ হাজার বর্গমাইল জায়গা ভাগ-বাটোয়ারা হয় মিত্রপক্ষের

মধ্যে। জার্মানিকে গুণতে হয় বিশাল অঙ্কের ক্ষতিপূরণ; যদিও সন্ধিতে ক্ষতিপূরণের অঙ্ক উল্লেখ ছিল না। জার্মানির পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত পোসেন ও পশ্চিম প্রুশিয়া পোল্যান্ডকে দিয়ে দেওয়া হয়। জার্মান অধ্যুষিত ডানজিগকে উন্মুক্ত শহর হিসেবে গণ্য করা হয় এবং তার শাসনভার দেওয়া হয় লীগ অব নেশন্সকে।

সন্ধি মোতাবেক জার্মানিকে তার সকল উপনিবেশ ছাড়তে বলা হয়। এগুলো ভাগ হয়ে যায় মিত্রপক্ষের দেশগুলোর মধ্যে। টগোল্যান্ড পায় ব্রিটেন, জার্মান সামোয়ান দ্বীপপুঞ্জের ভার যায় নিউজিল্যান্ডের কাছে, মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ পায় জাপান আর নিউ গায়ানার শাসনভার যায় অস্ট্রেলিয়ার কাছে। ফ্রান্সের অধীনে রাখা হয় ক্যামেরুনের একাংশ। বর্তমান সিরিয়া, মরক্কো, মিশর, তুরস্ক ও বুলগেরিয়াসহ বিভিন্ন দেশে থাকা সকল সম্পত্তি ও বিশেষ অধিকার ছাড়তে হয় জার্মানিকে। জার্মান নাগরিকদের বৈদেশিক সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার অধিকার পায় মিত্রপক্ষ।

চুক্তিতে ক্ষতিপূরণের নির্দিষ্ট অঙ্ক ঠিক না করায় ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলো যে যার মতো করে অর্থ দাবি করা শুরু করল। জার্মানিকে বলা হলো– ১২ বছর পর্যন্ত ১ লাখের বেশি স্বেচ্ছাবাহিনী রাখা যাবে না, নৌ-বহরের সংখ্যা কমাতে হবে, বিমানবহর রাখা যাবে না, বাধ্যতামূলক সৈন্য সংগ্রহের কানুন বন্ধ করতে হবে।

বোঝাই যাচ্ছে, ভার্সাই চুক্তির মূল উদ্দেশ্য ছিল জার্মানিকে সব দিক দিয়ে দুর্বল করে দেওয়া। তাই এই অপমানজনক চুক্তি মানতে চায়নি জার্মান সরকার। জার্মানিকে চুক্তি মানতে সময় বেঁধে দেওয়া হয় তিন সপ্তাহ। চুক্তি মানা হবে কি না এ নিয়ে মতবিরোধ তৈরি হয় ক্ষমতাসীন জোট সরকারের মধ্যে। পদত্যাগ করেন সোশ্যাল ডেমোক্রেট নেতা ও জার্মান চ্যান্সেলর ফিলিপ শিডম্যান। তার মতে এই চুক্তি মৃত্যু পরিকল্পনা (ডেথ প্ল্যান)। এর মাধ্যমে জার্মান জনগণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হবে। অন্যদিকে জোটের শরিক ক্যাথলিক সেন্টার পার্টির নেতা এরজবার্জার চুক্তি সই করতে রাজি হন এই যুক্তিতে যে, জার্মানি চুক্তি সইয়ে অসম্মতি জানালে আবার যুদ্ধ বাধবে এবং জার্মানরা স্বাধীনতা হারাবে।

ভার্সাই চুক্তি নিয়ে পরস্পরবিরোধী মত আছে। তবে বেশিরভাগ বিশ্লেষকই বলেছেন, চুক্তিতে ন্যায়-নীতি ও সততা বিসর্জন দিয়ে জার্মানির প্রতি অবিচার করা হয়েছিল। এই পক্ষের দাবি, বিজয়ীরা যদি জার্মানির প্রতি এত কঠোর না হতেন, তাহলে হয়তো জার্মানি তার পরিবর্তিত অবস্থা মেনে নিত। অনেকেই একে আরোপিত চুক্তি বা ডিক্টেটেড পিস বলেছেন। অধ্যাপক ই এইচ কার বলেছেন–

> 'বিজিত ও বিজয়ীর মধ্যে আলাপ-আলোচনার দ্বারা এই চুক্তির শর্ত নির্ধারিত হয়নি। চুক্তির শর্তাবলি ছিল জার্মানির জন্য কঠোর ও নির্মম।'

কেউ কেউ বলছেন– জার্মানদের কাছ থেকে বলপূর্বক চুক্তিতে স্বাক্ষর আদায় করা হয়েছে।

তবে চুক্তির পক্ষেও যুক্তি ছিল। বলা হয় জার্মানির সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ হুমকি মোকাবিলায় চুক্তিটি যথাযথ ছিল। এর ফলে অত্যাচারিত জাতিগুলো জার্মানদের কাছ থেকে মুক্তি পেয়েছিল। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, ভার্সাই চুক্তির কঠোরতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসেবে জার্মানদের মধ্যে প্রতিশোধস্পৃহা জাগ্রত হয় হয় এবং আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

তিন

ভার্সাই চুক্তি মোতাবেক ক্ষতিপূরণ নিশ্চিতে আলাদা একটা কমিশন হয়েছিল-ক্ষতিপূরণ কমিশন। ১৯২১ সালের এপ্রিলে এই কমিশন ৬ লাখ ৬০ কোটি (৬৬ হাজার মিলিয়ন পাউন্ড) পাউন্ড ক্ষতিপূরণের অর্থ ধার্য করে। তবে এই অর্থ নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়। মিত্রপক্ষ আরেকটি কমিটি করে দেয়; যা ইয়ং কমিটি নামে পরিচিত। ১৯২৯ সালে এই কমিটি জার্মানির ক্ষতিপূরণের অঙ্ক ৬৬ হাজার মিলিয়ন পাউন্ড থেকে ৯ হাজার মিলিয়ন পাউন্ডে নামিয়ে আনে, কিন্তু তাতেও ক্ষতিপূরণ সমস্যার সমাধান হয়নি। শেষ পর্যন্ত ১৯৩২ সালে মিত্রপক্ষ লুসান সম্মেলনে ইয়ং কমিটির সিদ্ধান্ত বাতিল ঘোষণা করে জার্মানিকে ১৫ কোটি পাউন্ড অর্থ এককালীন পরিশোধের শর্তে সমস্ত ক্ষতিপূরণের দাবি তুলে নেয়।[৫৩]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর চারটি সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। রুশ সাম্রাজ্য ১৯১৭ সালে। অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান (হ্যাবসবুর্গ সাম্রাজ্য) সাম্রাজ্য, জার্মান সাম্রাজ্য দুটোই ১৯১৮ সালে এবং অটোমান সাম্রাজ্য ১৯২২ সালে। হ্যাবসবুর্গ সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী স্বাধীন রাষ্ট্রগুলো হলো অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, যুগোস্লাভিয়া ও চেকোস্লোভাকিয়া। অবশ্য যুগোস্লাভিয়া ও চেকোস্লোভাকিয়া এখন আর একক ভূখণ্ড না। এগুলো ভেঙে হয়েছে আরও কিছু স্বাধীন রাষ্ট্র। পোল্যান্ড, রুমানিয়া ও গ্রিসকে দেওয়া হয়েছিল নতুন নতুন ভূখণ্ড। এ ছাড়া, এস্তোনিয়া, লাটভিয়া, লিথুনিয়া এবং তুরস্কও স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে ওঠে। অটোমান শাসিত উত্তর আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রাচ্য বেদখল করা হয় এবং তুরস্কের নানা অংশ দখল করার লক্ষ্যে ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইটালি ও গ্রিস, তুর্কি ভূখণ্ডে ঢুকে যায় (যদিও কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে তুরস্ক নিজেদের ভূমি রক্ষা করতে সক্ষম হয়)। ১৯২২ সালে ইতালির ক্ষমতায় বসে ফ্যাসিস্টরা।

যুদ্ধের শেষ দিকে মাখন খাওয়ার লোভে যোগ দিয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। যুদ্ধের পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনের নেতৃত্বে শুরু হয় নতুন ধরনের রাজনীতি। উইলসন ছিলেন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে গণতন্ত্র ও লিবারালিজমের প্রবক্তা ও বাস্তবায়নের অন্যতম নায়ক। যুদ্ধের ভয়াবহতায় পশ্চিমের নেতাদের মধ্যে অনুশোচনা জাগে।

---

৫৩. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস, ডক্টর প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৭২, ৮৪।

তারা যুদ্ধকে দেখলেন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে 'অভিশাপ' হিসেবে। তাই ভবিষ্যতে সরকার ব্যবস্থায় এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য গড়ে তোলা হয় 'লীগ অব নেশনস'। এই আন্তর্জাতিক জোটই ১৯২২ সালে ব্রিটেনকে প্যালেস্টাইন শাসনের ম্যান্ডেট দেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্যেই আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। আর তা হলো বেলফোর ডিক্লারেশন। সেটা কীরকম, তার প্রেক্ষাপটই-বা কী, এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে বইয়ের পরবর্তী অংশে।

বেলফোর ডিক্লারেশন

Foreign Office,
November 2nd, 1917.

Dear Lord Rothschild,

I have much pleasure in conveying to you, on behalf of His Majesty's Government, the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations which has been submitted to, and approved by, the Cabinet

"His Majesty's Government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country"

I should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the Zionist Federation.

Yours
Arthur James Balfour

ছবি : লিওনেল ওয়াল্টার রথসচাইল্ডের (সেকেন্ডব্যারন রথসচাইল্ড) কাছে পাঠানো বেলফোর ডিক্লারেশনের কপি।

এক

ইজরাইলের প্রথম রাষ্ট্রপতি খেইম ওয়াইজম্যান। এই ইহুদি নেতার জন্ম পশ্চিম রাশিয়া বা বর্তমান বেলারুশে। ওয়াইজম্যান ছিলেন ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের অধ্যাপক। থিওডর হার্জেল আধুনিক ইহুদিবাদের ধারণা রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করলেও প্যালেস্টাইনে ইজরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নেপথ্যের কারিগর ধরা হয় ওয়াইজম্যানকে। এই ব্যক্তিটি ব্রিটিশদের কাছ থেকে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার হিস্যা আদায় করে নিতে সক্ষম হন। কিন্তু কীভাবে? আর ওয়াইজম্যানকেই-বা কেন এত গুরুত্ব দিলো ব্রিটিশ সরকার?

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাসায়নিকের অভাবে বেশ বেকায়দায় পড়ে ব্রিটিশ সেনারা। প্রয়োজন হয় অ্যাসিটন নামের এক রাসায়নিকের। বিস্ফোরক দ্রব্যের বিস্ফোরণে সহায়ক উপাদান হিসেবে এই রাসায়নিক ব্যবহার করা হতো। সস্তায় অ্যাসিটন উৎপাদনের গোপন কৌশল জানতেন খেইম। এই কৌশল তিনি নিজেই উদ্ভাবন করেছিলেন। ব্রিটিশ আর্মিকে অ্যাসিটনের বড়ো জোগান দেন অধ্যাপক ওয়াইজম্যান। উৎপাদন করেন প্রায় ৩০ হাজার টন অ্যাসিটন।

এরপর থেকেই রণাঙ্গনে সফল হতে থাকে ব্রিটিশরা। অধ্যাপক ওয়াইজম্যান এই কাজের পুরস্কার চেয়ে বসেন। এর বিনিময়ে তিনি চান প্যালেস্টাইনে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ব্রিটিশ সরকারের সমর্থন! বিশ্বযুদ্ধ তখনও শেষ হয়নি। তার চাওয়া অনুযায়ী ব্রিটিশ ক্যাবিনেট প্যালেস্টাইনে ইহুদি রাষ্ট্র গড়ার অনুমোদন দিয়ে দেয়। তারিখটি ছিল ১৯১৭ সালের ৩০ অক্টোবর। তবে সেদিন এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন মন্ত্রিসভার একমাত্র ইহুদি সদস্য অ্যাডওয়ার্ড মন্টেগু। ভারতবিষয়ক মন্ত্রী মন্টেগু তখনই আঁচ করতে পেরেছিলেন, এর মাধ্যমে মুসলমান ও ইহুদিদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী শত্রুতা তৈরি হবে।

দুই

ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড আর্থার বেলফোর, আর সেসময়ের প্রধানমন্ত্রী ডেভিড লয়েড জর্জ জায়োনিজমের প্রতি দুর্বল ছিলেন। বেলফোর ইহুদি ধনকুবের লর্ড লিওনেল ওয়াল্টার রথসচাইল্ডকে চিঠি লিখে সেই সুখবরটি জানিয়ে দেন ১৯১৭ সালের দোসরা নভেম্বর। যদিও চিঠিটি প্রকাশ পায় একই বছরের ৯ নভেম্বর। *দি টাইমস* পত্রিকায় প্রথম সেটি ফাঁস হয়। পরের বছরের ১১-ই ফেব্রুয়ারি ফ্রান্স, আর ২৩ ফেব্রুয়ারি ইতালি বেলফোর ঘোষণা অনুমোদন করে। ২৯ অক্টোবর মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন ইহুদি ধর্মযাজক স্টিফেন এজ ওয়াইজকে এক পত্রের মাধ্যমে ঘোষণাটির প্রতি তার সমর্থনের কথা জানান।

প্যালেস্টাইন তখন উসমানীয় সাম্রাজ্যের সিরিয়া সানজাকের অন্তর্ভুক্ত ভূখণ্ড। বেলফোরের চিঠিতে জানানো হয়, মহামান্য সরকার প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের জন্য জাতীয় আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার পক্ষে মনোভাব পোষণ করেছে এবং এটি অর্জনের জন্য সরকার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাবে। ব্রিটিশ সরকারের এমন ঘোষণা প্যালেস্টাইনে একটি ইহুদিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে

একরকম বৈধতা দিয়ে দিলো। বলা যায়, ইহুদিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে প্রথম কোনো আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এটাই। বেলফোর যে চিঠিটা রথসচাইল্ডকে লিখেছিলেন, সেটা এখনও ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে।

এখানে লক্ষণীয়, বেলফোর তার ঘোষণায় ইহুদিদের জন্য আলাদা 'জাতীয় আবাসভূমির' কথা বলেছেন। কোনো রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলেননি। এটা হতে পারে তার চাতুর্য। কারণ, 'রাষ্ট্র' শব্দটি ব্যবহার করলে হয়তো এই ঘোষণা ব্রিটিশ কেবিনেটে অনুমোদন পাওয়া সহজ হতো না। ঘোষণাটিতে যে কয়টি অস্পষ্টতা ধরা পড়ে, তার মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো– 'জাতীয় আবাসভূমি' বলতে তিনি কী বোঝালেন? প্যালেস্টাইনে ইহুদি নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্র, নাকি আরবদের নিয়ন্ত্রণে ইহুদিদের স্বায়ত্তশাসন? ইহুদি আবাসভূমির আয়তনের বিষয়টা উল্লেখ ছিল না ঘোষণায়। বেলফোর যে খসড়া ঘোষণাপত্র তৈরি করেছিলেন, তাতে উল্লেখ ছিল –'Palestine should be reconstituted as the national home of the jews people.' তাই মন্ত্রিসভায় এটি পেশ করা হলে এর বিরোধিতা করেছিলেন ভারতবিষয়ক মন্ত্রী মন্টেগু। তার বিরোধিতার মুখে চূড়ান্ত ঘোষণায় আনা হয় ভাষাগত কিছু পরিবর্তন। ওপরে উল্লেখিত অংশটির পরিবর্তে লেখা হয়– 'the establishment in Palestine of a national home for the jewish people.' চূড়ান্ত বাক্যাংশে 'ইন' শব্দটি দ্বারা সমগ্র প্যালেস্টাইন নয়; বরং এর মধ্যে একটি ইহুদি আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার কথা বোঝানো হয়েছে।

যাযাবর (বিনয় কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়) তার *দৃষ্টিপাত* বইতে বিষয়টা উল্লেখ করেছেন এইভাবে–

> '১৯১৬ সালে প্রথম মহাযুদ্ধে যখন সংকটজনক কাল, ইংল্যান্ডে বিস্ফোরক উৎপাদনের অপরিহার্য উপাদান অ্যাসিটনের অভাব, তখন কৃত্রিম অ্যাসিটন তৈরির ভার নিলেন ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটির এক অধ্যাপক। প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ বললেন– ''প্রফেসর, সমগ্র ব্রিটেনের ভাগ্য নির্ভর করছে তোমার সফলতা-বিফলতার ওপরে। আমি চাই তাড়াতাড়ি কাজ, তাড়াতাড়ি ফল লাভ।''

অধ্যাপক বললেন– 'তথাস্তু।'

> দিবারাত্রির অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে সপ্তাহ কয়েকের মধ্যে আবিষ্কার করলেন কৃত্রিম অ্যাসিটন। পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করলেন ব্রিটেনকে। কৃতজ্ঞ লয়েড জর্জ তাকে ডেকে দিতে চাইলেন সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার। ওয়াইজম্যান প্রত্যাখ্যান করলেন সবিনয়ে। লয়েড জর্জ আবার জিজ্ঞাসা করলেন– "পিয়ারেজ? (এর অর্থ কী?) অর্থ?"
>
> "কিছু নয়। একটি মাত্র চাওয়া আছে আমার। আমার স্বজাতির জন্য চাই নির্দিষ্ট একটি দেশ, ইহুদির ন্যাশনাল হোম।"

> এর কিছুকাল পরেই বেলফোর ঘোষণায়, ইহুদিদের জন্য প্যালেস্টাইনে নির্দিষ্ট হলো জাতীয় বাসস্থান।' (দৃষ্টিপাত, যাযাবর, পৃষ্ঠা : ২২, ঢাকা, ২০০৯)

খেইম ওয়াইজম্যান ছাড়াও বেলফোর ডিক্লারেশনে আরও বড়ো একটা প্লেয়ার ছিল। আলোচিত সেই প্লেয়ার হলো রথসচাইল্ড পরিবার। এই পরিবারের এক সদস্য লর্ড নিওনেল রথসচাইল্ডের কাছেই ইজরাইল রাষ্ট্র গড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ব্রিটেন, যা এরই মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। এবার রথসচাইল্ড পরিবারকে নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক।

ইহুদি অর্থনীতি বনাম রথসচাইল্ড পরিবার

রথসচাইল্ড পরিবারকে নিয়ে আছে পর্বতসম রহস্য। এই একটি পরিবার- যাদের উত্থানের গল্প কল্পকথার মতোই সিনেমা, ডকুমেন্টারি ও বইয়ে স্থান করে নিয়েছে। পরিবারটির হাতে বিপুল অর্থ-বিত্ত। তাদের সম্পদ নেই কোথায়? বিশ্বজুড়ে ইহুদিবাদ চর্চায় যে বিপুল অর্থ খরচা হচ্ছে, তার একটা বড়ো অংশের জোগানদাতা রথসচাইল্ড পরিবার। ইহুদি ধর্মীয় স্থাপনার উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন করাসহ ইজরাইলের বিভিন্ন ইহুদি ফান্ডে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার সহায়তা দিচ্ছেন তারা। তবে রথসচাইল্ডরা সবচেয়ে বেশি আলোচনায় থেকেছে ১৯১৭ সালের বেলফোর ডিক্লারেশনকে ঘিরে। সেই আলোচনায় যাওয়ার আগে রথসচাইল্ড পরিবারের উত্থান নিয়ে আলোচনা করা যাক।

এক

বর্তমানে পৃথিবীজুড়ে অত্যাধুনিক যে 'ব্যাংকিং সিস্টেম' আমরা দেখছি, তাতে একক কোনো পরিবারের আধিপত্যের কথা যদি বলতে হয়, তাহলে রথসচাইল্ড পরিবারকে আলোচনায় আনতেই হবে। ব্যাংকিং সিস্টেম কয়েকশো বছর ধরে অনেকটাই এই পরিবারের পরিকল্পনায় গড়া; যার শুরু হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে জার্মানিতে। মেয়ার আমশেল রথসচাইল্ড নামের ইহুদি বংশোদ্ভূত এক জার্মান কয়েন (মুদ্রা) ব্যবসায়ীর হাত ধরে। এই ব্যক্তি রথসচাইল্ড ব্যাংকিং ডাইনেস্টির প্রতিষ্ঠাতা তো বটেই, আবার তাকে আন্তর্জাতিক অর্থনীতির প্রতিষ্ঠাতা পিতাও বলা হয়ে থাকে।

১৯ শতকের প্রথম দুই দশক পর্যন্ত রথসচাইল্ড পরিবারের সম্পদ নিয়ে এক ধরনের মিথলজি ছিল। তারা অবিশ্বাস্য দ্রুততায় কোন প্রক্রিয়ায় সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলল, তার কারণ খোঁজার চেষ্টা হয়েছে বহুবার। এরপর জাতীয়-আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও ইউরোপের সমাজে এই পরিবারের প্রভাব নিয়েও রয়েছে নানান কাহিনি। নাথান মেয়ার রথসচাইল্ড কীভাবে বিপুল সম্পত্তির মালিক হলেন, তা নিয়ে আমরা যা জানি, তা হলো- ওয়াটার লু যুদ্ধের ব্যাপারে গুজব তৈরি করা এবং মিশরের সুয়েজখালের শেয়ার কেনা।

বর্তমানে রথসচাইল্ড পরিবারের সপ্তম প্রজন্মের সদস্যরা এ পারিবারিক ব্যাবসা পরিচালনা করছেন। অন্তত কুড়িটি দেশে আছে তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম। ২০০৮ সালের এক হিসাবে দেখা যায়, এককভাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ১০০ বিলিয়ন ইউরো অর্থায়ন করেছে রথসচাইল্ড পরিবার।

দুই

মেয়ার আমশেল রথসচাইল্ড-এর জন্ম ১৭৪৪ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে। তিনি ব্যবসায়িক মূলধন সরবরাহ, রেলওয়ে শিল্প, সুয়েজখাল নির্মাণের জন্য অর্থায়ন করতেন।

মেয়ার তার পাঁচ পুত্রকে ইউরোপের পাঁচটি দেশে পাঠিয়ে তাদের ব্যাংককে প্রথম আন্তর্জাতিক ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। অথচ শুরুর দিকে তিনি ছিলেন পুরোনো মুদ্রার একজন ডিলার মাত্র। ব্যাংকিং ব্যবস্থায় হাত দেওয়ার পর ব্যাবসা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ইউরোপের সে সময়কার সবচেয়ে সমৃদ্ধ শহরগুলো বেছে নেওয়া হয়। সবচেয়ে ডায়নামিক ছেলে নাথানকে লন্ডনে, জেমসকে প্যারিসে, সলোমনকে ভিয়েনা, কার্লকে ইতালির নেপলস এবং সবচেয়ে বড়ো ছেলে আমশেলকে ফ্রাঙ্কফুর্টে রাখা হয়। মেয়ারের ছেলেরা সেসব শহরে গিয়ে ক্ষমতাসীন রাজপরিবার ও শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতেন, যুদ্ধ পরিচালনার জন্য তাদের বিপুল পরিমাণে ঋণ সরবরাহ করতেন। ১৭৮৯ সালে শুরু হওয়া ফরাসি বিপ্লবের সময় রথসচাইল্ডদের গড়া ব্যাংক ফুলে-ফেঁপে ওঠে।

১৯ শতকে ইউরোপের দেশগুলো প্রায়ই বাজেট ঘাটতিতে ভুগত। বেশিরভাগ দেশেরই রাজস্ব আয় দিয়ে রাষ্ট্রীয় খরচ মেটানো সম্ভব হতো না। সেই হিসেবে ১৮ শতকের দেশগুলো থেকে তারা ভিন্নরকম ছিল। ১৮ শতকের আগে যুদ্ধ আর যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে নিতে দ্রুতই খরচ বাড়তে থাকে ইউরোপের শাসকদের। সেইসঙ্গে ফসল না হওয়ায় কর আদায়ের পরিমাণও কমে যায়। এই যে ঘাটতি, যদিও তা জাতীয় আয়ের তুলনায় কম ছিল, কিন্তু সহজে তা মেটানো সম্ভব হতো না। তখন রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাজারগুলোও ততটা উন্নত ছিল না।

এই সময়ে আমস্টারডামকে কেন্দ্র করে এক ধরনের আন্তর্জাতিক পুঁজি ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠছিল। সুদের হার বেশি থাকায় তখন দেশগুলোর ঋণ নেওয়ার ব্যাপারটি ছিল তুলনামূলক ব্যয়বহুল। কারণ, ঋণদাতারা গ্রহীতাদের ওপর আস্থা রাখতে পারতেন না। বাজেট ঘাটতি মেটাতে গিয়ে রাজকীয় সম্পদ বিশেষ করে ভূমি ও অফিস বিক্রি করে দিতে হতো অথবা নিজস্ব মুদ্রার অবমূল্যায়ন করেও এটা হতো। আরেকটা উপায় ছিল– করের হার বাড়িয়ে দেওয়া।

কিন্তু সপ্তদশ শতকের মতো ১৯ শতকেও বিভিন্ন প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে রাজনৈতিক সম্মতির মাধ্যমে কর আদায় ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন প্রয়োজন হয়ে দেখা দিলো। কিন্তু তা করতে গিয়ে বিপাকে পড়তে হলো শাসকগোষ্ঠীকে। এস্টেট জেনারেল থেকে নতুন কর আদায়ের নির্দেশনা ফরাসি বিপ্লব ত্বরান্বিত করেছিল। ব্যতিক্রম ছিল ব্রিটিশ স্টেট। সপ্তদশ শতক থেকেই তারা তুলনামূলক কার্যকর ও বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন সরকারি ঋণ ও মুদ্রা ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে পেরেছিল। সেটা তারা করেছিল 'ব্যাংক অব ইংল্যান্ড' প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে।

আরেকটা ব্যতিক্রম ব্যাপার চোখে পড়েছিল জার্মানির হেসে কাসেল নামক রাজ্যে। এখানকার শাসক ছিলেন অন্যদের তুলনায় সচ্ছল, রাজ্যের আয়-রোজগারও ছিল ভালো। এটা তিনি করতে পেরেছিলেন অন্যান্য স্টেট থেকে মার্সিনারি ভাড়া করে তাদের হাতে ব্যবস্থাপনা ছেড়ে দিয়ে। এখানকার শাসকের ইনভেস্টমেন্ট পোর্ট ফোলিও-এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন মেয়ার আমশেল রথসচাইল্ড। একজন কয়েন ডিলার থেকে ব্যাংকারে পরিণত হওয়ার এটাই ছিল তাঁর প্রথম পদক্ষেপ।

১৭৯৩ ও ১৮১৫ সালের মধ্যে যুদ্ধ-সংঘাতের কারণে ইউরোপের অর্থনীতিতে তার বড়ো প্রভাব পড়ে। যুদ্ধরত দেশগুলোতে ব্যাপক আকারে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। এ সময় ফরাসি অর্থনীতি একরকম ধসে যায়। ১৭৯৭ সালের পর ডলার, স্টারলিংসহ ইউরোপের মুদ্রাগুলোর মান পড়ে যায়। নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যবাদ নীতি ও ফ্রান্স কর্তৃক আমস্টারডাম দখল হয়ে গেলে টেক্সটাইল চোরাচালান ও নির্বাসিত শাসকদের অর্থ বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রচুর অর্থ কামানোর সুযোগ তৈরি হয়। উপমহাদেশীয় মিত্রদের কাছে ব্রিটেন থেকে ভর্তুকি হস্তান্তর করার জন্য আন্তঃসীমান্ত পেমেন্ট সিস্টেম চালু করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এর আগে এই ব্যবস্থা কোথাও থাকলেও বড়ো আকারে ছিল না। এমন ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে নিজের লক্ষ্য ঠিক করে নেন রথসচাইল্ড। ফ্রাঙ্কফুট আর ম্যানচেস্টারে তার যে ছোটো মার্চেন্ট ব্যাংক ও পোশাক আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান ছিল, এগুলোকে মাল্টিন্যাশনাল পর্যায়ে নিয়ে যান তিনি।

তিন

রথসচাইল্ডরা ইউরোপের রাজনীতিতে নেতৃত্ব দেওয়া নেতাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখত। আলাদা গুপ্তচর নিয়োগ করত। বেতনভুক্ত এজেন্ট নিয়োগ করে ইউরোপের বিভিন্ন শহরে একটা নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছিল। রথসচাইল্ড পরিবারের সাথে শুধু ব্যাবসা করবে এ জন্য না; বরং সবশেষ রাজনৈতিক ও ফিনান্সিয়াল খবর জানানোও ছিল এজেন্টদের কাজ!

প্রথমদিকে সংবাদ আদান-প্রদানে রথসচাইল্ড পরিবার ব্যবহার করত কুরিয়ার। এক মার্কেট থেকে অন্য মার্কেটে শেয়ারের দাম ও বিনিময় হারের তথ্য বিনিময়ে কবুতরও

ব্যবহার করা হতো মাঝে মাঝে। এরা নিজেদের নিয়ন্ত্রিত অর্থ বাজার-সংক্রান্ত পত্র-পত্রিকার মাধ্যমেও প্রভাব সৃষ্টি করত। ১৮৩০ থেকে ১৮৪০-এর দশকে ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া ও জার্মানিতে যখন রেলওয়ে ডেভেলপ হয়, এসবের পেছনে অর্থ ঢেলেছিল রথসচাইল্ড পরিবার।

১৮৬০ সালে জেমস দ্য রথসচাইল্ড একটি প্যান ইউরোপীয় রেলওয়ে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলেন– যা ফ্রান্স, বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ড, স্পেন, অস্ট্রিয়া, জার্মানি ও ইতালিকে সংযুক্ত করেছিল। ১৮৩০-এর দশকে একটি স্পেনীয় পারদ খনি (Almaden) কিনে ফেলে রথসচাইল্ড পরিবার। ১৮৮০ ও ১৮৯০-এর দশকে নিজস্ব ব্যাংকিং ব্যাবসার পাশাপাশি খনিজ সম্পদ আহরণে প্রচুর অর্থ লগ্নি করে পরিবারটি। তারা স্বর্ণ, তামা, হিরা ও তেল ব্যবসায় প্রচুর বিনিয়োগ করে। এই খনি ব্যবসায়ের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে বার্মা ও মনটোনা থেকে আজারবাইজানের বাকু পর্যন্ত তারা বাণিজ্যদুনিয়ায় প্রবেশ করে।

মেয়ার ইউরোপের বিভিন্ন রাজনীতিকের সাথে তার ছেলেদের সম্পর্ক গড়ে তোলেন। ১৮১৩ সালের শুরুর দিকে ছেলে নাথানের সাথে ব্রিটিশ কমিশারি জেনারেল জন চার্লস হ্যারিসের (John Charles Herries) ঘনিষ্ট সম্পর্ক হয়। চার্লসকে ফ্রান্স কর্তৃক ওয়েলিংটন আক্রমণের পেছনে অর্থায়নকারী বলে ভাবা হয়। প্রধানমন্ত্রী লর্ড লিভারপুলের সাথেও নাথানের ভালো সম্পর্ক ছিল। ১৮৩০-৩২-এর দিকে ডিউক অব ওয়েলিংটনকে রিফর্ম ক্রাইসিসে পরামর্শ দেন তিনি। রথসচাইল্ডের সন্তানরা লর্ড র‍্যানডল্ফ চার্চিল, জোসেফ চেম্বারলিন ও আর্থার বেলফোরদের নজরেও পড়েছিলেন।

তবে রথসচাইল্ড পরিবারকে নিয়ে লেখালেখিতে সমালোচনাও কম হয়নি। ১৮৩৭-৩৮-এর দিকে রথসচাইল্ডকে নিয়ে একটি ফিকশন প্রকাশ করা হয়েছিল, যাতে মেয়ার আমশেলকে একজন বদমায়েশ জার্মান ব্যাংকার হিসেবে তুলে ধরা হয়েছিল। The House of Nucingen নামে এই ফিকশনে বলা হয়– রথসচাইল্ড তার ভাগ্য গড়তে পেরেছিলেন ঋণগ্রহীতাদের ভুয়া খেলাপী দেখিয়ে। এখানে উপসংহার টানা হয় এভাবে–

> 'All rapidly accumulated wealth is either the result of luck or discovery, or the result of a legalised theft.'

এর নয় বছর পর ১৮৪৬ সালে *The Edifying and Curious History of Rothschild I, King of the Jews* নামে একটি বই লিখেন Georges Dairnvaell. তিনি তার বইয়ে ওয়াটার লু যুদ্ধে নেপোলিয়নের হেরে যাওয়ার খবর শোনার পর শেয়ার মার্কেটে গুজব ছড়িয়ে নাথান রথসচাইল্ড কীভাবে বিপুল অর্থের মালিক হয়েছিলেন, তার চিত্র তুলে ধরেছিলেন। লেখক লিখেছেন–

> 'The Rothschilds have only ever gained from our disasters; when France has won, the Rothschilds have lost.'

আমশেল একবার নাথানকে বলেছিলেন–

'You can only make a lot of money with a lot of blood!'

চার

১৭৯০-এর দশকে এসে মেয়ার আমশেল রথসচাইল্ড কেবলই একজন প্রাচীন মুদ্রা ও পদকের ডিলারই রইলেন না; ফ্রাঙ্কফুটের একজন ধনাঢ্য ব্যক্তিতেও পরিণত হলেন এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যবসায়ের জগতে প্রবেশ করলেন। ফরাসি বিপ্লব ও ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লব মেয়ারের ব্যক্তিগত জীবন ও ব্যবসায়ের ধরন পালটে দিয়েছিল। ১৭৯০-এর দশকের পর থেকে ব্যাংকিং ব্যাবসা ছড়িয়ে দিতে থাকেন মেয়ার। একই সঙ্গে তার যে পুরোনো ব্যাবসা ছিল, সেটাও ছোটো পরিসরে অব্যাহত থাকে।

এই ব্যাবসা মেয়ারের মৃত্যুর পরও বজায় ছিল। ১৮০০ সালের পর মুনাফায় এগিয়ে ছিল কাপড় ব্যবসায়ীরা। ল্যাঙ্কাশায়ারের কটন, স্পিনিং ও ডায়িং-এর ব্যাবসা অর্থনীতিকে নজিরবিহীনভাবে চাঙা করে তোলে। বলা যায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এই ধাক্কা গিয়ে লাগে জার্মানিতে। সেখানে তোয়ালে, চেক, রুমাল, মসলিনের কদর বাড়ল। এই ব্যাবসা থেকে যারা ব্যাপক মুনাফা লুফে নিতে পেরেছিলেন, তাদেরই একজন মেয়ার আমশেল। তখন ফ্রাঙ্কফুটে ১৫টির বেশি আমদানিকারক বসেছিল, যারা ইংল্যান্ড থেকে টেক্সটাইল আমদানি করত। এমনকী ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টারে ৮-১০ টার মতো স্থায়ী জার্মান প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল।

ল্যাঙ্কাশায়ার, ম্যানচেস্টার ঘুরে ঘুরে টেক্সটাইলস ব্যবসায় প্রচুর মুনাফা করেন নাথান। ১৮০০ সালের নভেম্বরের দিকে ম্যানচেস্টার থেকে স্কটল্যান্ডে যান অপেক্ষাকৃত ভালো কাপড় ও ভালো দাম পাওয়ার আশায়। সেখান থেকে ফিরে আবার লন্ডনে ব্যাংকারদের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেন। ১৮০২ সালের বসন্তে ধীরে ধীরে ব্যবসাকে প্যারিস, ব্রাসেলস, আমস্টারডামে এমনকী মস্কোতে ছড়িয়ে দেন। এক ফাঁকে জার্মানি ফিরে কোলন, হাইডেলবার্গ, হামবুর্গ, নুরেমবার্গ ও মিউনিখে অর্ডার খুঁজতে থাকেন।

ব্রিটেন, ফ্রান্স আর জার্মানির মুদ্রা ও শেয়ারবাজার নিয়ে খেলা করা ছিল পান্তা ভাতের মতো। নাথানের ভাই জেমস একবার নাথানকে জানালেন–

'It depends solely on me whether the pound rises or falls in Paris.'

মুনাফার লোভে ইউরোপে যুদ্ধ উসকে দিত রথসচাইল্ড পরিবারের সদস্যরা। তারা কিছু কূটচাল চালত। হয়তো দেখা গেল, ইংল্যান্ড আর ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ চলছে, রথসচাইল্ডের এক পুত্র ইংল্যান্ড সরকারকে আর আরেক পুত্র ফরাসি সরকারকে ঋণ দিচ্ছে! এ কৌশলে ভালো কাজ হতো। জয়-পরাজয় যাই ই ঘটুক না কেন, ফুলে-ফেঁপে উঠত রথসচাইল্ড পরিবারের ব্যাংক! ইউরোপের বিভিন্ন যুদ্ধের পেছনে তাদের হাত ছিল বলে নানা সময়ই গুঞ্জন ছিল।

ব্যাবসার পাশাপাশি ইউরোপজুড়ে নিজেদের একটা গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে রথসচাইল্ডরা। সব জায়গা থেকেই তাদের গুপ্তচররা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক খবরাখবর সংগ্রহ করত। এসব তথ্য কাজে লাগিয়ে বাড়াতো নিজেদের অর্থ-সম্পদ।

পাঁচ

১৮১৫ সালের ওয়াটার লু'র যুদ্ধে ব্রিটিশদের টাকার জোগান দিচ্ছিল রথসচাইল্ডদের ব্যাংক। ব্রিটিশ রথচাইল্ড ব্যাংকের প্রধান নাথান রথসচাইল্ড একটা কূটচাল চাললেন। গুপ্তচরের মাধ্যমে খবর পেলেন ব্রিটিশরা যুদ্ধে জিতে যাচ্ছে। তিনি সস্তা দরে লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জে সব ব্রিটিশ শেয়ার বিক্রি করা শুরু করলেন! ব্যাপারটা অদ্ভুত না? তিনি নিশ্চিত ব্রিটিশরা জিতছে অথচ তিনি ছাড়ছেন সব ব্রিটিশ কোম্পানির শেয়ার? অথচ উলটো কাজ করার কথা ছিল তার। নাথানদের দেখাদেখি অন্যরাও তাদের নিজেদের শেয়ার ছেড়ে দিতে লাগল। এইসব ছেড়ে দেওয়া শেয়ার গোপনে পানির দামে কিনছিল নাথানের লোকরাই! নাথানের লন্ডন ফেরার পরের দিনই জানা গেল ব্রিটিশদের জয়ের কথা। মাত্র একদিনেই নাথানের সম্পদের পরিমাণ বেড়ে গেল ২০ গুণ। এইভাবে ব্রিটিশ অর্থনীতি চলে গেল মাত্র একটি পরিবারের হাতে।

ওয়াটার লু'র যুদ্ধে ফরাসিরা পরাজিত হলো। ডিউক অব ওয়েলিংটনের কাছে হারলেন নেপোলিয়ন। যুদ্ধে হারার পর নেপোলিয়নকে এলবা দ্বীপে নির্বাসন দেওয়া হলো। ফরাসি সরকারের আগেই নেপোলিয়নের হারের খবর জানতে পেরেছিলে নাথান। এই তথ্যের মাধ্যমে গুজব ছড়িয়ে শেয়ার বাজার থেকে নাথানদের আয় হয়েছিল কম করে হলেও ১ মিলিয়ন পাউন্ড।

যুদ্ধে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির পর ফরাসি সরকার বিভিন্ন ব্যাংকের কাছে ঋণের জন্য ধরনা দিতে থাকে। তারা রথসচাইল্ড পরিচালিত ব্যাংকগুলোকে এড়িয়ে যায়। কারণ, ফরাসি অভিজাতরা ইহুদি রথসচাইল্ডদের কাছে হাত পাততে চাননি। অন্যদিকে রথসচাইল্ড পরিবারও বসে ছিল না। ফরাসিদের মন জোগাতে তারা নানারকম পার্টি, উপহার ও ফরাসি শিল্পকলায় অনুদান দেওয়া শুরু করল। এসবে কাজ না হওয়ায় নতুন ফন্দি আঁট পরিবারটি। ১৮১৮ সালের অক্টোবরে তারা কিনে নিতে শুরু করল ফ্রান্সের দুটো প্রধান কোম্পানির সরকারি বন্ড। দ্রুতই এর প্রভাব দেখা গেল বাজারে। বন্ডের দাম বেড়ে হলো কয়েকগুণ। এরপর হঠাৎ করেই পরের মাসে তারা একসঙ্গে সব বন্ড বাজারে ছেড়ে দিলে ফরাসি অর্থনীতির বারোটা বেজে গেল! ফরাসি শাসকগোষ্ঠী বাধ্য হলেন হার মানতে। পৃথিবীর তখনকার দুটো প্রধান অর্থনীতি ব্রিটেন ও ফ্রান্স চলে এলা রথসচাইল্ডের হাতের মুঠোয়।

১৮৭৫ সালে প্রথম ইহুদি হিসেবে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে জায়গা করে নেন লায়োনেল রথসচাইল্ড। বিনিময়ে মাত্র কয়েক ঘণ্টার নোটিশে ব্রিটিশ সরকারকে সেই সময়কার ৪ মিলিয়ন পাউন্ড ধার দেন, যা দিয়ে ব্রিটিশরা সুয়েজ খালের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়!

রথচাইল্ডদের টাকার জোরের সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ সম্ভবত ইজরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। কথিত আছে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সেকেন্ড ব্যারন রথসচাইল্ড ব্রিটিশ সরকারকে ঋণ দেন এই শর্তে– যুদ্ধের পর প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের জন্য নিজস্ব দেশ তৈরি করতে হবে। ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড আর্থার বেলফোর রাজি হয়ে এই ইস্যুতে যে ঘোষণা দেন, তা 'বেলফোর ঘোষণা' নামে পরিচিত। সেই ঘোষণা অনুযায়ী– ১৯৪৮ সালে ইজরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই এমনটাও বলা হয়ে থাকে, পৃথিবীতে ইজরাইল একমাত্র দেশ, যা টাকা দিয়ে কেনা হয়েছে!

রথসচাইল্ড ফ্যামিলি প্রতিনিয়ত বিপুল সম্পত্তির মালিক হচ্ছে। যদিও এরা কখনোই সম্পদের হিসাব জনসমক্ষে প্রকাশ করে না। তবে তাদের নিজের নামে খুব অল্পকিছু ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানটিকে আছে। তাদের সম্পদ বেশিরভাগই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করা। তেল, কয়লা, ব্যাংক প্রভৃতি নানা ধরনের কোম্পানিতে তাদের বিনিয়োগ আছে। ধারণা করা হয়– মোটামুটি ২০ট্রিলিয়ন ডলারের সম্পদ আছে রথসচাইল্ড পরিবারের হাতে। এই অল্প লোকের হাতে বিপুল সম্পদের জমা হওয়া নিশ্চিতভাবেই আধুনিক সভ্যতার সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতা। রথসচাইল্ড পরিবারের কথা আলোচনা করতে গেলে প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে ইহুদিদের সুদি কারবারের ইতিহাস পর্যালোচনা করা।

ইহুদিদের সুদি কারবারের ইতিহাস

এক

পৃথিবীতে সুদপ্রথা আসে ইহুদিদের হাত ধরে। ইহুদিরা সুদি কারবারের দিকে ঝুঁকেছিল বাণিজ্য করতে গিয়ে। যখন রোমান ক্যাথলিক চার্চগুলো ইহুদি মালিকানায় জমি রাখা আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প তৈরির অধিকার বাতিল করে দিয়েছিল, তখন নিজেদের জীবনমান উন্নয়ন আর দুর্দশা লাঘবের উপায় হিসেবে ইহুদিরা বেছে নেয় বাণিজ্যকে। তারা দেশে-বিদেশে বাণিজ্য বিস্তারের পাশাপাশি সুদের বিনিময়ে টাকা খাটাত। ইউরোপের শাসকরা 'ঘেটো' নামক যেসব বসতিতে ইহুদিদের থাকতে বাধ্য করত, সেখানে গড়ে উঠেছিল একদল পেশাজীবী। বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়ে ইহুদিদের ছিল স্থল ও নৌ-বাণিজ্য।

মধ্যযুগে বর্তমান ইরানের রাজধানী তেহরান ছিল বিশাল এক বাণিজ্যকেন্দ্র। তার পরিচিতি ছিল আর্মেনিয়াম আর খোরাসান বণিক কাফেলার সংযোগকারী স্টেশন হিসেবে। ইহুদিরা তেহরান থেকে পশুর চামড়া বিশেষ করে পশম সংগ্রহ করে সেসব নিয়ে যেত ইউরোপের বাজারে বিক্রির উদ্দেশ্যে। সে সময় স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোতে (ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ড ও আইসল্যান্ড) ছিল পশমের ব্যাপক চাহিদা। তাই এই পশমকে কেন্দ্র করে ইহুদিরা একটা সম্ভাবনাময় বাণিজ্যের পথ খুঁজে পায়।

দ্বাদশ শতকে বাল্টিক সাগরের উপকূলে কিছু বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে তোলে ইহুদিরা; যেগুলোর বেশিরভাগই ছিল অস্থায়ী। ভাইকিংরা এসব বাণিজ্যকেন্দ্রের পাশে জাহাজ ভিড়িয়ে পশম কিনে নিত। বিনিময়ে তারা ইহুদিদের কাছে বিক্রি করত সুগন্ধি সামগ্রী, সামদ্রিক মাছ আর লুট করা স্বর্ণালংকার। ভাইকিংদের নিয়ে ইউরোপে আছে নানান গল্প, উপকথা। তবে এ যুগেও ভাইকিং শব্দটি বেঁচে আছে সাহসিকতা আর বীরত্বের সমার্থক হয়ে।

দুই

ভাইকিং শব্দটি এসেছে নরওয়ের নর্স ভাষা থেকে, যার অর্থ ফিয়র্ডের সন্তান। আর ফিয়র্ড মানে হলো সমুদ্র উপকুলের বিশেষ ভূ-প্রাকৃতিক গঠন– যার প্রকৃতি খুব ভঙ্গুর। বরফ যুগের হিমবাহের ফলে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান ভূমির অনেক অংশ বিলীন হয়ে সৃষ্টি হয়েছিল ফিয়র্ডের। ভূমির গঠন ভঙ্গুর হওয়ায় এই অঞ্চলের বাসিন্দারা ভূমিতে বসবাসের চেয়ে ছোটো-বড়ো নৌকাতে বসবাস করতে পছন্দ করতেন। সেই থেকে তারা জড়িয়ে পড়েন মাছ ধরার সাথে। উপকুল থেকে শুরু করে গভীর সমুদ্রে মাছ শিকার করতেন ভাইকিংরা। মাছ শিকারের সঙ্গে সঙ্গে দস্যুভিত্তিতে জড়িয়ে যায় এরা।

প্রথম দিকে তারা ছোটো ছোটো নৌযান আটকে ডাকাতি করত। একসময় দস্যুপনাই হয়ে যায় তাদের মূল পেশা। কেউ কেউ সরাসরি বলে থাকেন, ভাইকিং মানে উপসাগর। দুদিক থেকেই এই উপসংহারে আসা যাচ্ছে যে, তাদের ইতিহাসের সাথে সমুদ্রের একটা ব্যাপার আছে। ইউরোপের স্ক্যান্ডিনেভিয়ান অঞ্চল ছিল ভাইকিংদের আদি নিবাস। পরবর্তী সময়ে বাকি ইউরোপেও তারা ছড়িয়ে যায়। বলা হয়ে থাকে, রাশিয়া, আয়ারল্যান্ড, আইসল্যান্ড ও গ্রিনল্যান্ডের অধিবাসীদের পূর্বপুরুষরা ছিলেন ভাইকিং।

এই ভাইকিংরা ছিল জলপথের ত্রাস; নবম-দ্বাদশ শতক পর্যন্ত ইউরোপের বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ করে বাণিজ্য-বহরে হামলা চালিয়ে ব্যাপকমাত্রায় লুটপাট চালাত। তবে ভাইকিংরা কেন দস্যুপনায় জড়াল তারও আলাদা প্রেক্ষাপট আছে। মাছ শিকারের পাশাপাশি ভাইকিংরা কৃষিকাজেও যুক্ত ছিল। কিন্তু স্ক্যান্ডিনেভিয়ান অঞ্চলের অনুর্বর জমিতে কৃষিকাজ করেটিকে থাকা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। শেষমেষ ভাইকিংরা লুটপাট ও দখলবাজির মধ্যেই আয়েসি জীবনের গ্যারান্টি পায়। আর বৃহদাকার শারীরিক গঠন তাদের এনে দিয়েছিল বাড়তি সুবিধা।

অ্যাম্বারগ্রেস সুগন্ধির একচেটিয়া ব্যাবসা ছিল ইহুদিদের হাতে। খ্রিষ্টান ক্রুসেডাররা দক্ষিণ ইউরোপে ইহুদিদের বাণিজ্য কেন্দ্রগুলো ধ্বংস করে দিলে ভাইকিংদের সঙ্গে ইহুদি বাণিজ্যের প্রয়োজন দেখা দেয়। সে সময় পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের মশলার বাজারও ইহুদিদের দখলে ছিল। ক্রুসেডের সময় ভেনিসের ব্যবসায়ীরা ইহুদিদের হটিয়ে দেয়। ইতালিসহ বিভিন্ন দেশে ইহুদি জাহাজগুলো লুট করা হয়; এমনকী কখনো কখনো লুটপাট শেষে এসব জাহাজ পানিতে ডুবিয়ে দেওয়া হয়।

পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত মার্সেলিস বন্দরে কিছু বিত্তবান ইহুদি ব্যবসায়ী টিকে থাকতে পেরেছিল। কিন্তু ততদিনে তাদের ব্যবসায় লালবাত্তি জ্বলে উঠেছিল। ইহুদি বাণিজ্য চলে যায় ভেনিসীয়দের দখলে। সে সময়ে ইউরোপে সুগন্ধীর ব্যাপক চাহিদা ছিল, যা আসত পূর্বের দেশগুলো থেকে। এক আউন্স সুগন্ধি বিক্রি করেই এক পরিবারের বছরের খাই-খরচা মেটানো যেত। এর বাইরে ইহুদিদের আরেকটি আয়ের খাত ছিল– মুক্তা।

তিন

চতুর্থ থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত খ্রিষ্টান খাতকরা ইহুদি মহাজনদের কাছে হাত পেতেছেন। তখন ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সুদের হার ঠিক করে দেওয়া হতো রাষ্ট্রীয়ভাবে। এই হার সর্বোচ্চ সত্তর শতাংশের মধ্যেই থাকত।[৫৪]

সে সময়ে যদি কোনো জার্মান জমিদার তার সমগোত্রীয় কোনো জমিদারের কাছ থেকে ঋণ নিতেন, তবে তাকে তিনশো থেকে চারশো শতাংশ হারে সুদ দিতে হতো। অন্যদিকে ইহুদি মহাজনদের সুদের হার ছিল দশ থেকে পঞ্চাশ শতাংশ। এ জন্য ঋণের জন্য ইহুদিদের দরবারেই ভিড় হতো বেশি। ফলে চাঙা হতে থাকে ইহুদি অর্থনীতি।

একসময় যেই ভেনিস থেকে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেখানেই আবার তাদের ডেকে নেওয়া হয়। ভেনিসে ইহুদিদের পুনরায় ডাক পড়ে ১৫৯৮ সালে। এটা ছিল কূটনীতির জয়। ড্যানিয়েল রড্রিগা নামে এক ইহুদি ব্যবসায়ী ভেনিস কর্তৃপক্ষকে বোঝাতে সক্ষম হন, শহরের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য ইহুদি ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসন প্রয়োজন। তিন দফায় ইহুদিদের ভেনিসে ব্যবসায়ের অনুমোদন দেওয়া হয়। সবশেষ অনুমোদন বহাল ছিল ১৭৯৭ সাল পর্যন্ত।

ইহুদিরা যে সুদের কারবার গড়ে তুলেছিল, তার বিরুদ্ধে দীর্ঘ সময় ধরে লড়াই করেছিল ইউরোপের খ্রিষ্টানরা; বিশেষ করে চার্চগুলো। সে সময় সুদি কারবার ঠিক কোন পর্যায়ে এসে ঠেকেছিল, তার একটা চিত্র আমরা দেখতে পাই উইলিয়াম শেক্সপিয়রের 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' নাটকে। ইহুদি 'সাইলক' চরিত্রের মাধ্যমে শেক্সপিয়র দেখিয়েছেন– সুদি কারবারের নির্মমতা। এখানে আমরা দেখতে পাই, ইউরোপিয়ান খ্রিষ্টানদের সুদ ব্যবস্থা বন্ধ করার নানান প্রচেষ্টা। আর এইচ টনির লেখা *রিলিজিওন এন্ড দ্য রাইস অব ক্যাপিটালিজম* ইতিহাসে সুদ ব্যবস্থার ওপর লেখা আরেকটি ক্ল্যাসিক্যাল বই। এখানে উঠে এসেছে সুদ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ধার্মিক খ্রিষ্টানদের লড়াই-সংগ্রামের কথা।

১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবের পর পশ্চিম ইউরোপের খ্রিষ্টান চার্চগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে। যাজকরা আগের মতো ক্ষমতা প্রয়োগ করার সুযোগ পাননি। পূর্ব ইউরোপের চার্চগুলোও

---

[৫৪]. ইহুদিকথা, অমিতাভ সেনগুপ্ত, পৃষ্ঠা-১১৮ থেকে ১২০

নখদন্তহীন বাঘে পরিণত হয়, যখন ১৯১৭ সালে রাশিয়াতে জারের শাসন পায়ে ঠেলে বলশেভিকরা ক্ষমতায় চলে আসে। সোভিয়েত ইউনিয়নের মদদে ইউরোপের এই অংশে গড়ে উঠে কতগুলো কমিউনিস্ট রাষ্ট্র। চার্চের ক্ষমতা কমে যাওয়ায় এর সুবিধা ঘরে তুলতে পারে ইহুদিরা। কারণটা খুব পরিষ্কার, এত বছর ধরে ইহুদিরা যে সুদি কারবারব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল, তা পূর্বের ন্যায় চ্যালেঞ্জ করার মতো শক্ত কোনো পক্ষ রইল না।

চার

সময়ের বিবর্তনে ইহুদিরা আরেক ধাপ এগোলো। তারা সুদপ্রথাকে আনুষ্ঠানিক একটা সিস্টেমের মধ্যে নিয়ে এলো– 'লেন্ডিং মানি অন ইন্টারেস্ট' যার আধুনিক ভার্সন হলো ব্যাংকিং সিস্টেম। ইহুদি মালিকানায় ইউরোপজুড়ে অনেক ব্যাংক গড়ে তোলা হলো। এই ব্যাংকগুলোই একসময় কাগজি মুদ্রা (পেপার মানি) ছাপানো ও বিতরণের কাজ হাতে নিল। বিনিময়ে এই প্রজেক্ট ইহুদিদের অনেক অর্থ এনে দিলো। ব্যাংকমালিকরা দিন দিন ধনী থেকে ধনী হতে লাগল। ইহুদিদের এই উন্নতি নজর এড়াল না ইউরোপের শাসকদের। তারা চাইল কাগজি মুদ্রা ছাপানো এবং তা বিতরণের ওপর নিজেদের প্রভাব বাড়াতে।

তাহলে ব্যাপারটা এই দাঁড়াল– ধাতব মুদ্রাকে ধীরে ধীরে 'পেপার মানি' সিস্টেম দ্বারা প্রতিস্থাপন করা শুরু হয় ইউরোপে। ইউরোপের সরকারগুলো এ ক্ষেত্রে সফলতা পেতে থাকে। নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পর কিছু কাগজের টুকরার বিনিময়ে রিয়েল মানি (স্বর্ণ/রুপা)/ রিয়েল রিসোর্স নিজেদের হস্তগত করে ইউরোপীয়রা।

প্রথম যখন কাগজি মুদ্রা ছাপানো হলো, তখন উদ্ভাবকরা বলতে থাকলেন– এটি স্বর্ণ দ্বারা বিনিময়যোগ্য (রিডেবল ইন গোল্ড)। এভাবে নতুন একটি সিস্টেম দাঁড়িয়ে গেল। ১৯২০ সাল পর্যন্ত আমেরিকায় ২০ ডলারের একটা পেপার নোট দিলে ব্যাংক থেকে এক আউন্স স্বর্ণ পাওয়া যেত। সে সময় মার্কিন ডলারে লেখা থাকত– 'ইন গড উই ট্রাস্ট (যা এখনও অব্যাহত আছে)।' এটাকে অনেকে দেখে থাকেন ইমোশনাল ব্ল্যাকমেইলের অংশ হিসেবে।

বর্তমানে বিশ্ব অর্থব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করছে যুক্তরাষ্ট্র আর এ যাত্রায় দেশটির সহযোগী ইহুদি ধনকুবেররা, যারা বিশ্বব্যাংকিং সিস্টেমের দানবরূপে আবির্ভূত হয়েছেন।

নিক্সন শক

১৯৭১ সালের আগস্টে 'ব্রেটন উডস সিস্টেম'-কে বুড়ো আঙুল দেখায় যুক্তরাষ্ট্র। তারা এক ঘোষণায় বিশ্ব অর্থব্যবস্থায় একটা পরিবর্তন নিয়ে আসে অনেকটা ইলেকট্রিক শকের মতোই ইউরোপের অনেক রাষ্ট্রনায়কের হৃদয়ে যা বড়ো ধরনের ধাক্কা বা শক হিসেবে গেঁথে আছে। আর যেহেতু প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের হাত ধরেই এই পরিবর্তন, তাই এটি প্রতিষ্ঠা পায় 'নিক্সন শক' হিসেবে। কীভাবে আসে এই পরিবর্তন?

এক

আমরা যে কাগজি নোট বা ধাতব মুদ্রা ব্যবহার করছি, এটি আসলে রিপ্রেজেনটেটর। একটা সময় পর্যন্ত কাগজি নোট বা ধাতব মুদ্রার রিপ্রেজেনটেটর হিসেবে কাজ করত স্বর্ণ। প্রতিটি নোটের সমমূল্যের স্বর্ণ গচ্ছিত রাখা হতো কেন্দ্রীয় ব্যাংকে। বাংলাদেশে প্রতিটি নোটেই 'চাহিবামাত্র ইহার বাহককে দিতে বাধ্য থাকিবে' লেখাটি থাকে। এর অর্থ হলো– আপনি যদি আপনার কাছে থাকা নোটটি বাংলাদেশ ব্যাংকে নিয়ে জমা দেন, তাহলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ওই নোটের বিপরীতে গচ্ছিত স্বর্ণমুদ্রা আপনাকে ফেরত দিতে বাধ্য! অবশ্য বর্তমানে টাকাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুদ্রার মূল্য নির্ধারণ করা হচ্ছে ডলার দিয়ে। কার্যত স্বর্ণ এখন আর কাগজি মুদ্রার রিপ্রেজেনটেটর না।

এখন আলোচনা করা যাক– আমার, আপনার, আমাদের সম্পদ কীভাবে টাকায় (কাগজি মুদ্রা) পরিণত হলো সে বিষয়ে। টাকা যেহেতু প্রিন্ট করা বিশেষ কোনো কাগজ, এখন এই প্রশ্নও তো আসতে পারে যে সরকার কি ইচ্ছেমতো টাকা প্রিন্ট করতে পারে? বা করলেই কি সম্পদের পরিমাণ বাড়বে? যদি ইচ্ছেমতো টাকা প্রিন্টই করা যায়, তাহলে তো কোনো দেশ আর্থিক সংকটে পড়ার কথা না। জিম্বাবুয়ে বা ভেনেজুয়েলার মতো দেশগুলো নিজেদের ইচ্ছেমতো কারেন্সি প্রিন্ট করে বা প্রিন্ট করা বন্ধ করে দিয়ে সংকট কাটানোর চেষ্টা করত, তাই না?

এখানে একটা সমীকরণ আছে। অর্থনীতির ভাষায় আমি, আপনি যা উৎপাদন করি কিংবা জমিতে যে ফসল-ফলাদি ফলাই, এটিই প্রকৃত সম্পদ বা রিয়েল রিসোর্স। এই সম্পদ টাকা/কাগজি মুদ্রা দিয়ে রিপ্লেস করা সম্ভব। আর এ জন্য প্রকৃত সম্পদের সমান মূল্যের টাকা বা নোট ছাপানো হয়। আমার প্রকৃত সম্পদ কম কিন্তু টাকা প্রিন্ট করা হলো বেশি, সেক্ষেত্রে পণ্যসামগ্রীর দাম বেড়ে হবে 'ইনফ্লেশন' বা মুল্যস্ফীতি। আর যদি উলটোটা ঘটে মানে প্রকৃত সম্পদ বেশি কিন্তু টাকা ছাপানো হলো কম, তাহলে হবে 'ডিপ্লেশন' বা মূল্য সংকোচন। কিন্তু প্রকৃত সম্পদের বিপরীতে বাড়তি কাগজি মুদ্রা ছাপানো হলে মূল্যস্ফীতি হওয়ার কথা থাকলেও এই কাজটা একটু একটু করে করলে বাজারে তার প্রভাব রাতারাতি পড়বে না, মানে মানুষ সহজে তা টের পাওয়ার কথা নয়।

প্রাচীন যুগে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হতো ধাতব মুদ্রা। এগুলো ছিল স্বর্ণ, রুপা কিংবা তামার তৈরি। যেহেতু ছাপার মেশিন ছিল না, সেহেতু কাগজি নোটের প্রচলন সম্ভব ছিল না, ঝুঁকি ছিল না ইচ্ছেমতো প্রিন্ট করিয়ে দিয়ে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে দেওয়ার। ধাতব মুদ্রা বরং খনি থেকে তুলে বাজারে ছাড়তে হতো। কিন্তু এসব মুদ্রা বহন করা ছিল যথেষ্ট কষ্টকর ও বিপজ্জনক, তাই বিকল্প ভাবনা এলো। ইউরোপের দেশগুলো স্বর্ণমুদ্রাকে ব্যাংকে জমা রেখে স্বর্ণমুদ্রার সমমূল্যের 'প্রিন্ট' করা নোট বাজারে ছাড়তে লাগল। নিয়ম করা হলো, যখন-তখন ইচ্ছে করলে প্রিন্ট করা টাকা ব্যাংকে জমা দিয়ে ব্যাংক থেকে স্বর্ণ তুলে নেওয়া যাবে।

দুই

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইউরোপের দেশগুলো তাদের স্বর্ণগুলো নির্দিষ্ট একটা ডলার মূল্যে (এক আউন্স=৩৫ ডলার হারে) আমেরিকায় জমা রাখল। এটা চুক্তির ভিত্তিতে হয়েছিল এবং তার একটা প্রেক্ষাপটও ছিল। চুক্তিটি ছিল এ রকম– 'যখনই তাদের দরকার হবে, আমেরিকাকে প্রিন্টেড কারেন্সি (কাগজি মুদ্রা) দেবে, বিনিময়ে আমেরিকা স্বর্ণ ফেরত দেবে।' আর তাই তখন আমেরিকান ডলারকে বলা হতো 'গোল্ড-বেকড কারেন্সি।' কথিত আছে– হিটলার ইউরোপ দখল করে এসব স্বর্ণ নিয়ে যেতে পারেন– এমন ভাবনা থেকেই মার্কিনিদের সাথে চুক্তিতে যায় ইউরোপের নেতারা। এই ব্যবস্থার নাম ছিল 'ব্রেটন উডস সিস্টেস'-যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশায়ারের ব্রেটন উডস শহরে ৪৪টি দেশের সঙ্গে আমেরিকার যে অর্থনৈতিক চুক্তি হয়েছিল, ইউরোপের বাইরেরও কিছু দেশ এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মেনে নিয়েছিল।

গোল্ড বেকড কারেন্সির ব্যাপারটা হচ্ছে এ রকম। ধরুন, প্রথমে নির্ধারণ করা হলো এক ডলার সমান এক গ্রাম সোনা। এখন আমেরিকা এক ডলার ছাপাতে চাইলে এক গ্রাম সোনার মজুদ রাখতে হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই ব্যবস্থাতেই বিশ্ব বাণিজ্যের লেনদেন ও অর্থনৈতিক সিস্টেম অব্যাহত থাকল। ষাটের দশকের মধ্যভাগে এসে আমেরিকার কাছে প্রায় ১৪ বিলিয়ন ডলারের স্বর্ণ ছিল, কিন্তু সারা বিশ্বে কাগুজে ডলারের পরিমাণ ছিল এর দ্বিগুণেরও বেশি। এটাকে ভালোভাবে নেননি ইউরোপের নেতারা (বিশেষ করে ফরাসি নেতা শার্ল দ্য গল)। তারা বিশ্বাস হারান আমেরিকার ওপর।

প্রশ্ন উঠে, আমেরিকা কি স্বর্ণের বিপরীতে বেশি মুদ্রা ছাপাচ্ছে? এমন সন্দেহের মুখে ১৯৭১ সালে যুক্তরাষ্ট্র 'ব্রেটন উডস সিস্টেম' থেকে সরে আসে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন ঘোষণা করলেন, তারা নির্দিষ্ট কোনো ডলার রেটে স্বর্ণ বেচাকেনা করবেন না; বাজারই ঠিক করে দেবে এর দাম কত হবে। ফলে তাতে সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। নিক্সন-এর বক্তব্য অনুযায়ী– বেসিক ইকোনমিক রুল এখানে প্রযুক্ত হবে, ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাইয়ের মাধ্যমেই নির্ধারিত হবে ডলারের মূল্যমান। এ ঘোষণায় কাগজি মুদ্রার রিপ্রেজেনটের হিসেবে আর স্বর্ণ থাকল না, ডলার হয়ে গেল ভাসমান মুদ্রা। এটাই নিক্সন শক। এতদিন ফরেন রিজার্ভ গোল্ডে রাখা হলেও তার জায়গা দখল করল ইউএস ডলার।

কিন্তু আমেরিকা এই ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করছে কীভাবে? এটা করা হচ্ছে ডলারের প্রচুর চাহিদা বাড়িয়ে আর জোগান কমানোর মাধ্যমে। এ ক্ষেত্রে তেলই হয়ে উঠে প্রধান হাতিয়ার। সৌদি আরবসহ ওপেকভুক্ত দেশগুলোকে ডলার দিয়ে তেল বেচতে বাধ্য করেছে আমেরিকা। এভাবেই বাড়ছে ডলারের চাহিদা, হচ্ছে আরও বেশি শক্তিশালী।

তাই আমেরিকান ডলার পরিচিতি পেল পেট্রোডলার হিসেবে। স্বর্ণের পরিবর্তে ডলার মুদ্রা ব্যবস্থায় নির্ধারকের জায়গায় চলে আসায় এটি যুক্তরাষ্ট্রের হাতিয়ারে পরিণত হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। আর তাই রাশিয়া, ইরান ও তুরস্কের মতো দেশগুলো প্রায়ই হুমকি-ধমকি দিচ্ছে ডলারের মাধ্যমে তেল না বেচার বা না কেনার। সেই হিসেবে নতুন কোনো আর্থিক সিস্টেমের ঘোষণা হয়তো ভবিষ্যতে দেখা যেতে পারে। আর তখন ডলারই একমাত্র স্বীকৃত আন্তর্জাতিক বিনিময় মাধ্যম থাকবে না। তবে এটা দুরূহ ও যথেষ্ট চ্যালেঞ্জিং। এই দেশগুলো ডলারকে চ্যালেঞ্জ করার মতো যথেষ্ট অনুশীলন করেনি কিংবা সেই সক্ষমতা দেখানোর মতো বড়ো অর্থনীতি তাদের হাতে নেই। তবে এই শিবিরে বিশাল অর্থনীতির চীন যোগ দিলে ব্যাপারটা যথেষ্ট উপভোগ্য হতে পারত।

সাইকস-পিকো (পিকট) চুক্তি

যুক্তরাষ্ট্র মিত্রশক্তির হয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নামে ১৯১৭ সালে। মার্কিনবিরোধী অনেকেই যুক্তরাষ্ট্রের এমন সিদ্ধান্তকে শেষ দিকে এসে 'মাখন খাওয়ার চেষ্টা' হিসেবে দেখে থাকেন। যদিও সুযোগটা জার্মানিই করে দিয়েছিল। মার্কিনিরা লড়াইয়ে নামায় জার্মানদের সাবমেরিন আক্রমণে বিপর্যস্ত ব্রিটেন-ফ্রান্স উজ্জীবিত হলো। লড়াইয়ে হারল জার্মান ও অটোমানরা। অটোমান সালতানাত ভেঙেই গেল। তুর্কিদের তাড়াতে আরব বিদ্রোহীরা মূল যুদ্ধটা করলেও অটোমান সাম্রাজ্যের সদ্য বিচ্ছিন্ন আরব অংশ ভাগ-বাটোয়ারা করে নিল ব্রিটেন ও ফ্রান্স। কীভাবে এই ভাগ-বাটোয়ারা হয়?

এক

স্যার মার্ক সাইকস। মধ্যপ্রাচ্য বিশেষজ্ঞ ও ব্রিটিশ আলোচক। ছিলেন টোরি এমপি (কনজারভেটিভ পার্টি) এবং যুদ্ধমন্ত্রী কিচেনারের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি। ফিল্ড মার্শাল কিচেনারের হয়ে বিভিন্ন পলিসি মেকিং ফোরামে নেতৃত্ব দিতেন সাইকস। প্রথমদিকে জায়োনভীতি থাকলেও তিনি পরে জায়োনিস্ট হয়েছিলেন। আর অটোমান-আরব ইস্যুতে ছিলেন আরব ন্যাশনালিস্টদের পক্ষে। ফরাসি কূটনীতিক ফ্রাঙ্কোজ জর্জ পিকোর (পিকট) সাথে মিলে গোপনে এক চুক্তির মাধ্যমে অটোমানদের খসে পড়া আরব-অনারব অংশ ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে ভাগ করে নেন সাইকস। কর্মজীবনে দীর্ঘদিন ধরে বৈরুতের কনসাল জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি।

১৯১৫ সালের শেষ দিক থেকেই চুক্তিটি নিয়ে আলোচনা চলছিল। চুক্তিটি চূড়ান্ত করার আগে রাশিয়ার অনুমোদনের জন্য ১৯১৬ সালের বসন্তের শুরুতে সাইকস ও পিকোকে সেন্ট পিটার্সবুর্গে পাঠানো হয়। রাশিয়ার অনুমোদনের পর ১৬ই মে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের

প্রতিনিধিদের স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে[৫৫] চুক্তিটি পরিণতি পায়। অবশ্য সাইকস বা পিকো তাদের কেউ-ই চুক্তিটিতে সই করেননি। দুই দেশের হয়ে চুক্তিতে সই করেছেন অ্যাডওয়ার্ড গ্রে ও পল কেম্বর।

গোপন সমঝোতা চুক্তি অনুযায়ী বর্তমান ইরাক, কুয়েত ও প্যালেস্টাইনের আংশিক অংশের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ পায় ব্রিটেন। আর ফ্রান্স তার অংশ পৃথক দুটি দেশে ভাগ করে নেয়। একটি হলো সিরিয়া, অন্যটি লেবানন। এ ছাড়াও দক্ষিণ তুরস্ক পায় ফ্রান্স। লেবানন দেশটি ভৌগোলিক কাঠামোগতভাবে না করে বরং সীমানা টেনে কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করা হয়। কারণ, এখানকার বেশিরভাগ মানুষ ছিল খ্রিষ্টান।[৫৬]

রাশিয়াকে দেওয়া হয়েছিল ইস্তাম্বুল আর আর্মেনিয়ার কিছু অংশ। চুক্তি অনুযায়ী আরও কিছু ভূখণ্ড পায় ব্রিটেন ও ফ্রান্স, যেখানে দেশ দুটির পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ বজার রাখার কথা বলা হয়েছিল। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী যেসব এলাকায় পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার কথা ছিল, চাইলে ব্রিটেন ও ফ্রান্স সেসব এলাকা সরাসরি নিজেরা শাসন করতে পারবে অথবা আরব রাষ্ট্রগুলোকে নিয়ে কনফেডারেশন গড়তে পারবে। ব্রিটেন অটোমান সাম্রাজ্যের কিছু প্রদেশ নিয়ে ইরাক নামে নতুন যে রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে, তার আমির বানানো হয় শরিফ হোসেনের দ্বিতীয় সন্তান ফয়সালকে। ফয়সালের বড়ো ভাই আব্দুল্লাহ পান ট্রান্সজর্ডান (বর্তমানে জর্ডান) নামে আরেকটি নতুন রাষ্ট্র, যার সৃষ্টি ব্রিটিশ ম্যান্ডেট থেকেই। তবে দুই ভাইয়ের শাসক হওয়ার নেপথ্যেও আছে বিদ্রোহ, সে আলোচনা থাকছে আরও পরের দিকে।

দুই

সন্তানরা রাজত্ব পেলেও মক্কায় সুবিধে করতে পারলেন না তাদের বাবা শরিফ হোসেন। ব্রিটিশদের কাছ থেকে সান্ত্বনার পুরস্কার হিসেবে মক্কাসহ বর্তমান সৌদি ভূখণ্ড শাসনের অধিকার থাকল তার কাছে। কিন্তু ১৯২৪ সালে ওয়াহাবি আদর্শে অনুপ্রাণিত ব্রিটিশবান্ধব আরেক ব্যক্তি আজিজ ইবনে সৌদ, যিনি হাশিমাইতদের মতোই; অটোমানদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন, তিনি পবিত্র মক্কা আক্রমণ করে বসেন। হাশিমাইত শাসকগোষ্ঠীকে সেখান থেকে উচ্ছেদ করেন আজিজ। ধারাবাহিক কিছু যুদ্ধে ইয়েমেন, ওমান ও আরও কিছু আরব এলাকা বাদ দিলে আরব উপদ্বীপের ৮০ শতাংশ জায়গাই দখল করে নিতে পারে ইবনে সৌদ পরিবার। ১৯৩২ সালে সৌদি আরব নামে নতুন এক রাষ্ট্রের ঘোষণা দেন আজিজ। এ ক্ষেত্রে ব্রিটেন, ফ্রান্স বা সোভিয়েত ইউনিয়ন–কোনো দিক থেকেই কোনো রকম বিরোধিতা বা বাধা আসেনি।

---

৫৫. Britain and France conclude Sykes-Picot agreement, www.history.com

৫৬. Destiny Disrupted: A History of the World Through Islamic Eyes, Tamim Ansary, (অনুবাদ, আলী আহমদ মাবরুর, পৃষ্ঠা-৪৩০)

ছবি, বিবিসি, ১৬ মে, ২০১৬।
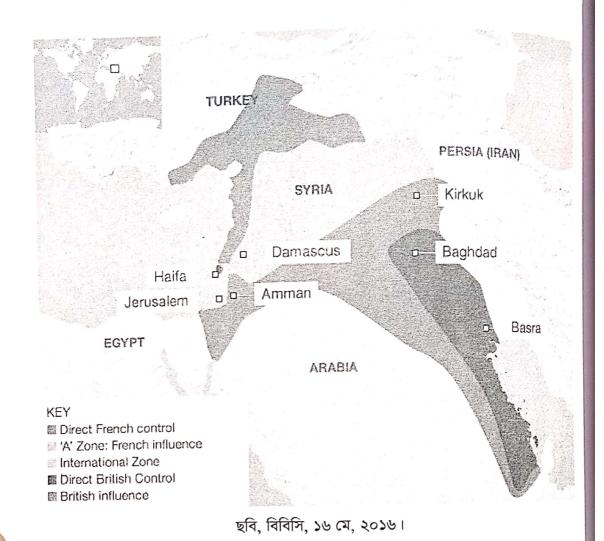
ব্রিটেন, ফ্রান্স ও সোভিয়েত ইউনিয়ন মিলে কনফেডারেশনের মাধ্যমে জেরুজালেম নেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন কমই গুরুত্ব পেল এই ভাগাভাগিতে। ইতিহাসের এই গোপন চুক্তিটি সাইকস-পিকো চুক্তি বা এশিয়া মাইনর চুক্তি নামে পরিচিত।

১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের পর বলশেভিকরা ক্ষমতায় এসে চুক্তিটি ফাঁস করে দেয়। অবশ্য ফাঁস হওয়ার কয়েক মাস আগে সাইকস ও পিকো শরিফ হোসেনের কাছে এসেছিল তাদের প্ল্যান নিয়ে, কিন্তু তাকে ঠিক কতটুকু তথ্য দেওয়া হয়েছিল, এ নিয়ে বিতর্ক আছে। চুক্তি ফাঁস হয়ে যাওয়ায় বিব্রত হয় ব্রিটেন ও ফ্রান্স। হতাশা বাড়ে আরবদের মাঝে। ২০১৪ সালে ইসলামিক স্টেট (আইএস) সাইকস-পিকো চুক্তি অনুযায়ী ঠিক করা ইরাক-সিরিয়া সীমান্ত গুঁড়িয়ে দিয়ে ইসলামি খিলাফতের ঘোষণা দেয়।[৫৭] শত বছর আগের সাইকস-পিকো চুক্তি এখনও আরব অসন্তোষ ও সীমান্ত বিরোধের অন্যতম কারণ হয়ে থেকে গেছে।

[৫৭]. Sykes-Picot: Carving up the Middle East| The Economist, Nov 24, 2016.

শরিফ হোসেনের দুই ছেলের বিদ্রোহ ও ক্ষমতায় আরোহণ

এক

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আরবরা যে প্রতারণার শিকার হয়েছেন, তা তাদের বুঝতে দেরি হয়নি। শরিফ হোসেন সাইকস-পিকো চুক্তির বিস্তারিত জানতে পারেন চুক্তি সইয়ের বহু পরে। ততদিনে রাশিয়ায় জারের শাসন উপড়ে ফেলেছেন বিপ্লবীরা। ক্ষমতায় এসেই বলশেভিকরা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আর্কাইভ থেকে আগের সরকারের করা সব গোপন চুক্তি ফাঁস করে দেয়। নভেম্বরের শেষ দিকে (২৩ নভেম্বর) স্থানীয় দুটি পত্রিকাতে চুক্তি সইয়ের খবর ছাপা হয়। ২৬ নভেম্বর ম্যানচেস্টার *গার্ডিয়ান* পত্রিকায় চুক্তিটি প্রকাশিত হয়। আরবদের পাশাপাশি এই খবর হতাশা ছড়ায় ইহুদিদের মাঝেও। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ শুরুতে চুক্তির ব্যাপারটি অস্বীকার করে বলে– এটি তুর্কি ষড়যন্ত্র। পরে তারা নিজেদের মতো করে একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করায়। বলা হয়– এটা যুদ্ধ শুরুর আগে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে সম্পাদিত প্রাথমিক আলোচনা।

১৯১৮ সালের নভেম্বরে অ্যাংলো-ফ্রান্স যৌথ ঘোষণার মাধ্যমে সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ায় একটি আরব রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতার ঘোষণা দেওয়া হয়। এতে আশ্বস্ত হয়ে ক্ষোভ সত্ত্বেও মিত্রপক্ষের প্রতি সমর্থন ধরে রাখেন শরিফ।

পরের বছরের জানুয়ারিতে প্যারিসে কথিত শান্তি সম্মেলনে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড লয়েড জর্জ ও ফরাসি প্রধানমন্ত্রী ক্লেমেনশো-এর সাথে এক বৈঠকে অংশ নেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন। সম্মেলনে শরিফ হোসেনের ছোটো ছেলে ফয়সাল ও ইহুদি নেতা অধ্যাপক খেইম ওয়াইজম্যান প্রতিনিধি সহকারে যোগ দেন। গোপন চুক্তির নথি অনুযায়ী ফ্রান্স সিরিয়াকে দাবি করলে ফয়সাল তাতে ভেটো দেন। ব্রিটেন তাকে ফ্রান্স ও জায়োনবাদীদের সাথে সমঝোতা করার পরামর্শ দেয়। ফয়সাল নিশ্চিত হয়ে যান, তিনি সাইকস-পিকো চুক্তির ফাঁদে আটকে গেছেন। তবুও স্বাধীনতার দাবি ছাড়েননি এই আরব নেতা।

দুই

তুর্কি সাম্রাজ্যের অঞ্চলগুলোর ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য ১৯২০ সালের ১৯-২৬ এপ্রিল ইতালির স্যান রেমোতে মিত্র শক্তির এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এখানেই লীগ অব নেশন্সের তত্ত্বাবধানে ইউরোপের শক্তিগুলো ম্যান্ডেটের চুক্তিতে সই করে। লেবানন ও সিরিয়ায় ফ্রান্স এবং প্যালেস্টাইন ও ইরাকে ব্রিটিশ ম্যান্ডেট প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ম্যান্ডেট কার্যকর হয় ১৯২২ সাল থেকে। ফিলিস্তিনের ম্যান্ডেট চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় তিন বছর আগের বেলফোর ঘোষণা। ফলে আরবরা স্যান রেমো সম্মেলনের সিদ্ধান্তকে দেখল বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে।

১৯২০ সালের মার্চ মাসে সিরিয়ার জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সমগ্র সিরিয়ার (সিরিয়া, লেবানন, ফিলিস্তিন ও ট্রান্সজর্ডান) বাদশাহ ঘোষণা করা হয়। এই সম্মেলন আয়োজন করা হয়েছিল ঐতিহাসিক নগরী দামেস্কে। ফয়সালের অনুগতরা লেবাননে ফরাসি স্বার্থে গেরিলা কায়দায় হানা দিতে শুরু করল। সিরিয়াকে ফ্রান্সের ম্যান্ডেট দেওয়ার পর ফরাসি বাহিনী ফয়সালকে হটিয়ে সিরিয়ার ক্ষমতা নিয়ে নেয়। ফয়সাল প্রথমে ফিলিস্তিন ও পরে ইতালি পালিয়ে যান। তাঁর ভাই আব্দুল্লাহকে একই সময়ে মেসোপটেমিয়ার বাদশাহ ঘোষণা করা হয়েছিল। ম্যান্ডেট ঘোষণার পর তাই সেখানেও বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। তবে কঠোরভাবে বিদ্রোহ দমন করে ইরাকের নিয়ন্ত্রণ নিতে পারে ব্রিটেন।

কিন্তু অব্যাহত আরব অসন্তোষে এ অঞ্চলে অটোমানদের পুনরুত্থানের শঙ্কায় ব্রিটিশরা দোটানায় পড়ে যায়। এরপরই শরিফের সন্তানদের সাথে সমঝোতার পথ বেছে নেয় তারা। ডিসেম্বরে ব্রিটিশ উপনিবেশ দপ্তরের অধীনে খোলা হয় মধ্যপ্রাচ্য বিভাগ। তখনকার ব্রিটিশ উপনিবেশ মন্ত্রী উইন্সটন চার্চিল ১৯২১ সালের ১২-২৪ জুন মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ে নীতি ঠিক করতে কায়রোতে এক সম্মেলনের ডাক দেন। এই সম্মেলন থেকেই সিরিয়া থেকে বিতাড়িত ফয়সালকে ইরাকের (মেসোপটেমিয়ার নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় ইরাক) বাদশা ও আব্দুল্লাহকে ট্রান্স জর্ডানের আমির ঘোষণা করা হয়। কিন্তু ফয়সাল এই মত দেন, ইরাকের ওপর তার ভাই আব্দুল্লাহর অধিকার রয়েছে, তাই তাতে তিনি রাজি নন। পরে টি ই লরেন্স দায়িত্ব নেন আব্দুল্লাহকে রাজি করানোর।

আব্দুল্লাহ তার অনুগত হেজাজি বাহিনী নিয়ে তখন জর্ডানে। ছোটোভাই ফয়সালকে সিরিয়া থেকে বিতাড়িত করায় ফরাসি সেনাবাহিনীর ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তিনি। লরেন্স ফয়সালকে ইরাকের বাদশাহ করার প্রস্তাবটি আব্দুল্লাহকে জানালে তিনি তা মেনে নেন। পরে ভাই রাজি হওয়ায় ফয়সালও আর ব্রিটিশদের বিরোধিতা করেননি। সেই থেকে জর্ডানে শুরু হয় শরিফ হোসেন পরিবারের শাসন, যা আজও অব্যাহত আছে। ১৯২১ সালের ২১ জুন ইরাকের নেতারা ফয়সালকে মেনে নেয় তাদের বাদশাহ হিসেবে। তবে এর মধ্য দিয়ে ইরাক ও জর্ডান ব্রিটিশদের আশ্রিত রাজ্যে হিসেবেই থেকে যায়। অথচ প্যারিস শান্তি সম্মেলনে ইহুদিদের ষোলোকলা পূর্ণ হয়েছিল। ফিলিস্তিনে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণের বদলে আসে ম্যান্ডেট শাসন, আর তার সাথে জুড়ে দেওয়া হয় বেলফোর ঘোষণা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে মধ্যপ্রাচ্যে কয়েক মডেলের শাসনব্যবস্থা দেখা যায়; যা আজও অব্যাহত আছে।[৫৮] সেখানে ধর্মীয় ব্যক্তি বা ইমামের নেতৃত্বে এক ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন : ইয়েমেন, ওমান, হেজাজ ও ইরান। আবার দেখা যায়

---

[৫৮]. মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি, তারেক শামসুর রেহমান। পৃষ্ঠা ১৯-২০।

গোত্রভিত্তিক শাসনব্যবস্থা। যেমন : সৌদি আরব ও জর্ডান। এই দুই ব্যবস্থাতেই ধর্মকে গুরুত্ব দেওয়া হতো। এসবের বাইরেও আরও দুটি ধারা ছিল। একটি ছিল পারিবারিক শাসনব্যবস্থা। কাতার, বাহরাইন, কয়েত ও লেবানন ছিল এই তালিকায়। কিছুটা সেক্যুলার ধারায় পরিচালিত পারিবারিক শাসনব্যবস্থায় ধর্মীয় পণ্ডিতরা খুব একটা গুরুত্ব পেতেন না। সবশেষ চতুর্থ আরেকটি শাসনব্যবস্থা কায়েম করেছিল বামমনা কিছু ব্যক্তি ও আর্মি জেনারেল; যাদের কেউ কেউ ছিলেন বাথ পার্টির অনুসারী। আলজেরিয়া, মিশর, তিউনিসিয়া, ইরাক ও সিরিয়ায় এই টাইপের শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। ইরাকের প্রয়াত নেতা সাদ্দাম হোসেন ও সিরিয়ার বর্তমান শাসকগোষ্ঠী বাথ পার্টির অনুসারী হিসেবে পরিচিত।

প্যালেস্টাইন ভূখণ্ডে ইহুদি ঢল

এক

ইউরোপ থেকে আসা ইহুদিরা প্যালেস্টাইনের বিভিন্ন এলাকায় গড়ে তুলছিল কৃষি খামার। এটা তাদের সমবায় আন্দোলনের অংশ, যাকে বলা হয় (Kibbutz)। কিবুৎজ হিব্রু শব্দ, যার অর্থ 'সমষ্টি'। প্রতিটি কিবুৎজের সদস্যরা কাজ করেন একত্রে। তারা যা উৎপাদন করেন, পুরোটাই ভোগ করেন সম্মিলিতভাবে। প্রথম কিবুৎজ প্রতিষ্ঠা করা হয় ১৯০৯ সালে গ্যালিলি সমুদ্রের তীরে উত্তর ইজরাইলের দেগানিয়ায়। ইহুদি চিন্তাবিদ বের বরোচভ ও এডি গর্ডনের ব্রেইন চাইল্ড হচ্ছে এই কিবুৎজ।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নির্বাসিত জীবনযাপনের সময় ইহুদিরা মাটির সাথে কোনো সম্পর্ক রাখেনি বা রাখতে পারেনি; অনেক এলাকাতেই তারা পায়নি ভূমির মালিকানা। তাই কৃষি কাজের পরিবর্তে ইহুদিরা ঝুঁকেছিল ব্যাবসা-বাণিজ্যে। কিন্তু চিন্তক বের রবরোচভ ভাবতেন, ইহুদিরা আবার চাষী ও শ্রমিকের জীবন বেছে না নিলে তাদের সুস্বাস্থ্য ফিরবে না। আর গর্ডন বলতেন, চাষাবাদ হতে হবে ইহুদিদের ধর্ম; এই চাষীদের নিয়েই প্রতিষ্ঠা করতে হবে ইহুদি সমাজ ও রাষ্ট্র। কৃষিতে আজ ইজরাইলের যে ঈর্ষণীয় সাফল্য, তার পেছনে রয়েছে কিবুৎজ আন্দোলন।

বাইরে থেকে কিবুৎজের জন্য আসত প্রচুর অর্থ। ইউরোপ-আমেরিকায় থাকা ধনাঢ্য ইহুদি আর জায়োনিস্টরা এই অর্থের জোগান দিতেন। এই কৃষি খামার রক্ষায় শুরুর দিকেই গড়ে তোলা হয় রক্ষীবাহিনী 'হাশোমার'। ইহুদিরা একইসঙ্গে নজর দিয়েছিল শিল্প ও বিজ্ঞানে। সে কারণেই আজ ইজরাইল বিশ্বে পরিচিত হতে পেরেছে স্টার্টআপ নেশন হিসেবে। দখলকৃত বিরশেবাকে গড়ে তোলা হয়েছে হাইটেক সিটি হিসেবে।

গাজা থেকে মাইল দুয়েক উত্তরে ছিল একটি কিবুৎজ এলাকা। ৩০-এর দশকে পোল্যান্ড থেকে আসা ইহুদিরা এখানে কৃষি খামার গড়ে তোলে। পোলিশ ইহুদিরা এই ভূখণ্ডে জড়ো হয়েছিল। কারণ, ইউরোপে তখন চলছিল নাৎসিদের রাজত্ব। নতুন আসা এসব ইহুদির পাশেই ছিল ফিলিস্তিনি আরবদের বসবাস। তাদেরও কৃষি খামার ছিল।

এই আরবরা কয়েক শতাব্দী ধরেই এই এলাকায় বসবাস করছে। সেখানে রোমান আমল থেকে কিছু ইহুদি থাকলেও সংখ্যার বিচারে তা খুবই কম। দুই জাতিগোষ্ঠীর মধ্যেই ছিল পারস্পরিক সম্প্রীতি-সদ্ভাব। কিন্তু এই সম্পর্ক তিক্ত হওয়া শুরু করল যখন ফিলিস্তিনিরা বুঝতে পারল তারা ধীরে ধীরে নিজেদের জমি হারাচ্ছে। ইহুদিরা স্রোতের মতো আসছিল আর নামমাত্র দামে আরব জমিগুলো কিনে নিচ্ছিল। ফলে তাদের সংখ্যা যেমন বাড়ছিল, তেমনি আগে থেকে বসবাস করা আরবদের জমিজমা হাতছাড়া হতে থাকল।

১৯৪৮ সালে ইজরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে যেসব ফিলিস্তিনি ভিটেমাটি ও কৃষিজমি হারিয়েছিলেন, তারা ভেবেছিলেন দ্রুতই তারা বাড়ি ফিরে যেতে পারবেন। কিন্তু সেটা আর হলো না, ইজরাইল তাদের আর কখনোই বাড়িতে ফিরতে দেয়নি। শিমন পেরেজ- যিনি একসময় ইজরাইলের প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্ট ছিলেন– একবার বিবিসিকে তিনি বলেছিলেন, ফিলিস্তিনিদের কেন এই দশা হলো সে জন্য তাদের নিজেদেরই প্রশ্ন করা উচিত। তার দাবি–

> 'অধিকাংশ জমি ফিলিস্তিনিদের হাতেই থাকত। তাদের একটি আলাদা রাষ্ট্র হতো। কিন্তু তারা সেটি প্রত্যাখ্যান করেছে। ১৯৪৭ সালে তারা ভুল করেছে। আমরা কোনো ভুল করিনি!'

দুই

১৯১৭ সাল থেকে '৪৮ সাল পর্যন্ত ফিলিস্তিনের ভূমি ব্রিটেনের নিয়ন্ত্রণে ছিল। সাইকস-পিকো চুক্তি আর পরবর্তী সময়ে লীগ অব নেশন্সের দেওয়া ম্যান্ডেট– এই দুই উপায়ে ১৯৪৮ পর্যন্ত ফিলিস্তিন শাসনের বৈধতা পেয়েছিল ব্রিটেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে আরবদের সহায়তায় অটোমান সেনাদের কাছ থেকে জেরুজালেম দখলে নিয়েছিল ব্রিটেন। ইহুদিদের কাছে তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে ফিলিস্তিনিদের জমিতে তাদের জন্য একটি রাষ্ট্র গঠনের সুযোগ করে দেবে। সেই সুযোগ এলো যখন জার্মানির শাসক হিটলার ইহুদিদের প্রতি কঠোর হতে শুরু করলেন।

হিটলারের দমন-নিপীড়নের মুখে জাহাজে করে হাজার হাজার ইহুদি ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে আসতে থাকে। এর আগে টাকা পেয়ে নিজেদের জমি ইহুদিদের কাছে বেচে দিলেও, এবার ঘুম ভাঙে আরবদের। তারা এটাকে নিজেদের ভুল বলে উপলব্ধি করতে থাকে। অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে বিদ্রোহ করে আরব ফিলিস্তিনিরা। তারা ব্রিটিশ সৈন্য এবং ইহুদি লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালাতে শুরু করে। কিন্তু ইহুদিদের সহায়তায় আরবদের বিদ্রোহ কঠোর হাতে দমন করতে পারে ব্রিটিশ সেনারা। ব্রিটিশ সেনাদের দমন-পীড়ন এতটাই কঠোর ছিল যে, তাতে আরব সমাজে ভাঙন তৈরি হয়েছিল।

ইহুদিরা তাদের জন্য একটি আলাদা রাষ্ট্র গঠনে বদ্ধপরিকর ছিল। সে অনুযায়ী বড়ো আকারের প্রস্তুতিও নেওয়া হয়েছিল। ১৯৩০-র দশকের শেষের দিকে ব্রিটেন চেয়েছিল

হিটলারের নাৎসি বাহিনীর বিরুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্যে তাদের অবস্থান জোরালো করতে। সে জন্য আরব এবং ইহুদি দু-পক্ষকেই হাতে রাখতে চেয়েছিল দেশটি। ১৯৩৯ সালের মাঝামাঝি (১৭ মে) ব্রিটিশ সরকার একটি শ্বেতপত্র (হোয়াইট পেপার) প্রকাশ করে, যেখানে বলা হয়েছিল, পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য পঁচাত্তর হাজার ইহুদি অভিবাসী আসতে পারবে ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে। এরপর কেউ এলে আরবদের অনুমতি লাগবে। ইহুদিদের জমি কেনায় কিছু বিধি-নিষেধ দেওয়া হয়। পরবর্তী ১০ বছরের মধ্যে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের প্রস্তাবও দেওয়া দেয়। বিদ্রোহীর চাপে 'আরব হায়ার কমিটি' শ্বেতপত্র প্রত্যাখ্যান করে। কারণ, তাতে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা পিছিয়ে দেওয়া হয়। এ ছাড়া অভিবাসন বন্ধেও সুনির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা আসেনি শ্বেতপত্রে।

তবে, ইহুদিদের জন্য এই হোয়াইট পেপার ছিল বড়ো একটা শক। কারণ, এর মধ্য দিয়ে বেলফোর ঘোষণা থেকে কার্যত (ইহুদিদের জাতীয় আবাসভূমি) সরে যায় ব্রিটেন। তারা মোটামুটি লিবারেল পলিসি নেয়। টোরি দল ব্রিটেনের ক্ষমতায় থাকলেও তারা ডিফেন্সিভ নীতি নিয়েছিল। লেবার দলের সব এমপি হোয়াইট পেপারের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিল। টোরি দলের ১১০ দশ পক্ষে-বিপক্ষে কোনো ভোট না দিলেও ২০ জন এমপি ভোট দেয় প্রস্তাবের বিরুদ্ধে। যাদের মধ্যে ছিলেন চার্চিলও। হোয়াইট পেপারের বিরোধিতাকারীরা বলছিলেন এটা আরব সহিংসতার প্রতি আত্মসমর্পণ।[৫৯] যদিও আরব-ইহুদি কেউ-ই হোয়াইট পেপারকে স্বাগত জানায়নি। ইহুদি আগমনও ঠেকানো যায়নি।

সংখ্যা বেঁধে দেওয়ার ব্রিটিশ পরিকল্পনা মনঃপূত হয়নি ইহুদিদের। তারা চাইছিল আরও বেশি বেশি ইহুদি অভিবাসী আসুক। ইহুদিরা একই সঙ্গে ব্রিটেন এবং হিটলারের বিরুদ্ধে লড়াই করার পরিকল্পনা করে; যদিও এটা ব্রিটিশদের কাছে গোপন রাখা হয়। তখন ৩২ হাজার ইহুদি ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়। সেখান থেকে সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়ে ইহুদি সৈন্যরা ব্রিটেন এবং আরবদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছিল।

তিন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর হিটলারের ক্রোধ থেকে যেসব ইহুদি বাঁচতে পেরেছিলেন তাদের জন্য কী করা যায়, এ নিয়ে আমেরিকাসহ পশ্চিমাদের শুরু হয় মাথাব্যথা। প্যালেস্টাইন ভূখণ্ডে আলাদা ইহুদিরাষ্ট্র গঠনের চিন্তা আরও জোরালো হয়। তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যান ইজরাইল রাষ্ট্রের পক্ষে জোরালো অবস্থান নেন। তিনি চেয়েছিলেন, হিটলারের হাত থেকে বেঁচে যাওয়া একলাখ ইহুদিকে অতি দ্রুত প্যালেস্টাইনে জায়গা দিতে। কিন্তু এত বিপুল সংখ্যক ইহুদিকে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে নিয়ে গেলে সেখানে গৃহযুদ্ধ বেধে যাওয়ার আপদ দেখছিল ব্রিটেন। ব্রিটিশদের চাপে রাখতে সশস্ত্র ইহুদি গোষ্ঠীগুলো ব্রিটিশ সৈন্যদের হামলা চালানো শুরু করে।

---

[৫৯]. Righteousvictims: A History of the Zionist-Arab Conflict, 1881-1998, Benny Morris, page-158.

এই অবস্থায় ইউরোপ থেকে প্যালেস্টাইনের উদ্দেশ্যে জাহাজ বোঝাই হয়ে আসা হাজার-হাজার ইহুদিকে বাধা দেয় ব্রিটিশ বাহিনী। প্রতিক্রিয়ায় ব্রিটিশদের ওপর আক্রমণের মাত্রা বাড়িয়ে দেয় ইহুদিরা; যার উদ্দেশ্য ছিল এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি করা, যাতে ইহুদিরাষ্ট্র গঠনের জন্য ব্রিটেন এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়। সংকট সমাধানের জন্য চাপ বাড়ল ব্রিটেনের ওপর। চাপ সামলাতে না পেরে বিষয়টিকে জাতিসংঘে নিয়ে গেল তারা।

১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে দুটি রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত নেয় জাতিসংঘ। একটি ইহুদিদের জন্য এবং অন্যটি আরবদের জন্য। ইহুদিরা মোট ভূখণ্ডের ৬ শতাংশের মালিক হলেও তাদের দেওয়া হয় মোট জমির অর্ধেকেরও বেশি। স্বভাবতই এ সিদ্ধান্ত মানতে পারেনি আরবরা। কিন্তু ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে ইহুদিরা উল্লাসে ফেটে পড়ে। কারণ, তারা অবশেষে একটি স্বাধীন ভূখণ্ড তো পেল। আরবরা দেখল কূটনীতিতে সমস্যার সমাধান হবে না। ফলাফল, আরব-ইহুদি দাঙ্গার সূচনা। সক্রিয় হয় ইহুদি সশস্ত্র গ্রুপগুলো। তাদের হাতে এলো গোপন কারখানায় তৈরি সমরাস্ত্র। কিন্তু সশস্ত্র ইহুদিদের বিপরীতে আরবদের দাঁড়ানোর মতো না ছিল মনোবল, না ছিল নেতৃত্ব আর অস্ত্রের শক্তি।

ইহুদি, মুসলমান, খ্রিষ্টান সবারই নজর ছিল পবিত্র শহর জেরুজালেমের দিকে। জাতিসংঘ যে সিদ্ধান্ত দিয়েছিল, সেখানে জেরুজালেম আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণে থাকার কথা ছিল। কিন্তু আরব কিংবা ইহুদি-কোনো পক্ষই সেটি মানল না। ফলে জেরুজালেম শহরের নিয়ন্ত্রণের জন্য দুপক্ষের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। ১৯৪৮ সালের দিকে ফিলিস্তিন নেতা আল-হোসেইনি সিরিয়া গিয়েছিলেন অস্ত্র সহায়তা চাইতে, কিন্তু তাকে ফিরতে হয়েছিল খালি হাতে। সিরীয়রা হোসেইনিকে অস্ত্র দেয়নি। হতাশ ফিলিস্তিন নেতা ফিরে এসে আবার ইহুদিদের মুখোমুখি হন। এর কয়েকদিন পরেই তিনি নিহত হন। ইহুদিরা যখন তাদের আক্রমণের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়, ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাস নাগাদ বহু ফিলিস্তিনি আরব তাদের বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়। ইহুদি সশস্ত্র গ্রুপগুলোর নৃশংসতা আরবদের মনে ভয় ধরিয়ে দেয়।

ইজরাইল রাষ্ট্রের ৭০ বছর পূর্তি

২০১৮ সালের ১৯ এপ্রিল প্রতিষ্ঠার সত্তর বছর পালন করেছে ইজরাইল। যদিও ইজরাইল রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল ১৪ মে-তে। যেহেতু ইজরাইল গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের পরিবর্তে হিব্রু রীতিতে দিবসটি পালন করে থাকে, সেই হিসেবে ইংরেজি তারিখের সাথে এর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর দিনক্ষণ মেলে না। ইজরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিনটিকে ফিলিস্তিনিরা দেখে নাকবা বা বিপর্যয়ের দিন হিসেবে। যদিও ১৪-ই মে-এর পরিবর্তে তারা এটি পালন করে পরদিন অর্থাৎ ১৫-ই মে।

১৯৪৮ সালের নাকবাতে প্রায় সাড়ে সাত লাখের মতো ফিলিস্তিনি বাস্তুচ্যুত হয়। ওই সময়ে সংখ্যার বিচারে এটি প্যালেস্টাইন ভূখণ্ডে বসবাস করা মোট ফিলিস্তিনির ৮৫ থেকে ৯০ শতাংশ। এ ছাড়া ৫০০-এর মতো ফিলিস্তিনি গ্রাম হয় ধ্বংস করা হয়, না হয় বাসিন্দাদের সরিয়ে দেওয়া হয়।[৬০] সে সময় জেরুজালেম ও হাইফা নিয়ে নেওয়া হয়। লিদ্দা ও রামলা থেকে ৫০ হাজারের মতো ফিলিস্তিনিকে পশ্চিম তীরের দিকে জোর করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। জুনের দিকে ইজরাইলের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ডেভিড বেন গুরিয়ান তার মন্ত্রিসভাকে বললেন, আরবদের ফেরত আনা যাবে না। পঞ্চাশের দশকে ফিলিস্তিনিরা তাদের বাড়িঘরে ফিরতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যারাই ফিরতে চেয়েছিলেন তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়া হয়েছে, এদের কেউ কেউ মারা গেছেন। তারও আগে ১৮০০ সালে প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের সংখ্যা ছিল সেখানকার মোট জনসংখ্যার আড়াই শতাংশ। ১৮৮০ থেকে ১৮৯০ সালের দিকে ইহুদি জনসংখ্যা দাঁড়ায় ৫-৬ শতাংশে, বাকি সবাই ছিল আরব।

বর্তমানে ইজরাইলের প্রতি ৫ জনের মধ্যে একজন ফিলিস্তিনি, যারা বিভিন্নভাবে তাদের বাস্তুচ্যুতি ঠেকাতে পেরেছিলেন। এ রকম ফিলিস্তিনির সংখ্যা প্রায় সতেরো লাখের মতো। তারা বসবাস করছেন ইজরাইলের ভেতরকার বিভিন্ন ক্যাম্পে। এর বাইরে লেবানন, সিরিয়া, জর্ডান এবং ইজরাইল অধিকৃত গাজা ও পশ্চিম তীরের শরণার্থী ক্যাম্পগুলোতে আছেন লাখ লাখ ফিলিস্তিনি। ইজরাইলের অভ্যন্তরে যেসব ফিলিস্তিনি রয়েছেন, তারা ইজরাইল ভূখণ্ডের বাইরে যারা আছেন তাদের মতোই দিনযাপন করছেন। ২০১১ সালে বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সরকার নাকবা আইন প্রণয়ন করে, যা ইজরাইলের অভ্যন্তরে থাকা ফিলিস্তিনের অধিকার খর্ব করে। আইনটিতে বলা হয়, যেসব প্রতিষ্ঠান ইহুদি ও ইজরাইলকে মানবে না এবং ইজরাইলের স্বাধীনতা দিবসকে শোক দিবস হিসেবে পালন করবে, যেসব প্রতিষ্ঠানকে সরকার কোনো অর্থ সহায়তা দেবে না। এতে করে ফিলিস্তিনিদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হয়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় ফিলিস্তিনি অধ্যুষিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। মোটের ওপর এই আইনের ফলে ফিলিস্তিনি অধিকারের ব্যাপারগুলো ঝুলে যায়।

---

[৬০]. A place I do not recognise': Palestinians mark 70 years of Israeli injustice, middle east eye, Jonathan Cook, Thursday 19 April 2018

নবম অধ্যায়

দ্বিতীয় আরব-ইজরাইল যুদ্ধ

'you (the Jews) will never be able to live here in peace, because you left here black but came back white. We cannot accept you'!—Gamal Abdel Nasser.

নাসেরের উত্থান

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাজা ফারুকের ব্রিটিশ তোষণ নীতি মিশরের ইসলামিস্ট, সাধারণ জনতা আর জাতীয়তাবাদী আর্মি অফিসারদের তেতিয়ে তোলে। ১৯৪৫ সালে গড়ে তোলা হয় 'ফ্রি অফিসার্স' নামে একটি গোপন আন্দোলন। জামাল আবদেল নাসেরসহ মিশর ও সুদানের কিছু শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তা এই সংগঠনে ভেড়েন। মিশরীয় আর্মি অফিসার আর ইসলামপন্থিদের ক্ষোভ আরও বাড়ে প্রথম আরব-ইজরাইল যুদ্ধের পর। ওই যুদ্ধে ইজরাইলের কাছে হেরে গণবিস্ফোরণের মুখে পড়েন আরব শাসকরা। মিশরে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে রাজা ফারুকের শাসন। ঠিক এই সময়ে শাসক ছাপিয়ে সামরিক কর্তাব্যক্তিদের প্রতি দুর্বলতা বাড়ে মিশরীয়দের। জামাল আবদেল নাসের হচ্ছেন এমনই একজন সেনা কর্মকর্তা, যিনি জনপ্রিয়তার পাল্লায় অন্য সবাইকে ছাড়িয়ে যান। ইহুদিদের কাছে আরবদের পরাজয় মানতে পারেননি সেনাবাহিনীর এই কর্নেল। তার সব ক্ষোভ গিয়ে পড়ে মিশর রাজের ওপর।

১৯৫২ সালে ফারুককে উৎখাত করে মিশরের শাসনভার হস্তগত করেন নাসের অনুগত ফ্রি অফিসার্সের সদস্যরা। এই অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেন মিশরের সেনাবাহিনীর অধিনায়ক মোহাম্মদ নাগিব।[৬১] অভ্যুত্থান ছিল মোটামুটি রক্তপাতহীন। নাগিব অভ্যুত্থানে মূল ভূমিকা পালন করলেও দ্রুতই ক্ষমতার কেন্দ্রে চলে আসেন নাসের।[৬২] '৫২-এর অভ্যুত্থানে সমর্থন ও সহযোগিতা ছিল মুসলিম ব্রাদারহুডের। বিপ্লবের মাত্র তিন বছর আগে রাজা ফারুকের গোপন বাহিনীর হাতে গুপ্তহত্যার শিকার হয়েছিলেন ব্রাদারহুড নেতা হাসান আল বান্না।

---

[৬১]. মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি, তারেক শামসুর রেহমান। পৃষ্ঠা-১০৮ থেকে ১১০।

[৬২]. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস, ডক্টর প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা-২৫৪, ১৯৯৪ কোলকাতা।

কিন্তু বছর ঘুরতেই এ সম্পর্ক টেকেনি। নিষিদ্ধ করা হয় মুসলিম ব্রাদারহুডের কার্যক্রম। ব্রাদারহুড কানেকশনের অভিযোগে ৫৪ সালে নাগিবকে সরিয়ে চূড়ান্তভাবে মিশরের ক্ষমতায় চলে আসেন জনপ্রিয়তার দৌড়ে এগিয়ে থাকা নাসের। এই সময়টাতে ইজরাইলের সাথেও সম্পর্ক আরও তিক্ত হচ্ছিল আরবদের। '৫৪ সালের দিকে ফ্রান্স ইজরাইলকে উন্নত যুদ্ধবিমান সরবরাহের সিদ্ধান্ত নেয়। ইজরাইলকে অস্ত্র দিতে রাজি হয় যুক্তরাষ্ট্র; এমনকী যুক্তরাজ্যও।

নাসের চেয়েছিলেন তার দেশ থেকে ব্রিটিশদের তাড়াতে। এ কারণেই বড়ো একটি পরাশক্তির সমর্থন দরকার ছিল। শুরুতে যুক্তরাষ্ট্রকেই বন্ধু বানাতে চাইলেন তিনি। কিন্তু মিশরের রাজনৈতিক ও ভৌগলিক গুরুত্বকে হালকাভাবে দেখে মার্কিনিরা। তারা নাসেরের ওপর ভরসা করতে পারেনি, তাই তাকে নজর দিতে হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে। হাত বাড়িয়ে বললেন– 'বন্ধু হও।' সোভিয়েত নেতারা প্রস্তাবটি লুফে নিলেন এ কারণে যে, পাশ্চাত্যের প্রভাব ঠেকাতে বন্ধু খুঁজছিলেন তারাও। রুশ কমিউনিস্ট শাসকদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র-সহায়তা আসে জামাল আবদেল নাসেরের কাছে।

'৫৪-এর দিকে আলজেরিয়ার মুসলমানরা ফরাসি ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে। আলজেরীয়দের পক্ষে এগিয়ে আসেন নাসের, বিদ্রোহীদের ভান্ডারে যোগ হয় মিশরীয় অস্ত্রশস্ত্র। উত্তাল আন্দোলনের মুখে পরবর্তী সময়ে ১৯৫৬ সালের মার্চে মরক্কো ও তিউনিশিয়াকে স্বাধীনতার স্বীকৃতি দেয় ফ্রান্স। তার এক বছর আগে ১৯৫৫ সালের সেপ্টেম্বরের দিকে নাসের ঘোষণা দেন– 'পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক শিবিরের দেশ চেকোশ্লোভাকিয়া মিশরকে অস্ত্র দিতে রাজি হয়েছে।' চেক সরকারের সঙ্গে চুক্তির ফলে মিশর ৮০টি মিগ বিমান, ৮৫টি ইলিউসিন বোমারু বিমান ও ১১৫টি ভারী ট্যাংক পায়। এবার হুঁশ ফেরে আমেরিকার। তারা নাসেরের সাথে যোগাযোগ শুরু করে। প্রস্তাব দেওয়া হয় নীলনদে আসওয়ান বাঁধ নির্মাণে অর্থায়ন করার। নাসের প্রস্তাবে রাজি হন। কারণ, তিনিও বিদেশি ঋণ খুঁজছিলেন। মিশর সরকার হিসাব কষে দেখল, আসওয়ান নির্মিত হলে ৮৬ হাজার হেক্টর জমি চাষাবাদের উপযোগী করা যাবে। এই প্রকল্পে ব্যয় নির্ধারণ করা হয় ১৪০০ মিলিয়ন ডলার। যুক্তরাষ্ট্র আর যুক্তরাজ্য যৌথভাবে ৭০ মিলিয়ন ডলার ঋণ দিতে রাজি হয়।

কিন্তু নাসের হতাশ হলেন, যখন তিনি সম্ভাব্য চুক্তির খসড়া দলিলটি হাতে পেলেন। বাঁধ নির্মাণের বিনিময়ে বাড়তি কিছু সুবিধা চাইল যুক্তরাষ্ট্র। তারা মিশরে একটি সামরিক ঘাঁটি বানাতে চাইল, সাথে চাইল কিছু অর্থনৈতিক সুবিধাও। নাসের যুক্তরাষ্ট্রের এমন অভিলাষকে দেখলেন সাম্রাজ্যবাদী চিন্তা-ভাবনা হিসেবে। চুক্তিটি আর সই হলো না। কারণ, নাসেরও শর্ত মানলেন না, যুক্তরাষ্ট্রও অর্থায়ন করতে চাইল না। ১৯৫৬ সালের ২০ জুলাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারিভাবে জানিয়ে দেয়, তারা আসওয়ান বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পে ঋণদানের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নিয়েছে। এই সিদ্ধান্তের মাত্র পাঁচদিন পর ২৬ শে জুলাই সুয়েজখাল জাতীয়করণের ঘোষণা দেয় মিশর।

কারা নিয়ন্ত্রণ করত সুয়েজখাল

সুয়েজখাল খনন শুরু হয় ১৮৫৯ সালে। দশ বছর ধরে চলে এই কর্মযজ্ঞ। এরপর ১৮৭৫ (কারও কারও মতে ১৮৮২) সাল থেকে খালটির নিয়ন্ত্রণ ছিল ব্রিটিশদের হাতে।[৬৩] একসময় সুয়েজখালের নিয়ন্ত্রণ যায় ফ্রান্স ও ব্রিটেনের একটি যৌথ কোম্পানির হাতে, যেখান থেকে বছরে আয় হতো ৯০ মিলিয়ন ডলার। এই আয় থেকে মিশর পেত মাত্র ৬ দশমিক তিন মিলিয়ন ডলার। বিংশ শতাব্দির ষাটের দশকে মিশরের প্রেসিডেন্ট নাসের ভাবলেন পুরো অর্থ পেলে আসওয়ান বাঁধ নির্মাণে বিদেশিদের কাছে ধরনা দিতে হবে না তার দেশকে। এই চিন্তা থেকেই নাসের সুয়েজখাল জাতীয়করণের উদ্যোগ নেন।

নাসের সুয়েজখাল এলাকায় সামরিক আইন জারি করেন এবং সুয়েজ কেনাল কোম্পানি (অ্যাংলো-ফ্রান্স কোম্পানি) থেকে খালটির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেন। একইসঙ্গে ঘোষণা দেন– যেসব জাহাজ এই খাল দিয়ে যাবে, এগুলোকে পাঁচ বছরের মধ্যে আসওয়ান বাঁধ নির্মাণের খরচ বহন করতে হবে। সুয়েজখাল থেকে ব্রিটিশ সেনা উপস্থিতি প্রত্যাহারে কয়েক বছর ধরেই চাপ দিয়ে আসছিল মিশরের সেনাবাহিনী।

ব্রিটেন ও ফ্রান্সের আগে থেকেই আশঙ্কা ছিল, নাসের সুয়েজখাল দখলে নিতে পারেন এবং পারস্য উপসাগর থেকে পশ্চিম ইউরোপ অভিমুখে তেল সরবরাহ বন্ধ করে দিতে পারেন। নাসের যখন আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিলেন, তখন ন্যাটোভুক্ত দেশগুলো বিশেষ করে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ বিপন্ন হয়ে উঠল। কারণ, সেই আমলে প্রতিবছর যে সমস্ত জাহাজ সুয়েজখাল দিয়ে যেত, তার তিন-চতুর্থাংশ ছিল ন্যাটো জোটের অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহের। দেশ হিসেবে এই খাল দিয়ে চলা বেশিরভাগ জাহাজের মালিক ছিল ব্রিটেন। আলোচনা করে সমস্যা সমাধান করতে চাইল ইঙ্গো-ফরাসিরা। কিন্তু ন্যূনতম ছাড় দিচ্ছিল না নাসের। তাই দুই ঔপনিবেশিক শক্তি মিশরে গোপন আক্রমণের প্রস্তুতি নিল; প্রয়োজনে নাসেরকে ক্ষমতাচ্যুত করারও পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হলো। এই পরিকল্পনায় যুক্ত হলো মিশরের ওপর আগে থেকে নানা কারণে ক্ষিপ্ত থাকা ইজরাইল। কেননা, লোহিত সাগরে ইজরাইলের প্রবেশ ঠেকাতে আকাবা উপসাগর অবরোধ করেছিল মিশর।

ইজরাইল, ফ্রান্স ও ব্রিটেনের যুদ্ধ পরিকল্পনা

১৯৫৬ সালের আগস্টে ব্রিটেন ও ফ্রান্স-এর সামরিক ইউনিটগুলো মাল্টা ও সাইপ্রাসে জড়ো হতে থাকে। এই বছরে ছিল ৫০ হাজার ব্রিটিশ ও ৩০ হাজার ফরাসি সেনা, সাথে কয়েকশো বিমান ও শতাধিক জাহাজ।

---

[৬৩]. Why is the Suez Canal a big deal? Explained in 60 secs -BBC News, Aug 6, 2015..

পরিকল্পনা ছিল ইজরাইল সুয়েজখাল অবরোধ করবে। তারপর ফ্রান্স ও ব্রিটেন নতুন মোতায়েন হওয়া ইজরাইলি এবং আগে থেকে সেখানে থাকা মিশরীয় সেনা সদস্যদের প্রত্যাহার করতে বলবে। মিশর সেনা প্রত্যাহারের আহ্বান অগ্রাহ্য করলে তারা শক্তি প্রয়োগ করে মিশরীয় সেনাদের সরিয়ে দেবে।

২৯ অক্টোবর ইজরাইলি আর্মির ১০টি ব্রিগেড গাজা ও মিশরের সিনাই আক্রমণ করে এবং পরদিন মিশরীয় সেনাদের হটিয়ে সুয়েজ খালের দিকে এগোতে থাকে, তবে ইঙ্গো-ফরাসি বাহিনী আক্রমণে একটু দেরি করে ফেলে। ৫ ও ৬ ই নভেম্বর ব্রিটিশ ও ফরাসি বাহিনী পোর্ট সৈয়দ এবং পোর্ট ফুয়াদে অবতরণ করে এবং সুয়েজখাল এলাকা দখল করে নেয়। চটে যান সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ক্রুশ্চেভ নিকিতা। ইজরাইলসহ তিন দেশের বাহিনী মিশর না ছাড়লে তিনি পশ্চিম ইউরোপ অভিমুখে পরমাণু মিসাইল মোতায়েনের হুমকি দেন। এ সময় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ছিলেন আইসেনহাওয়ার। আইসেন হাওয়ার নড়েচড়ে বসলেন। কারণ, ভয় তার ওখানে যদি ইউরোপীয়দের একটি ভুলের কারণে পুরো মধ্যপ্রাচ্য সোভিয়েত ইউনিয়নের একক নিয়ন্ত্রণে চলে যায়! এ ছাড়া, নভেম্বরে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের কথা ছিল। তাই কোনো ঝুঁকি নিতে চাচ্ছিলেন না মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

রাশিয়াকে সরাসরি হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকতে বললেন আইজেনহাওয়ার। যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা দিলো– বিদেশি বাহিনীকে মিশর ছাড়তে হবে। আক্রমণকারী তিন দেশের ওপর অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপেরও হুমকি দিয়েছিলেন আইসেন হাওয়ার। তিনি জাতিসংঘে একটি রেজুলেশন (প্রস্তাব) আনেন হামলার নিন্দা জানিয়ে। নভেম্বরের দুই তারিখে এটি পাশ হয়, কিন্তু এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেই ৫ নভেম্বর ফরাসি ও ব্রিটিশ প্যারাসুট বাহিনী মিশরের ওপর হামলে পড়ে। তবে দেশটিতে যুদ্ধের বিরুদ্ধে তীব্র জনমত তৈরি হওয়া আর রাশিয়ার হুমকিতে সাত নভেম্বর হঠাৎ করে যুদ্ধবিরতি মেনে নেয় ব্রিটেন। ফলে সাত তারিখ ছিল তাদের জন্য বিব্রতকর একটি দিন। ফ্রান্স আর ব্রিটেন নাসেরকে সরাবে দূরের কথা; সুয়েজখাল দখল এবং এর উভয় তীর থেকে দশ মাইলব্যাপী লম্বা বাজারজোন প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়। এর ব্যর্ততার সুযোগে ব্রিটেনের বদলে যুক্তরাষ্ট্র আরবে পাখা মেলতে থাকে।

সুয়েজখাল মিশরকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। ২২ ডিসেম্বর জাতিসংঘের নির্দেশনায় সরে যায় ফ্রান্স ও ব্রিটেনের বাহিনী; যদিও ইজরাইলি বাহিনী মিশর ছাড়ে পরের বছরের মার্চে।

যুদ্ধের ফলাফল

জামাল আবদেল নাসেরকে বিপুল জনপ্রিয়তা এনে দেয় সুয়েজ যুদ্ধ। পুরো আরব দুনিয়াতে তিনি পরিণত হন জাতীয়তাবাদীদের আইকনে। ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা কাজে লাগিয়ে ১৯৫৮ সালে সিরিয়াকে নিয়ে একটি বৃহৎ ফেডারেশন গড়তে চাইলেন নাসের,

ইংরেজিতে যার নাম দেওয়া হয়েছিল 'ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক।' ১৯৫৮ সালের পহেলা ফেব্রুয়ারি এই রিপাবলিকের ঘোষণা দেওয়া হয়, কিন্তু সাড়ে তিন বছর পর সিরিয়া তাতে নারাজি জানায়। ১৯৬১ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর আলাদা হয়ে যায় সিরিয়া।

ইঙ্গো-জর্ডান চুক্তি বাতিল করে মিশরের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে জর্ডান। মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের প্রভাব দুর্বল হয়ে পড়ে। দীর্ঘদিন ধরে সুয়েজ খালের ওপর তাদের যে একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ ছিল, তা ক্ষুণ্ন হয়। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী রবার্ট অ্যান্থনি ইডেনের জন্য ছিল এ এক তিক্ত অভিজ্ঞতা। তার রাজনৈতিক ক্যারিয়ার শেষ করে দেয় সুয়েজ যুদ্ধ।[৬৪] পরের বছরের ৯ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রিত্ব ছেড়ে দেন রবার্ট অ্যান্থনি। অনেকে সুয়েজ যুদ্ধে ইঙ্গো-ফরাসি বিপর্যয়কে দেখে থাকেন দ্বিতীয় দিয়েন-বিয়েন ফু হিসেবে।

১৯৫৪ সালে প্রথম ইন্দো-চীন যুদ্ধে (১৯৪৬-৫৪) ভিয়েতনামের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় এলাকা দিয়েন-বিয়েন ফুতে মার্কিন সহায়তা সত্ত্বেও ভিয়েতনামী গেরিলা যোদ্ধাদের কাছে হেরে যায় ফরাসি সেনারা। হো চি মিনের সহচর জেনারেল ভো নগুয়েন গিয়াপ দিয়েন বিয়েন ফু যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এর মধ্য দিয়ে ওই অঞ্চল থেকে পাততাড়ি গোটাতে বাধ্য হয় ফ্রান্স। ভিয়েতনাম স্বাধীন হয় দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে কমিউনিস্ট শাসিত উত্তর ভিয়েতনাম, আর মার্কিন সমর্থনপুষ্ট দক্ষিণ ভিয়েতনাম।

এ ছাড়া, সুয়েজ যুদ্ধের পর বড়ো ধরনের আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছিল ব্রিটেন। ১৯৫৬ সালের শেষ তিন মাসে ব্রিটেনের অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪শ মিলিয়ন ডলার। তবে, সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য টার্নিং পয়েন্ট হয়ে দাঁড়ায় এই যুদ্ধ। বলা যায়- যুদ্ধের বড়ো বেনিফিশিয়ারি তারাই। যুদ্ধের কারণে সারা বিশ্বের নজর যখন মধ্যপ্রাচ্যে, তখন হাঙ্গেরির বিদ্রোহ দমন করে ফেলে সোভিয়েত ইউনিয়ন। আরবদের পাশ্চাত্য বিরোধিতা কাজে লাগিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে প্রভাব বাড়াতে উঠেপড়ে লাগে দেশটি। প্রতিশ্রুতি দেয় আসওয়ান বাঁধ নির্মাণে অর্থ সহায়তা দেওয়ার। সোভিয়েত ইউনিয়নের তৎপরতা দেখে যুক্তরাষ্ট্রও এই অঞ্চলে আরও বেশি সক্রিয় হওয়ার দৌড়ে অবতীর্ণ হয়।

১৯৫৭ সালের ৫ জানুয়ারি মার্কিন কংগ্রেসে প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে একটি ঘোষণা দেন, যা আইজেনহাওয়ার ডকট্রিন নামে খ্যাত। এতে বলা হয়, আন্তর্জাতিক সাম্যবাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কোনো রাষ্ট্রের সশস্ত্র আক্রমণের বিরুদ্ধে কোনো দেশ সাহায্যের আবেদন করলে, সেই দেশের নিরাপত্তার জন্য সেনাবাহিনী নিয়োজিত করবে তার দেশ। চাঙা হলো স্নায়ুযুদ্ধের আমেজ। ইজরাইল স্বাধীনভাবে খালটি ব্যবহারের সুযোগ হয়তো পায়নি, কিন্তু তিরান মোহনা থেকে মিশরীয় অবরোধ উঠে গেলে স্বাভাবিক হয় ইজরাইলি জাহাজ চলাচল।

---

[৬৪]. The Other Side of Suez (BBC Documentary)

দশম অধ্যায়

তৃতীয় আরব-ইজরাইল যুদ্ধ

'ইহুদিদের আবাসভূমি দেওয়ার জন্য আপনাদের (ইউরোপীয়) যখন এতই উদ্‌বেগ, তাহলে আপনাদের ভূমি দিন। দয়া করে আমাদের ভূমি দিতে বলবেন না। শত শত বছর ধরে আমরা এখানে বাস করে আসছি। আপনাদের ঋণ পরিশোধের জন্য আমরা এই ভূমি দেবো না।'—ইয়াসির আরাফাত

ফাতাহ

প্রথম আরব-ইজরাইল যুদ্ধে যেসব আরব মাতৃভূমি হারিয়েছেন, তাদেরই একজন খলিল আল ওয়াজির। তিনি সপরিবারে বসবাস করতেন তেলআবিবের দক্ষিণ-পূর্বের শহর রামলাতে। ইহুদি মিলিশিয়ারা তাড়িয়ে দিলে খলিলরা আশ্রয় নেন গাজার এক শরণার্থী শিবিরে। অন্য যে সকল আরব, ইহুদি আগ্রাসনকে সশস্ত্রভাবে ঠেকাতে চেয়েছেন, তাদের দলে ভেড়েন তিনি। চাচ্ছিলেন তাড়া খাওয়ার প্রতিশোধ নিতে। মাত্র ১৬ বছর বয়সে এক আরব মিলিশিয়া গ্রুপের নেতৃত্বে বসেন খলিল। এর দুই বছর পর দুই শতাধিক তরুণ স্বাধীনতাকামী তার কমান্ডের আওতায় আসে। ১৯৫৪-৫৫-এর দিকে খলিলের শিষ্যরা ইজরাইলের ভেতরে আঘাত হানতে শুরু করে। মিশরীয়রা এদের ব্যবহার করত ইজরাইলের বিরুদ্ধে দাবার গুটি হিসেবে। খলিলের অনুসারীদের/সহযোগীদের একজন মোহাম্মদ ইয়াসির আবদেল রহমান আব্দুল রউফ আরাফাত আল কুদওয়া আল হোসাইনি। তিনি পড়াশোনা করেছেন কায়রো ইউনিভার্সিটিতে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে। পরবর্তী সময়ে সারা বিশ্ব তাকে চিনতে পারে ইয়াসির আরাফাত নামে। আরাফাত পরিচিত ছিলেন আবু আম্মার নামে। আর আল ওয়াজির নিয়েছিলেন আবু জিহাদ নাম।[৬৫]

---

[৬৫]. Rise and Kill First: The Secret History of Israel's Targeted Assassinations, Ronen Bergman, page-106, 107.

১৯৫৮ সালে ইয়াসির আরাফাত, খলিল আল ওয়াজিরসহ কয়েকজনের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ফাতাহ মুভমেন্ট'। এই নাম খলিল আল ওয়াজিরের দেওয়া, যার অর্থ 'গৌরবজনক বিজয়'। আরাফাত আর খলিল ছাড়া অন্যসহ প্রতিষ্ঠাতারা হলেন- সালাহ খালাফ, খালেদ আল হাসান, আদিল আবদেল করিম, মুহাম্মদ ইউসুফ আল নজর, খালিদ আল আমিরা ও আবদেল ফাতাহ। ইজরাইলকে হারিয়ে প্যালেস্টাইন ভূখণ্ডে আবার ফিলিস্তিনি পতাকা উড়ানোই ছিল ফাতাহর লক্ষ্য। তবে এই সংগঠনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসে ১৯৫৯ সালের ১০ অক্টোবর। এরপর থেকেই ইজরাইলি গোয়েন্দা সংস্থা 'মোসাদ' আর 'আমানের' চোখ খুঁজে বেড়াতে থাকে আরাফাত আর ওয়াজিরকে।

১৯৬৫ সালের তেসরা জানুয়ারি ইজরাইলের বিরুদ্ধে প্রথম অপারেশনে যায় 'ফাতাহ'। তারা ইজরাইলের গ্যালিলি এলাকায় পানি সরবরাহ লাইনে বোমা পুঁতে রাখে। এটি ছিল ইজরাইলের জাতীয় পানি সরবরাহ লাইন। এর মাধ্যমে গ্যালিলি সাগর থেকে পানি নিয়ে আসা হতো দক্ষিণের খরাপ্রবণ এলাকাগুলোতে কৃষি কাজের উদ্দেশ্যে। আরবরা বিশেষ করে সিরিয়া এই পানি সরবরাহ লাইন নিয়ে ক্ষুব্ধ ছিল, কিন্তু তারা ইজরাইলকে নিবৃত্ত করতে পারেনি।

পানি সরবরাহ লাইনে আঘাত হানার চিন্তাটি আসে খলিল আল ওয়াজির ওরফে আবু জিহাদের মাথা থেকে, কিন্তু অপারেশনটি সফল হয়নি। ইজরাইল তা আগেই টের পেয়ে যায়। ফাতাহর এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সপ্তাহখানেক আগে গাজা থেকে একটা গ্রুপ আটক হয়। তার কিছুদিন পর লেবানন থেকে আটক হয় আরেকটা গ্রুপ। আর তৃতীয় গ্রুপটা আটক হয় ঘটনার দিন। তিন নম্বর গ্রুপটাই সরবরাহ লাইনে বোমা পুঁতে রাখার অপারেশনে অংশ নিয়েছিল; যদিও ইজরাইল তা নিষ্ক্রিয় করে ফেলতে সক্ষম হয়। অপারেশন শেষে ফিরে আসার সময় জর্ডানি বাহিনীর হাতে আটক হন ফাতাহর কমান্ডোরা।

একই বছরের প্রথম তিন মাসে ইহুদিদের বিরুদ্ধে আরও কয়েকটি হামলার চেষ্টা করে ফাতাহ। তবে বেশিরভাগই ব্যর্থ হয়। ফাতাহ-এর এক বন্দুকধারী ইজরাইলি বাহিনীর হাতে আটকও হয়। ১৯৬৬ সালের মে ও অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে ইজরাইলের বিরুদ্ধে অন্তত ১৫টি অপারেশন পরিচালনা করে ফাতাহ। এগুলোর বেশিরভাগই করা হয় জর্ডানের ভূখণ্ড ব্যবহার করে। জবাবে ইউক্রেনীয় বংশোদ্ভূত ইজরাইলি প্রধানমন্ত্রী লেভি এশকল ফিলিস্তিনি গেরিলাদের বিরুদ্ধে অভিযানের নির্দেশ দেন।

ওই বছরের ১৩ই নভেম্বর পশ্চিম তীরের সামু গ্রামে অভিযান চালায় ইজরাইল, তাতে সত্তরজনেরও বেশি মানুষ মারা যায়। এই হামলা ফাতাহর প্রতি সহানুভূতির জন্ম দেয়। বছরের শেষে ফাতাহ দাবি করে, তারা ইজরাইলের বিরুদ্ধে অন্তত ৪১টি হামলা চালিয়েছে।

১৯৬৭ সালের প্রথম ছয় মাসে আক্রমণ বেড়ে হয় দ্বিগুণ। এ সময় ৩৭টি হামলার নির্দেশনা দেওয়া হয় ফাতাহর পক্ষ থেকে। সে বছরই মিশর সরকার ঘোষণা দেয়, তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা লোহিত সাগরে কোনো ইজরাইলি জাহাজ চলাচল করতে পারবে না। শুরু হয় তৃতীয় আরব-ইজরাইল যুদ্ধ। ইজরাইলই প্রথম আক্রমণ চালিয়ে যুদ্ধের সূচনা করে।

তৃতীয় আরব-ইজরাইল যুদ্ধ

৫ জুন, ১৯৬৭। সোমবার, সকাল সাতটা। ইজরাইলের আকাশে একঝাঁক যুদ্ধবিমান। এগুলো দ্রুতই সমুদ্র বরাবর উড়ে যায়, তারপর পানির স্তরের সামান্য ওপর দিয়ে এগোতে থাকে মিশরের দিকে। বিমানগুলো খুব নিচ দিয়ে উড়ছিল। কারণ, ইহুদি বায়ুসেনারা চাচ্ছিলেন আরবদের স্থাপন করা রাডারের চোখ ফাঁকি দিতে। কিন্তু জর্ডানের আজলুনের পাহাড় চূড়ায় বসানো রাডারের নজর এড়াতে পারেনি জেট বিমানের এই বহর। ব্রিটিশ নির্মিত অত্যাধুনিক এই রাডার স্থাপন করা হয়েছিল জর্ডানের রাজধানী আম্মান থেকে ৫০ মাইল উত্তরে। জায়গাটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১২০০ মিটারের মতো উঁচু।

ইজরাইলি বিমান উড়ে যাওয়ার তথ্য পাঠানো হয় মিশরের সেন্ট্রাল জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে। কিন্তু সেই তথ্য গৃহীত হয়নি। কারণ, মাত্র একদিন আগে তথ্য কনভার্টের গোপন কোড পরিবর্তন করেছিল মিশরের মিলিটারি কমান্ড। মিশর ও জর্ডানের বাহিনী একই কমান্ডের অধীনে যুদ্ধে অংশ নেওয়ার কথা থাকলেও গোপন কোড পরিবর্তনের খবর জানানো হয়নি জর্ডানকে। ফলে জর্ডান থেকে পাঠানো জরুরি তথ্যটি মিশরের কাছে পৌঁছাল না, মিশরও সতর্ক হতে পারল না। এর প্রায় পৌনে দুই ঘণ্টা পর জর্ডানের বাদশাহ হোসেন বিন তালালের কাছে খবর এলো– মিশর আক্রান্ত হয়েছে!

অবশ্য খুব শিগগিরই আজলুনের রাডার প্রতিরক্ষাব্যবস্থা রিপোর্ট করল– 'সিনাইয়ের দিক থেকে এক ঝাঁক বিমান উড়ে আসছে।' জেনারেল হেডকোয়ার্টাস থেকে বাদশাহ হোসেনকে জানানো হয় ইজরাইল ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়েছে এবং মিশরের বিমানবাহিনী বড়ো ধরনের পালটা আঘাত হেনেছে– এই খবর শুনে হোসেন এবার তার দেশের বাহিনীকে ইজরাইল আক্রমণের নির্দেশ দিয়ে দেন। সাড়ে ৯টার দিকে, রেডিওতে জর্ডানের বাদশাহর জরুরি বার্তা প্রচার করা হয়– 'জর্ডান আক্রান্ত হয়েছে এবং প্রতিশোধ নেওয়ার সময় এসে গেছে।'

পৌনে দশটার দিকে জর্ডানের গোলন্দাজ বাহিনী পশ্চিম জেরুজালেম বরাবর কামানের গোলা ছুড়তে শুরু করে। ইজরাইল প্রথমে পালটা আক্রমণে যায়নি। তারা ভেবেছিল– আরবদের প্রতি ঐক্য দেখাতে গিয়ে জর্ডান হয়তো লোক দেখানো কিছু শেল ইজরাইলের দিকে ছুড়ছে। কিন্তু গোলন্দাজ আক্রমণ তীব্র হলে ইজরাইলের ভুল ভাঙে। ১১টার দিকে সীমান্তের ইজরাইলি অবস্থানগুলোতে বোমাবর্ষণ শুরু করে জর্ডানের যুদ্ধবিমানগুলো।

ভূমিতে স্থাপন করা দূরপাল্লার ১৫৫ মিলিমিটার হাউটজার থেকেও ইজরাইলের ভেতরের বিভিন্ন টার্গেটে গোলা ছোড়া হচ্ছিল। এর আগে মিশর-জর্ডানের হিত্তিন ইনফ্যান্টি ব্রিগেড জেরুজালেমের একটি বেসামরিক এলাকা নিয়ন্ত্রণে নেয়। এখানে একসময় প্যালেস্টাইনে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনারের বাসভবন ছিল। তারা একাধিক ইজরাইলি সরকারি ভবনও দখল করে নেয়। এবার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নারকিসের নির্দেশে পালটা হামলায় যায় ইজরাইলের গোলন্দাজ ও পদাতিক বাহিনী। জর্ডান বাহিনীর কাছ থেকে কিছু এলাকা পুনরুদ্ধারে সক্ষম হয় ইহুদি সেনারা।

জেরুজালেম রক্ষার লড়াই

৫ জুন। দুপুর ১২ টা বাজার আরও দশমিনিট বাকি। জর্ডান বিমান বাহিনীর ১১টি হকার হান্টার ইজরাইলের নেতানিয়া এলাকা ঘিরে সিরিজ হামলা চালাতে থাকে। দ্রুতই ইরাক ও সিরিয়ার বিমানগুলো কিবুজ দেগানিয়া এলাকা কাঁপিয়ে দেয়। ইজরাইলের প্রধানমন্ত্রী লেভি এশকল ও বিমান বাহিনীর কমান্ডার মেজর জেনারেল মরদেচাই হোডের বাসভবন এখানেই। হামলায় ইজরাইলের খুব একটা ক্ষতি হয়নি সত্য, কিন্তু তাতে মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব পড়ে বেশ। এর দ্বারা পরিষ্কার হয়ে যায় ইজরাইলের সঙ্গে জর্ডানের যুদ্ধ! এটা ধারণারও অতীত ছিল। কারণ, জর্ডানের সাথে বিভিন্ন সময়ে ইজরাইলের ছিল গোপন যোগাযোগ।

ইজরাইলি প্রতিরক্ষা বাহিনী পশ্চিম তীর ও জেরুজালেমে হামলার নির্দেশ দেয়। অন্যদিকে, ব্রিগেডিয়ার হোড ইরাক, জর্ডান ও সিরিয়ার বিমান ঘাঁটিতে হামলার নির্দেশনা জারি করেন। সাড়ে ১২টা থেকে হামলায় যায় ইজরাইলি বিমানবাহিনী। দুপুর ১টা ১০ মিনিটের দিকে আরেক দফা হামলায় জর্ডানের বিমানবাহিনী বিধ্বস্ত হয়। এমনকী ইজরাইলি বাহিনীর কামান ও রকেট জর্ডানের বাদশাহ হোসেনের রাজকীয় প্রাসাদ 'বাসমানে'র উদ্দেশ্যে ছুটে যায়। সৌভাগ্যবশত বাদশাহ প্রাসাদে ছিলেন না। ইজরাইল বারবার যুদ্ধের কৌশল পরিবর্তন করতে লাগল। তাদের সেনারা যেকোনো মূল্যে জেরুজালেম থেকে আরব সেনাদের তাড়াতে চাইল। তরুণ ইজরাইলি এয়ারফোর্স কর্মকর্তা কর্নেল গার তার সহযোদ্ধাদের বললেন−

'We will free Jerusalem!'

গারের নেতৃত্বাধীন প্যারাট্রুপার বাহিনীর শহুরে এলাকায় যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ছিল না। তাদের হাতে না ছিল পর্যাপ্ত ম্যাপ, না ছিল শহরের বিবরণসংবলিত দরকারি ফটোগ্রাফ। তাই প্যারাট্রুপারদের ব্যাকআপে ছিল আরেকটি পদাতিক ইউনিট।

জর্ডান শক্তিশালী প্রতিরক্ষাব্যূহ প্রস্তুত করে রেখেছিল। তাদের বাংকারগুলো ঘিরে বসানো হয়েছিল সারি সারি মাইন। সীমান্তে যাদের মোতায়েন করা হয়েছিল,

তাদের মধ্যে দুর্ধর্ষ তৃতীয় তালাল ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেডের সেনারাও ছিল। রণাঙ্গনের এই অংশে জর্ডানের সেনাদের নেতৃত্ব দেন মেজর মানসুর ক্রাসনুর। অন্যদিকে, ইজরাইলের পক্ষে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন মেজর (পরবর্তী সময়ে কর্নেল) মোত্তা গার।

রাত আটটায় ইজরাইলি আক্রমণ শুরু হয় গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায়। ৯০ মিনিটেই ৩৪টি জর্ডানিজ বাংকার ও মেশিনগান পয়েন্ট ধসিয়ে দেয় ইহুদি প্যারাট্রুপাররা। পরদিন ভোরে জেরুজালেমের অ্যামুনিশন হিলে থাকা বাকি তিনটি জর্ডানি বাংকার খুব কাছ থেকে আক্রমণ করে ধসিয়ে দেওয়ার জন্য ইজরাইলের শ্যার্মন ট্যাংকগুলো এগিয়ে যায়। অ্যামুনিশন হিলের যুদ্ধে ১০৬ জর্ডানি সেনা নিহত এবং আরও অনেকে আহত হয়। যুদ্ধে অংশ নেওয়া পাঁচশো ইজরাইলি প্যারাট্রুপারের মধ্যে ৩৭ জন নিহত ও দেড় শতাধিক আহত হয়। প্যারাট্রুপারদের অন্য দুটি ব্যাটালিয়ন রাতভর লড়ে পুরাতন জেরুজালেম শহরের দেয়ালের কাছেই রকফেলার মিউজিয়াম দখল করে নেয়। এরপর তারা শেখ জারাহ শহর অভিমুখে এগোতে থাকে। ইজরাইলিরা জারা হয়ে অ্যাম্বাসেডর হোটেলের দিকে যায় ৬ জুন সকাল দশটা নাগাদ।

এদিকে জর্ডানের বাদশাহ তখন মহা টেনশনে। জেনারেল রিয়াদ চাচ্ছিলেন যুদ্ধবিরতি হোক। তিনি বাদশাহর কানে ঢোকালেন– অন্যথায় হোসেনের সিংহাসন ও দেশ ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যেতে পারে। এই সময়টাতে পরিষ্কার হয়ে যায়– ইরাক, সিরিয়া ও সৌদির বাহিনী ইজরাইলের বিপক্ষে জর্ডানকে সহায়তা দেবে না। পশ্চিম তীর থেকেও দুঃসংবাদ আসছিল, তবুও যুদ্ধে অটল থাকলেন বাদশাহ হোসেন। মিশরের নাসেরের সাথে টেলিফোনে পরামর্শ চাইলেন।

তাদের দুজনের কথোপকথন–৬৬

নাসের 'আমরা আক্রমনাত্মকভাবে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি। রাতভর আমাদের সৈন্যরা সবকয়টি ফ্রন্টে লড়াই করেছে। এখনও লড়ছে বীরদর্পে।

হোসেন বিড়বিড় করে কিছু বলছে, কিন্তু কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না।

নাসের হোসেনের কথার দিকে খেয়াল না দিয়ে আবার বলা শুরু করল– 'শুরুর দিকে কোনো ভুল বোঝাবুঝি হয়ে থাকলে মনে কিছু নেবেন না। আমরা নিশ্চয় যুদ্ধে অনেক ভালো করব। মহান আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। যুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিনরা জড়িয়ে পড়া নিয়ে যদি একটা বিবৃতি দিতেন...'

হোসেন এখনও বিড়বিড় করে চলেছে...

---

৬৬. The Six Day War 1967: Jordan and Syria, Simon Dunstan.page-58

জবাব না পেয়ে নাসের আবারও বলে চলল– 'আমার কাছে মনে হচ্ছে– আমরা বরং বিষয়টি নিয়ে বিবৃতি দিই। আমি এবং আপনি আলাদাভাবে দুটি বিবৃতি ইস্যু করি। সেইসঙ্গে সিরিয়ান সরকারকেও বিবৃতি দিতে অনুরোধ করি, ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধ বিমানগুলো আমাদের স্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ড অব্যাহত রেখেছে।'

হোসেন মৃদু কিন্তু স্পষ্ট স্বরে বলল– 'ঠিক আছে।'

নাসের বলল– 'অসংখ্য ধন্যবাদ। অটল থাকুন। মিশরের সরকার ও জনগণ সবসময় আপনাদের পাশে আছে। মিশরের যুদ্ধবিমানগুলো এখন ইজরাইলের বিভিন্ন সামরিক স্থাপনা লক্ষ্য করে হামলা অব্যাহত রেখেছে।'

হোসেন অস্পষ্টভাবে নাসেরের কথায় সম্মতি এবং ধন্যবাদ দিলো। এরপর 'আল্লাহ আপনার কল্যাণ' করুন বলে নাসের ফোন রেখে দিলো।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কায়রো, আম্মান ও দামেস্কের রেডিও স্টেশন থেকে প্রচার করা হলো আমেরিকা ও যুক্তরাজ্য ইজরাইলের পক্ষে যুদ্ধবিমান সহায়তা দিচ্ছে। আমেরিকা ও মিশরের কূটনৈতিক সম্পর্কে টানাপোড়েনের সৃষ্টি হলো। ব্রিটিশরা বলছিল– 'এটা ঢাহা মিথ্যা কথা।' বাদশাহ হোসেন প্রভাবশালী বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের ডেকে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের মাধ্যমে যুদ্ধবিরতির উদ্যোগ নিতে চাপ দিলেন। সাত জুন, ১০ টা ১৫ মিনিটের মধ্যে পুরোনো জেরুজালেম শহরের ওয়েস্টার্ন ওয়াল দখলে চলে যায়।

জেরুজালেম এখন ইজরাইলের হাতে!

যুদ্ধের প্রথম দিনেই বিমান হামলা চালিয়ে মিশরীয় বিমানবাহিনীর প্রায় ৯০ শতাংশ ধ্বংস করে দেয় ইজরাইল। বিমান হামলার ছত্রছায়ায় ইজরাইলি সাঁজোয়া যান ঢুকে পড়ে মিশরীয় ভূখণ্ডে। জবাবে পালটা যুদ্ধের ডাক দেয় আরব দেশগুলো। তারা জেরুজালেমে ইজরাইলি অবস্থান লক্ষ্য করে গোলা ছুড়তে শুরু করে।

৬ জুন ইজরাইলি বাহিনীর অভিযানে গাজার পতন হয়। তখন ওই উপত্যকা মিশরের শাসনে ছিল। ইজরাইলি বাহিনী সিনাই উপদ্বীপের দিকে এগিয়ে যায় এবং জেরুজালেমের আরব অংশে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়। এ অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনার পর জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে একটি অস্ত্রবিরতি প্রস্তাব গ্রহণ করে।

৭ জুন ইজরাইলি সেনাবাহিনী সুয়েজ খালের পূর্ব তীর দখল করে নেয়। ইহুদি নৌ-বাহিনী মিশরের পর্যটন এলাকা শারম আল-শেখে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে, এরপর ইজরাইলি বাহিনী জেরুজালেমের ওল্ড সিটিতে প্রবেশ করে। তারা বেথলেহেম এবং জেরিকো শহরসহ জর্ডান নদীর পশ্চিম তীরের বেশিরভাগ এলাকা দখল করে নেয়।

৮ জুন ইজরাইলি সেনারা সুয়েজ খালের তীরে পৌঁছায়। এটা ছিল সিনাই দখলের লড়াই অবসানের সংকেত। তখন মিশরীয় বেতারে ঘোষণা দেওয়া হয়– 'কায়রো জাতিসংঘের অস্ত্রবিরতি প্রস্তাব গ্রহণ করছে।'

৯ জুন ইজরাইলিরা সিরিয়ার সুরক্ষিত গোলান মালভূমিতে অভিযান শুরু করে। এক দিনের প্রচণ্ড লড়াই শেষে তারা সিরীয় বাহিনীকে হটিয়ে গোলান দখল করে নেয়। ওই দিনই মিশরের প্রেসিডেন্ট জামাল আবদেল নাসের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে সম্প্রচারিত ভাষণে পদত্যাগের ঘোষণা দেন, তবে তিন ঘণ্টা পরই তিনি অবস্থান পালটে জানান– গণদাবির মুখে প্রেসিডেন্ট পদে বহাল থাকছেন। ইজরাইল অস্ত্রবিরতি মেনে নেয়। ১০ জুন শনিবার সিরিয়া-ইজরাইল সম্মুখযুদ্ধ জোরদার হয়। সিরিয়াকে হটাতে ইজরাইল তাদের পুরো সামরিকশক্তি কাজে লাগায়। সিরিয়ার কুনেইত্রা শহরের পতনের পরও ইজরাইলিরা এগিয়ে যেতে থাকে।

১৯৬৭ সালের জুনে হওয়া এই 'ছয় দিনের যুদ্ধ' (৫ জুন থেকে ১০ জুন) তৃতীয় আরব-ইজরাইল যুদ্ধ নামে পরিচিত, যা মধ্যপ্রাচ্যের মানচিত্র অনেকখানি বদলে দেয়। লড়াইয়ে ইজরাইলি বাহিনী আরবদের পরাজিত করে এবং মিশরের সিনাই উপদ্বীপ, গাজা উপত্যকা, পশ্চিম তীর, পূর্ব জেরুজালেম সিরিয়ার গোলান মালভূমি দখল করে নেয়।
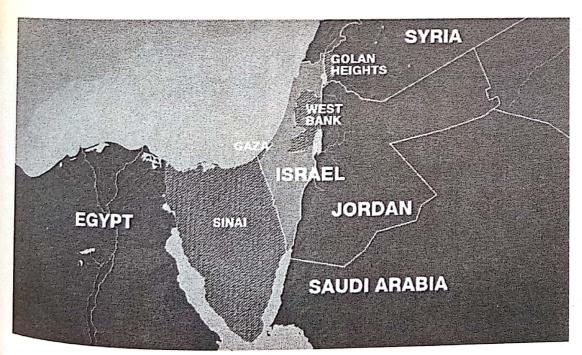
ছবি : আলজাজিরা

পরবর্তী সময়ে মিশর ও ইজরাইলের মধ্যে এক চুক্তির মাধ্যমে সিনাই ও গাজা উপত্যকা থেকে ইজরাইলি সেনারা সরে গেলেও সিরিয়ার গোলান মালভূমি এবং পূর্ব জেরুজালেম তারা ছাড়েনি। জর্ডান নদীর পশ্চিম তীরেও স্থাপন করা হয় নতুন নতুন ইহুদি বসতি।

যুদ্ধের ফলাফল ও পরাজয়ের কারণ

এক

দ্বিতীয় আরব-ইজরাইল বা সুয়েজ যুদ্ধের সময় নাসের যেভাবে আরব জাতীয়তাবাদের আইকনে পরিণত হয়েছিলেন, '৬৭-এর যুদ্ধের পর তা টিকিয়ে রাখা যায়নি। ছয় দিনের যুদ্ধে তার সামর্থ্য নিয়ে আরব দেশগুলোতে চালু থাকা উচ্চ ধারণার পরিবর্তন হয়। ইজরাইল এই অল্প সময়ে তিনটি আরব দেশের সেনাবাহিনীকে একরকম ধ্বংস করে দেয়। পরবর্তী সময়ে সুয়েজখাল, জর্ডান নদী গোলান উপত্যকা ধরে এ অঞ্চলের সীমানা নির্ধারণ করা হয়।

ইজরাইল ও আরবদের পারস্পরিক অবিশ্বাস এবং বিদ্বেষ দিনকে দিন বাড়ছিল। এর মধ্যে ১৯৫০ এবং ৬০-এর দশকের স্নায়ুযুদ্ধ সে তিক্ততা আরও বাড়িয়ে দেয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন আধুনিক বিমান প্রতিরক্ষাব্যবস্থা দিয়ে মিশরকে সাহায্য করেছিল। অন্যদিকে, ইজরাইলের সাথে ভালো সম্পর্ক ছিল আমেরিকার। ১৯৪৮ সালের যুদ্ধের পর থেকেই ইজরাইল তার সামরিক শক্তি বাড়ানোর জন্য উঠেপড়ে লাগে। ফ্রান্স ও ব্রিটেনের কাছ থেকে যুদ্ধবিমান ও ট্যাংক ক্রয়ের পাশাপাশি বাড়ানো হয় সেনাসংখ্যা। ১৯৬৭ সাল নাগাদ পরমাণুশক্তি অর্জনের দ্বারপ্রান্তে চলে যায় ইজরাইল।

আইজ্যাক রবিন তখন ইজরাইলি সেনাবাহিনীর প্রধান ছিলেন। তার প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস ছিল তার সেনাবাহিনী যথেষ্ট শক্তি অর্জন করেছে। তারা বুঝতে পারে, প্রতিটি যুদ্ধে তাদের জিততে হবে; কোনো ধরনের পরাজয়ের কথা চিন্তাও করেনি ইজরাইল।

আইজ্যাক রবিন (বামপাশে), যিনি তৃতীয় আরব-ইজরাইল যুদ্ধের সময় ইজরাইলি সেনাবাহিনীর প্রধান ছিলেন। ছবি : ইন্টারনেট

সে সময় মিশর আর সিরিয়াকে সামরিক শক্তির দিকে ততটা মনোযোগ দিতে দেখা যায়নি। সুয়েজখাল জাতীয়করণের মাধ্যমে জামাল আবদেল নাসের আরবদের কাছ থেকে যে গৌরব অর্জন করেছিলেন, সেটি তাকে ১৯৪৮ সালের পরাজয়ের কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল। তিনি হয়ে উঠেছিলেন প্যান-আরব জাতীয়তাবাদের নেতা। একটি দক্ষ সেনাবাহিনী গড়ে তোলার প্রতি তার তেমন মনোযোগ ছিল না। এ ছাড়া সিরিয়ার সেনাবাহিনীও রাজনীতির মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিল।

দেশটিতে ধারাবাহিক কয়েকটি সামরিক অভ্যুত্থান হয়। আরবরা নিজেদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের কথা বলত প্রচুর, কিন্তু সেগুলো ছিল কথার কথা। বাস্তবে তার প্রতিফলন দেখা যেত না; বরং আরব নেতাদের মধ্যে অনৈক্য ও বিভক্তি ছিল স্পষ্ট। সিরিয়া আর মিশরের শাসকগোষ্ঠী মনে করতে থাকে– জর্ডান ও সৌদি আরবের মদদে তাদের দেশে অভ্যুত্থানের চেষ্টা হচ্ছে। জর্ডানের বাদশাহ হোসেন ছিলেন ব্রিটেন এবং আমেরিকার ঘনিষ্ঠ মিত্র। তার দাদা বাদশাহ আব্দুল্লাহর সঙ্গে ইহুদি গোয়েন্দা সংস্থার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। আরব এবং ইজরাইলের মধ্যে ক্রমাগত তিক্ততা এবং সীমান্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংঘাতের প্রেক্ষাপটে ১৯৬৭ সালের যুদ্ধ শুরু হয়।

ইজরাইল-মিশর সীমান্ত তুলনামূলক শান্ত ছিল। ইজরাইলের সঙ্গে সবচেয়ে বড়ো সংঘাতটি হয়েছিল সিরিয়ার। আমেরিকা জানত, আরব দেশগুলো যদি ইজরাইলকে সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করে, তাহলেও তারা জিততে পারবে না। মিশরের বিমানবাহিনী শক্তিশালী থাকলেও তাদের সেনাবাহিনী ছিল দুর্বল। ১৯৬৭ সালের জুন মাসের ২ তারিখে ইজরাইলের সামরিক কর্মকর্তারা যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়।

দুই

ইজরাইলি সামরিক কর্মকর্তারা রাজনীতিবিদদের বুঝিয়েছিলেন, তারা মিশরকে পরাস্ত করতে পারবেন। এর কিছুদিন আগে ইজরাইলি গুপ্তচরসংস্থা মোসাদের প্রধান গোপনে ওয়াশিংটন সফর করেন। তিনি মার্কিন প্রশাসনকে জানিয়েছিলেন, ইজরাইল যুদ্ধ করতে চায়। ইজরাইলকে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য সবুজ সংকেত দেয় আমেরিকা। অন্যদিকে মিশরের প্রেসিডেন্ট নাসের ধারণা করে বসে আছেন– ইজরাইল হয়তো জুন মাসের ৪ অথবা ৫ তারিখে হামলা করতে পারে।

১৯৬৭ সালের জুন মাসের ৫ তারিখ সকাল সাতটা চল্লিশ মিনিটে বিমান আক্রমণের জন্য তৈরি হয় ইজরাইল। তাদের প্রথম লক্ষ্য ছিল আরবদের বিমান প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস করে দেওয়া এবং সেটি শুরু হবে মিশরকে দিয়ে। ইজরাইল তার সামরিক প্রস্তুতির অংশ হিসেবে বছরের পর বছর ধরে আরবদের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার গোপন নকশা জোগাড় করেছে। ইজরাইলের যুদ্ধবিমানের পাইলটদের কাছে একটি বই দেওয়া হয়েছিল, যেখানে মিশর, জর্ডান এবং সিরিয়ার বিমান ঘাঁটিগুলোর চিত্র ছিল।

সাইনাইয়ের বিমান ঘাঁটিতে মিশরের সেনাপ্রধান তার বাহিনীর শীর্ষ অফিসারদের নিয়ে যখন বৈঠকে ব্যস্ত, তখনই খবর আসে ইজরাইলি বিমান হামলার। শুরুর দিকে ব্যাপারটা বুঝতেই পারেনি মিশরের সেনা কর্মকর্তারা। তাদের ধারণা ছিল– এটা হয়তো মিশরের সেনাবাহিনীর একটি অংশের বিদ্রোহ, কিন্তু দিন শেষ হতে না হতেই জর্ডান এবং সিরিয়ার বহু বিমানঘাঁটি ধ্বংস করে দেয় ইজরাইলের বিমানবাহিনী। পুরো আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা চলে যায় তাদের নিয়ন্ত্রণে।

ইজরাইল অবশ্য জর্ডানকে সতর্ক করে দিয়েছিল– যাতে তারা যুদ্ধে না জড়ায়, কিন্তু জর্ডান শোনেনি ইজরাইলের বারণ। পাঁচ দিনের যুদ্ধে মিশর, সিরিয়া ও জর্ডানের সেনাবাহিনী ইজরাইলের কাছে পরাস্ত হয়। ইজরাইল মিশরের কাছ থেকে গাজা উপত্যকা, সিনাই উপদ্বীপ, সিরিয়া থেকে গোলান মালভূমি এবং জর্ডানের কাছ থেকে পশ্চিম তীর এবং পূর্ব জেরুজালেম দখল করে নেয়। প্রথমবারের মতো পবিত্র জেরুজালেম ইজরাইলের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসে। সেখান থেকে বহু ফিলিস্তিনিকে বিতাড়িত করা হয়। এর জেরেই পদত্যাগ করেন জামাল আবদেল নাসের। কিন্তু তার সমর্থনে বহু মানুষ রাস্তায় নেমে আসে। ফলে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন তিনি। ১৯৭০ সালে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন নাসের।

জর্ডানের বাদশাহ হোসেন অবশ্য ক্ষমতায় টিকে যান। তার সাথে ছিল ইজরাইলের গোপন আঁতাত। শেষ পর্যন্ত ১৯৯৪ সালে জর্ডান ইজরাইলের সাথে শান্তিচুক্তি করে। অন্যদিকে, সিরিয়ার ক্ষমতা দখল করেন বর্তমান প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের পিতা হাফেজ আল আসাদ। হাফেজ ছিলেন বিমানবাহিনীর একজন কমান্ডার।

সম্মিলিত আরব বাহিনীকে হারিয়ে দেওয়া ইজরাইলি আর্মির গুরুত্ব বাড়ে পশ্চিমের দেশগুলোতে। '৬৭-এর যুদ্ধের পর থেকে ইজরাইলকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা শুরু করে আমেরিকা। আর সে যুদ্ধের পর আরবরা ইজরাইলকে দেখে আরও বেশি আগ্রাসী ও দখলদার হিসেবে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের হুঁশিয়ারি ডিঙিয়ে প্যালেস্টাইন ভূখণ্ডে নতুন ইহুদি বসতি নির্মাণ শুরু করে ইজরাইল। এখন প্রশ্ন হলো– ইজরাইল কেন আগ বাড়িয়ে তৃতীয় আরব-ইজরাইল যুদ্ধের সূচনা করল? কারণ, তার কাছে ছিল আরবদের দুর্বলতার গোয়েন্দা তথ্য। আর সেই তথ্য মোসাদের হাতে তুলে দিয়েছিল আরব রাষ্ট্র মরক্কো!

ইজরাইলের সাথে মরক্কোর আঁতাত

মেইর অমিত মোসাদের দায়িত্বে আসার পর সংস্থার আধুনিকীকরণে হাত দেন, বৈদেশিক নেটওয়ার্ক শক্তিশালী করেন। মোসাদের ভেতরে একটি একক অপারেশন বিভাগ খোলার পদক্ষেপ হাতে নেন অমিত, যার মাধ্যমে আরব বিশ্বে গোয়েন্দাবৃত্তি ও টার্গেট কিলিং মিশনের মতো কার্যক্রমগুলো একই কমান্ড সেন্টার থেকে সমন্বয় করা যায়।

আর এ লক্ষ্যে অমিত, আমানের ইউনিট-১৮৮-কে মোসাদে নিয়ে আসেন এবং আইজ্যাক শামিরের 'মিফরাতজ' ইউনিটের সঙ্গে একীভূত করেন।

মিফরাতজ ছিল মোসাদের প্রথম হিট টিম। নতুন সংস্থার প্রধান করা হয় ইউসেফ ইয়ারিভকে। শামিরকে করা হয় ইউসেফের ডেপুটি। আর নতুন সংস্থার নাম দেওয়া হয় কায়সারেয়া। ভূমধ্যসাগরের তীররর্তী রোমান আমলের এক শহরের নামে এর নামকরণ করা হয়। ইজরাইলের বাইরে কায়সারেয়ার কোড নাম ছিল 'সিনেট'।

বার্ড ইউনিট একইসঙ্গে মোসাদ ও শিনবেতের হয়ে কাজ করত তখন। অমিত বার্ড ইউনিট থেকে কিছু লোকজন সরিয়ে এনে নতুন আরেকটা গোয়েন্দা ইউনিট খোলেন, যার নাম দেওয়া হয় 'কলোসাস'। আরব রাষ্ট্র মরক্কোর সাথে ইজরাইলের গোপন যোগাযোগ গড়ে তুলতে সক্ষম হন মেইর অমিত। তখন মরক্কোর বাদশাহ দ্বিতীয় হাসান। পাশ্চাত্যপন্থি হাসানের ইশারায় মরক্কো আর ইজরাইল গুরুত্বপূর্ণ গোয়েন্দা তথ্য বিনিময় করতে থাকে। বাদশাহ মরক্কোতে বসবাস করা ইহুদিদের ইজরাইলে নিয়ে যাওয়ার প্রজেক্টে সহায়তা করেন। মরক্কো সরকারের সবুজ সংকেতে রাবাতে একটি স্থায়ী অফিস বানিয়ে নেয় মোসাদ। এর মাধ্যমে পুরো আরব বিশ্বে গোয়েন্দাবৃত্তি করার সুযোগ সামনে চলে আসে।

১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরে মরক্কোর কাসাব্লাংকাতে বসে আরব নেতাদের এক শীর্ষ সম্মেলন। সম্মেলন আয়োজন করার উদ্দেশ্যই ছিল ইজরাইলের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতের যুদ্ধ প্রস্তুতি হিসেবে আরব বিশ্বকে একই কমান্ডে নিয়ে আসা। কিন্তু মরক্কোর বাদশাহ বিশ্বাসঘাতকতা করেন। তিনি মোসাদকে অনুমতি দেন সম্মেলনের স্থান আর আরব নেতাদের থাকার জায়গাগুলোতে কথা রেকর্ড করার ডিভাইস সংযুক্ত করার। বাদশাহ এটা করেছিলেন। কারণ, বেশ কিছু আরব নেতার সাথে তার সম্পর্ক ভালো যাচ্ছিল না। তার ভয় ছিল, প্রভাবশালী আরব নেতারা তাকে সিংহাসন থেকে ছুড়ে ফেলে দিতে পারে।

সম্মলনে আরব নেতাদের পাশাপাশি হাজির হয়েছিলেন আরব দেশসমূহের শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তারাও। আরব কমান্ডাররা রিপোর্ট করেন, ইজরাইলের সাথে যুদ্ধে যেতে তারা প্রস্তুত নয়। এই তথ্য ছিল মোসাদের জন্য গরম খবর। তারা ইজরাইলি প্রধানমন্ত্রী লেভি এশকলকে পরামর্শ দেয় দুই বছর পর, মানে ১৯৬৭ সালের জুনের মধ্যে আরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে। মোসাদ প্রতিষ্ঠার পর সব বড়ো অর্জনের মধ্যে এটিও একটি।

১৯৬৯ সালে আরাফাত ঘোষণা দেয়– 'আমাদের কোনো আদর্শ নেই। আমাদের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে প্যালেস্টাইনকে স্বাধীন করা।' তার কয়েক বছর আগে ১৯৬৪ সালে আরব রাষ্ট্রগুলোর সহায়তায় পিএলও (প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন) গঠন করা হয়।

আহমেদ সুকেইরিকে তার প্রধান করা হয়, কিন্তু ইয়াসির আরাফাতের খ্যাতির কারণে পিএলও'র নিয়ন্ত্রণ ধীরে ধীরে ফাতাহর কাছে চলে যায়। আরাফাত পিএলও'র চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন আর আবু জিহাদ হন তার মিলিটারি সমন্বয়ক। ফাতাহ গড়ে উঠে সেক্যুলার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে।

পিএলও গঠন করা হয়েছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি জাতীয় আমব্রেলা ফ্রন্ট হিসেবে। পিলওর উদ্দেশ্যে ছিল প্যালেস্টাইনকে স্বাধীন করা, মানে ১৯৪৮ সালের যুদ্ধে যে ভূমি হারিয়ে গেছে, তা পুনরুদ্ধার করা। কিন্তু ১৯৬৭ এর যুদ্ধে ইজরাইল সব দখলে নিয়ে নিলে পিএলও'র লক্ষ্য পরিবর্তিত হয়। প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতার পরিবর্তে গাজা ও পশ্চিম তীর বা সদ্য হারানো শহরগুলো উদ্ধার করার কাজকে তারা গুরুত্ব দিতে থাকে। এর মধ্যেই ইজরাইলের বিরুদ্ধে ফাতাহর গেরিলা আক্রমণ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। আরাফাত প্যালেস্টাইনের ডি ফেক্টো নেতায় পরিণত হলেন। এর কয়েক বছর পরই সূচনা হয় চতুর্থ আরব-ইজরাইল যুদ্ধের।

একাদশ অধ্যায়

চতুর্থ আরব-ইজরাইল যুদ্ধ

'প্রয়োজনে আমরা আবার তাঁবুতে ফিরে যাব, উটের দুধ খেয়ে বাঁচব, কিন্তু তেল ছাড়া তোমাদের এসব গাড়ি দিয়ে কী হবে?'—পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে তেল অবরোধ প্রসঙ্গে সৌদি বাদশাহ ফয়সাল।

অপারেশন বদর

৬ অক্টোবর, ১৯৭৩। ১০ রমজান, শনিবার। দুপুর দুটার পরপরই আরব বাহিনী হামলা চালায় ইজরাইলের ওপর। হামলা হয় দুই দিক থেকে : উত্তর দিক থেকে সিরিয়া আর দক্ষিণ দিক থেকে মিশর। লক্ষ্য, ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে ইজরাইলের কাছে হারানো ভূমি পুনরুদ্ধার করা।

আরবরা এ যুদ্ধকে দেখে থাকে 'অক্টোবর যুদ্ধ' নামে, আর ইজরাইলের কাছে এটি 'ইয়োম কিপুর যুদ্ধ' নামে পরিচিত। যুদ্ধের প্রেক্ষাপট তৈরি হয় ৬ বছর ধরে। '৬৭ সালে ছয় দিনের লড়াইয়ে আরবদের বিশাল এলাকা দখলে নিয়েছিল ইজরাইল। প্যালেস্টাইন তো বটেই, মিশরের সিনাই উপদ্বীপ আর সিরিয়ার গোলান মালভূমিও নিজেদের কবজায় নিয়ে নেয় তারা। যুদ্ধে গোহারা আরবরা চেয়েছিল প্রতিশোধ নিতে। চাপ ছিল সাধারণ আরবদের তরফ থেকেও।

১৯৭২ সালে মিশরের তাহরির স্কয়ারে ইজরাইলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করেছিল মিশরীয়রা। এটাই সেই স্কয়ার, যেখানে ২০১৩ সালে মুরসিবিরোধীরা জড়ো হয়ে সরকারের পতন চেয়েছিল আর জেনারেল সিসির মতো সুপ্ত এক দানবকে জাগিয়ে তুলেছিল। '৭২-এর গণবিক্ষোভের পর প্রতিশোধমূলক একটি লড়াই ছিল অবশ্যম্ভাবী। কেবল সময়-সুযোগের অপেক্ষা। মিশরীয় লেখক জামাল আল গনি বলেন–

> 'জনগণ পরাজয়ের গ্লানি সহ্য করতে পারছিল না। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিল। তারা যখন যুদ্ধের জন্য রাজপথে নামল, তখন মিশরের সেনাবাহিনীও ভাবল– এই তো সুযোগ, আমরা কম কীসে? তারা প্রমাণ করতে চাইল– ইজরাইলের মতো শত্রুকে পরাজিত করার ক্ষমতা তারা রাখে।'

১৯৭৩-এর জানুয়ারিতে আনোয়ার সাদাত এবং হাফেজ আল আসাদ গোপনে সিদ্ধান্ত নেন– মিশর ও সিরিয়ার সেনাদের ইজরাইলের বিরুদ্ধে একই কমান্ডে নিয়ে আসবেন। ঠিক হয়, ইয়োম কিপুরের সময় ইজরাইল অধিকৃত অঞ্চলে আকস্মিক হামলা চালানোর। ইয়োম কিপুর ইহুদিদের কাছে ধর্মীয়ভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও পবিত্র দিন। বছরের এই একটি দিন ইজরাইলে বেতার-টেলিভিশন সম্প্রচার কার্যক্রম বন্ধ থাকে, দোকান পাট খোলা হয় না, এমনকী রাস্তায়ও গাড়ি চলাচল করতে দেখা যায় না।

'অপারেশন বদর' নামে শুরু হয় আরবদের যৌথ আক্রমণ। শুরুতে আরবরাই রণাঙ্গন কাঁপায়। সুয়েজখাল পার হয়ে বারলেভ লাইন দখলে নেয় মিশরীয় বাহিনী। '৬৭-র যুদ্ধে সিনাই উপদ্বীপ দখলে নেওয়ার পর সুয়েজ খালের পূর্ব পাড়ে বারলেভ লাইন নামের এই শক্তিশালী প্রতিরক্ষাব্যূহটি নির্মাণ করেছিল ইজরাইল। সিরিয়ার যোদ্ধারাও গোলান মালভূমি পেরিয়ে ইজরাইলের উত্তরাঞ্চল দখল করতে থাকে। পদাতিক আক্রমণে অংশ নেয় ৪০ হাজারের মতো সিরীয় সেনা, সাথে ছিল ৬'শর মতো ট্যাংক।

ইজরাইলি বাহিনী শুরুতে সিরিয়ার মুখোমুখি হয়। তিন দিনের যুদ্ধেই সিরীয় বাহিনীকে তাড়িয়ে যুদ্ধবিরতি রেখার বাইরে পাঠিয়ে দেয় ইহুদি সেনারা। এ অবস্থায় জর্ডান, সৌদি আরব, মরক্কো আর ইরাকি বাহিনী এসে যোগ দেয় সিরীয়দের সাথে। আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট কর্নেল বুমেদিন সিরিয়া ও মিশরের সহায়তায় এক মিলিয়ন করে মোট দুই মিলিয়ন ডলার মূল্যের অস্ত্র দিতে সোভিয়েত ইউনিয়নকে ব্ল্যাংক চেক দেন। তারপরও পরিস্থিতি আরবদের পক্ষে আসেনি। ইজরাইলি সেনারা সিরিয়ার মূল ভূখণ্ডে ঢুকে হাফেজের বাহিনীকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় একেবারে দামেস্কের উপকণ্ঠ পর্যন্ত।

মাত্র দশদিনেই ধরাশায়ী হয় সিরিয়া-মিশর। ইহুদি যোদ্ধারা কায়রোর দোরগোড়ায় পৌঁছে যায় বড়ো ধরনের কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই। এ অবস্থায় ইজরাইলি সেনা প্রত্যাহারের দাবিতে তেল অবরোধ দেয় আরবরা। আন্তর্জাতিক বাজারে হু হু করে বাড়তে থাকে তেলের দাম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমের যারা ইজরাইলকে এতদিন হাওয়া-বাতাস দিয়ে আসছিল, আরবদের 'তেল অস্ত্র' তাদের ফেলে দেয় বিপাকে। পশ্চিম থেকেই শুরু হয় দূতিয়ালি– 'বন্ধ করতে হবে যুদ্ধ!'

অক্টোবরের শেষ নাগাদ যুদ্ধবিরতিতে রাজি হয় উভয় পক্ষ। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৮ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের মধ্যস্থতায় সই হয় ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি। সিনাই ফিরে পায় মিশর, বিনিময়ে ইজরাইল পায় মিশরের স্বীকৃতি। আর এর মধ্য দিয়েই রচিত হয় নতুন ইতিহাস। সোভিয়েত ইউনিয়নের কোল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের কোলে চেপে বসে মিশর। আমেরিকানদের মধ্যপ্রাচ্য নীতিও যায় পালটে। মিশর ছাড়াও মার্কিন মিত্রতে পরিণত হয় আরও কিছু আরব দেশ।

আক্রমণের আগাম খবর জানত মোসাদ

আরবরা আক্রমণে যাচ্ছে– এটা মোসাদ জানত। জরুরি অধিবেশনে মিলিত হয় ইজরাইলি মন্ত্রিসভা, তলব করা হয় রিজার্ভ ফোর্স। সম্ভাব্য আরব আক্রমণের পালটা জবাব দিতে নেওয়া হয় প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা, যার নাম দেওয়া হয় 'ডাভকোট' (ঘুঘুর বাসা)। ডাভকোট পরিকল্পনা অনুযায়ী লড়াই শুরুর দুই ঘণ্টা আগে তার বাস্তবায়ন শুরু করতে চেয়েছিল ইজরাইল। মোসাদের কাছে তথ্য ছিল আক্রমণটা হবে সন্ধ্যায়।

৬ অক্টোবর, বেলা ২টায় সারি সারি মিশরীয় জঙ্গিবিমান সুয়েজখাল পেরিয়ে সিনাইয়ের দিকে এগিয়ে যায়। বহরটিতে ছিল দুই শতাধিক জেট বিমান। একই সময়ে গোলান মালভূমির ইজরাইলি অবস্থানগুলোতে হামলা চালায় সিরিয়ার জঙ্গিবিমানগুলো। তাদের ছিল দেড়শো বিমানের বহর। আরবরা এই আক্রমণ শুরু করেছিল মোসাদ চর আশরাফ মারওয়ানের দেওয়া নির্ধারিত সময়ের চার ঘণ্টা আগে।

মিশরের ক্ষমতায় তখন নাসেরের সহযোদ্ধা আনোয়ার সাদাত। তিনি একবার ইজরাইল কর্তৃপক্ষকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন– 'আপনারা সিনাই ছেড়ে দিন, তাহলে আমরা আপনাদের সাথে চুক্তি করব।' কিন্তু ইজরাইলের লৌহমানবী প্রধানমন্ত্রী গোল্ডামেয়ার সাদাতের প্রস্তাব মানেননি। ক্ষুব্ধ সাদাত সিদ্ধান্ত নেন– ইজরাইলের বিরুদ্ধে লড়বেন।

সাদাতের দলে ভেড়েন আরেকজন। তিনি সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হাফেজ আল আসাদ। '৬৭-এর যুদ্ধের সময় সিরিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করা আসাদ এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসেন ১৯৭০ সালে। সে বছরই মিশরের প্রেসিডেন্ট হন আনোয়ার সাদাত। আসাদ ভুগছিলেন মনোবেদনায়। জনগণকে আস্থায় নেওয়ার দরকার ছিল আসাদের। কারণ, ১৯৬৭-এর যুদ্ধে আরব জোটের পরাজয়ের জন্য তাকেই সিরিয়াতে প্রধানত দায়ী করা হয়। তাই সামরিক শাসক আসাদ চেয়েছিলেন কলঙ্কমুক্ত হতে, সুযোগও তো এখন হাতের নাগালেই!

৩. মিশরীয়দের সুয়েজখাল অতিক্রম

প্রথম বিমান হামলার কয়েক মিনিট পরই ইজরাইলের দিকে তাক করা মিশরীয় ট্যাংকগুলো গর্জে ওঠে। গোলন্দাজ বাহিনীর ছত্রছায়ায় সাত শতাধিক ভেলায় চড়ে ৪ হাজার মিশরীয় পদাতিক সেনার প্রথম দলটি সুয়েজখাল পার হয়। এবার ইজরাইল মনোযোগ দেয় 'ডাভকোট' পরিকল্পনা বাস্তবায়নে। কিন্তু বিকেল ৫টার মধ্যেই ৪৫টি মিসরীয় পদাতিক ব্যাটালিয়ন সুয়েজখাল পেরিয়ে গেলে ব্যর্থ হয় 'ডাভকোট' পরিকল্পনা।

দ্বিতীয় দিনের শুরুতে ইজরাইলি প্রতিরোধের মধ্যেই হাজার খানেকের বেশি ট্যাংক নিয়ে সুয়েজখাল পার হওয়ার পর এগোতে থাকে এক লাখ মিশরীয় যোদ্ধা। তাদের সাথে ছিল দশ হাজার সাঁজোয়া যানের একটি বহর। সিরিয়াও বিমান হামলার পাশাপাশি কামান দাগাতে দাগাতে যুদ্ধ শুরুর দুই ঘণ্টার মধ্যেই 'ইজরাইলের চোখ' বলে পরিচিত হারমন পর্বতের গুরুত্বপূর্ণ অংশ দখলে নেয়। সিরীয় ট্যাংকগুলো গোলানের কেন্দ্রস্থলে পৌঁছে যায় ৬ অক্টোবর রাতেই, কিন্তু আকস্মিক একটি নির্দেশনায় থেমে যায় সিরীয়দের বিজয়রথ। মধ্যরাতে সিরিয়ার মিলিটারি কন্ট্রোল রুম থেকে নির্দেশ আসে– অভিযান স্থগিত রেখে পরদিন সকালে আবার আক্রমণে যাওয়ার।

এই নির্দেশ ছিল অপ্রত্যাশিত। এটা এমন একসময় আসে, যখন ইজরাইলের প্রাণকেন্দ্র ছিল অরক্ষিত। চাইলেই মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে গোলানের প্রান্তে থাকা ইজরাইলি সেনা অবস্থানগুলো সহজেই দখলে নিতে পারত সিরিয়ার বাহিনী। এটা হতে পারত যুদ্ধের টার্নিং পয়েন্ট। কারণ, যুদ্ধ ধরে রাখলে ইজরাইলের আরও গভীরে ঢুকে যাওয়ার রাস্তা পরিষ্কার হয়ে যেত সিরীয়দের কাছে, কিন্তু সিরীয় বাহিনীর কমান্ড ছিল প্রেসিডেন্ট হাফেজ আল আসাদের নিজ হাতে। তার যুদ্ধ পরিকল্পনার বিরোধিতা করা সেনা কমান্ডারদের কাছে ছিল অসম্ভব ব্যাপার। যুদ্ধের সময় আসাদ রাতে সিরীয় কমান্ড সেন্টারেই ঘুমাতেন আর সেনা অফিসারদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতেন।

ওদিকে, ইজরাইল নামক 'গোখরা' কেবল ফণা তুলতে শুরু করেছে। যুদ্ধ শুরুর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আড়াই লাখের মতো ইহুদি সেনা প্রস্তুত হয়ে যায়। সিরীয়দের ধারণা ছিল– ইজরাইলিরা জড়ো হয়ে গোলানে পৌঁছতে সময় নেবে ২৪ ঘণ্টার মতো। কিন্তু তাদের অবাক করে দিয়ে ১৫-১৬ ঘণ্টার মধ্যেই গোলানে পৌঁছে যায় ইজরাইলি ট্যাংকবহর।

যুদ্ধের চতুর্থ দিন শেষে দেখা যায়, উত্তর গোলানের একটি স্থানে ইহুদি সেনারা শত শত সিরীয় ট্যাংক ধ্বংস করেছে। পরে এই জায়গাটি 'অশ্রুজলের উপত্যকা' (Valley of Tears) নামে পরিচিত হয়। এখানে নিহত সৈনিকদের স্মরণে ইজরাইল জাতীয় স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেছে, যার নাম দেওয়া হয়েছে Oz 77, হিব্রুতে যার অর্থ শক্তি।[৬৭]

---

৬৭. Avalley of Tears where Israel stopped Syria in 1973, 22 September 2015, times of Israel.
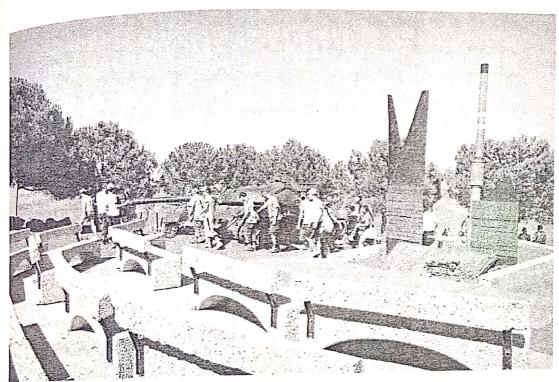
The Oz 77 memorial (Shmuel Bar-Am), times of Israel.

সিরীয়রা ভেবেছিল, ইহুদিদের লাশের পাহাড় পেছনে ফেলে গোলান হয়ে প্যালেস্টাইনের দিকে এগিয়ে যেতে পারবে তারা। অথচ প্রথম তিন দিনের যুদ্ধেই তাদের বিপুলসংখ্যক ট্যাংক হারাতে হয়েছে। তারা এবার ধাওয়া দিয়ে সিরিয়ার মূল ভূখণ্ডের গভীরে নিয়ে গেল হাফেজ আল আসাদের বাহিনীকে।

ইয়োম কিপুর যুদ্ধে মিশরের হয়ে লড়াই করেন ইয়োসরি ওমারা। যুদ্ধের স্মৃতিচারণ করে ওমারা লিখেন–

> 'আমরা গুলি চালানোর নির্দেশ পেলাম। আমাদের কাছে যত রকম অস্ত্র ছিল, সব দিয়ে গুলি চালালাম। মিশরীয় রকেটচালিত গ্রেনেড বা আরপিজিধারী সৈন্যরা পাখির মতো এক গাছ থেকে আরেক গাছে লাফিয়ে লাফিয়ে ফিরছিল। তারা ইজরাইলি ট্যাংক রেঞ্জের মধ্যে এলেই ফায়ার করছিল। তারা একটাকে অচল করে দেওয়ার পর আরেকটাকে আঘাত করছিল।'

ইজরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর এই প্রথম আত্মরক্ষামূলক অবস্থানে যেতে বাধ্য হয় ইহুদি সেনারা। ১৩ই অক্টোবর সুয়েজ খালের পূর্ব তীরের বারলেভ লাইন নামে পরিচিত ইসরাইলের প্রতিরক্ষার রেখার সর্বশেষ সেনা ঘাঁটির সৈন্যরা মিশরীয় ৪৩ কমান্ডো ব্যাটালিয়নের কাছে আত্মসমর্পণ করে। যুদ্ধ শেষ হয়নি, অথচ সিনাই পুর্নদখল করতে পেরে উল্লসিত মিশরীয়দের ভিড়ে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায় কায়রোর রাজপথগুলো।

সাদাত আর আসাদ একই কমান্ডে দুটি ফ্রন্টে লড়াইয়ে নামলেও কার কী উদ্দেশ্যে, এ নিয়ে তৈরি হয় ধোঁয়াশা। এক পর্যায়ে মনে হলো– তারা আলাদা দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে লড়াই করছেন। হাফেজ আল-আসাদের জীবনীকার ব্রিটিশ সাংবাদিক প্যাট্রিক সিয়েল বলেন–

> 'আসাদ আমাকে বলেছিলেন, ক্ষমতায় আসার দিন থেকেই তার আকাঙ্ক্ষা ছিল ১৯৬৭-এর পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়া। সে যুদ্ধের সময় তিনি নিজেই ছিলেন সিরিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী। তাই আমি মনে করি, হারানো এলাকা পুনরুদ্ধারকে তিনি ব্যক্তিগত দায়িত্ব বলে মনে করতেন। আসাদ এ যুদ্ধকে মুক্তিযুদ্ধ হিসেবে দেখতেন। অন্যদিকে সাদাত চেয়েছিলেন– একটি সীমিত যুদ্ধ, যার লক্ষ্য ছিল বিশ্ব শক্তিগুলোকে নাড়া দেওয়া, যাতে স্থগিত শান্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়। যুদ্ধ শুরুর এক সপ্তাহের মধ্যেই সাদাতের ব্যক্তিগত লক্ষ্য অর্জিত হয়।'[৬৮]
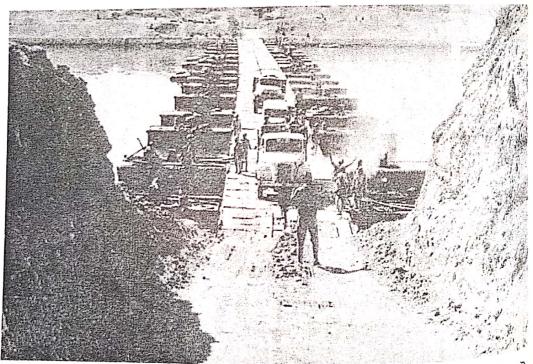
মিশরীয় সেনারা ১৯৭৩ সালের অক্টোবরের সাত তারিখে সুয়েজখাল অতিক্রম করছে। ছবি, ইন্টারনেট

১৩ অক্টোবর ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দেন সাদাতকে। কিন্তু সাদাত দাবি করে বসেন, পুরো সিনাই থেকে ইজরাইলি সেনা প্রত্যাহার হলেই কেবল যুদ্ধবিরতি মানবেন। *দি ইয়োম কিপুর ওয়ার* বইয়ের লেখক আব্রাহাম রবিনোভিচ বলেন–

---

[৬৮]. ৭৩-এর যুদ্ধে আরবদের পরাজয়ের কারণ– আরব ইসরাইল যুদ্ধে যে কারণে হেরে যায় আরবরা, মূল লেখক হুসেইন আল-রাজ্জাজ, হোসেন মাহমুদের করা অনুবাদ প্রকাশিত হয় অন্যদিগন্তে, ২০১৭ সালের ৩ অক্টোবর।

'সাদাতের জন্য সবকিছুই খুব ভালোমতো চলছিল। তিনি যুদ্ধ বন্ধ করতে চাননি। তাকে যুদ্ধবিরতিতে রাজি করাতে হলে নাটকীয় কিছু করা দরকার ছিল, হয়তো অনুরোধ করলে তিনি রাজি হতেন। সবচেয়ে ভালো কাজ হতো ইজরাইলিরা সুয়েজখাল অতিক্রম করলে। তাকে তা যথেষ্ট শঙ্কিত করত।'

১৪ অক্টোবর সকালে মিশরীয় সাঁজোয়া বহর পূর্ব দিকে এগিয়ে যায়, কিন্তু এখানে ইজরাইলের তাড়া খেয়ে দুপুর নাগাদ আড়াইশো ট্যাংক হারিয়ে পিছু হটে মিশরীয় বাহিনী। অপর ফ্রন্টে ইজরাইল ততক্ষণে পৌঁছে গেছে দামেস্কের ৩৫ কিলোমিটারের মধ্যে।

ইয়োম কিপুর যুদ্ধ চলাকালে ১৯৭৩ সালের ১৫ অক্টোবর কায়রোর আর্মি হেডকোয়ার্টার্সে সেনাপ্রধান সাদেদিন শাজিল ও যুদ্ধমন্ত্রী জেনারেল আহমেদ ইসমাইলের সাথে আনোয়ার সাদাত (মাঝখানে)। ছবি-এপি।

কায়রোর রাজপথে সাদাত : ইসমাইলিয়া আর সুয়েজ ইজরাইলের দখলে

তৃতীয় আরব-ইজরাইল যুদ্ধে একটি বিদেশি কৃষি খামার দখলে নিয়েছিল ইজরাইল। এই খামার পরিচালনা করত একদল জাপানি বিশেষজ্ঞ, কিন্তু ইহুদি সেনারা ভেবেছিল এরা চাইনিজ। এবার চতুর্থ আরব-ইজরাইল যুদ্ধে (ইয়োম কিপুর) মিশরীয়রা পুনর্দখল করে নিতে সক্ষম হয় খামারটি। কিন্তু ১৫ অক্টোবর ইসরাইলি সেনারা ফার্মটির ওপর ট্যাংক হামলা শুরু করে। পরদিন সকালে ১৫টি ছোট্ট ছোট্ট ফেরি খালে আনা হয়।

এগুলো দিয়ে ইজরাইলি ট্যাংক নিয়ে যাওয়া হয় সুয়েজের পশ্চিম পাড়ে। ইহুদি সেনাদের এগিয়ে যাওয়ার তথ্য মিশরীয় কমান্ডের কাছে ছিল না।

সকালে প্রেসিডেন্ট সাদাত নেমেছেন কায়রোর রাজপথে এক বিজয় কুচকাওয়াজে নেতৃত্ব দিতে। খালের পশ্চিম পাড়ে আকস্মিক ইজরাইলি হামলা শুরুর পরই ঘুম ভাঙে মিশরীয়দের। খাল অভিমুখী সড়কটিতে মিশরীয় যে সেনাদলটি ইজরাইলিদের বাধা দিতে এগিয়ে যায়। দুদিনের প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর তারা হাল ছেড়ে দেয়, তবে পিছু হটার আগে পেছনে রেখে যায় ইহুদি সেনাদের লাশের মিছিল। উরি ড্যান নামে এক ইহুদি সাংবাদিক বলেন–

> 'হ্যাঁ, প্রধানত আহত ও নিহতদের বিপুলসংখ্যার কারণে এটা ছিল একটি বেদনাময় বিজয়। খাল পার হওয়ার এক রাতেই আমরা ৪ শত লোক হারাই।'[৬৯]

১৮ই অক্টোবর সুয়েজ খালের পশ্চিম তীরে তিনটি সাঁজোয়া ডিভিশন মোতায়েন করে ইজরাইল। একটি ডিভিশন মিশরের ইসমাইলিয়া এলাকা দখল করে নেয়। অন্য দুটি ডিভিশন দক্ষিণে গিয়ে সুয়েজ শহরের নিয়ন্ত্রণ নেয়। এরপরই সাদাত সোভিয়েত রাষ্ট্রদূতকে জানালেন, তিনি যুদ্ধবিরতি মানছেন। তবে সাদাতের যুদ্ধবিরতিতে আগ্রহ ছিল না ইজরাইলের। তারা চেয়েছিল আরও এলাকা নিয়ন্ত্রণে আসুক।

ইয়োম কিপুরের যুদ্ধে হারার আরেক কারণ বিশ্বাসঘাতকতা

৬ অক্টোবর, ১৯৭৩। মধ্যরাত। লন্ডনের ছয়তলা এক ভবনে এক বিদেশির সাথে বৈঠকে বসেছেন মোসাদপ্রধান জভি জামির। এই বিদেশিকে মোসাদের লোকজন চেনে 'অ্যাঞ্জেল' নামে। বৈঠকে আছেন তৃতীয় আরেকজন। তিনিও মোসাদের চর- কোড নাম 'ডুবি'। দুই ঘণ্টা ধরে চলে কথাবার্তা। এরপর বিদেশি বেরিয়ে যায়, তবে তার আগে অপর একটি কক্ষে নিয়ে তার হাতে তুলে দেওয়া হয় এক লাখ মার্কিন ডলার।

বৈঠকে চমকে যাওয়ার মতো কিছু তথ্য পান মোসাদপ্রধান, যা তাকে অস্থির করে তোলে। দ্রুতই নিজ দেশে একটি টেলিগ্রাম পাঠাতে চাইলেন জামির, কিন্তু সেটা সম্ভব হলো না যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে। টেলিগ্রাম পাঠাতে ব্যর্থ হয়ে নিজের স্টাফ অফিসার এইনির বাড়িতে দেন ফোন। কয়েক দফা ফোনের পর আধাঘুমন্ত অবস্থায় রিসিভার উঠালেন এইনি। তাকে কাপড়-চোপড় পরে মোসাদ সদর দপ্তরে গিয়ে সবাইকে জাগানোর নির্দেশ দিলেন জামির। বসের নির্দেশ পেয়ে ফ্রেডি এইনি ইজরাইলের

---

৬৯. ৭৩-এর যুদ্ধে আরবদের পরাজয়ের কারণ– আরব ইসরাইল যুদ্ধে যে কারণে হেরে যায় আরবরা, মূল লেখক হুসেইন আল-রাজ্জাজ, হোসেন মাহমুদের করা অনুবাদ প্রকাশিত হয় অন্যদিগন্তে, ২০১৭ সালের ৩ অক্টোবর।

রাজনৈতিক ও সামরিক নেতাদের নিয়ে বৈঠক ডাকেন। ইজরাইল জেনে গেল– আজই তাদের বিরুদ্ধে শুরু হবে যুদ্ধ! লন্ডনে এ তথ্যটাই মোসাদপ্রধানকে জানিয়েছিলেন 'অ্যাঞ্জেল'; ছদ্মবেশী ওই বিদেশি।

আরবরা ইজরাইল আক্রমণ করবে– এমনটা বিশ্বাস করতে চাননি আরেক ইহুদি গোয়েন্দা সংস্থা 'আমান'-এর প্রধান জেনারেল এলি জেইরা। পালটা কতগুলো গোয়েন্দা রিপোর্ট হাজির করে জেইরা বলেন, যুদ্ধের মতো কোনো ঘটনা ঘটবে না। দুই গোয়েন্দা সংস্থার মধ্যে শুরু হলো রশি টানাটানি।

এ অবস্থায় আরেকটি গোপন বার্তা আসে, যাতে বলা হয়– সিরিয়া ও মিশরে নিযুক্ত রুশ সামরিক উপদেষ্টাদের পরিবারের সদস্যরা জরুরি ভিত্তিতে দুই দেশ ছাড়ছেন। সন্দেহ আরও বাড়ল, কিন্তু কিছুতেই আমান প্রধান মিশর-সিরিয়ার সম্ভাব্য আক্রমণের কোনো কারণ খুঁজে পেলেন না। এর আগেও অন্তত দুই দুফায় আক্রমণের ভুল বার্তা দিয়ে পরে সেগুলো প্রত্যাহার করেছিলেন অ্যাঞ্জেল।

লন্ডন থেকে দেশে ফিরেই মোসাদ জানালেন, সূর্যাস্তের আগেই ইজরাইল আক্রান্ত হবে! কিন্তু আমানপ্রধান তখনও মত বদলাচ্ছেন না। বেলা দুইটার দিকে সাংবাদিকদের ডেকে নিয়ে তিনি বললেন, যুদ্ধ বাধার আশঙ্কা সামান্যই। সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্যেই আক্রান্ত হওয়ার বার্তা চলে এসেছে আমানপ্রধানের হাতে। মুখ ভার করে বেরিয়ে গেলেন জেনারেল জেইরা। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বেজে উঠল বিমান আক্রমণের সাইরেন।

তারপর কী ঘটল?

অ্যাঞ্জেল-এর কথাই ঠিক হলো, কিন্তু বিপত্তি বাধল আরেক জায়গায়। আমানের লোকজন রটিয়ে দিলো, এই বিদেশি মোসাদপ্রধানকে বিভ্রান্ত করেছেন। কীভাবে? অ্যাঞ্জেল জানিয়েছিলেন, যুদ্ধ শুরু হবে সন্ধ্যায় অথচ দুপুরেই মিশরীয়রা আঘাত হানল। আক্রমণের তারিখ ঠিক রাখলেও পরে ক্ষণ বদলে ফেলেছিল মিশর কর্তৃপক্ষ। আর তাই অ্যাঞ্জেলকে নিয়ে মোসাদ আর আমানের মধ্যে বিবাদ থেকেই গেল।

অ্যাঞ্জেলের দেওয়া তথ্যে বড়ো ধরনের মিসাইল যুদ্ধও এড়ানো গেছে। মিশরীয় বাহিনী ইজরাইলি সেনা অবস্থানে স্কাই মিসাইল ছুড়েছিল। পালটা আকাশ হামলার বড়ো ধরনের প্রস্তুতি নিচ্ছিল ইজরাইলি বাহিনী। অ্যাঞ্জেল নিশ্চিত করলেন, মিশরের দিক থেকে আর কোনো মিসাইল হামলা হচ্ছে না। ইজরাইল আপাতত চুপ থাকল।

অক্টোবরের ২৪ তারিখে ইয়োম কিপুর যুদ্ধের অবসান হলো। গোলানে সিরিয়ার বাহিনীকে হটিয়ে দিয়ে ইজরাইলি গোলন্দাজ বাহিনী পৌঁছে যায় দামেস্কের একেবারে উপকণ্ঠে। মিশর ফ্রন্টেও ব্যাপক সফলতা পায় ইহুদি সেনারা; কায়রো থেকে তারা মাত্র ৬৩ কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছিল।

যুদ্ধের পর গণচাপে পড়ে একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করে ইজরাইল কর্তৃপক্ষ। সেই কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চাকরি ছাড়তে হয় আমানপ্রধান জেনারেল জেইরাকে। বরখাস্ত করা হয় মোসাদপ্রধান জামিরের চিফ অব স্টাফ ডেভিডকেও। ক্ষেপলেন গোয়েন্দা কর্মকর্তা জেইরা। তারপর?

কে এই অ্যাঞ্জেল?

'অ্যাঞ্জেল' দ্রুতই নায়কে পরিণত হলেন। সারা বছর ধরে ইজরাইলি পত্র-পত্রিকায় তাকে নিয়ে লেখা হয় অসংখ্য গল্প, উপকথা আর প্রতিবেদন। তিনি যে মিশরেরই কেউ হবেন, তা কারোরই বোঝার বাকি থাকল না। কিন্তু নাম-পরিচয়টাই অজানা থেকে যাচ্ছিল। একটা সময় পর পরিচয় আর চেপে রাখা যায়নি। প্রথমে গণমাধ্যম, তারপর সাবেক গোয়েন্দা কর্মকর্তারাই ফাঁস করে দেয় অ্যাঞ্জেল রহস্য। 'আমান' থেকে বিতাড়িত জেনারেল জেইরা চুপ থাকেননি। ইয়োম কিপুর যুদ্ধ নিয়ে লিখে ফেলেন বই।

জেনারেল এলি জেইরা তার *The Yom Kippur War: Mythvs. Reality* নামের বইয়ের প্রথম সংস্করণে এক ব্যক্তির (আশরাফ মারওয়ান) কথা উল্লেখ করেন। অবশ্য সে সময় সরাসরি মারওয়ান পরিচয় প্রকাশ করেননি তিনি। তাঁর পরিবর্তে ব্যবহার করেন মারওয়ানের ছদ্মনাম– 'দ্য অ্যাঞ্জেল'।

জেইরা দাবি করেছিলেন, অ্যাঞ্জেল একজন ডাবল এজেন্ট; ইজরাইলকে বিভ্রান্ত করতেই মিশর সরকার তাকে কায়দা করে মোসাদে ঢুকিয়েছে![৭০]

কিন্তু না ইজরাইলের গণমাধ্যম, না আদালত জেনারেল জেইরার বক্তব্য গ্রহণ করছিল। তারা অ্যাঞ্জেলকে 'ডাবল এজেন্ট' হিসেবে মেনে নেয়নি। ইহুদি সাংবাদিকরা তাদের লেখায় প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন– 'অ্যাঞ্জেলের তথ্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সঠিক ছিল এবং তিনি ইজরাইলের পক্ষেই কাজ করেছেন।'

অ্যাঞ্জেলের সত্যিকারের পরিচয় আর তার ভূমিকা নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই মোসাদ ও আমান দুটি আলাদা তদন্ত কমিটি গঠন করে। দুই কমিটির প্রতিবেদনেই বলা হয়, মারওয়ান (অ্যাঞ্জেল) ডাবল এজেন্ট ছিলেন না, তিনি ইজরাইলের জন্য ক্ষতিকর কিছু করেননি। এর মধ্যেই এক ইজরাইলি সাংবাদিকের অনুসন্ধানে বেরিয়ে যায় অ্যাঞ্জেল রহস্য। জানাজানি হয় এই অ্যাঞ্জেল আসলে 'আশরাফ মারওয়ান'।

জেনারেল জেইরা এবার তার বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে সরাসরি আশরাফ মারোয়ানের নাম উল্লেখ করেন। জেইরা আগের বক্তব্যেই অনড় থাকেন– 'অ্যাঞ্জেল মিশরের ডাবল এজেন্ট।'

---

৭০. The Story Behind the Yom Kippur Mole, The new york times, July 27, 2016, Mark Mazzetti.

অ্যাঞ্জেলের নাম-পরিচয় প্রকাশ করে রীতিমতো হইচই ফেলে দেন এই জেনারেল। তার বেফাঁস কথাবার্তাই তখন গরম খবর। তাই টেলিভিশনগুলোতে প্রায়ই ডাক পড়ত জেইরার।

জেইরার এসব বক্তব্যে ফুঁসছিলেন মোসাদপ্রধান জাভি জামির। মোসাদ কর্তার বক্তব্য– ইজরাইলের গোপন এজেন্টের নাম-পরিচয় ফাঁস করে জেইরা রাষ্ট্রীয় নিয়মনীতি লঙ্ঘন করেছেন, তাই তার বিচার হওয়া উচিত। জেনারেল জেইরা তারপরও দমে যাননি। তিনি জামিরের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দেন।

অ্যাঞ্জেলের প্রকৃত নাম আশরাফ মারওয়ান। তিনি মিশরের সাবেক জাতীয়তাবাদী নেতা জামাল আবদেল নাসেরের জামাতা। আর ইয়োম কিপুর যুদ্ধের সময় ছিলেন প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের উপদেষ্টা। মারওয়ানকে ইজরাইলি এজেন্ট বা ডাবল এজেন্ট হিসেবে কখনোই মেনে নেয়নি মিশর। তাদের ভাষায়– 'এটা অসম্ভব, মারওয়ান ইজরাইলি চর হতে পারেন না!'

আশরাফ মারওয়ানকে নিয়ে এ যাবৎ যত বই বেরিয়েছে, এগুলোর বেশিরভাগই লিখেছেন ইজরাইলি সাংবাদিক ও গবেষকরা। এসব বই লিখতে গিয়ে তারা নিয়েছেন ইহুদি গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার। কেউ কেউ গোপন নথি বের করে এনে বইয়ের তথ্য ভারী করতে পেরেছেন। এমন কয়েকটি বই হলো ইউরি জোসেফ বার-এর লেখা *The Angel : The Egyptian Spy Who Saved Israel.* হাওয়ার্ড ব্লামের লেখা– *The Eve of Destruction: The Untold Story of the Yom Kippur War.* এবং অ্যারন বার্গম্যানের লেখা *The Spy Who Fell to Earth: My Relationship with the Secret Agent Who Rocked the Middle East*। এসব বইয়ে আশরাফ মারওয়ানকে ইজরাইলি এজেন্ট হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে। কোনো কোনোটিতে দাবি করা হয়েছে, মারওয়ান ইজরাইলের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ গুপ্তচর। মারওয়ানকে নিয়ে ইজরাইলি পরিচালক এরিয়েল ভ্রমেন-এর (Arielvromen) মুভি 'দ্য অ্যাঞ্জেল' (The Angel) ও বেশ আলোচিত।

ইউরি বার জোসেফ তার *দ্য এঞ্জেল* বইয়ে লিখেছেন, আনোয়ার সাদাত অনেক দিন ধরেই ইজরাইলের ওপর আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। সেই তথ্য মারওয়ানের মাধ্যমে ইজরাইল আগেই পেয়ে যায়। কিন্তু চূড়ান্ত আক্রমণের তারিখটি সাদাত গোপন রাখেন। মারোয়ান শেষ মুহূর্তে তারিখটি জানতে পারেন এবং সাথে সাথেই তা মোসাদের কাছে পৌঁছে দেন। ইউরি বার জোসেফ-এর মতে– আশরাফ মারওয়ান, যিনি মিশরের প্রেসিডেন্টের জামাতা, তিনি নিজে থেকে মোসাদে যোগ দিতে চাইবেন, আর মোসাদও তাকে সাথে সাথে বিশ্বাস করে ফেলবে– এমনটা সম্ভব না। তারা সম্ভব সব উপায়ে মারওয়ানের বিশ্বাসযোগ্যতা যাচাই করেছে। তার দেওয়া তথ্যগুলো অন্য গোয়েন্দাদের দ্বারা সত্যায়িত করেছে, আবার তাকে পালটা তথ্য দিয়ে পরীক্ষা করেছে। সম্পূর্ণ নিশ্চিত হওয়ার পরেই কেবল মারোয়ানকে নিজেদের এজেন্ট হিসেবে বরণ করে নেয় মোসাদ।

২০০৭ সালের জুনের প্রথম দিকে ইজরাইলের একটি আদালত সরকারিভাবে স্বীকার করে নেয়, জামিরের হয়ে মারওয়ান মোসাদের পক্ষে কাজ করেছেন। আদালত রায় দেন, জেইরা মারওয়ানের নাম ফাঁস করে দিয়ে আইন ভঙ্গ করেছেন। ইজরাইলি আদালতের এই রায়ের পর মারওয়ানকে রহস্যময় গুপ্তচর 'দ্য এঞ্জেল' হিসেবে মেনে নিতে কারও আপত্তি উঠার কথা নয়, কিন্তু তিনি ইজরাইলের এজেন্ট নাকি মিশরের ডাবল এজেন্ট– এই বিষয়ে বিষয়ে চূড়ান্ত কোনো সমাধান পাওয়া যায়নি।

যে বছর আদালত মারওয়ানকে ইজরাইলি এজেন্ট হিসেবে মেনে নেয়, একই বছরের ২৭ জুন বেলা দেড়টার দিকে তার নিথর মরদেহ লন্ডনের বাসার নিচে রাস্তার পাশে পাওয়া যায়। বাসার পাশের ভবনেই ছিল মারওয়ানের ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান। কোটিপতি এই ব্যবসায়ীর ছিল ওষুধের কোম্পানি।

কারা মারল মারওয়ানকে, মোসাদ না মিশরীয় চররা– এর উত্তর আজও মেলেনি। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দারাও এর কোনো কূল-কিনারা করতে পারেননি। শুরুর দিকে এটিকে আত্মহত্যা হিসেবে ধারণা করলেও আত্মহত্যার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ হাজির করতে পারেনি পুলিশ। মারওয়ান কোনো সুইসাইড নোটও রেখে যাননি।

মৃত্যুর কয়েক মাস আগে থেকে নিজের স্মৃতিকথা লিখছিলেন আশরাফ মারওয়ান। তিন খণ্ডের একটি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতও করেছিলেন তিনি। মারোয়ানের স্ত্রী মুনা নাসেরের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী মৃত্যুর পর তার ডেস্ক থেকে পাণ্ডুলিপি গায়েব হয়ে যায়। কারা করল, কেন করল– এর কোনো উত্তর নেই। ইজরাইল ও মিশর-উভয়ের দিকেই ভাসা ভাসা অভিযোগ ছিল।

মারওয়ানের মৃত্যুর পর মিশরের প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারক, যিনি একটি সম্মেলনে যোগ দিতে ঘানা সফরে ছিলেন। তিনি বিবৃতি দিয়ে বললেন, মারওয়ান একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক ছিল। মোবারক সাংবাদিকদের বলেছিলেন, মারওয়ানের ওপর অর্পিত দায়িত্ব এবং তার অপারেশনগুলো সম্পর্কে তিনি জানতেন।

মিশরীয় কর্তৃপক্ষ মারওয়ানকে নিজেদের লোকই ভাবত। তার সাথে ছিল ক্ষমতার শীর্ষে থাকা কর্তাব্যক্তিদের সুসম্পর্ক। মারওয়ানের এক পুত্রের বিয়ে হয়েছিল মিশরীয় রাজনীতিবিদ ও আরব লীগের সাবেক মহাসচিব আমর মুসার মেয়ের সাথে। তার আরেক পুত্র ছিল সাবেক প্রেসিডেন্ট হোসনে মুবারকের ছেলে জামাল মোবারকের ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন হয়েছিল আশরাফ মারওয়ানের। জানাজা পড়ান মিশরের সর্বোচ্চ ইমাম শেখ মোহাম্মদ সাইয়্যেদ তানতাউই।

জাতিসংঘের উদ্যোগ

যুদ্ধের দুই সপ্তাহ পেরিয়ে যাওয়ার পর মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার মস্কো পৌছান। যুক্তরাষ্ট্র চেয়েছিল জাতিসংঘের উদ্যোগে একটি যুদ্ধবিরতি কার্যকর করতে। ২২ অক্টোবর জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়ে ৩৩৮ নম্বর প্রস্তাব গ্রহণ করে। মধ্যপ্রাচ্য সময় সন্ধ্যা ৬টা ৩২ মিনিটে যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু ২৩ অক্টোবর সকালে দেখা যায়, ইসরাইলি বাহিনী রণাঙ্গনেই থেকে গেছে। এদিন সুয়েজ সিটি পাশ কাটিয়ে আদাবিয়া বন্দরে পৌঁছে যায় ইহুদি সেনারা।

খালের পূর্ব পাড়ে অবস্থান নিয়ে থাকা মিশরের তৃতীয় আর্মি ইসরাইলি সেনাদের দ্বারা একরকম ঘেরাও হয়ে যায়। প্রায় ৩৫ হাজার সৈন্য তাদের মূল ঘাঁটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ২৩ তারিখ আবার নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন বসে। রণাঙ্গনে জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক প্রেরণসংবলিত ৩৩৯ নম্বর প্রস্তাব গৃহীত হয়। পরদিন সকাল ৭টা থেকে যুদ্ধবিরতি কার্যকর করার সময় নির্ধারিত হয়। এবারও তা ভঙ্গ করে যুদ্ধ অব্যাহত রাখে ইজরাইল। কারণ, দেশটির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সুয়েজ বা ইসমাইলিয়ার মতো বড়ো ও গুরুত্বপূর্ণ কোনো শহর দখলে নেওয়া, যাতে যুদ্ধবিরতিতে দর কষাকষি করে বৃহত্তর রাজনৈতিক সফলতার লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়।

২৪ তারিখ সকালে নতুন যুদ্ধবিরতি কার্যকর হতে শুরু করেছে কেবল। প্রায় জনশূন্য শহরে ইসরাইলি ট্যাংকসহ সৈন্যদের চলাচল শুরু হয়। তারা মিলিশিয়াদের একটি ছোটো দলের প্রতিরোধের মুখে পড়ে। মিলিশিয়াদের তাড়িয়ে সামনে এগোয় ইজরাইলিরা, কিন্তু পেছনে রেখে যায় ৮০ জনের মরদেহ।

সেদিনই ওয়াশিংটনে একটি উদ্‌বেগজনক বার্তা পৌঁছে আর তা হলো– সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধবিরতি বাস্তবায়নে একতরফা পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বিবেচনা করছে। প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন এ সংকট মোকাবিলার জন্য পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জারকে দায়িত্ব দিলেন। কিসিঞ্জার চাইলেন শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে সোভিয়েত হুমকির জবাব দিতে, কিন্তু তার আর দরকার পড়ল না। পরদিন জাতিসংঘ ৩৪০ নম্বর প্রস্তাব গ্রহণ করল। এটি ছিল চার দিনের মধ্যে তৃতীয় প্রস্তাব।

যুদ্ধ যখন ইজরাইলের অনুকূলে, তখন অন্য আরব দেশগুলোও সিরিয়া ও মিশরের সাহায্যে এগিয়ে আসে। ইরাক, জর্ডান, সৌদি আরব ও কুয়েত সিরিয়ার বাহিনীর সাথে যোগ দেয়। সম্মিলিত এই আরববাহিনী দিয়ে সিরিয়ার মূল ভূখণ্ডে বিভিন্ন দখল করা স্থান থেকে ইজরাইলিদের হটানোর পরিকল্পনা করা হয়। এ আক্রমণের তারিখ নির্ধারণ করা হয় ২৩ অক্টোবর, কিন্তু তা আর হয়নি। কারণ, আনোয়ার সাদাত জাতিসংঘের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব মেনে নিয়েছিলেন ২৩ তারিখ সন্ধ্যা থেকেই।

এ অবস্থায় হাফেজ আল-আসাদ লড়াই করার ঝুঁকি নিলেন না। এদিকে, বিজয়ী ইজরাইল এবার নজর দেয় হারমন পর্বতের সেই জায়গায় যেটি যুদ্ধের প্রথম দিনেই সিরীয় ছত্রী সেনারা দখলে নিয়েছিল। ২৩ অক্টোবর সিরীয়দের সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয় ইজরাইলি সেনারা। দুশোর বেশি ইজরাইলি সেনা বন্দি হয়েছিল মিশর ও সিরিয়ার বাহিনীর কাছে।
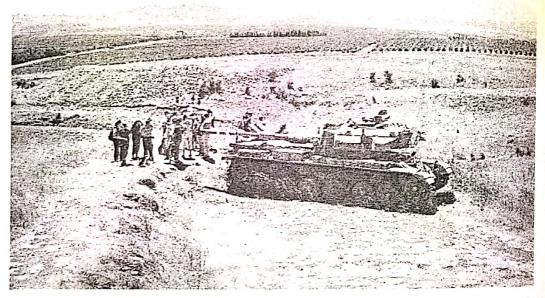
Thevalley of Tears (Emek Habaha), where Israel stopped the Syrians in 1973 Yom Kippur War. (Shmuel Bar-Am), times of israel

ইসরাইলের রাজপথে নেমে ক্ষোভ জানাতে থাকে দেশটির জনগণ। তারা ইহুদি যুদ্ধবন্দিদের ছাড়িয়ে আনতে গোল্ডামেয়ার সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। ২৮ অক্টোবর মিশর আর ইজরাইলের সেনা কর্মকর্তারা যুদ্ধবিরতির জন্য আলোচনায় মিলিত হন। ২৫ বছরের মধ্যে দুই দেশের সামরিক পর্যায়ে এটাই ছিল প্রথম বৈঠক, কিন্তু আলোচনা গতি পায়নি।

শাটল কূটনীতি

ইজরাইলি আগ্রাসনের বিপরীতে আরব দেশগুলো তেল অবরোধ দিলে তেলের দাম বেড়ে হয় তিন-চারগুণ। এটি ছিল ইজরাইলের পশ্চিমা মিত্র যুক্তরাষ্ট্রের জন্য আতে ঘাঁ লাগার মতো কিছু। কারণ, তখন মার্কিনিরাই ছিল তেলের সবচেয়ে বড়ো আমদানিকারক। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার কায়রোতে আনোয়ার সাদাতের সাথে প্রথমবারের মতো বৈঠকে মিলিত হলেন নভেম্বরের ৬ তারিখে। সপ্তাহখানেক পর দুই পক্ষের মধ্যে বন্দিবিনিময় ঘটে। ১৯৭৪ সালের শুরুতে আবার এ অঞ্চল সফরে আসেন কিসিঞ্জার।

১১ জানুয়ারি মিশরের আসওয়ান শহরে সাদাতের সাথে বৈঠকে বসেন তিনি। পরদিন যান তেলআবিব। উভয়পক্ষ রাজি হয় সৈন্য প্রত্যাহারে।

এ সময়ই আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে শাটল কূটনীতি শব্দটি চালু হয়। ১৮ জানুয়ারি মিশরীয় সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ জেনারেল মোহাম্মদ আল-গামাসি ও তার ইজরাইলি প্রতিপক্ষ জেনারেল ডেভিড এলাজার ধারাবাহিক সৈন্য প্রত্যাহারের প্রথম পর্যায়ের চুক্তিতে সই করেন। এর ভিত্তিতে সিনাই থেকে ইসরাইলি সেনা প্রত্যাহার করা হয়। ইজরাইল বিজয় উদ্‌যাপন করলেও সাধারণ সৈনিকদের হৃদয়ে চলছিল রক্তক্ষরণ। কারণ, তারা হারিয়েছে আড়াই হাজার সহযোদ্ধাকে। সর্বোচ্চ আদালতের প্রেসিডেন্টের নেতৃত্বে গঠন করা হয় বিচার বিভাগীয় কমিটি। কমিটি ব্যাপক প্রাণহানির জন্য দায়ী করে সেনাবাহিনীকে। দায়মুক্তি পেলেন ইজরাইলি প্রধানমন্ত্রী গোল্ডামেয়ার ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী মোশে দায়ান, কিন্তু সাধারণ ইজরাইলিরা রাজপথে নেমে যায়। কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের নয় দিন পরই পদত্যাগ করেন গোল্ডামেয়ার।

এবার সিরিয়ার দিকে নজর দিতে হয় আমেরিকাকে। কারণ, সিরিয়ায় ঢুকে পড়া ইহুদি সেনারা তখনও স্বদেশে ফেরেনি। ১৯৭৪ সালের মে মাসে কিসিঞ্জার দামেস্ক ও তেলআবিবের মধ্যে দ্বিতীয় দফা শাটল কূটনীতি শুরু করেন। মাসখানেক আলোচনার পর সফল হন কিসিঞ্জার। ২৮ মে ইজরাইল সিরিয়া থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করতে রাজি হয়। ৫ জুন জেনেভায় সেনা প্রত্যাহারের চুক্তি সই হয়। শুরুর ২৪৩ দিন পর আনুষ্ঠানিকভাবে অবসান ঘটে চতুর্থ আরব-ইজরাইল যুদ্ধের। এই যুদ্ধের পর বিভিন্ন সময়ে যুক্তরাষ্ট্র ইজরাইলকে খোটা দেওয়া অব্যাহত রাখে এই বলে– 'তারাই আরবদের কাছ থেকে ইজরাইলকে রক্ষা করেছিল।'[৭১]

সিআইএ কি যুদ্ধের আগাম খবর জানত

সিআইএসহ কোনো মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাই ইয়োম কিপুর যুদ্ধ পরিকল্পনার কিছুই আঁচ করতে পারেনি। গোয়েন্দা সংস্থা আমানের মতোই সিআইয়ের ধারণা ছিল– আরবরা ইজরাইল আক্রমণ করবে না। ৭৩-এর আরব-ইজরাইল যুদ্ধ নিয়ে সিআইএ তাদের ওয়েবসাইটে লিখেছে–

> 'This collection highlights the causes and consequences of US Intelligence Community's (IC) failure to foresee the October 1973 Arab-Israeli War, also known as the October War or the Yom Kippur War. A coalition of Arab nations led by Egypt and

[৭১]. Kissinger Wants Israel to Know: The U.S. Saved You During the 1973 War, Nov 02, 2013, www.haaretz.com.

Syria launched a surprise attack on Israel on October 6, the day of Yom Kippur. Prior to October 6, the CIA concluded that the Arabs would not attack, so the offensive surprised US policymakers as well as Israel.'[৭২]

মোসাদ আগাম জানতে পারলেও আক্রমণের সঠিক সময়টি ধরতে পারেনি। যুদ্ধের শুরুর দিকে ৮ অক্টোবর মারাত্মক বিপর্যয়ের মুখে ইজরাইলি প্রধানমন্ত্রী সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার অনুমোদন করেন। রিচার্ড নিক্সন অস্ত্র সরবরাহ নিশ্চিতে ওয়াশিংটন ও তেলআবিবের মধ্যে বিমান-সেতু প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেন। অন্যদিকে, আরবদের অস্ত্র সরবরাহ অব্যাহত রাখে সোভিয়েত ইউনিয়ন। ইজরাইল সিরিয়া উপকূলে একটি রুশ বাণিজ্য জাহাজ ডুবিয়ে দিলে পালটা জবাব হিসেবে দুটি যুদ্ধজাহাজ মোতায়েন করে সোভিয়েত ইউনিয়ন। যেসব পণ্যবাহী জাহাজ সিরিয়ার লাতাকিয়া বন্দরের দিকে যেত, সেগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই ছিল নতুন মোতায়েন করা এই দুটি যুদ্ধজাহাজের কাজ। তবে যেভাবে প্রত্যাশা করা হয়েছিল, সে রকম রুশ সহায়তা মেলেনি; পরিণতিতে মস্কোর সাথে কায়রোর বিদ্যমান উষ্ণ সম্পর্ক আর টেকানো যায়নি। আনোয়ার সাদাত কার্যতই ঝুঁকে পড়লেন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে। সোভিয়েত নেতা লিওনিদ ব্রেজনেভের একটি মন্তব্য এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে—

'আমরা বহুদিন ধরে তাদের (আরবদের) বিচক্ষণতার পরিচয় দেওয়ার জন্য বলে আসছি, কিন্তু তারা যুদ্ধ করতে চাইল। বেশ! আমরা তাদের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সহায়তা দিয়েছি, যা কিনা ভিয়েতনামকেও দেওয়া হয়নি। ট্যাংক ও জঙ্গিবিমানের ক্ষেত্রে তাদের ইজরাইলের চেয়ে দ্বিগুণ এবং আর্টিলারির ক্ষেত্রে তিনগুণ শ্রেষ্ঠত্ব ছিল। বিমান প্রতিরক্ষা ও ট্যাংক বিধ্বংসী অস্ত্রের ক্ষেত্রেও তারা সম্পূর্ণ এগিয়ে ছিল। কিন্তু আবারও তারা ব্যর্থ হয়েছে। তাদের রক্ষায় এগিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের সাহায্য চেয়ে চিৎকার করেছে। সাদাত মধ্যরাতে দুইবার টেলিফোনে আমার ঘুম ভাঙান। তিনি আমাকে তৎক্ষণাৎ সোভিয়েত সৈন্য পাঠানোর অনুরোধ জানান, কিন্তু আমি তাকে জানাই— "না, আমরা তোমাদের জন্য যুদ্ধ করতে যাচ্ছি না।"'

যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় ইজরাইলের প্রতি মার্কিন সমর্থনের প্রতিবাদে ১৬ অক্টোবর সৌদি বাদশাহ ফয়সাল তেলের দাম বাড়ানোর ঘোষণা দেন, যা তেল অবরোধ নামে পরিচিত। সৌদি আরবের সাথে এই অবরোধে যোগ দেয় ইরান, ইরাক, কুয়েত, কাতার, আরব আমিরাত ও বাহরাইন। ১৭ অক্টোবর থেকে প্রতি মাসে ৫ শতাংশ করে তেল উৎপাদন কমানোর ঘোষণা কার্যকর হয়। ১৯ অক্টোবর ইজরাইলকে ২২০ কোটি

---

[৭২]. President Nixon and the Role of Intelligence in the 1973 Arab-Israeli War, www.cia.gov

ডলারের অস্ত্র সহায়তা প্রদানের বিল মার্কিন কংগ্রেসে পাঠিয়ে এর জবাব দেয় নিক্সন প্রশাসন। প্রতিক্রিয়ায় তেল অবরোধ আরও তীব্র হয়। ২০ অক্টোবর থেকে যুক্তরাষ্ট্রে তেল রপ্তানি পুরোপুরি বন্ধ করে দেয় ইরাকসহ অন্য দেশগুলো।

বাদশাহ ফয়সাল নিক্সনকে উদ্দেশ্য করে বললেন–

> 'প্রয়োজনে আমরা আবার তাঁবুতে ফিরে যাব, উটের দুধ খেয়ে বাঁচব, কিন্তু তেল ছাড়া তোমাদের এসব গাড়ি দিয়ে কী হবে?'[৭৩]

কুয়েত সিটিতে অবরোধ আরোপ করা সাতটি দেশের জ্বালানিমন্ত্রীরা বৈঠকে বসেন। ইরাকের জ্বালানিমন্ত্রী চেয়েছিলেন– যুক্তরাষ্ট্রের ওপর কঠোর চাপ প্রয়োগ করতে। তিনি প্রত্যেকটি আরব দেশে থাকা মার্কিন ব্যাবসা-প্রতিষ্ঠানগুলোকে জাতীয়করণের পক্ষে মত দেন; যদিও এ প্রস্তাব অন্যরা গ্রহণ করেননি।

এই অবরোধের ফলাফল কী হয়েছিল, তা আগেই খানিকটা আলোচনা করা হয়েছে। তেলের দাম বেড়ে হয়েছিল কয়েকগুণ। আরবদের হালকা করে দেখার ঐতিহ্য থেকে বেরিয়ে আসে যুক্তরাষ্ট্র। যুদ্ধ থামাতে শাটল কূটনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছিল পশ্চিমের এই পরাশক্তিকে। পাঁচ মাসের অবরোধ শেষে তা প্রত্যাহার করা হয়েছিল ১৯৭৪ সালের ১৮ই মার্চ, যেখানে ১৯৭০ সালের পহেলা জানুয়ারি বিশ্ববাজারে এক ব্যারেল সৌদি পেট্রোলিয়ামের মূল্য ছিল ১.৩৯ ডলার। ১৯৭৪ সালের পহেলা জানুয়ারি তা বেড়ে দাঁড়াল ৮.৩৪ ডলারে।[৭৪]

---

[৭৩]. Inside the Kingdom: Kings, Clerics, Modernists, Terrorists, and the struggle for Saudi Arabia, Robert Lacey.

[৭৪]. Confessions of an Economic Hit Man, John Perkins, অনুবাদ-দেবাশিস চক্রবর্তী, পৃষ্ঠা-১১১

দ্বাদশ অধ্যায়

হামাস উত্থানের গল্প

'Hamas is not hostile to Jews because they are Jews. We are hostile to them because they occupied our land and expelled our people.... We did not say we want to throw the Jews in the sea or feed them to sharks. We just said that there is a land called occupied Palestine. It was burglarized and it needs to be returned to the Palestinian people.'—Ismail Hanieh

পিএলও ও ইয়াসির আরাফাত

যে বছর চতুর্থ আরব-ইজরাইল যুদ্ধ শুরু হয়, তার পরের বছর (১৯৭৪) লেবাননের বৈরুতে খোলা হয় পিএলও'র সদর দপ্তর। এটিই তাদের প্রথম সদর দপ্তর। ইয়াসির আরাফাতকে কেন্দ্র করে শুরু হয় ফিলিস্তিনিদের নয়া স্বাধীনতা আন্দোলন। জন্মের বছরেই জাতিসংঘের পর্যবেক্ষকের মর্যাদা পায় পিএলও। পিএলও-কে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়। এর মধ্য দিয়েই আরাফাত প্যালেস্টাইনের রাষ্ট্রপ্রধানের মর্যাদা লাভ করেন এবং পিএলও পায় আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি।

পিএলও'র সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠার বছরে মরক্কোর রাজধানী রাবাতে বসে ওআইসির শীর্ষ সম্মেলন। সেখানেও আরাফাত ও তার সংগঠন পিএলও-কে প্যালেস্টাইনের একমাত্র বৈধ প্রতিনিধিত্বের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে ১৯৭৭ সালের ২৯ শে নভেম্বরকে 'প্যালেস্টাইন দিবস' ঘোষণা করে জাতিসংঘ। সে বছরই ইজরাইল রাষ্ট্রের ক্ষমতায় বসে কট্টর ইহুদিবাদী রাজনৈতিক দল লিকুদ পার্টি। মেনাখেম বেগিন হন ইজরাইলের প্রধানমন্ত্রী, যিনি একসময় ইহুদি সশস্ত্র সংগঠন ইরগুনের নেতা ছিলেন।[৭৫] '৭৭ থেকেই লিকুদ ও লেবার এই দুই দলীয় রাজনৈতিক রাষ্ট্রে রূপ নেয় ইজরাইল। এ রকম কার্যত দ্বি-দলীয় রাজনীতি আরও কিছু দেশে দেখা যায়, যার একটি ইজরাইলের গুরুত্বপূর্ণ মিত্র- যুক্তরাষ্ট্র।

---

[৭৫]. প্যালেস্টাইনের বুকে ইজরাইল, আসাদ পারভেজ, পৃষ্ঠা ১৩৩

১৯৭৮ সালে মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত প্রথম মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে ইজরাইল সফরে যান। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের মধ্যস্থতায় ওই বছরের ১৭-ই নভেম্বর আনোয়ার ও বেগিন ক্যাম্প ডেভিডে দুটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। প্রথম চুক্তি অনুযায়ী মিশর ও ইজরাইল এক বছরের মধ্যে শান্তি-চুক্তিতে স্বাক্ষর করবে : সিনাই থেকে ইজরাইলি বাহিনী প্রত্যাহার হবে। দ্বিতীয় চুক্তি অনুযায়ী প্যালেস্টাইনের ভবিষ্যৎ নিয়ে উভয় দেশ একসঙ্গে কাজ করবে।

তবে উভয় চুক্তিই ছিল অস্পষ্ট। যেখানে জাতিসংঘ আর ওআইসি ইয়াসির আরাফাত ও পিএলও-কে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের বৈধ প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে, সেখানে মিশর ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে ইজরাইলের সঙ্গে কোনো চুক্তি স্বাক্ষর করতে পারে কি না, এ নিয়ে প্রশ্ন উঠে এবং এই প্রশ্ন উঠাই ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। মিশর-ইজরাইল চুক্তির পর আরব ও মুসলিম বিশ্ব ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়। ওআইসি ও আরব লীগ থেকে বহিষ্কার করা হয় মিশরকে। ১৯৮০ সালে বৈরুত থেকে পিএলও'র সদর দপ্তর সরিয়ে নেওয়া হয় পূর্ব জেরুজালেমের ওরিয়েন্ট হাউজে।

নিজের বুকে ছুরি

আবার অতীতে ফেরা যাক।

সত্তরের দশকে প্যালেস্টাইনে প্রভাব বাড়তে থাকায় মুসলিম ব্রাদারহুডকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করতে শুরু করে ফাতাহ। এই সুযোগে ব্রাদারহুড ও ফাতাহ-এর মধ্যে বিরোধ উসকে দেয় ইজরাইল। দেশটি ব্রাদারহুডকে কিছুটা কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়– কোনোরকম বাধা না দিয়ে। এর মধ্য দিয়ে মূলত নিজের বুকেই ছুরি চালায় ইজরাইল। এ জন্য অবশ্য চড়া মূল্যও দিতে হয়েছে ইজরাইলকে। কারণ, শিগগিরই এই ব্রাদারহুডের-ই একদল নেতা ফাতাহর চাইতেও ইহুদিদের জন্য যমদূত হয়ে দেখা দেন।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী থাকাকালে আইজ্যাক রবিনকে নেসেট মেম্বাররা একবার প্রশ্ন করেছিল– তিনি কেন শেখ আহমেদ ইয়াসিনের 'ইসলামিক কম্পাউন্ড'-কে অর্থ দিয়ে সহায়তা করছেন? জবাব ছিল– পিএলও'র প্রভাব কমাতে। তখন ইসলামিক কম্পাউন্ড ছিল কেবলই একটা এনজিও। ইসলামিক কম্পাউন্ডের যে লাইসেন্স নেওয়া হয়, তার উদ্দেশ্য ছিল খেলাধুলা; যদিও পরবর্তী সময়ে ইয়াসিন এটিকে ধর্মীয় প্রচারের কাজে লাগান। একসময় গাজার সবচেয়ে বড়ো ফাউন্ডেশনে রূপ নেয় ইসলামিক কম্পাউন্ড। চোখ কপালে উঠা ইজরাইল দ্রুতই কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করে ব্রাদারহুডের কার্যক্রমের ওপর।

তৃতীয় আরব-ইজরাইল যুদ্ধ থেকেই প্যালেস্টাইনে ব্রাদারহুডের জনপ্রিয়তা বাড়ছিল। ব্রাদারহুড নেতা শেখ আহমেদ ইয়াসিন ১৯৭৩ সালে 'আল মুজাম্মা আল ইসলামি' নামে

একটি সংগঠন খোলেন। মূলত এর মাধ্যমেই ফিলিস্তিনে ব্রাদারহুডের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম শুরু হয়। তারা গাজার শরণার্থী ক্যাম্পগুলোতে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য, ডে-কেয়ার ও ফুড সার্ভিস দেওয়া শুরু করে। দ্রুতই বাড়ে ইয়াসিনের জনপ্রিয়তা, বিশাল হতে থাকে তার কর্মী-সমর্থকের বহর। ১৯৮৪ সালে একবার গ্রেফতার হন ইয়াসিন, তবে পরের বছরই তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ইজরাইলি বাহিনীর ধারাবাহিক অভিযানের মুখে 'প্যালেস্টাইন ইসলামিক জিহাদ' যখন ক্ষয়প্রাপ্ত, তখনই ফাতাহ ও ইজরাইলকে চালেঞ্জ করে বড়ো শক্তি হিসেবে দৃশ্যপটে আসে হামাস।

১৯৯০-এর দশকে পিএলও দুটি ছাড় দেয়। তারা পুরো প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতার দাবি থেকে সরে আসে ইজরাইলকে স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমে; মেনে নেয় ইজরাইলের অস্তিত্ব। পশ্চিম তীর ও গাজাকে নিয়ে একটি প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র গঠনের আশ্বাসে দীর্ঘদিনের সশস্ত্র সংগ্রামও ছেড়ে দেয় পিএলও। (Hamas : A Beginner's Guide, by Khaled Hroub)

১৯৮৭ সালের ৮ ডিসেম্বর। ইজরাইলি আর্মির এক ট্রাকের সাথে অপর একটি গাড়ির ধাক্কায় গাজায় বসবাস করা চার ফিলিস্তিনি শ্রমিক নিহত ও আরও কয়েকজন আহত হন। ওই রাতেই প্রতিবাদ-বিক্ষোভে ফেটে পড়ে ফিলিস্তিনিরা। প্রথম ইন্তিফাদার শুরু এভাবেই; যদিও হামাস আনুষ্ঠানিকভাবে ইন্তিফাদার ঘোষণা দেয় ১৪-ই ডিসেম্বর।

প্যালেস্টাইনের ব্রাদারহুডপন্থিরা দুই ভাগে ভাগ হয়ে যান। একপক্ষ সরাসরি যান সহিংসতার দিকে, আরেকপক্ষ ব্রাদারহুড প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে ইজরাইল বিরোধী প্রচারণা শুরু করেন। ইজরাইলকে প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে ঠিক এ সময়েই দ্বিতীয় গ্রুপটিকে নিয়ে শেখ ইয়াসিনদের হাত ধরে হামাসের জন্ম। ১৯৮৭ সালের ডিসেম্বর কিংবা পরের বছরের জানুয়ারির দিকে শেখ ইয়াসিন 'হারাকাত আল মুকাওয়াম্মা আল ইসলামিয়া' নামে এক সংগঠনের জন্ম দিলেন, সংক্ষেপে যার নাম 'হামাস'। ইংরেজিতে এর নাম 'ইসলামিক রেসিসটেন্স মুভমেন্ট'। প্রথম ইন্তিফাদা শুরুর মাত্র পাঁচদিন পর গাজার রাজপথে লিফলেট বিলি করতে শুরু করে হামাস; আগে যেমনটা পিএলও করত।

পিএলও যে ফিলিস্তিনের বৈধ প্রতিনিধি, তা চালেঞ্জ করে বসে হামাস। চলে সমর্থক বাড়ানোর কার্যক্রম। এভাবেই হামাস-ফাতাহ/পিএলও'র দ্বন্দের শুরু। ইজরাইলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের কথা বলে ফাতাহ সমর্থকদের দলে ভেড়াতে থাকে হামাস। রাজনীতিতে তখনও সক্রিয় ভূমিকা রাখতে না পারলেও গাজার ৪০ শতাংশ মসজিদের নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতেই থাকল– শেখ আহমেদ ইয়াসিনের হাতে গড়া ইসলামিক সেন্টারের বদৌলতে। এতদিন যারা ফাতাহর কার্যক্রমকে সমর্থন দিত, তারা কেন হামাসের দিকে ঝুঁকল– এ বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

আসলেই ইজরাইলের ধ্বংসাত্মক কার্যক্রমের বিপরীতে পিএলও'র অপেক্ষাকৃত লিবারেল ও ধীরগতির সংগ্রাম ফিলিস্তিনিদের মধ্যে হতাশা বাড়িয়ে তুলছিল। তারা আরও বড়ো ধরনের প্রতিরোধ প্রত্যাশা করছিল। ফিলিস্তিনিদের এই হতাশা থেকে মুক্তির পথ দেখাতে চাইলেন শেখ ইয়াসিন। ইয়াসিনের হামাস সেই লক্ষ্য নিয়েই এগোতে থাকল। ধীরে ধীরে গাজা ও পশ্চিম তীরের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও ইসলামিক কেন্দ্রগুলোতে ফাতাহকে চ্যালেঞ্জ করতে থাকল হামাস সমর্থকরা। ফাতাহর বুঝতে দেরি হলো না- হামাস তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠছে। ব্রাদারহুড সদস্য ইজ্জেদিন আল কাসেমের জীবন-সংগ্রাম অনুসরণ করে নতুন এক সংগ্রামের সূচনা করেছিল হামাস।

ইজ্জেদিন আল কাসেম ব্রিগেড

> 'তোমরা (ফিলিস্তিনি আরব) হলে খরগোশের জাত। যারা মৃত্যুভয়ে ভীত, আর অকাজের কথা বেশি বলো। তোমাদের জানা উচিত, ইহুদিদের আগ্রাসনের বিপরীতে অস্ত্র ছাড়া অন্য কিছুতে আমাদের রক্ষা নেই।'
> —ইজ্জেদিন আল কাসেম।

এক

২৩ ডিসেম্বর, ১৯৩২। জেজরিল উপত্যকার এক বাড়িতে বোমা ছুড়ে একদল লোক। ছেলেসহ বাড়ির কর্তা নিহত হয়, কিন্তু শিগগিরই হামলাকারীদের কয়েকজন ধরা পড়ে যায়। বেরিয়ে আসে 'ব্ল্যাক হ্যান্ড' নামের এক গুপ্ত সংগঠনের নাম। এর প্রতিষ্ঠাতা ইজ্জেদিন আল কাসেম।

১৮৮২ সালে সিরিয়ার বন্দর নগরী লাতাকিয়ার অদূরে জন্ম নেওয়া কাসেম ছিলেন মুসলিম ব্রাদারহুডের সদস্য। তিনি পড়েছেন কায়রোর আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে। তখনকার সময়ে শরিয়া আইন ও ইসলামিক স্টাডিজের জন্য আল আজহারের ছিল বিশ্বজোড়া খ্যাতি। আল আজহারে থাকতেই কাসেম উজ্জীবিত হন জিহাদের আদর্শে।

১৯২০ সালে ফরাসি বাহিনী সিরিয়া দখল করে নেয়। তখন থেকেই সেখানে কার্যকর হয় ফরাসি ম্যান্ডেট। আরব জাতীয়তাবাদীরা ফরাসিদের ভালোভাবে মেনে নিতে পারেননি। অন্য আরবদের মতো কাসেমও এই বিদেশি বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা আক্রমণে শরিক হন। সিরিয়ার উত্তর উপকূলে কিছু সহযোদ্ধা নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন তিনি। নিজের বাড়ি বিক্রি করা টাকা দিয়ে কেনেন বন্দুক। ফরাসি কর্তৃপক্ষ কাসেমকে বাগে আনার কৌশল হাতে নেয়। প্রশাসনে ভালো একটি পদে যোগদানের টোপ দেওয়া হয় তাকে, কিন্তু প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন কাসেম। পরিণতিতে তার বিরুদ্ধে দেওয়া হয় মৃত্যুদণ্ডের আদেশ!

লাতাকিয়া থেকে পালিয়ে কাসেম প্রথমে দামেস্ক যান। সেখান থেকে প্যালেস্টাইনের হাইফার অদূরে গিয়ে জমি কিনে বসবাস শুরু করেন। এই ব্যক্তি মিশরের 'ইয়ং ম্যানস মুসলিম অ্যাসোসিয়েশন'-এর সাংগঠনিক কার্যক্রম প্যালেস্টাইনে নিয়ে আসেন। তার হাত ধরেই 'ব্ল্যাক হ্যান্ড' (আল কাফ আল আসওয়াদ) যাত্রা শুরু করে ১৯৩০ সালে। হাইফার শরিয়া আদালতের বিচারকের পদ পাওয়া কাসেম ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতেন ফিলিস্তিনিদের সাথে। কখনো কখনো নিজ বাড়িতেই তাদের নিয়ে মিলিত হতেন গোপন বৈঠকে। প্রথমে ছোট্ট একটি জিহাদি গ্রুপ দিয়ে তৎপরতা শুরু করলেও চার-পাঁচ বছরের মধ্যেই কাসেমের বাহিনীতে নাম লেখান কয়েকশো আরব। যোদ্ধাদের ছোটো ছোটো গ্রুপে ভাগ করেন তিনি। প্রতিটি গ্রুপে ছিল পাঁচজন করে।

ইহুদি অভিবাসন ঠেকাতে কাসেমের জিহাদি সেলের সদস্যরা ইহুদি বসতিগুলোতে আক্রমণ চালাতে শুরু করে। ব্রিটিশ সরকার অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে কাসেমের অনুসারীদের মধ্য থেকে গুপ্তচর নিয়োগের পাঁয়তারা শুরু করে। এক পর্যায়ে কাসেমের ব্ল্যাকহ্যান্ড নিষিদ্ধ হয়। ১৯৩৫ সালের ৮ নভেম্বর এক ব্রিটিশ সৈনিকের মরদেহ পাওয়া গেলে ব্ল্যাকহ্যান্ডকে দায়ী করা হয়। কাসেমের বাহিনীকে শেষ করে দিতে পাঠানো হয় কয়েকশো ব্রিটিশ সেনা। বেশ কয়েকজন অনুসারীকে নিয়ে শুরুতে আত্মগোপনে যান তিনি। ২০ নভেম্বর জেনিনের একটি গ্রামে কাসেম ও তার বাহিনীকে ঘিরে ফেলে ব্রিটিশ পুলিশ। আত্মরক্ষায় ঝাপিয়ে পড়েন কাশেম। বীরদর্পে লড়াই করে অবশেষে শক্রর গুলিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। এই বন্দুকযুদ্ধে কাসেমসহ তার কিছু অনুসারীও মারা যান। কেউ কেউ আটকও হন।

ইজ্জেদিন আল কাসেম একই সঙ্গে ছিলেন কমান্ডার ও ধর্মীয় নেতা। ব্রিটিশদের চোখে তিনি ছিলেন খুবই বিপজ্জনক শেখ। তাঁর অনুসারীদের বেশিরভাগই ছিল দরিদ্র। এদের অনেকে আবার ইহুদি আগ্রাসনের কারণে ভিটেমাটি, সহায়-সম্বল হারানো। অনুসারীদের নিয়ে ব্রিটিশ ও ইহুদি স্বার্থে বেশ কিছু সফল আঘাত হেনেছিলেন কাসেম। কাসেমের উদ্দেশ্য ছিল– ইহুদিদের তাড়িয়ে একটি স্বাধীন ও ইসলামিক ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠন করা; একই লক্ষ্য হামাসেরও। তারা ইজরাইল ও পিএলও'র নেতৃত্বাধীন ফিলিস্তিনের মধ্যকার যেকোনো চুক্তির বিরোধিতা করতে থাকে। হামাস মনে করে, মুক্তির জিহাদ দ্বারাই ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব। তাই কাসেমের নামে নামকরণ করে খোলা হয় হামাসের সামরিক শাখা– ইজ্জেদিন আল কাসেম ব্রিগেড। ইজরাইলের বিমান হামলার বিপরীতে রকেট ব্যবহার করে নিজেদের শক্তিমত্তার জানান দেয় হামাস। রকেটের নাম দেওয়া হয় 'কাসেম রকেট'।

দুই

১৯৮৮ সালের ১৫ নভেম্বর আলজিয়ার্সে জেরুজালেমকে রাজধানী করে স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রের ঘোষণা দেন ইয়াসির আরাফাত। এর প্রথম স্বীকৃতি দেয় আলজেরিয়া।

একে একে অন্যান্য আরব ও মুসলিম দেশগুলোও স্বীকৃতি দিতে থাকে। ১৯৯০ সালে পিএলও'র সদর দপ্তর জেরুজালেম থেকে তিউনিসিয়ায় স্থানান্তর করা হয়। পরের বছর ইজরাইল-ফিলিস্তিন শান্তি আলোচনা শুরু হলে ইজরাইল পশ্চিম তীরের স্বায়ত্তশাসন ধীরে ধীরে ফিলিস্তিনিদের হাতে ছেড়ে দেয়। ১৯৯২ সালে রোম, মরক্কো ও ওয়াশিংটনে ক্রমান্বয়ে শান্তি আলোচনা অব্যাহত থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৩ সালে ওয়াশিংটনে নবম ও দশম রাউন্ড আলোচনা শুরু হয়। জাতিসংঘ ইজরাইলকে অধিকৃত ভূমি ছেড়ে দেওয়ার জন্য ২৪২ নম্বর প্রস্তাব গ্রহণ করে।

জাতিসংঘের দীর্ঘ প্রস্তাব আর আরব ফিলিস্তিনিদের প্রতিরোধের ফলে দুর্বল হতে থাকে ইজরাইল। ১০ সেপ্টেম্বর ইজরাইল ও পিএলও পরস্পরকে স্বীকৃতি দেয়। তার দুই দিন পর (১৩ই সেপ্টেম্বর) ওয়াশিংটনে ইজরাইল ও পিএলও এক শান্তিচুক্তিতে সই করে, যা 'প্রথম অসলো-চুক্তি' নামে পরিচিত। নরওয়ের অসলোতে কয়েক মাসের গোপন আলোচনার পর এই চুক্তি সই হয় বলে একে 'অসলো-চুক্তি' বলা হয়।

অসলো-চুক্তির মূল বিষয় হলো– একে অপরের স্বায়ত্তশাসনের প্রতি স্বীকৃতি প্রদান করা ও শ্রদ্ধাশীল থাকা। ফিলিস্তিনিদের পক্ষে পিএলও প্রধান ইয়াসির আরাফাত আর ইজরাইলের পক্ষে আইজ্যাক রবিন চুক্তিতে সই করেন। পরের বছর এই চুক্তির জন্য আরাফাত ও রবিন পান শান্তিতে নোবেল। চুক্তির ফলে গাজা ও জেরিকোতে ফিলিস্তিন শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ফিলিস্তিনের জন্য পুলিশ বাহিনী গঠন সম্ভব হয়।

১৯৯৩ সালের এই অসলো-চুক্তির ফলে জনপ্রিয়তা হারায় আইজ্যাক রবিন ও তার দল লেবার পার্টি। দুই বছরের মাথায় পুনরায় রবিন পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিন স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কিত চুক্তিতে সই করেন। মিশরের তাবাতে স্বাক্ষরিত এই চুক্তিটি 'দ্বিতীয় অসলো-চুক্তি' নামে পরিচিত। এবারের চুক্তি অনুযায়ী পিএলও গাজা ও পশ্চিম তীরে প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার অধিকার লাভ করে। আর রামাল্লাকে করা হয় অস্থায়ী রাজধানী। অসলো-চুক্তি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে বইয়ের অন্য অংশে।

ইনফরমার

এক

২০০২ সালের ২৩ জুলাই। মধ্যরাত।

গাজার অধিকাংশ বাসিন্দাই ঘুমে। দোতলা এক ভবন নিশানা করে বিমান হামলা চালায় দুটি ইজরাইলি F-16 জেটবিমান। একটি থেকে ছোড়া হয় স্মার্ট বোমা। আশপাশের আরও কয়েকটি ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আগে থেকেই বাড়িটি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে দেখা যায় বিমানগুলোকে। সালাহ শেহাদা মারা গেছেন বিমান হামলায়।

তিনি কাসেম ব্রিগ্রেডের প্রধান। সাথে আরও ১৬ জন নিহত হয়েছেন, যাদের নয়জনই শিশু। নিহতের মধ্যে রয়েছেন শেহাদার স্ত্রী, পুত্র ও এক দেহরক্ষী। ইজরাইলি প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল শ্যারনের ভাষায় এটি ছিল সফলতম অপারেশন। অপারেশনটি চালানো হয় আকরাম আল জুটমেহ নামের এক ইনফরমারের তথ্য অনুযায়ী, যিনি নিজেও একজন ফিলিস্তিনি। আকরাম সালেহর হদিস জানিয়েছিলেন ইজরাইলি গোয়েন্দাদের।

২২ বছরের যুবক আকরাম ছিলেন রাফিয়া এলাকার বাসিন্দা। বাবা দরিদ্র মুদি দোকানি। দরিদ্র আকরাম চেয়েছিলেন উচ্চশিক্ষা নিতে। এ জন্যই গাজার আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে যান পড়তে। সেখানকার ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরিতে ইজরাইলি গোয়েন্দা জালে আটকে যান তিনি। যখন তৃতীয় বর্ষে পড়েন, তখন শেক্সপিয়রের *কিনলিয়ার*-এর ওপর গবেষণা করছিলেন। এ জন্যই তাকে লাইব্রেরিতে যেতে হতো। একদিন সেখানেই এক বিদেশিকে ইংরেজি পত্রিকা পড়তে দেখে আকরাম আগ বাড়িয়েই তার সাথে পরিচিত হন। ভদ্রলোক নিজেকে কানাডার অটোয়া ইউনিভার্সিটির লেকচারার বলে পরিচয় দেন, নাম টেরি। ফিলিস্তিনিদের জীবনযাপন নিয়ে গবেষণা করতে এসেছেন গাজায়। কথা শেষে টেরি আকরামকে তার রিসার্চ সহযোগী হিসেবে নেন, যাতে সে আরবি থেকে ইংরেজিতে অনুবাদে সাহায্য করে। বিনিময়ে আকরামকে প্রতি মাসে দেওয়া হতো ১০০ ডলার করে। টেরি কথা দেন, আকরামকে কানাডায় নিয়ে যাবেন। তার জন্য পার্সপোর্ট সাইজ ছবি জমাও নেওয়া হয়, যাতে তেলআবিবের কানাডীয় দূতাবাস থেকে আইডি কার্ড পাওয়া যায়। ভিসা প্রসেসিং-এর কাজে দুজনই যান তেলআবিবের কানাডীয় দূতাবাসে। সেখানেই ডেভিড নামে আরও একজনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় টেরি। আকরাম তখনই বুঝতে পারেন, তারা ইজরাইলি গোয়েন্দা, কিন্তু ততক্ষণে বহু দেরি হয়ে গেছে। টেরি স্বীকার করেন, তিনি ইজরাইলি এজেন্ট আবু মোহাম্মদ। আকরাম বলেন–

> 'তারা আমাকে ব্ল্যাকমেইল করে আমার কিছু ছবি এডিট করে তাতে মেয়েদের নগ্ন ছবি জুড়ে দেয়। হুমকি দেওয়া হয়– সহযোগিতা না করলে এসব ছবি ফাঁস করে দেওয়া হবে।'

ফেরার উপায় নেই আকরামের। আবু মোহাম্মদ তাকে ইহুদি সেলেটারদের ওপর আত্মঘাতী হামলাকারীদের তথ্য জোগার করতে কাজে লাগান। আবু মোহাম্মদের সাথে কাজ করতে করতেই আবু ইহাব নামক এক এজেন্টের কাছ থেকে টেলিফোনে কল পান আকরাম। তাকে বলা হয় সালেহ শেহাদার ব্যাপারে খোঁজ রাখতে। কাসেম ব্রিগেডের এই নেতা কখন কী করেন, কখন গাড়ি নিয়ে বের হন, কোথায় কোথায় যান সেসব খবর। যে বাড়িতে শেহাদাকে মারা হয়, তার হদিস আকরামই দেয়। তার দেওয়া তথ্যের ২০ মিনিটের মধ্যে উড়ে আসে ইজরাইলি যুদ্ধবিমান।

আকরামের মতো এ রকম হাজারো ইনফরমারকে কাজে লাগাত ইজরাইল। তাদের বেশিরভাগকেই অর্থের লালসা কিংবা প্রতারণার ফাঁদে ফেলে তথ্য হাতিয়ে নেওয়া হতো।

দুই

আকরামের মতোই আরেকজন ইনফরমার হায়দার ঘানেম। সে ইজরাইলি গোয়েন্দা সংস্থা শিনবেতের (সাবাক) চর। ১৯৯৫-এর দিকে পত্রিকায় চাকরির অফারসংক্রান্ত এক বিজ্ঞাপন দেখে মনে খুশি ধরে ঘানেমের। একটি সিভি পাঠিয়ে দেয় চাকরিদাতার ঠিকানায়। পরের বছরের শুরুতেই জবাব আসে। ঘানেমকে সাংবাদিকতায় উচ্চতর পদের একটি অফার দিয়ে বলা হয়– তথাকথিত স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিস সেন্টারে যোগাযোগ করতে। ঘানেমকে জানানো হয়– এর মূল অফিস সিঙ্গাপুরে; যদিও তাকে চাকরি দেওয়া হয় পশ্চিম তীরের শাখায়। গাজার পরিস্থিতি নিয়ে তাকে গবেষণা করতে বলা হয়।

ছয় মাস এভাবে চলার পর নতুন কাজ দেওয়া হয় ঘানেমকে। এবার অফিসের বাইরে তাকে গাজার কারেসপন্ডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে বলা হয়। এক পর্যায়ে এই ফিলিস্তিনি যুবক বুঝতে পারেন, তার বসরা আসলে ইজরাইলি গোয়েন্দার সাথে জড়িত। কাজ করতে গড়িমসি করে ঘানেম, কিন্তু বসরা হুমকি দেয়– তার আগের করা সব রিপোর্ট ফাঁস করে দেওয়া হবে। ফাঁদে আটকে যান হায়দার ঘানেম। তিনিও আর ফিরতে পারলেন না। ফিলিস্তিনি আন্দোলন ও নেতাদের বিষয়ে তথ্য দিতে থাকলেন জাতশত্রু ইজরাইলিদের। মোসাদের জন্য এসব তথ্য ছিল গরম গরম খাবার। ঘানেম সাংবাদিকের বেশে শেখ আহমেদ ইয়াসিন, মাহমুদ জাহার ও নাফিদ আজ্জামের মতো হামাস, ইসলামিক জিহাদ ও পিএলও নেতাদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন ইজরাইলি গুপ্তচর হয়ে। ঘানেমের দেওয়া তথ্যেই দ্বিতীয় ইন্তিফাদার মধ্যে হত্যা করা হয় ফাতাহ নেতা জামাল আব্দুল রাজ্জাককে।

অসলো-চুক্তি : ফিলিস্তিন ভূখণ্ড ভোগ-দখলের ইজরাইলি হাতিয়ার

এক

জাতিসংঘের দলিলপত্র অনুযায়ী অসলো-চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল ইজরাইল ও পিএলও'র মধ্যে সমঝোতার জন্য একটা সাধারণ গাইডলাইন প্রস্তুত করা, যার ভিত্তিতে পশ্চিম তীর ও গাজায় পাঁচ বছরের জন্য অন্তবর্তীকালীন একটি স্বশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়। একই সঙ্গে নিরাপত্তা পরিষদের ২৪২ এবং ৩৩৮ নম্বর প্রস্তাব অনুযায়ী সংকটের স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে আলোচনার পরিবেশ তৈরি করা।

এই চুক্তির ২৫ বছর পরে এসে যেখানে ফিলিস্তিনিদের কিছু পাওয়ার কথা ছিল, সেখানে উলটো তারা একের পর এক বড়ো ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। অধিকৃত ভূখণ্ড ফিরিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে সেটা আরও সংকোচনের মধ্য দিয়ে ফিলিস্তিনিদের ক্ষয়ক্ষতি বাড়ছে।

নিরাপত্তাজনিত ক্ষয়ক্ষতি, অর্থনৈতিক কঠোরতা ও চলাফেরার স্বাধীনতায় বিধিনিষেধ আরাপের মধ্য দিয়ে, যা ফিলিস্তিনিদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে।

এই কুখ্যাত চুক্তির যারা মধ্যস্থতাকারী ছিল, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র; যেই দেশটি এই চুক্তি অনুষ্ঠান আয়োজনের হোস্ট ছিল, তারা ইজরাইলের পক্ষ নেওয়া ছাড়া আর কিছুই করেনি। যুক্তরাষ্ট্র সব ধরনের সহায়তা দ্বিগুণ করে এবং শত শত টনের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ইজরাইলকে সরবরাহ করে। ২০০৬ ও ২০১৪ সালে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে এসব অস্ত্রের নির্মম ব্যবহার দেখেছে বিশ্ব।

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ২৪২ এবং ৩৩৮ নম্বর প্রস্তাব অনুযায়ী ফিলিস্তিন সংকটের সমাধান করতে রাজি হয়েছিল দুই-পক্ষই। নিরাপত্তা পরিষদের ২৪২ নম্বর প্রস্তাবে বলা হয়েছিল– ইজরাইল ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে যে ভূখণ্ড দখল করেছে, সেখান থেকে সেনাবাহিনীকে সরিয়ে নিতে হবে। ভূখণ্ডগুলো হচ্ছে– পশ্চিম তীর, পূর্ব জেরুজালেম, গাজা উপত্যকা, গোলান মালভূমি এবং সিনাই উপদ্বীপ। অথচ একমাত্র সিনাই ছাড়া বাকি সব ভূখণ্ডে এখনও ইজরাইলি বাহিনীর উপস্থিতি আছে। ১৯৭৮ সালে মিশর ও ইজরাইলের মধ্যে আলাদা একটি চুক্তির (ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি) মাধ্যমে সিনাইকে মিশরের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

পশ্চিম তীর ও জেরুজালেমে অবৈধ বসতি স্থাপন করার পাশাপাশি শত শত মিলিটারি চেকপোস্ট বসিয়ে রেখেছে ইজরাইল। অবৈধ দেয়াল তুলে পশ্চিম তীরকে বিভক্ত এবং ছোটো ছোটো ক্যান্টনে পরিণত করা হয়েছে। ফলে ফিলিস্তিনি কৃষি খামার ও আবাসিক এলাকা বিনষ্ট হয়েছে। বসতি নির্মাণের লাইসেন্স নেই– এমন অজুহাত দেখিয়ে হাজারো ফিলিস্তিনির ঘরবাড়ি ধ্বংস করা হয়েছে। পরে ধ্বংসপ্রাপ্ত জায়গায় গড়ে উঠে ইহুদি কলোনি। যেখানে ১৯৯৩ সালে অধিকৃত অংশে ইহুদি বসবাসকারীর সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৫ হাজার, ২০১৫ সালে সে সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭ লাখ ৬৫ হাজারে।

দুই

২০০৫ সালে রকেট আক্রমণের মুখে গাজা থেকে অবৈধ বসতি নির্মাণকারীদের সরিয়ে নেয় ইজরাইল। পরের বছর নির্বাচনে হামাসের বিজয়ের পর গাজায় কঠোর অবরোধ দেয় দেশটি। অবরোধের মুখে ফিলিস্তিনিদের গাজায় বসবাস করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে, কিন্তু চুক্তির মধ্যস্থতাকারী পক্ষ কিছুই করেনি। ২০০৬ থেকে ২০১৫ সালে গাজা ইজরাইলের চারটি বড়ো ধরনের হামলার শিকার হয়। এসব হামলায় কয়েক হাজার বেসামরিক ফিলিস্তিনি নিহত ও লাখখানেক মানুষ আহত হয়।

ইজরাইলি হামলায় এ সময় বহু ফিলিস্তিনি অবকাঠামো, হাসপাতাল, স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস হয়ে যায় এবং সবকিছু অচল হয়ে পড়ে। বিদ্যুৎ ও পরিবেশ সংকট

দেখা দেওয়ায় গাজার শিশুরা পড়তে, ঘুমাতে কিংবা খেলতে পারত না। ১৯৯৪ সালে গাজার আয়তন যেখানে ছিল ৩৬২ বর্গকিলোমিটার, ২০০৫ সালে তা এসে দাঁড়ায় ২৭৫ বর্গকিলোমিটারে। ইজরাইল নতুন নতুন এলাকা দখল করেছে এবং নোম্যান্স ল্যান্ডে পরিণত করেছে।

নিরাপত্তা পরিষদের যে প্রস্তাব অনুযায়ী অসলো-চুক্তি সই হয়েছিল, তাতে ভূখণ্ডের আন্তর্জাতিক সমুদ্রসীমায় ফিলিস্তিনিদের অবাধ স্বাধীনতার নিশ্চয়তা ছিল, অথচ তাদের শুধু এ অধিকার থেকে বঞ্চিতই করা হয়নি; বরং বর্তমানে ছয় নটিক্যাল মাইলের পর মাছ ধরা নৌযান যেতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। কিছু নৌযানকে সর্বোচ্চ নয় নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত যেতে দেওয়া হয়, কিন্তু সেটা বিরল ঘটনা। চুক্তিপত্রের আর্টিকেল 'ভি' অনুযায়ী ফিলিস্তিনিরা সরাসরি ট্যাক্স আদায় করার কথা, কিন্তু বাস্তবে ইজরাইল তা আদায় করছে এবং প্রশাসনিক খরচ বাদ দিয়ে বাকি অর্থ ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষকে ফেরত দিচ্ছে। ফিলিস্তিনিদের দমনে তাদের দেওয়া ট্যাক্সের-ই একটা অংশ ব্যবহার করা হচ্ছে।

অসলো-চুক্তির মধ্যস্থতাকারীরা প্যালেস্টাইনে একটি অন্তবর্তী নিজস্ব সরকার ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিল। একই সঙ্গে চেয়েছিল ১৯৯৯ সালের মধ্যে আরেকটি সমঝোতার মাধ্যমে সমস্যাটি নিষ্পন্ন করে ফেলতে। অথচ আড়াই দশক পরে এসে পরিস্থিতি ক্রমেই অবনতির দিকে যাচ্ছে এবং চুক্তিরও কোনো অগ্রগতি দৃশ্যমান নয়। ফিলিস্তিনি রাজনীতিক এমনকী পিএলও'র ভেতর থেকেও অসলো-চুক্তির সমালোচনা করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল– এটি ছিল ইজরাইলি দখলদারিত্ব বাড়ানোর একটা সুযোগ। প্যালেস্টাইন ন্যাশনাল ইনিসিয়েটিভের মহাসচিব মুস্তাফা বারগুতির মতে–

> 'অসলো-চুক্তি ছিল ইজরাইলের এ যাবৎকালের সবচেয়ে বড়ো আইডিয়া। কোনোরকম ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই এই চুক্তি তাদের দখলদারিত্ব বজায় রাখতে সহায়তা করেছে।'

উপসাগরীয় যুদ্ধে সাদ্দামের পক্ষ নেওয়ায় ৯১ সালের মাদ্রিদ শান্তি সম্মেলনে সুবিধাজনক দরকষাকষি করতে পারেনি পিএলও। তারা ইজরাইল-ফিলিস্তিন চিরস্থায়ী শান্তিচুক্তি করার সিদ্ধান্তে না এলেও সরে এসেছিল সশস্ত্র সংগ্রাম থেকে। নরওয়েতে কয়েক মাসের গোপন আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত আসে। অসলো-চুক্তির দুটি ধাপ ছিল। প্রথম ধাপটি ছিল পাঁচ বছরের, যার শুরু হওয়ার কথা ৯৪ সাল থেকে। এর উদ্দেশ্য– ফিলিস্তিনিরা নিজেদের শান্তিপূর্ণভাবে শাসন করার যোগ্যতা রাখে কি না এবং অবৈধ সশস্ত্র প্রতিরোধ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে কি না তা পরীক্ষা করে দেখা। প্রথম ধাপের সফলতার ওপর নির্ভর করছে দ্বিতীয় ধাপের বাস্তবায়ন। এটা ছিল চূড়ান্ত চুক্তি। পাঁচ বছরের অন্তবর্তী চুক্তিতে শরণার্থীদের ঘরে ফেরা, জেরুজালেমের পরিণতি, প্যালেস্টাইনের সীমানার নিয়ন্ত্রণ এবং গাজা ও পশ্চিমতীরে ইহুদি বসতি সরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে কোনো ইস্যু গুরুত্ব পায়নি। এসব বিষয়ে দ্বিতীয় ধাপে আলোচনার কথা বলা হয়।

ফিলিস্তিনিরা দুই ভাগে ভাগ হলো। একভাগ মনে করল, অসলো-চুক্তি মানে ইজরাইলের কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ। আরেক পক্ষ এটাকে প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ হিসেবে দেখল। অন্তবর্তী সময়ে গাজা ও পশ্চিম তীরে নতুন বসতি বাড়িয়ে যেতে থাকে ইজরাইল। এতে হতাশ হয়ে পড়ে ফিলিস্তিনিরা। এর জবাব তারা দেয় ২০০৬ সালে। এসব কারণে দ্বিতীয় দফার চুক্তির চূড়ান্তে পৌছানোয় ঝুঁকি তৈরি হয়। ২০০০ সালে দ্বিতীয় ইন্তিফাদা শুরু হয়। এরিয়েল শ্যারন আল আকসা মসজিদ সফরে গেলে তার প্রতিক্রিয়ায় শুরু হয় এই ইন্তিফাদা।[৭৬]

সংঘাত-সংঘর্ষ, প্রতিবাদ-বিক্ষোভ এখনও থামেনি। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার; যিনি ইজরাইল-মিশর শান্তি আলোচনায় মধ্যস্থতা করেছিলেন, তিনি বলছেন- 'প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পের কাছ থেকে ফিলিস্তিনিরা ন্যায্য বিচার পাবে- এ বিষয়ে কোনোও আশা করতে পারছি না।' জাতিসংঘের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে- দ্বি রাষ্ট্রীয় সমাধানে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অনুপস্থিতি প্যালেস্টাইন সংকট উত্তরণের পথে বড়ো বাধা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে- ভোগান্তি ছাড়া অসলো ফিলিস্তিনিদের জন্য আর কী নিয়ে আসবে বা এসেছে?

অসলো-চুক্তির কারণে আইজ্যাক রবিনের ওপর ক্ষুব্ধ ছিল চরমপন্থি ইহুদি সংগঠন ইয়োলো। ১৯৯৫ সালে ইয়েলোর সদস্য ইগল আমিরের গুলিতে নিহত হন ইজরাইলের সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী, কিন্তু তারা আজ এর সুফল পাচ্ছে।

হামাস-ফাতাহ দ্বন্দ্বের শুরু

এক

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ চাচ্ছিলেন প্যালেস্টাইনে এমন একটা সরকার আসুক, যারা ফিলিস্তিনিদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। আর আরাফাত চেয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে। তিনি কৌশলে ১৯৪৭ সালের নভেম্বরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ দ্বি-রাষ্ট্রিক সমাধান উল্লেখ করে যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল, সেটা মেনে নেন। এখন ইজরাইল দেখছে, ইন্তিফাদা থেকে বেরিয়ে আসার উপায় তাদের সামনে। তাই তাদের মিত্র বুশ প্রশাসন আরাফাতদের সাথে কাজ করা শুরু করল।

ফাতাহ সমর্থিত পিএলও যখন ফিলিস্তিনিদের জন্য একটা দৃশ্যমান সরকার গঠনে ব্যস্ত, হামাস নেতারা তখন চষে বেড়াচ্ছেন পশ্চিম তীর ও গাজা। উদ্দেশ, আরাফাত-এর নেতৃত্বের ওপর আস্থা হারানো ফিলিস্তিনিদের হতাশাকে কাজে লাগানো। পিএলও'র ইজরাইলকে স্বীকৃতি দেওয়ার ঘটনাকে অনেকেই আরাফাতের দুর্বলতা হিসেবে দেখছিলেন।

---

৭৬. Hamas: A Beginner's Guide, by Khaled Hroub, page-49.

কেউ কেউ এটাও বলতে লাগলেন– আরাফাত মূলত ইজরাইলকে মোকাবিলা করতে আগ্রহী নন। ফাতাহর ব্যর্থতাগুলোকে হামাস, মুসলিম ব্রাদারহুড আর ইসলামিক জিহাদ ফিলিস্তিনিদের কাছে বারবার তুলে ধরছিল। হামাস ফিলিস্তিনিদের বোঝাল– ফাতাহর সেক্যুলার ও জাতীয়তাবাদী ধ্যানধারণা নয়; বরং ইসলামের মাধ্যমেই সংকট সমাধান সম্ভব। এভাবে হামাসের প্রভাব বাড়তে লাগল ফিলিস্তিনিদের মাঝে।

ফাতাহ নিয়ন্ত্রিত ইউএনএলইউ (Unified National Leadership of the Uprising)-এর বিকল্প হয়ে দাঁড়াল হামাস। প্রথম ইন্তিফাদার পক্ষে তৃণমূল পর্যায়ে জনমত গড়ে তুলতে ইউএনএলইউ গঠন করেছিল ফিলিস্তিন নেতারা। ১৯৮৮ সালে ইন্তিফাদা জোরদার হয়। আরেকটি ঘোষণা এই আন্দোলনকে উসকে দেয়।

৩১ শে জুলাই জর্ডানের বাদশাহ হোসেন ঘোষণা দেন, পশ্চিম তীরের ওপর থেকে অফিসিয়াল দাবি তুলে নিয়েছেন তিনি। ৪৮-এর যুদ্ধে ইজরাইলের কাছ থেকে এই ভূখণ্ড দখল করার পর ৬৭ পর্যন্ত সেখানে নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে পেরেছিল জর্ডান। বাদশাহ ঘোষণা দেন– ইজরাইল অধিকৃত ভূখণ্ডে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গড়ে তোলা হবে এটি দখলমুক্ত হওয়ার পর। ইন্তিফাদায় অংশ নেওয়া লোকদের মধ্যে এবার একটা আশা জাগল– অন্তত পশ্চিম তীর একদিন তাদের হবে। দ্বিতীয় ইন্তিফাদায় প্রাণ গেল ১১শ ফিলিস্তিনির। ফাতাহ ধীরে ধীরে গেরিলা আক্রমণ থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিল আর তার জায়গা দখল করল হামাস।

১৯৮৮ সালের ১২ই নভেম্বর আলজিয়ার্সে প্যালেস্টাইন ন্যাশনাল কাউন্সিলের এক জরুরি সভায় প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন ইয়াসির আরাফাত। এরপরই জাতিসংঘের ২৪২ এবং ৩৩৮ নম্বর প্রস্তাবের আলোকে একটি শান্তিপ্রস্তাব দেয় পিএলও, যাতে ছয় দিনের যুদ্ধে দখল করা ভূখণ্ড থেকে ইজরাইল সরে যায়। এর মানে হলো ১৯৪৮ সালের যুদ্ধের পর আরব-ইজরাইল সীমান্ত পিএলও মেনে নিয়েছে! এটা এক ঐতিহাসিক ঘটনা। দুই সপ্তাহের মধ্যে আরাফাতের স্বাধীনতার ঘোষণাকে স্বীকৃতি দেয় অন্তত ৫৫টি দেশ। এ সময়টাতে হামাসের মনোযোগ ছিল ফিলিস্তিন এবং আরব বিশ্বে জনপ্রিয়তা বাড়ানো, বাড়ছিলও।

দুই

প্রথম ইন্তিফাদা শেষ। হামাসের তখন ভরা যৌবন। আর্থিক সহায়তা পেতে শুরু করলেন শেখ ইয়াসিনরা। ১৯৮৯ সালের জানুয়ারিতে হামাস এবং পপুলার ফ্রন্ট ফর দ্য লিবারেশন অব প্যালেস্টাইন 'ইউএনএলইউ'-এর বিকল্প সংগঠনের প্রস্তাব দেয়। এর নয় মাসের মাথায় ইজরাইলের কাছ থেকে হামাস পায় 'সন্ত্রাসী' সংগঠনের তকমা। অখুশি হলেও হামাসের জন্য এই ঘোষণা শাপেবর হলো। ফিলিস্তিনিদের বাসাবাড়ি ও সড়কগুলোতে হামাসের জনপ্রিয়তা আরও বাড়ল।

লেবানের হিজবুল্লাহর সহযোগিতায় ইরানের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে হামাস। সিআইয়ের অভিযোগ– ইরান ১৯৮৮ থেকে '৯৪-এর মধ্যে হামাসকে ১০০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্থ সহায়তা করেছে। ১৯৯০ সালের জুলাইয়ে আরাফাত হামাসকে পিএলও-তে যোগদানের আমন্ত্রণ জানায়। হামাস ইজরাইলের বিরুদ্ধে একত্রে লড়াইয়ে সম্মত হলেও একীভূত (মার্জ) হওয়ার প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়। কয়েক মাসের মধ্যে সৌদি আরবে গোপন এক বৈঠকে মিলিত হয় হামাস ও প্যালেস্টাইন ইসলামিক জিহাদ। তারা ফাতাহর বিরুদ্ধে নতুন কৌশল ঠিক করে।

১৯৯১ সালের ডিসেম্বরে সিরিয়ার দামেস্কে ইসলামিক জিহাদ ও অন্যান্য পিএলওবিরোধী সংগঠনের সাথে বৈঠকে বসে হামাস। তারা ইজরাইলের সাথে পিএলও'র চলমান শান্তি আলোচনার বিরোধিতা করে। পরের বছরের অক্টোবরে হামাস নেতা মুসা আবু মারজুকের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল আয়াতুল্লাহ আলি খোমেনিসহ ইরানের গুরত্বপূর্ণ নেতাদের সঙ্গে দেখা করতে যান। ওই বৈঠকে ইরান হামাসকে বছরে ৩০ মিলিয়ন ডলার দিতে রাজি হয় বলে পিএলও'র পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়। ১৯৯২- এর মধ্যে ইজরাইল হামাসসহ অন্তত ৪ শতাধিক ইসলামিস্টকে জোরপূর্বক লেবাননে পাঠায়। এতে করে লেবাননের হিজবুল্লাহর সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের সুযোগ পায় ইসলামিস্টরা। ১৯৯৩ সালে মিশরীয় গোয়েন্দারা জানায়, ইরানের প্রেসিডেন্ট আকবর হাশেমি রাফসানজানি তিন হাজারের মতো হামাস মিলিশিয়াকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন এবং হামাস তেহরানে একটা অফিস খুলছে।[৭৭]

তিন

ইজরাইল ৯০-র দশকের মধ্যেই বুঝে যায়, হামাস তাদের জন্য 'আসল' বিপদ হয়ে দেখা দিয়েছে। লেবাননের অনুমতি ছাড়াই ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৯৯-তে চার হামাস নেতাকে জোর করে দক্ষিণ লেবাননে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এরা সেখান গিয়ে আগে থেকে শরণার্থী শিবিরে বসবাস করা ফিলিস্তিনিদের মন জুগিয়ে ফেলে। কয়েক বছর পরেই এই চারজনের দুজন পায় হামাসের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। ইমাদ আল আলামি হন ইরানে হামাসের মুখপাত্র আর মোস্তফা আল কানুয়া হন বৈরুতে হামাসের রাজনৈতিক প্রধান। আগে আরবদের কাছ থেকে পিএলও বরাবর আর্থিক সাহায্য আসত, কিন্তু ১৯৯১-র উপসাগরীয় যুদ্ধে ইয়াসির আরাফাত সাদ্দাম হোসেনের কুয়েত আক্রমণকে সমর্থন দেন। ক্ষুব্ধ আরবরা মুখ ফেরালেন। ইসলামি চ্যারিটির অর্থ চলে যেতে থাকে হামাসের দিকে। কুয়েতে থাকা পিএলও নেতা-কর্মীদেরও আম্মানে চলে যেতে হয়।

একসময় জর্ডানের সাথে তিক্ততা শুরু হয় হামাসের। এর শুরু ১৯৯১-তে। সে বছর আম্মানের চার-চারটি এলাকা থেকে দেড় মিলিয়ন ডলার মূল্যের ভারী মেশিনগান ও কামান

---

[৭৭]. Hamasvs. Fatah : The Struggle for Palestine, Jonathan Schanzer, page 41

উদ্ধার করার কথা জানায় জর্ডান কর্তৃপক্ষ। এ ঘটনায় নয় হামাস কর্মীকে আটক করা হয়। এদের দেওয়া হয় নয় মাসের জেল। তবে কারা মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই বাদশাহর ক্ষমায় মুক্তি পান হামাস কর্মীরা, কিন্তু নজরদারি শুরু হয় হামাসের কার্যক্রমে। কেবল মিডিয়া ও রাজনৈতিক কার্যক্রম চালানোর অনুমতি দেওয়া হয়। এরপর থেকে হামাস সেখানে দাঁড়াতেই পারেনি, ক্র্যাকডাউন চলতে থাকে।

অসলো-চুক্তিকে গ্রহণ করেনি হামাস। এর প্রতিবাদে '৯৬-র সাধারণ নির্বাচনেও তারা অংশ নেয়নি। ইজরাইল ও ফিলিস্তিন নেতারা অসলো-চুক্তির জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন– এই খবর যখন আসে, তখন হামাসের ইহুদিবিরোধী ধারাবাহিক আক্রমণ চলতে থাকে। ক্ষুব্ধ ইজরাইল ও তার মিত্র যুক্তরাষ্ট্র আরাফাতকে বলল– 'হামাসকে শেষ করে দিতে হবে।' এমনকী জর্ডানে বহু বছর ধরে অবস্থান নেওয়া ইসলামিস্টদের বিরুদ্ধে ক্র্যাকডাউন চালাতে অনুরোধ জানায় এই দুই দেশ। ১৯৯৪ সালের দিকে জর্ডানের বাদশাহ হোসেনকে অনুরোধ জানানো হয়– তার দেশে আশ্রয়ে থাকা শীর্ষ হামাস নেতাদের বের করে দিতে।

১৯৯৯ সালের প্রথম ছয় মাসে জর্ডানে কয়েকজন হামাস সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়। একই বছরের মধ্যভাগে অস্ত্রের লাইসেন্স না রাখায় খালিদ মিশালের দুই দেহরক্ষী আটক হন। ২৯ আগস্ট এক সরকারি নির্দেশনায় জর্ডানে নিষিদ্ধ হয় হামাস। খালিদ মিশালসহ তার কর্মীদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়; যদিও স্থানীয় মুসলিম ব্রাদারহুডসহ বিভিন্ন পক্ষের চাপে তিন সপ্তাহ পর মিশালকে দামেস্কে যেতে দেওয়া হয়।

২০০৫ সালে হামাস কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়। অসলো-চুক্তির প্রতিবাদে '৯৬-এর নির্বাচনে না গেলেও ২০০৬ সালের নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন হামাস নেতারা। পিএলও-তে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় (যদিও তা কার্যকর হয়নি) এই শর্তে– তাদের প্যালেস্টাইন স্বাধীন করার আগের লক্ষ্যে ফিরে যেতে হবে। সেইসঙ্গে ঘোষণা দেওয়া হয়– অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য সব সামরিক তৎপরতা বন্ধ রাখার। ফাতাহর স্বাধীনতা আন্দোলনের সশস্ত্র পথ থেকে ফিরে আসার ঘোষণার বিপরীতে প্যালেস্টাইনকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে তাদের প্রতি হামাসের আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতে হামাসের জনপ্রিয়তা বাড়ছিল।

হামাসের বিরুদ্ধে ইজরাইল ও পিএ'র অ্যাকশন

হামাসের ধারাবাহিক গেরিলা আক্রমণের মধ্যেই ১৯৯৬ সালের ২০ জানুয়ারি স্বশাসিত ফিলিস্তিনে প্রথমবারের মতো নির্বাচন হয়। নির্বাচনে যায়নি হামাস। প্রেসিডেন্ট হন পিএলও নেতা ইয়াসির আরাফাত। হামাসের ইজরাইলবিরোধী লড়াই চলতেই থাকে।

এর আগে পহেলা জানুয়ারি হামাস ইঞ্জিনিয়ার ইয়াহিয়া আয়াশকে গুপ্ত হামলায় হত্যা করে ইজরাইলি বাহিনী। এই হামলা হামাসের পক্ষে জনমত বাড়িয়ে দেয়। রাস্তায়, গাড়িতে, বাড়ির বেলকনিতে, রুমে ফিলিস্তিনিদের আহাজারি শুরু হয়। প্রিয় নেতার মৃত্যুশোকে রাস্তায় নেমে আসেন হাজার হাজার ফিলিস্তিনি।

এর জবাবে প্রতিশোধমূলক হামলা শুরু করে হামাস। বিল ক্লিনটন আরব ও পশ্চিমা নেতাদের মিশরের শারম আল শেখে ডাকেন। তিনি তার ভাষায় সন্ত্রাসী কার্যক্রম বন্ধ করতে চাইলেন। মূলত হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সুর তুললেন ক্লিনটন। একদিকে ইজরাইল হামাসের অবস্থানগুলোতে হামলা চালাচ্ছিল, অন্যদিকে আরাফাতের ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ (পিএ) হামাস সদস্যদের গ্রেফতার করতে থাকল। ১৯৯৭ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জর্ডানে নির্বাসিত হামাস নেতা খালিদ মিশালকে হত্যার চেষ্টা চালাল ইজরাইলি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ। ইজরাইলি কারাগার থেকে বেরিয়ে আসা হামাস নেতা শেখ আহমেদ ইয়াসিন ১৯৯৮ সালের এপ্রিলে আলজাজিরা টিভিতে এক সাক্ষাৎকারে বললেন– 'পিএ আমেরিকা ও ইজরাইলের অনুগত দাস। ইয়াসির আরাফাত ফিলিস্তিনিদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারছেন না।'

১৯৯৮ সালে তহবিল সংগ্রহের কাজে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে গিয়ে শেখ আহমেদ ইয়াসিন জানতে পারেন, ইজ্জেদিন আল কাসেম ব্রিগেডের সদস্যদের ফিলিস্তিনি নিরাপত্তা বাহিনীতে যোগ দিতে প্ররোচিত করা হচ্ছে। তাদের আর্থিক প্রলোভন দেওয়া হচ্ছে। সতর্ক হলেন হামাস নেতারা। এসবের মধ্যেই অক্টোবরে ওয়াশিংটনে ইজরাইল ও ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ 'উয়াই রিভার চুক্তি' সই করল।

উয়াই রিভার চুক্তি

এটিকে বলা হয় ভূমির বিনিময়ে চুক্তি। চুক্তিটি সই হয় ১৯৯৮ সালের ২৩ অক্টোবর হোয়াইট হাউজে ফিলিস্তিন নেতা ইয়াসির আরাফাত ও ইহুদি নেতা বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর মধ্যে, যার মধ্যস্থতা করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন। জর্ডানের তখনকার বাদশাহ হোসেনও এই চুক্তি সইয়ে ভূমিকা রাখেন। হোয়াইট হাউজে চুক্তিটি সই হলেও উভয় পক্ষ চুক্তির ব্যাপারে সম্মত হয়েছিল ওয়াশিংটনের অদূরে ম্যারিল্যান্ডের উই মিলস এলাকার উয়াই রিভার কনফারেন্স সেন্টারে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে।

এই সম্মেলন ১৫ অক্টোবর শুরু হয়ে শেষ হয়েছিল ২৩ অক্টোবর। সামিটের শেষ দিনেই চুক্তিটি সই হয়। ইজরাইলি পার্লামেন্ট নেসেটে চুক্তিটি অনুমোদিত হয় একই বছরের ১৭ নভেম্বর। উয়াই রিভার চুক্তির মূল উদ্দেশ্য ছিল দ্বিতীয় অসলো-চুক্তি পুনরুজ্জীবিত করা। এ ছাড়া চুক্তিটির আরও উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হলো–

১. ইসরাইল অধিকৃত পশ্চিম তীরের ১৩ শতাংশ এলাকা ফিলিস্তিনিদের হাতে অর্পণ এবং ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের মাঝে তিন শতাংশ এলাকা সবুজ বেষ্টনী অথবা সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করবে। ওই সবুজ বেষ্টনীতে বসবাসকারী ইজরাইলিদের নিরাপত্তা ও সন্ত্রাস দমনের বিষয়টি ইজরাইল কর্তৃপক্ষের হাতে ন্যস্ত থাকবে।

২. সন্ত্রাস দমনের ব্যাপারে উভয়পক্ষ সম্মত হয় এবং বলা হয়– নিজ নিজ বিচারব্যবস্থা অনুযায়ী সন্ত্রাসীদের বিচার করা হবে। ইহুদি ও ফিলিস্তিনিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটি দুই সপ্তাহ পরপর সন্ত্রাস দমনে গৃহীত পদক্ষেপগুলো পর্যালোচনা করবে।

৩. ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ সকল প্রকার সহিংসতা ও সন্ত্রাসী তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে একটি ডিক্রি জারি করবে।

৪. নিরাপত্তা সহযোগিতা প্রশ্নে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ ও প্রশিক্ষক বিনিময়সহ অব্যাহতভাবে উভয়পক্ষ ব্যাপক দ্বি-পাক্ষিক কর্মসূচি গ্রহণ করবে।

৫. পিএলও'র জাতীয় কমিটি এবং ফিলিস্তিনি কেন্দ্রীয় কাউন্সিল তাদের জাতীয় সনদ থেকে ইজরাইলবিরোধী ধারাগুলো বাতিল করবে।

৬. গাজা উপত্যকায় একটি শিল্পপার্ক গড়ে তোলা এবং এলাকায় একটি বিমানবন্দর তৈরি করা হবে।

চুক্তি সইয়ের পর পিএল'র জাতীয় কমিটি তাদের জাতীয় সনদ থেকে ইজরাইলবিরোধী ধারাগুলো অ্যাক্সপাঞ্জ করে। গাজাতে প্রথম বিমানবন্দরেরও উদ্বোধন করা হয়, তবে পশ্চিম তীরে– যেখানে ১৩ শতাংশ জায়গা থেকে ইজরাইলি বাহিনী সরে যাওয়ার কথা ছিল, তা মানা হয়নি। ইজরাইল মাত্র দুই শতাংশ জায়গা থেকে সেনা সরিয়ে নেয়। অতঃপর অন্যান্য চুক্তির মতো এটিও মরে যায়; যদিও এর জন্য উভয়পক্ষই একে অন্যকে দায়ী করে থাকে। উয়াই রিভার চুক্তি সংশোধন করে মিশরের শারম আল শেখে আরেকটি মেমোরেন্ডাম সই হয়, কিন্তু আলোর মুখ দেখেনি এটিও।

১৯৯৯-এর পরে বেশ চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে হামাস। হোসেনের পর তার ছেলে দ্বিতীয় আব্দুল্লাহ জর্ডানের বাদশাহ হলে দশকের পর দশক ধরে আম্মানে অবস্থান করা হামাস নেতাদের বের করে দেওয়া হয়। এর দুটি কারণ থাকতে পারে। প্রথমত, নয়া বাদশাহ সম্ভবত তার দেশে ইসলামপন্থিদের উত্থানে ভয় পেয়েছিলেন, বিশেষ করে ব্রাদারহুড সমর্থিত ইসলামিক অ্যাকশন ফ্রন্টের উত্থানকে। কিংবা পশ্চিমে শিক্ষিত হওয়া এই ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক ভালো রাখতে চেয়েছেন।[৭৮] একই বছর মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর একটা রিপোর্ট প্রকাশ করে, যাতে বলা হয়– ইরান-সৌদি আরবের বিভিন্ন ব্যবসায়ীগোষ্ঠী

---

৭৮. Hamasvs. Fatah : The Struggle for Palestine, Jonathan Schanzer, page 47.

এবং বেশ কিছু আরব দেশ থেকে অর্থ সহায়তা পাচ্ছে হামাস। ইহুদি মিত্ররা দেখল, হামাস খুবই শক্তিশালী হয়ে উঠছে এবং একটা শক্তিশালী আঞ্চলিক শক্তি হয়ে উঠার দ্বারপ্রান্তে।

২০০০ সালে ফিলিস্তিনে শুরু হয় দ্বিতীয় ইন্তিফাদা। এটিকে আরবদের তৃতীয় গণজাগরণ বলা হয়। প্রথম গণজাগরণ হয়েছিল ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৯ সালে, যাকে অন্যভাবে আরব বিদ্রোহও বলা হয়ে থাকে। এই বিদ্রোহ হয়েছিল ব্রিটিশ ও ইহুদি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে- ইহুদি অভিবাসনের কারণে। আর দ্বিতীয় গণজাগরণ হয়েছিল ১৯৮৭ সালে, যা প্রথম ইন্তিফাদা হিসেবে পরিচিত; যদিও ইজরাইলের কঠোর দমন-নিপীড়নের মুখে দ্বিতীয় ইন্তিফাদা শক্ত কোনো ভিত্তি তৈরি করতে পারেনি। এবার অধিকৃত ভূখণ্ডগুলোর চারপাশে বসানো হয় চেকপোস্ট। গাজা, পশ্চিম তীরে নিয়ন্ত্রণ আরও বাড়ানো হয়। অবশ্য অনেকে প্রথম ও দ্বিতীয় ইন্তিফাদাকে প্রথম ও দ্বিতীয় গণজাগরণ বলে থাকেন।

২০০১ সালের নির্বাচনের পর ইজরাইলের সরকারপ্রধান হলেন এরিয়েল শ্যারন। অর্থমন্ত্রী করা হয় সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে। আর পররাষ্ট্রমন্ত্রী হন শিলভান শ্যালম। শেষের দুজন কট্টরপন্থি হিসেবে পরিচিত। মন্ত্রিসভায় নেতানিয়াহুদের সংখ্যা বেশি হওয়ায় সরকার চালানো কঠিন হয়ে পড়ে। শ্যারন নিজেও একসময় কট্টর দক্ষিণপন্থি ছিলেন। বিতর্কিত কাজের জন্য ১৯৮৩ সালে তাকে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ওই ঘটনায় কিছুটা শিক্ষা পান শ্যারন। পরে তিনি ধরেন মধ্যপন্থার লেবাস। বেনগুরিয়ান কিংবা শিমন পেরেজের একপেশে নরম কিংবা কঠোর নীতির কোনোটিই তিনি নেননি।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

নয়া শতকের শান্তি পরিকল্পনা

'America is implementing Zionist Israeli policy to serve the Zionist project in Palestine. The battle America is undertaking is designed to allow Israel to remain in the Palestinian homeland.'
—Sheik Ahmed Yassin .

আরব শান্তি পরিকল্পনা

সৌদি পরিকল্পনার ভিত্তিতে আরব শান্তি পরিকল্পনাটি নেওয়া হয় ২০০২ সালের মার্চে, যখন দ্বিতীয় ইন্তিফাদা বেশ তুঙ্গে। এই পরিকল্পনার প্রস্তাব দিয়েছিলেন সৌদি আরবের ক্রাউন প্রিন্স (পরবর্তী সময়ে বাদশাহ) আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আজিজ। ২০০২ সালের ২৭ মার্চ, লেবাননের বৈরুতে আরব লীগের শীর্ষ সম্মেলনে প্রস্তাবটি পেশ করা হয়। প্রস্তাবে বলা হয়– ইজরাইল যদি ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে দখল করা আরব ভূখণ্ড ফিরিয়ে দিয়ে আগের সীমানা মেনে নেয়, তাহলে আরব রাষ্ট্রগুলো স্বাধীন ইজরাইল রাষ্ট্র মেনে নেবে এবং স্বীকৃতি দেবে। প্রস্তাবে আরও বলা হয়, গাজা ও পশ্চিম তীর নিয়ে হবে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র, যার রাজধানী হবে পূর্ব জেরুজালেম। আরব লীগের যে সম্মেলনে প্রস্তাবটি উত্থাপন করা হয়েছিল, তাতে ২২ আরব দেশের মাত্র ১০ জন সরকার/রাষ্ট্রপ্রধান উপস্থিত ছিলেন। ইজরাইলকে স্বীকৃতি দানকারী তাদের দুই প্রতিবেশী মিশর ও জর্ডানের রাষ্ট্রপ্রধানরা সম্মেলনে যাননি।

আরব শান্তি পরিকল্পনাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার। বুশের উত্তরসূরি বারাক ওমাবাও এই প্রস্তাবের পক্ষেই ছিলেন। কিন্তু কট্টর ইজরাইলি কিংবা কট্টর ফিলিস্তনী– উভয় শিবিরই এই প্রস্তাবে নাখোশ ছিল। হামাস ও ইসলামিক জিহাদ আল আকসা মার্টায়ার্স ব্রিগেড প্রস্তাবটির বিরোধিতা করেছিল। সিরিয়া বলেছিল, প্রস্তাবটি ইজরাইলের জন্য সুবিধা এনে দেবে। লেবাননও প্রস্তাবটির বিরোধিতা করেছিল।

সম্মেলনে বেশিরভাগ আরবরাষ্ট্রের প্রধান উপস্থিত না থাকায় প্রস্তাবের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়টি কিছুটা হালকা থেকে যায়। ইয়াসির আরাফাতকে ওই সম্মেলনে যেতে দেয়নি ইজরাইল। দেশটির কর্তৃপক্ষ তখন বলেছিল– তারা আরাফাতকে রামাল্লায় ফেরত আসার গ্যারান্টি দিতে পারবে না। রামাল্লা তখন ছিল ফিলিস্তিনের প্রশাসনিক রাজধানী। যেদিন এই পরিকল্পনার কথা ঘোষণা দেওয়া হয়, সেদিনই ইজরাইলের নেতানিয়ার পার্ক হোটেলে আত্মঘাতী বোমা হামলায় ২০ জন নিহত ও দেড় শতাধিক ব্যক্তি আহত হয়। ওই হামলার জেরেই ২৯ মার্চ পশ্চিম তীরে 'অপারেশন ডিফেন্সিভ শিল্ড' নামে বড়ো ধরনের অভিযান শুরু করে ইজরাইল। দখল করে নেওয়া হয় রামাল্লা, জেনিন আর নাবলুস। চার সপ্তাহব্যাপী অভিযানে ৫০০-এর বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়, প্রাণ হারায় ২৯ ইজরাইলি সেনা।

আরব শান্তি পরিকল্পনাটি নেওয়া হয়েছিল জাতিসংঘের ২৪২ এবং ৩৩৮ নম্বর প্রস্তাবের ভিত্তিতে, যেখানে প্রতিবেশী আরব দেশগুলোর সাথে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার প্রয়োজনে ইজরাইলকে দখলকৃত ভূখণ্ড থেকে সরে যেতে বলা হয়েছিল।

যাই হোক, ২০০৭ সালের মার্চ পর্যন্ত সৌদি শান্তি পরিকল্পনা ততটা দৃশ্যমান ও কার্যকর করা যায়নি। মার্চে যখন রিয়াদে আরব লীগ শীর্ষ সম্মেলন হলো, তখন শান্তি পরিকল্পনাটি পূর্ণ অনুমোদন পেল। কারণ, একমাত্র লিবিয়া ছাড়া বাকি ২১ দেশের প্রধানরা তাতে উপস্থিত ছিলেন। প্রথমে আপত্তি জানালেও আরব লীগের বাইরে ইরানও এই শান্তি পরিকল্পনায় সম্মতি দিয়েছিল। ইজরাইলকে ইরানের সাথেও সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল।[৭৯] ওআইসি শীর্ষ সম্মেলনেও প্রস্তাবটি অনুমোদন করা হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস প্রস্তাবে রাজি হলেও প্রত্যাখ্যান করেছিলেন হামাস থেকে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী ইসমাইল হানিয়া। যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও জাতিসংঘের সমর্থন ছিল সৌদি প্রস্তাবে। ইজরাইলি প্রধানমন্ত্রী এহুদ ওলমার্ট প্রস্তাবে সমর্থন দিলেও দেশটির কর্মকর্তারা পুরোপরি তা মানতে পারেননি। পরবর্তী সময়ে ২০১৩ সালে আরব লীগের শীর্ষ সম্মেলনে তৃতীয় দফায় প্রস্তাবটি অনুমোদিত হলেও এই প্রস্তাব এখনও বাস্তবায়নের বাইরেই থেকে গেছে। এর বাস্তবায়ন না হওয়ায় পরবর্তী সময়ে হা-হুতাশ করেছে ইজরাইলি মিডিয়াগুলো। কারণ, এটি হতে পারত মধ্যপ্রাচ্য সংকট উত্তরণের অধিকতর গ্রহণযোগ্য একটি এক্সিট পয়েন্ট।

রোডম্যাপ শান্তি পরিকল্পনা

ইজরাইল-ফিলিস্তিন সংকটের মুখে ২০০২ সালে ইজরাইলের পাশাপাশি স্বাধীন একটি ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ। তখন এই সংকট

---

৭৯. Why is Israel so afraid of the Arab Peace Initiative? RAPHAEL AHREN, 18 June 2013. The Times of Israel.

মোকাবিলার একটি উদ্যোগ নেওয়া হয়– যাতে যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও জাতিসংঘের অংশগ্রহণ ছিল। এই পরিকল্পনার মূলনীতিগুলোর খসড়া তৈরি করেছিলেন মার্কিন ফরেন সার্ভিস অফিসার ডনাল্ড ব্লুম। ২০০২ সালের ২৪ শে জুন দেওয়া এক ভাষণে বুশ বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন। এ নিয়ে একই বছরের নভেম্বরে বুশ প্রশাসন একটা খসড়া প্রস্তাব প্রকাশ করে। রোডম্যাপ পরিকল্পনা নামে চূড়ান্ত আকারে এটি ঘোষণা করা হয় ২০০৩ সালের ৩০ এপ্রিল।

রোডম্যাপ পরিকল্পনার প্রধান শর্ত ছিল ২০০৩ সালের জুন থেকে ২০০৩ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে ফিলিস্তিনিদের জন্য ইজরাইল সর্বাধিক ভূমি ছেড়ে দেওয়ার নিশ্চয়তা দেবে। ইজরাইলি প্রধানমন্ত্রী অ্যারিয়েল শ্যারন রোডম্যাপ পরিকল্পনাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। আসলে তিনি চাইছিলেন গাজা ও পশ্চিম তীর থেকে ইহুদি বসতিগুলোকে সরিয়ে নিতে, যাতে এই দুই এলাকার বাসিন্দাদের অবরুদ্ধ করা সহজ হয়। তবে এতেও বাধ সাধে কট্টর নেতানিয়াহু ও শ্যালম। তারা প্রচার করতে থাকে, ইহুদি বসতি সরিয়ে নেওয়ার অর্থ হচ্ছে ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর কাছে মাথানত করা।

২০০৪ সালের ৪ জুন তাদের মন্ত্রিসভা থেকে বের করে দেন শ্যারন। এর দুদিনের মাথায় ৬ জুন ইজরাইলি কেবিনেটে ১৪-৭ ভোটে গাজা ও পশ্চিম তীর থেকে ইহুদি বসতি সরিয়ে নেওয়ার প্রস্তাব পাশ হয়।

রোডম্যাপ শান্তি পরিকল্পনার আলোকে গাজা ও পশ্চিম তীর থেকে কিছু ইহুদি বসতি সরিয়ে নেওয়া হলেও পশ্চিম তীরে আগে থেকে শুরু হওয়া প্রাচীর নির্মাণের কাজ বন্ধ হয়নি। এই প্রাচীর তৈরির মাধ্যমে ইজরাইল পশ্চিম তীরের ফিলিস্তিনিদের একরকম গৃহবন্দি তো করলই; পাশাপাশি তাদের জন্য নজরদারি প্রক্রিয়াও সহজ হয়ে গেল। আন্তর্জাতিক আদালত (International Court of justice) ২০০৪ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি দেওয়া এক রায়ে ফিলিস্তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে জোরপূর্বক ইহুদি বসতি নির্মাণ ও বৈষম্যের প্রাচীর তোলাকে বেআইনি ঘোষণা করে। এ জন্য ফিলিস্তিনিদের ক্ষতিপূরণ দিতে ইজরাইলকে নির্দেশ দেয় আদালত। কিন্তু কে শোনে কার কথা, আমেরিকাই বরং ইজরাইলের পক্ষে এগিয়ে এলো। মার্কিন আর্থিক সহায়তায় বৈষম্যের দেয়াল তোলা হলো পশ্চিম তীরে।

বৈষম্যের দেয়াল

ইজরাইল ঘোষণা দিয়েছিল ৬০০ কিলোমিটার লম্বা প্রাচীর তারা তুলবেই। কিন্তু এই প্রাচীর তুলতে গিয়ে বাড়িঘর আর কৃষি জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ফিলিস্তিনিদের। প্রাচীর নির্মাণের পর এখন দীর্ঘ পথ পেরিয়ে ব্যবসার কাজে, অফিসের কাজে ছুটতে হয় ফিলিস্তিনিদের। তাই ইজরাইলের এই উদ্যোগের বিরুদ্ধে শুরু হয় আন্দোলন, যার নাম দেওয়া হয় এন্টি অ্যাপারথেইড ওয়াল ক্যাম্পেইন (Anti Apartheid Wall Campaign)।

জর্জ ডব্লিউ বুশের পর আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হলেন বারাক হোসেন ওবামা। তিনি ২০১০-এর দিকে নতুন করে শান্তি আলোচনার উদ্যোগ নিলেন। জর্জ মিশেল নামে এক ব্যক্তিকে দূত হিসেবে নিয়োগ দিলেন, যার কাজই ছিল উভয়পক্ষের সাথে আলোচনায় বসা। ওবামা ইজরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে পশ্চিম তীরে ১০ মাসের জন্য ইহুদি বসতি নির্মাণ স্থগিত রাখতে বলেন। ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ আগে থেকেই বলেছিল, পূর্ব জেরুজালেমে কোনো বসতি স্থাপন করা যাবে না।

সংকট নিরসনে এভাবে একের পর এক উদ্যোগ নেওয়া হতে থাকে, কিন্তু কোনোটাই আলোর মুখ দেখে না। এর মধ্যেও চলে সংঘাত-সংঘর্ষ। ২০১১ সালে গিলাত শালিত নামে এক ইজরাইলি সেনাকে হস্তান্তরের বিনিময়ে ১০৫০ জন ফিলিস্তিনিকে মুক্ত করে হামাস। ২০১২ সালের ২৯ শে নভেম্বর ফিলিস্তিনকে পর্যবেক্ষক রাষ্ট্রের মর্যাদা দেয় জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ। এর আগে ফিলিস্তিন পেত পর্যবেক্ষক ভূখণ্ডের মর্যাদা। এর ফলে জাতিসংঘের যেকোনো বিতর্কে অংশ নেওয়ার সুযোগ মিলল ফিলিস্তিনের। কিন্তু ভূখণ্ড উত্তপ্তই থাকল। হামাস-ফাতাহ বিরোধ, সেইসঙ্গে চলতে থাকে ইজরাইলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধযুদ্ধ।

অপারেশন প্রোটেকটিভ এজ

২০১৪ সালের ১২ জুন পশ্চিম তীরে বসবাসকারী তিন ইহুদি কিশোর নিহত হলে গাজার হামাসের ওপর চড়াও হয় ইজরাইল। হামাস এই হত্যাকাণ্ডের দায় স্বীকার করেনি, ইজরাইলও তাদের দাবির পক্ষে কোনো প্রমাণ দেখাতে পারেনি। কিন্তু ইহুদি বাহিনীর তাণ্ডবে কয়েকশো বাড়িঘর ধ্বংস হলো, আটক করা হলো কয়েকশো ফিলিস্তিনিকে। এরই মধ্যে এক ফিলিস্তিনি কিশোরকে পুড়িয়ে মারল ইজরাইলিরা।

জুলাই নাগাদ একটা যুদ্ধোন্মাদনা দেখা গেল উভয় শিবিরে। ৮ তারিখে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে অলআউট আক্রমণে যায় ইজরাইলি প্রতিরক্ষাবাহিনী। অভিযানের নাম দেওয়া হয় 'অপারেশন প্রোটেকটিভ এজ' (Operation Protective Edge)। মাত্র চারদিনেই মারা যায় শখানেক ফিলিস্তিনি। বিমান হামলার পর ১৭ তারিখ থেকে শুরু হয় স্থল অভিযান, বুলডোজারের তাণ্ডবে বিধ্বস্ত হয় বহু বাড়িঘর।

প্রতিরোধে লড়াইয়ে নামে ফিলিস্তিনিরা, হামাসের তৈরি শত শত কাসেম রকেট ছুটে যায় ইজরাইলি শহরগুলোর দিকে। কাসেম ঠেকাতে ইজরাইল ব্যবহার করে 'আয়রন ডোম মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেম।' এইভাবে ইজরাইল এড়াতে পারে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি। তবে হামাসের রকেট তেলআবিব আর হাইফার বাসিন্দাদের রাখে উৎকণ্ঠার মধ্যে। তেসরা আগস্ট নিহত হলেন হামাস নেতা আদনান আল ঘৌল। তার নামেই হামাসের নিজস্ব তৈরি একটি রাইফেলের নাম দেওয়া হয়েছিল 'ঘৌল রাইফেল'।

২৬ আগস্ট পর্যন্ত সাত সপ্তাহ ধরে চলা যুদ্ধে ৬৭ ইজরাইলি সেনা ও আড়াই হাজারের মতো ফিলিস্তিনি নিহত হয়, আহত হয় দশ হাজার ব্যক্তি। মিশরের মধ্যস্থতায় থামে হামাস ও ইজরাইল। ২৬ আগস্ট দুই পক্ষ মিলিত হয় চুক্তিতে। উভয়পক্ষই দাবি করে- যুদ্ধে তারা বিজয়ী হয়েছে। চুক্তির কিছু শর্ত ছিল এ রকম...

১. হামাস ও অন্যান্যরা ইজরাইলের ভেতরে রকেট হামলা বন্ধ করবে।

২. ইসরাইল সব ধরনের হামলা বন্ধ করবে।

৩. রাফাসহ গাজার সাথে সম্পৃক্ত সব সীমান্ত খুলে দিতে হবে।

৪. গাজায় মাছ ধরার এলাকা তিন মাইল থেকে ছয় মাইল করা হবে। ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ১২ মাইল পর্যন্ত এলাকায় মাছ ধরার সুযোগ পাবে।

৫. ইজরাইলের কারাগারে বন্দি ফিলিস্তিনিদের মুক্তি দিতে হবে।

৬. গাজায় সমুদ্রবন্দর নির্মাণে বাধা দেওয়া যাবে না।

রহস্যময় নেতা শেখ আহমেদ ইয়াসিন

মসজিদে ফজরের নামাজ পড়ে বাসায় ফিরছেন শেখ আহমেদ ইয়াসিন। হুইল চেয়ারে বসা হামাসের এই আধ্যাত্মিক নেতাকে ঘিরে আছে দেহরক্ষীরা। হঠাৎ-ই আকাশে উড়ে এলো ইজরাইলি হেলিকপ্টার। ইয়াসিনকে নিশানা করে ছোড়া হয় তিনটি মিসাইল। তিনিসহ নিহত হলেন অন্তত সাতজন। আহত ১৫ জনের মধ্যে হামাস নেতার দুই ছেলেও রয়েছে। ইজরাইলি প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল শ্যারনের নির্দেশেই হয় হামলা। শ্যারন ইয়াসিনকে মনে করতেন ফিলিস্তিনি সন্ত্রাসবাদের মাস্টারমাইন্ড। ২০০৪ সালের ২২ মার্চের এই হত্যাকাণ্ডের পর গাজার রাস্তায় নামে লাখো ফিলিস্তিনি। জানাজায় শরিক হয় দুই লাখেরও বেশি মানুষ।

শেখ আহমেদ ইয়াসিন একবার তার বন্ধু আব্দুল্লাহ আল খাতিবের সাথে রেসলিং খেলতে গিয়ে গুরুতর আঘাত পান। এই আঘাত শেষ অবধি হামাস নেতাকে পঙ্গুত্বের দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু ইয়াসিন কখনোই পঙ্গুত্বের কারণ কাউকে জানাতে চাননি। কারণ, যদি দুই পরিবারের সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায়? তাই তাকে গল্প সাজাতে হয় এ রকম– সমুদ্র সৈকতে স্কুল বন্ধুদের সাথে পৃষ্ঠলম্ফ (leapfrog) খেলতে গিয়ে তিনি আঘাত পেয়েছিলেন। ৪৫ দিন তার ঘাড় প্লাস্টার করে রাখা হয়। যখন প্লাস্টার সরানো হয়, তখনই ইয়াসিনের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় বাকি জীবন পঙ্গু হয়েই থাকতে হবে তাকে।[৮০] স্পাইনাল কর্ড ড্যামেজ হয়ে গেছে; না পারছেন হাঁটতে,

---

৮০. Inside Hamas: The Untold Story of the Militant Islamic Movement, Zaki Chehab, page-29.

না পারছেন হাতে কোনো কলম বা পেন্সিল ধরতে। তারপরও পড়তে যান আল আজহারে। বহু পরে অবশ্য পরিবারের সদস্যদের আসল ঘটনা জানিয়ে দেন শেখ ইয়াসিন।

ক্যামেরা গাইডেড মিসাইল ছুড়ে শেখ ইয়াসিনকে হত্যা করা হয়েছিল। হামাসের নতুন নেতা হন আব্দুল আজিজ রানতিসি। অল্প দিনের মধ্যে তাকেও বিদায় নিতে হয়। বাসা থেকে বের হওয়ার পর হেলিকপ্টার থেকে ছোড়া ইজরাইলি মিসাইলের আঘাতে রানতিসি মারা যান। রানতিসি হলেন প্রথম কোনো হামাস নেতা, যাকে আটক করা হয়েছিল ১৯৮৮ সালের ১৫ জানুয়ারি। দুই ইজরাইলি সেনা তার বাসায় ঢুকলে তাদের সাথে ধস্তাধস্তি হয়েছিল রানতিসির। ২১ দিনের জেল হয়েছিল। মুক্তির দুই মাসের মধ্যে আবার গ্রেফতার। এ দফায় রানতিসি জেলে ছিলেন আড়াই বছর। অসলো-চুক্তির বিরোধিতা করায় ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষও তাকে আটক করেছিল। রানতিসিকে গ্রেফতার করতে তখনকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও ফাতাহর প্রভাবশালী নেতা মোহাম্মদ দাহলানকে নির্দেশ দিয়েছিলেন ইয়াসির আরাফাত। কিন্তু দাহলান আরাফাতকে অক্ষমতার কথা জানিয়ে দেন। আরাফাত জানতে চাইলেন– 'কেন নয়? ভয় পাও হামাসকে?' 'না, মাকে ভয় পাই। কারণ, মা রানতিসিকে স্নেহ করেন।' রানতিসি ও দাহলান-দুজনেরই বেড়ে উঠা গাজাতে।

রানতিসির পর ইজরাইলের হামলায় আবু সানাবও মারা গেলেন। এরপর চতুর্থ উত্তরাধিকারের নাম আর প্রকাশ করেনি হামাস। এই দুঃসময়ে আবার লাইমলাইটে আসেন খালিদ মিশাল। জর্ডানে নির্বাসিত মিশালকে ১৯৯৯ সালে বহিষ্কার করেছিলেন বাদশাহ দ্বিতীয় আব্দুল্লাহ। এরপর তিনি কিছুটা স্থায়ী হন সিরিয়াতে। রানতিসি হত্যাকাণ্ডের পর থেকেই দামেস্কে বসে হামাসের সামরিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক দিকগুলো সমন্বয় করতেন মিশাল। হামাসের প্রতিরোধ যুদ্ধ বাড়ল আর ইজরাইলও গুপ্তহত্যায় জোর দিলো। আখেরে আরবরা বুকে টেনে নিল হামাস নেতাদের।

ইয়াসির আরাফাত গুপ্তহত্যার শিকার

ইয়াসির আরাফাত মারা যান ২০০৪ সালের ৮ নভেম্বর। ৭৫ বছর বয়সে ফিলিস্তিনের কিংবদন্তি এই নেতার মৃত্যু হয় ফ্রান্সের একটি হাসপাতালে। মেডিক্যাল রিপোর্টে বলা হয়– মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের কারণেই আরাফাতের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু কী কারণে দ্রুত তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়েছিল, এর ব্যাখ্যা দিতে পারেনি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এরপর থেকেই আরাফাতের মৃত্যুকে ঘিরে নানান কথা বাতাসে ভাসতে থাকে। মৃত্যুর পরে আরাফাতের স্ত্রী সুহা কোনো অভিযোগ করেননি, তাই তার লাশেরও কোনো ময়নাতদন্ত হয়নি।

আরাফাতের মৃত্যুর বিষয়ে চাঞ্চল্য বাড়ে ২০১২ সালে। সে বছর কাতারভিত্তিক আল-জাজিরা টেলিভিশনের একটি অনুসন্ধানে জানা যায়– সুইজারল্যান্ডের গবেষণায় আরাফাতের লিভারে পলোনিয়াম ২১০-এর অস্বাভাবিক অস্তিত্ব পাওয়া গেছে।[৮১] এরপরেই মত পালটান সুহা আরাফাত, দাবি জানান স্বামীর লাশ পরীক্ষার। রামাল্লায় ইয়াসির আরাফাতের কবর থেকে নমুনা সংগ্রহ করেন ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড আর রাশিয়ার তদন্তকারীরা। তবে ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে 'আরাফাতকে হত্যা করা হয়েছে' এমন সন্দেহে চলমান এক তদন্ত কার্যক্রম বন্ধ করে দেয় ফ্রান্সের বিচারকরা। ফরাসি চিকিৎসকরা জানায়, আরাফাতকে বিষ প্রয়োগে হত্যার অভিযোগের বিষয়ে কোনোও তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

কিন্তু জল বহুদূর গড়িয়েছে। পলোনিয়ামের সূত্র ধরে ফিলিস্তিন নেতারা অভিযোগ আনলেন– 'ইয়াসির আরাফাতের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি; এর পেছনে আছে ইজরাইলের হাত।' তবে ইজরাইল এই অভিযোগ এখনও স্বীকার করেনি। ফিলিস্তিনি যে কমিটি ইয়াসির আরাফাতের মৃত্যুর ঘটনা তদন্ত করছিল, তারা ঘোষণা দেয়– ২০০৪ সালের ওই ঘটনা নিয়ে আরও অনুসন্ধান চালানো হবে, যাতে আসল সত্য বের করা যায়। রামাল্লায় কমিটির প্রধান তওফিক তিরাবি এক সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করেন–

> 'আরাফাতকে হত্যার জন্য পলোনিয়াম না অন্য কিছু ব্যবহার করা হয়েছিল এবং তার কারণেই ইয়াসির আরাফাত মারা গেছেন কি না, নাকি অন্য কোনো কারণে, তা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। সিকিউরিটি এবং মেডিকেল কমিশনের একজন সদস্য হিসেবে আমার কাছে যে তথ্য আছে, তার ভিত্তিতে বলছি– ইয়াসির আরাফাতকে হত্যা করা হয়েছে এবং ইজরাইলই তাকে হত্যা করেছে। আমি এ কথা বানিয়ে বলছি না। এটা এরিয়েল শ্যারন আর শাওল মোফাজের মতো ইসরাইলি নেতাদের টেলিফোন আলাপেও শোনা গেছে তারা সে সময় বলেছেন, আরাফাতকে যেতে হবে।'

---

৮১. What Killed Arafat? I Al Jazeera Investigations.

চতুর্দশ অধ্যায়

আরাফাতবিহীন ফিলিস্তিন

'This is my homelad, no one can kick me ou.t'—Yasser Arafat.

নির্বাচনে হামাসের জয় এবং ফাতাহর সাথে সংঘাত

ইয়াসির আরাফাতের মৃত্যুর পর ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের অন্তবর্তী প্রধান করা হয়েছে তারই সহযোগী মাহমুদ আব্বাসকে। এই পদে আব্বাসকে স্থায়ী করা হয় ২০০৫ সালের জানুয়ারিতে। হামাস তখন সেবামূলক কাজে ব্যস্ত। প্যালেস্টাইনে তারা গড়ে তুলছে মসজিদ, দাতব্য সংস্থা আর স্পোর্টস ক্লাব। একসময় হামাস নিয়ে আসে নিজস্ব প্রচারমাধ্যম। প্রিন্ট ও ইন্টারনেট পাবলিকেশনের পাশাপাশি আল আকসা টেলিভিশনের মাধ্যমে দলীয় আদর্শ প্রচার করতে শুরু করে হামাস। ফিলিস্তিনিরা ভাবল-হামাসেই তাদের মুক্তি।

২০০৬ সালে আরাফাতবিহীন ফিলিস্তিনে হয় সাধারণ নির্বাচন। হামাস এ নির্বাচনে অংশ নেয়। ২৬ জানুয়ারি ফিলিস্তিনের কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটি ঘোষণা দেয়- 'বেশিরভাগ আসনেই জয় পেয়েছে হামাস।' ফাতাহ নেতাদের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। এ রকম পরিস্থিতির জন্য তারা মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না। অথচ নির্বাচনের রাতেও শূন্যে গুলি ছুড়ে সম্ভাব্য বিজয় উৎসব করেছে তাদের সমর্থকরা। নির্বাচনকে অস্বীকার করারও কোনো উপায় নেই। কারণ, বিদেশি পর্যবেক্ষকরাও ঘোষণা দিয়েছে– নির্বাচন সুষ্ঠু ও অবাধ হয়েছে।

১৩২টি আসনের মধ্যে ৭৬টিতে জয় পাওয়ার কথা জানায় হামাস জোট (তার মধ্যে ৭৪টিতেই নিজ ব্যানারে)। কেবল যে একটি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য ফিলিস্তিনিরা হামাসকে ভোট দিয়েছে, এটা শতভাগ ঠিক না-ও হতে পারে। ফিলিস্তিনিরা একটা পরিবর্তন চেয়েছিল; তারা ফাতাহর ইজরাইল তোষণ-নীতি পছন্দ করছিল না।

ভোট হয় ২৫ জানুয়ারি। ১০ লাখ ৭৩ হাজার ভোটার অংশ নেয় তাতে। নির্বাচনে কে জিতবে– এ নিয়ে পুরাই অন্ধকারে ছিল ফাতাহ ও হামাসের তৃণমূল সমর্থকরা। হামাস সমর্থক ভোটারদের নানা নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল। কাকে ভোট দেবেন? এর উত্তর কেউ জানতে চাইলে হামাস সমর্থকদের বলা হয়েছিল, তারা যাতে কনফিউজিং উত্তর দেন। যে কারণে একমাস আগেও ফাতাহ নেতারা জানতেন, তারাই (ফাতাহ) সরকার গঠন করতে যাচ্ছেন।

অন্ধকারে ছিল ইজরাইলও। নির্বাচনের কিছুদিন আগে ইজরাইলের প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল ডেন হালুজ (Lt.General Dan Halutzz) *নেসেটের ফরেন অ্যাফেয়ার্স ও নিরাপত্তা কমিটিকে (Committee for ForeignAffairs and Security)* জানান, কম মেজোরিটির সম্ভাবনা থাকলেও ফাতাহ-ই ক্ষমতায় থাকছে! কারণ, গোয়েন্দা সংস্থা 'আমান'-এর প্রতিবেদন এ রকমই ছিল। ফলে নির্বাচনের ফলাফল ইজরাইলি গোয়েন্দা সংস্থাকে বিব্রত করে দেয়। এ বিষয়ে সম্পাদকীয় ছাপা হয় ইজরাইলি দৈনিক *Yedioth Ahronoth*-এ। প্রশ্ন আসে গোয়েন্দারা যদি ঘরের কাছের ফিলিস্তিনের খবরই জানাতে না পারে, তাহলে ইরানের বিষয়ে কী করে তাদের ওপর ভরসা রাখবে সরকার?

নির্বাচনের আগে হামাস, ইসলামিক জিহাদসহ ১৩টি সংগঠন কায়রোতে বৈঠকে বসেছিল। সেখান থেকে ফিরে বুদ্ধিজীবীদের সাথে পরামর্শ করা হয়– কীভাবে ভোটার টানা যায়। গাজার ইসলামিক ইউনিভার্সিটি হয় তাদের প্রচারকেন্দ্র। পক্ষ, বিপক্ষ আর ভাসমান– এভাবে তিনটা ভাগে ভাগ করা হয় ভোটারদের। ভাসমানদের ওপর নজর দেওয়া হয় বেশি। ক্যাম্পেইন করতে গিয়ে নিজেদের সমর্থন করার কথা বলেনি হামাস; বরং তাদের কাছে তুলে ধরা হয়েছিল ফাতাহ সরকারের দুর্নীতি ও পশ্চিমের সঙ্গে তাদের দহরম-মহররমকে। তারা পরিবর্তন ও সংস্কারের ডাক দেয়। আহ্বানে সাড়া দিয়ে ফিলিস্তিন পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর অনেকেই হামাসকে ভোট দিয়েছিল। ফাতাহর জন্য এটা ছিল বিপর্যয়কর পরিস্থিতি। চরম বিপর্যয়কর। সাংবাদিকরা এর উত্তর খুঁজতে ফাতাহ নেতাদের পিছু লাগল, কিন্তু নেতারা মোবাইল ফোন বন্ধ রেখে যোগাযোগের বাইরে থেকে গেলেন। ক্ষুব্ধ ফাতাহ মিলিশিয়ারা রাগে-ক্ষোভে রাস্তায় নেমে মেশিনগানের গুলি ছুড়তে লাগল।

২৯ মার্চ কোয়ালিশন সরকার গঠন করে হামাস, যার প্রধান হন ইসমাইল হানিয়া। হামাসের জয় কিংবা হানিয়ার প্রধানমন্ত্রীত্ব– কোনোটাই মানতে পারছিল না ফাতাহ নেতারা। ফলে গাজার রাস্তায় বিভিন্ন উপদলের মধ্যে দ্রুতই সংঘাত ছড়িয়ে পড়ল। হামাসের জয় মার্কিনিদের জন্যও বিব্রতকর হয়ে দাঁড়ায়। এই নির্বাচনে আরেকটা বিষয় স্পষ্ট হয় যে, আরাফাত ছাড়া গাজা ও পশ্চিম তীরে ফাতাহর আবেদন অতটা নেই।

হামাস ও ফাতাহর সমর্থকরা সংঘাতে জড়িয়ে পড়ল। ১৫ মাস ধরে চলা সংঘাতে প্রাণ যায় অন্তত সাড়ে তিনশো ফিলিস্তিনির। এপ্রিলের ২০ তারিখে অ্যাক্সিকিউটিভ ফোর্স নামে নতুন একটি বাহিনী নামল গাজাতে। কয়েক সপ্তাহ পর হামাস নেতারা অভিযোগ করলেন– নিরাপত্তাকর্মীদের মধ্যে যারা ফাতাহ ও পিএলও'র অনুগত, তারা হামাস সরকারের নির্দেশনা মানছে না। ফাতাহ সদস্যরা অ্যাক্সিকিউটিভ ফোর্স নামানোর বিষয়টিকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিলেন। প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস গাজার পুলিশ কর্মকর্তাদের কাজে যোগ দিতে বারণ করেন।

এরই মধ্যে জুনের শেষ দিকে ৮ সশস্ত্র ব্যক্তি টানেল ব্যবহার করে একটি ইজরাইলি ট্যাংকে হামলা চালায়, যাতে দুজন সেনা মারা যায়। গিলাত শালিত নামে এক ইজরাইলি সেনাকে ধরে নিয়ে আসা হয়। ১৯ বছর বয়সি কর্পোরাল গিলাত শালিতকে হামাসসহ তিনটি সংগঠন অপহরণ করেছিল। তারা ৮শ মিটার একটি সুড়ঙ্গ পেরিয়ে ইজরাইলি চেকপোস্টে হামলা চালিয়েছিল। এর দুদিন পরই 'সামার রেইনস' নামে বড়ো ধরনের হামলা শুরু করে ইজরাইল। এছাড়া উত্তর সীমান্তে ইজরাইল পাশাপাশি লেবাননের হিজবুল্লাহ গেরিলাদের সাথেও সংঘাতে জড়িয়ে যায়।

জুলাইয়ের ১২ তারিখে হিজবুল্লাহ গেরিলারা দুটি ইজরাইলি টহল জিপে হামলা চালিয়ে তিন সেনাকে হত্যা ও দুজনকে আটক করার পর এই সংঘাতের সূচনা হয়। এরই জেরে ৩৩ দিনব্যাপী যুদ্ধ চলে। হাজার হাজার রকেট ইজরাইল অভিমুখে ছুটে যায়। বিপরীতে বৈরুতসহ দক্ষিণ লেবাননের বিভিন্ন হিজবুল্লাহ অবস্থানে বিমান হামলা চালায় ইজরাইল। যুদ্ধ থামে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় আনা এক যুদ্ধবিরতিতে, যা কার্যকর হয় ২০০৬ সালের ১৪-ই আগস্ট।

এদিকে, হামাস-ফাতাহ সমর্থকরা সংঘাত অব্যাহত রাখল। দ্রুতই তা ছড়িয়ে পড়ল পশ্চিম তীরের রামাল্লা, নাবালুস, জেরিকো হেবরনে। ডিসেম্বরে রাফা ক্রসিংয়ে প্রধানমন্ত্রী ইসমাইল হানিয়ার ওপর এক হামলা হয়, যাতে তার এক দেহরক্ষী মারা যায়। এ ঘটনায় ফাতাহকে দায়ী করে হামাস। মূলত গাজার ফাতাহ সিনিয়র নেতা মোহাম্মদ দাহলানকে অভিযুক্ত করা হয়। হামাসকে হঠাতে মাহমুদ আব্বাস আগাম নির্বাচনের ডাক দেন। আব্বাসের ঘোষণাকে গণতান্ত্রিক একটি সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ক্যু হিসেবে দেখে হামাস। ২০০৭ সালের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে সংঘাত গুরুতর আকার ধারণ করল।

হামাস ও ফাতার দ্বন্দ্ব ঠেকাতে দুই পক্ষকে মক্কায় আমন্ত্রণ জানান সৌদি আরবের তখনকার বাদশাহ আব্দুল্লাহ। আলোচনায় হামাসের পক্ষে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন খালিদ মিশাল ও ইসমাইল হানিয়া। আর ফাতাহর পক্ষে ছিলেন মাহমুদ আব্বাস ও মোহাম্মদ দাহলান। তিন দিনের আলোচনার পর ৭ ফেব্রুয়ারিতে দুই পক্ষ সমঝোতায় পৌঁছে।

মক্কা অ্যাগ্রিমেন্ট গৃহীত হয়। ২০০৭ সালের ১৭ই মার্চ মক্কা অ্যাগ্রিমেন্টের আলোকে একটি ঐকমত্যের সরকার গঠনে রাজি হয় হামাস ও ফাতাহ, কিন্তু বেশিদিন এই সমঝোতা টিকল না। গাজা থেকে সাহায্যকর্মীরা ফিরে যেতে লাগলেন। গাজার অনেক অবকাঠামো ক্ষতির মুখে পড়ল।

২০০৭ সালের ৭ জুন হামাস গাজার দখল নিতে অভিযান শুরু করে। জুনের ১৩ তারিখের মধ্যে মাহমুদ আব্বাসের প্রেসিডেন্ট কম্পাউন্ডসহ পিএ'র (ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ) কিছু ভবন, গাজার সড়ক দখলে নিয়ে নেয় হামাস যোদ্ধারা। ১৪-ই জুনের মধ্যে পুরো গাজা হামাসের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। মাহমুদ আব্বাস ভেঙে দিলেন ঐকমত্যের সরকার। তিনি অর্থমন্ত্রী সালাম ফায়েদকে পশ্চিম তীরে জরুরি একটি সরকারের প্রধান করেন। হামাস ও ফাতাহর মধ্যে চলমান দ্বন্দ্বের মধ্যেই পিএ ইন্টেলিজেন্স ও মিলিটারি বেস দখল করে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের সরবরাহ করা গুপ্তচরবৃত্তির নানা সরঞ্জাম পায় হামাস। হাজার হাজার নথি সংগ্রহের দাবি করে তারা। এমন খবরে বিব্রত হয় যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরাইল। গাজায় শুরু হয় ইজরাইলি অবরোধ।

গাজা-পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো উন্মুক্ত কারাগার

এক

মিশরের প্রথম গণতান্ত্রিক প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুরসিকে উৎখাত করে ক্ষমতায় এসেছেন জেনারেল আবদেল ফাত্তাহ আল সিসি। মুরসিরা কখনোই ভাবেননি কিংবা ভাবার সময় পাননি যে, সেক্যুলার জেনারেলরা আবার হবেন গণতন্ত্রের পথের কাঁটা। কারণ, ২০১১ সালের আরব বসন্তে মোবারক রেজিমের পতনের পর একটা সম্ভাবনাময় উত্থান ঘটেছিল ইসলামপন্থিদের, কিন্তু বাস্তবতা হলো– সৌদি-আমিরাতের অর্থ আর ইজরাইলের কৌশলের কাছে গণতন্ত্রের কবর রচিত হয়েছে।

ইজরাইল ঘনিষ্ঠ ও ব্রাদারহুডবিদ্বেষী জেনারেল সিসি গাজার বাসিন্দাদের রেখেছেন নিদারুণ কষ্টের মধ্যে। রাফা ক্রসিং– যা কিনা ইজরাইল ভূখণ্ড এড়িয়ে তামাম দুনিয়ার সঙ্গে গাজার বাসিন্দাদের সড়ক যোগাযোগের একমাত্র উপায়, সিসি ক্ষমতায় আসার পর বছরের বেশিরভাগ সময়ই সেটা বন্ধ থাকছে। ২০১৭ সালে মাত্র ২৯ দিন খোলা হয়েছিল রাফার ফটক। এটি দুই ভাগে বিভক্ত এক এলাকা, যা ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের পর কাঁটাতার আর কংক্রিটের তৈরি দেয়াল দ্বারা আলাদা করা। শহরটির একাংশ দখলদার ইজরাইলের হাতে গড়া। অপর অংশ গড়ে উঠে মিশরীয় সেনাবাহিনীর হাতে। সিনাই উপদ্বীপে জঙ্গি তৎপরতা বেড়ে গেলে রাফার মিশরীয় অংশটিকে একটি বাফারজোনে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নেয় কর্তৃপক্ষ। মিশর যদিও বলছে, এর মাধ্যমে তারা চোরাচালান বন্ধ করতে চায়, অথচ তা দুর্দশা বাড়িয়েছে ফিলিস্তিনিদের।

সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাফায় বসবাস করা শত শত মিশরীয় পরিবারকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়। গায়ের জোরে এসব পরিবারের ভূমি কিনে নিয়েছে সরকার। ফলে রাফার কৃষিব্যবস্থা প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়, হাজার হাজার ফলের গাছ কাটা পড়ে। এই পদক্ষেপ ফিলিস্তিনিদের দুঃখ-দুর্দশার চক্রকে আরও জটিল করেছে। গাজা থেকে আগে যেসব ছোটো ছোটো টানেল বা সুরঙ্গ মিশরের রাফা পর্যন্ত চলে যেত, সেগুলোর প্রায় সবই বন্ধ হয়ে গেছে এবং মিশরীয় সেনাদের নজর এড়িয়ে ফিলিস্তিনিদের এখন দীর্ঘ টানেল তৈরির প্রয়োজন পড়বে– যা প্রায় অসম্ভব। অথচ এই টানেলগুলো দিয়ে ফিলিস্তিনিরা খাবার, আসবাব ও জরুরি ওষুধপত্র আনা-নেওয়া করত।

রাফা ক্রসিং দিয়ে বৈধভাবে মিশরে প্রবেশের প্রক্রিয়া কেবল কঠিনই নয়; বরং চরম ঝুঁকিপূর্ণ। ২০১৫, ১৬ এবং ১৭-এই তিন বছরে রাফা দিয়ে প্রবেশকারী অন্তত ১৫ ফিলিস্তিনি গুম অথবা নিখোঁজ হয়েছেন। এ সকল গুম/নিখোঁজের নেপথ্যে আছে মিশরীয় বাহিনী। গুম হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে হামাসের কাসেম ব্রিগেডের সদস্য যেমন রয়েছেন, তেমনি আছেন বেশ কয়েকজন নারীও। সন্ত্রাসে জড়িত থাকার অভিযোগে তাদের মিশরীয় টর্চার সেলে নিয়ে উলঙ্গ করে নির্যাতন করে নিরাপত্তা বাহিনী। ২০১৫ সালের ১৯ শে আগস্ট রাফা হয়ে বাসে করে কায়রো যাওয়ার পথে মুখোশধারী লোকজন ধরে নিয়ে যায় আবদেল দেইম আবু লিব্দে নামে এক ফিলিস্তিনিকে। পরে জানা যায়– মিশরীয় একটি ডিটেনশন সেলে আটক আছেন তিনি।

রাফা ক্রসিং দিয়ে ফিলিস্তিনিরা মিশরে প্রবেশের অপেক্ষায়। ছবি এএফপি, ১৪ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৬।

২০ লাখ মানুষের ভূখণ্ড গাজা কংক্রিটের এক ভারী দেয়াল দিয়ে ঘেরা। কোথাও কোথাও এই দেয়ালের উচ্চতা আট মিটারের মতো! ইজরাইল ও মিশর-উভয় দেশই গাজাকে 'বোঝা' মনে করে।

রাফা সীমান্ত দিয়ে এক ফিলিস্তিনি শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণভাবে পারাপার করা হচ্ছে। ছবি, রয়টার্স, ২০০৫

পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে (৬ই এপ্রিল, ২০১৮) গাজা সীমান্তে ইজরাইলি সেনাদের গুলিতে গুরুতর আহত হন ফিলিস্তিনের সাংবাদিক ইয়াসির মুর্তজা। দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও শেষ পর্যন্ত তাকে বাঁচানো যায়নি। ছবি : ইন্টারনেট

দুই

ইজরাইল-মিশরের যৌথ অবরোধে দারিদ্র্যে জর্জরিত গাজা, হামাস নিয়ন্ত্রিত এলাকা হিসেবেই বেশি পরিচিত। হামাসের সামরিক শাখা ইজ্জেদিন আল কাসেম ব্রিগেড এখান থেকেই ইজরাইলি শহর গুলোর দিকে স্বল্পপাল্লার রকেট ছুড়ে থাকে। গাজায় সক্রিয় ইসলামিক জিহাদের মতো সশস্ত্র গোষ্ঠীও। গতবছরের ৩০ মার্চ (২০১৮) ফিলিস্তিনি ভূমি দিবস উপলক্ষ্যে প্রতিবাদ-বিক্ষোভে ইজরাইলি বাহিনীর হামলায় ১৯ ফিলিস্তিনি নিহত হওয়ার জেরে নতুন করে জ্বলে উঠে এই উপত্যকা। সেদিন আহত হয় কয়েকশো ফিলিস্তিনি। ২০১৪ সালের যুদ্ধের পর গাজায় এটিই সবচেয়ে বড়ো প্রাণহানির ঘটনা। ১৯৭৬ সালের পর থেকে প্রতিবছরই নিজেদের ভিটেমাটি ও ফসলি জমি ফিরে পাওয়ার আশায় দিবসটি পালন করে আসছে গাজার বাসিন্দারা। এ নিয়ে কয়েক সপ্তাহব্যাপী সংঘাতে গাজায় ঝরেছে অধর্শত ফিলিস্তিনির প্রাণ।

১৯১৭ সালের আগে গাজা উপত্যকা ছিল উসমানীয় (পশ্চিমাদের ভাষায় অটোমান) সাম্রাজ্যের অধীনে। এরপর কয়েক দফায় শাসকশ্রেণির পরিবর্তন ঘটে। গত শতকে ব্রিটিশদের কাছ থেকে গাজার মালিকানা যায় মিশরের কাছে। '৬৭-র যুদ্ধের আগেও গাজা মিশরের নিয়ন্ত্রণেই ছিল। বর্তমানে এই এলাকা হামাসের দখলে থাকলেও পশ্চিম তীরের মতো এখানেও জারি আছে ইজরাইলি সামরিক শাসন। মাত্র ১৪১ বর্গমাইল (৩৬৫ বর্গকিলোমিটার) এলাকায় বসবাস করছে ২০ লাখের মতো মানুষ। তাই নিঃসন্দেহে এটি বিশ্বের ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাগুলোর একটি।

পশ্চিম তীর থেকে গাজা পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন। দুই ভূখণ্ডের বিভাজন মূলত নির্ধারিত হয়েছে ১৯৪৯ সালের যুদ্ধবিরতি রেখা বরাবর। এলাকা দুটির মধ্যে সবচেয়ে কাছাকাছি দূরত্ব প্রায় ৪০ কিলোমিটার।[৮২] গাজা ৪১ কিলোমিটার (২৫ মাইল) দীর্ঘ এবং ১০ কিলোমিটার চওড়া। একদিকে ভূমধ্যসাগর, তিন দিকে ইজরাইল ও দক্ষিণ দিকে মিশরের সিনাই সীমান্ত। ইজরাইলের সঙ্গে গাজার রয়েছে ৫১ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত। মিশরের সঙ্গে আছে ৭ কিলোমিটার। গাজার অন্যদিকে ৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ ভূমধ্যসাগর উপকূল।

গাজায় যারা বসবাস করছেন, তাদের বেশিরভাগই ১৯৪৮ সালে ইজরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সময় উৎখাত হওয়া ফিলিস্তিনিদের বংশধর। অনেকেই এখনও বাস করেন শরণার্থী শিবিরে। এই হতভাগাদের কাছে গাজা যেন পৃথিবীর বৃহত্তম উন্মুক্ত কারাগার। এখানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে বাস করেন ৫ হাজার ৪৭৯ জন লোক। আগামী তিন বছরে তা ৬ হাজার ছাড়াতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ২০১৫ সালে গাজার জনসংখ্যা ছিল ৬ লাখ ৩০ হাজারের মতো।

---

[৮২]. ফিলিস্তিনি-ইজরাইলি সংঘাতের মূলে যে দশটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, বিবিসি বাংলা, ২২ আগস্ট, ২০১৮।

জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী ২০৩০ সাল নাগাদ এই সংখ্যা ৩১ লাখে গিয়ে দাঁড়াবে। দারিদ্র্যের পাশাপাশি গাজায় আছে বেকারত্ব। ইজরাইল-মিশরের কঠোর সীমান্ত নজরদারি আর চেকপয়েন্ট পেরিয়ে বাইরে যাওয়ার সুযোগও সীমিত। চিকিৎসার জন্য এখানকার লোকদের আগে মিশরে বা ইজরাইলের ভেতরে যাওয়ার সুযোগ ছিল, কিন্তু সীমান্তে কড়াকড়ির জন্য তা ব্যাপকভাবে কমে গেছে। বিদেশি সাহায্য সত্ত্বেও এখানে পাঁচ লাখেরও বেশি লোক মাঝারি থেকে তীব্র খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। ইজরাইল ঘোষিত সীমান্তসংলগ্ন প্রায় এক মাইলের বাফার জোনে চাষবাস করার অনুমতি নেই ফিলিস্তিনিদের। সমুদ্রে তীর থেকে একটা নির্দিষ্ট এলাকার বাইরে গাজার জেলেরা মাছ ধরতেও পারেন না। কোনো রকেট হামলা হলেই ইজরাইল এই মাছ ধরার এলাকা কমিয়ে দেয়।

গাজার বেশিরভাগ বিদ্যুৎ আসে ইজরাইল থেকে। তবে তাদের একটি নিজস্ব বিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে আর কিছু মিশর থেকে আসে। এই অবস্থায় দৈনিক ছয়-সাত ঘণ্টা বিদ্যুৎহীন থাকতে হয় গাজার বাসিন্দাদের। কেউ কেউ এই সংকট কাটাতে ব্যবহার করে ডিজেলের জেনারেটর, কিন্তু তাতে খরচ হয় প্রচুর অর্থ।[৮৩] গাজায় মিঠা পানির বড়ো কোনো জলাধার নেই। বাড়িগুলোতে পাইপে যে পানি আসে, তার সরবরাহ অনিয়মিত। ৯৭ শতাংশ বাড়িতে নির্ভর করতে হয় ট্যাংকার দিয়ে সরবরাহ করা পানির ওপর।

১৯৬৭ সালের যুদ্ধে মিশরের কাছ থেকে এলাকাটি দখল করে নেওয়ার পর ২০০৫ সালে দখল ছেড়ে দেয় ইজরাইল। তখন ইহুদি সেনাদের পাশাপাশি গাজা ছেড়ে যায় ৭ হাজারের মতো ইহুদি বসতি স্থাপনকারী। ২০০৬ সালে ফিলিস্তিনি আইনসভার নির্বাচনে জয়ী হয় হামাস, কিন্তু তারপর প্রতিদ্বন্দ্বী ফাতাহর সাথে সংঘাত সৃষ্টির পর তারা গাজার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। হামাসের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের পর খুব দ্রুত ইজরাইল এই এলাকাটির ওপর অবরোধ আরোপ করে। মিশরও গাজার দক্ষিণ সীমান্তে অবরোধ আরোপ করে। ইজরাইল ও হামাসের মধ্যে এক সংক্ষিপ্ত সামরিক সংঘাত হয় ২০১৪ সালে।

ইজরাইলের চেষ্টা ছিল গাজা থেকে রকেট হামলা থামানো। অন্যদিকে, হামাসের লক্ষ্য ছিল তাদের বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটানো। মিশর ও গাজার মধ্যে রাফাহ সীমান্ত দিয়ে সে সময় গড়ে উঠে চোরাচালানের সুড়ঙ্গের এক নেটওয়ার্ক। এগুলো দিয়ে খাদ্যসহ বিভিন্ন পণ্য মিশর থেকে গাজায় ঢুকত। ২০১৩ সালের মাঝামাঝি সুড়ঙ্গের নেটওয়ার্কগুলো বন্ধ করে দেওয়ার অভিযান চালায় মিশর। বিশেষ কিছু ক্ষেত্র ছাড়া ২০১৪ সালের অক্টোবর থেকেই গাজা সীমান্ত বন্ধ করে রেখেছে মিশরের সরকার।

---

৮৩. অবরুদ্ধ গাজায় কীভাবে জীবন কাটে ফিলিস্তিনিদের? বিবিসি বাংলা, ১৬ মে, ২০১৮।

গাজার বাসিন্দাদের গড় আয়ও কমে গেছে। ১৯৯৪ সালে সেখানকার একজন অধিবাসীর গড় বার্ষিক আয় ছিল ২ হাজার ৬৫৯ ডলার। ২০১৮ সালে সে আয় কমে নেমে এসেছে ১ হাজার ৮২৬ ডলারে– বলছে বিশ্বব্যাংকের এক রিপোর্ট। গাজায় দারিদ্র্যের হার ৩৯ শতাংশ, যা পশ্চিম তীরের ফিলিস্তিনিদের তুলনায় দ্বিগুণ।

১৯৪০-এর দশকের শেষের দিকে ফিলিস্তিনে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পরপরই ইহুদি ও আরবদের মধ্যে সংঘাত বাড়তে থাকে। প্রথম আরব-ইজরাইল যুদ্ধ এবং ইজরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর গাজার নিয়ন্ত্রণ যায় মিশরীয় প্রশাসনের কাছে; যদিও মিশর কখনোই গাজাকে তার মূল ভূখণ্ডের সাথে একীভূত করেনি। ১৯৬৭ সালের জুনে ছয় দিনের তৃতীয় আরব-ইজরাইল যুদ্ধে মিশর থেকে গাজা দখল করে নেয় ইজরাইল। একই সময় পশ্চিম তীর ও জেরুজালেমও ইজরাইলের দখলে চলে যায়। তবে ২০০৫ সালের ১২ সেপ্টেম্বর একতরফাভাবে গাজা থেকে ইহুদি অধিবাসী এবং সেনাদের প্রত্যাহার করে নেয় ইজরাইল।

গাজায় অবরোধ ও হত্যা বন্ধের দাবিতে ৭ এপ্রিল, ২০১৮ লন্ডনে বিক্ষোভ হয়। ছবি : এএফপি

তিন

ইজরাইলের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ গাজা থেকেই হয় বেশি। কারণ, এখানে হামাস, ইসলামিক জিহাদসহ ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ গোষ্ঠীগুলো সক্রিয়। হামাসকে প্রতিরোধ করতে গাজায় বিভিন্ন সময়ে অভিযান চালিয়েছে ইজরাইল। গাজা থেকে ছোড়া রকেট নিক্ষেপে এক ইজরাইলির মৃত্যুর জেরে ২০০৮ সালের ২৭ মার্চ 'হট উইন্টার' নামে অভিযান চালায় ইজরাইল। এতে ১২০ জনেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়। এরপর জুনে যুদ্ধবিরতির আগ পর্যন্ত রকেট হামলা ও ইজরাইলের পালটা হামলা অব্যাহত থাকে। তখনও শত শত ফিলিস্তিনি নিহত হয়। ওই বছরেরই ২৭ ডিসেম্বর

'অপারেশন কাস্ট লিড' নামে ব্যাপক বিমান হামলা শুরু করে ইজরাইল। সে সময়ে ১ হাজার ৪০০ ফিলিস্তিনি ১৩ ইজরাইলি নিহত হয়। ২০০৯ সালের ১৮ জানুয়ারি এক যুদ্ধবিরতির মধ্য দিয়ে এই হত্যাযজ্ঞ বন্ধ হয়।

এরপর ২০১২ সালের ১৪ নভেম্বর ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় শীর্ষ হামাস কমান্ডার আহমেদ জাবারিকে হত্যার মধ্য দিয়ে 'অপারেশন পিলার অব ডিফেন্স' নামে ইজরাইল আরেক অভিযান শুরু করে। আট দিনের ওই অভিযানে ১৭৭ ফিলিস্তিনি এবং ৬ ইজরাইলি নিহত হয়। পরে মিশরের মধ্যস্থতায় কার্যকর হয় যুদ্ধবিরতি। সবশেষ ২০১৪ সালের ৮ জুলাই গাজার বিরুদ্ধে 'অপারেশন প্রটেকটিভ এজ' নামের বিশাল এক অভিযান চালায় ইজরাইল। উদ্দেশ্য, গাজা থেকে রকেট হামলা এবং বিদ্রোহীদের সুড়ঙ্গ খোঁড়া বন্ধ করা। ২০১৭ সালের অক্টোবরে হামাস ও ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের মধ্যে হওয়া চুক্তিতে আশা জেগেছিল– গাজার পরিস্থিতির উন্নতি হবে, কিন্তু কার্যত তা এখনও হয়নি। এই দুই সংগঠনের নেতৃত্বের দ্বন্দ্বে ঝুলে আছে ফিলিস্তিনিদের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ।

গাজার মতো পশ্চিম তীরও ১৯৬৭ সালে দখলে নেয় ইজরাইল। এখানে একক কর্তৃত্ব প্রয়াত ইয়াসির আরাফাতের পিএলও'র। ওয়েস্ট ব্যাংক বা পশ্চিম তীরের আয়তন ৫৬৫৫ বর্গ কিলোমিটার। পশ্চিম তীরকে এই নামে ডাকা হয়। কারণ, এটি জর্ডান নদী এবং ডেড-সির পশ্চিম তীরে। এলাকাটির বিস্তার একেবারে জেরুজালেম শহর পর্যন্ত। এখানকার রামাল্লাতে আছে ইয়াসির আরাফাতের কবর এবং পিএলও'র সদর দপ্তর।

পশ্চিম তীরের বেথেলহেমের একটি ইজরাইলি চেকপোস্ট এলাকা থেকে ছবিটি তুলেছে ব্রিটিশ গণমাধ্যম গার্ডিয়ানের প্রতিনিধি। এই দেয়াল ইজরাইল ও ফিলিস্তিনি এলাকাকে আলাদা করেছে।

পশ্চিম তীরে হামাসের ওপর ফাতাহর ক্র্যাকডাউন

নির্বাচনপরবর্তী তিক্ততা আর দ্বন্দ্বে পশ্চিম তীরে হামাস সমর্থকদের হাতে গড়ে উঠা ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান আর দাতব্য সংস্থাগুলো বন্ধ করে দেয় পিএ নিয়ন্ত্রিত ফোর্স। হামাস করা লোকজনের শত শত ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। ফাতাহর বাড়াবাড়ি মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। সংগঠনটির মুখোশ পরিহিত বন্দুকধারীরা হামাস সরকারের বিচারমন্ত্রী আহমেদ আল খালিদিকে অপহরণ করে। এমনকী ফাতাহর বাহিনী হামাস নেতাদের গ্রেফতার ও গুপ্তহত্যা করতে ইজরাইলি বাহিনীর সাথে একজোট হয়ে কাজ করতে দ্বিধা করেনি। ২০০৭ সালের জুন থেকে অক্টোবরের মধ্যে হাজারখানেক হামাস কর্মী পশ্চিম তীর থেকে গ্রেফতার হন। হামাস সমর্থিত মসজিদের ইমামদের পশ্চিম তীর থেকে বের করে দেওয়া হয়। জুমার খুতবা নজরদারি করা শুরু হয়।[৮৪]

২০০৮-এর গ্রীষ্ম পর্যন্ত এভাবেই চলল। গণমাধ্যমে সেন্সরশিপ আরোপ করে পিএ। হামাসের আল আকসা টেলিভিশনের বেশ কয়েকজন সাংবাদিককে গ্রেফতার করা হয়। এমনকী মিশরকে অনুরোধ জানানো হয়, আল আকসা টিভি প্রচারে স্যাটলোইট সুবিধা না দিতে। মাহমুদ আব্বাস আশঙ্কা করছিলেন– ইরান, সিরিয়া এমনকী কাতারের সহায়তায় তাকে হটিয়ে দেবে হামাস। তাই ক্ষমতা ধরে রাখতে ইজরাইল ও যুক্তরাষ্টের সহায়তা চাইল পিএ।

গাজায় হামাস সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর একগুচ্ছ অবরোধ আরোপ করেছিল ইজরাইল। খাদ্য আমদানি ও ভ্রমণের ওপর নিষেধাজ্ঞা ছাড়াও অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। গাজা সীমান্ত লাগোয়া চেকপয়েন্টগুলোতে বাড়ানো হয় ইজরাইলি নিরাপত্তকর্মীর সংখ্যা। ইজরাইল নেতারা হামাস নিয়ন্ত্রিত ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষকে অর্থ সহায়তা না দিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানায়। দেশটি ফিলিস্তিনিদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা ৫০ মিলিয়ন ডলারের কাস্টমস ডিউটি দিতেও অস্বীকৃতি জানায়। ইজরাইলের এমন আচরণকে হামাস আখ্যা দেয় প্রকাশ্য চুরি হিসেবে।

যুক্তরাষ্ট্র আর ইউরোপীয় ইউনিয়ন ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষকে দেওয়া অর্থ সহায়তা বন্ধ করে দিলো। যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বিভাগ হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে তালিকাভুক্ত করায় তাদের অর্থ সহায়তা দেওয়া সম্ভব না– এটাই যুক্তরাষ্ট্রের যুক্তি। ইজরাইলি অবরোধের এক বছরে ১২০ মিলিয়ন ডলার সাহায্য দেয় ইরান। গাজায় অবরোধ দেওয়া হলেও পশ্চিম তীরে ফাতাহ নিয়ন্ত্রিত জরুরি সরকারকে সাহায্য অব্যাহত রাখল যুক্তরাষ্ট্রসহ ইজরাইলপন্থি পশ্চিমারা। ফিলিস্তিনিদের এটাই বোঝানো হলো– হামাসের অধীনে তাদের খুব ভুগতে হবে। অন্যদিকে ফাতাহ-এর অধীনে জীবন হবে নির্ঝঞ্ঝাট। ফিলিস্তিনিদের কাছ থেকে রাজস্ব হিসেবে আদায় করা অর্থ যা জব্দ করা হয়েছিল, তার মধ্যে ৩০০ থেকে ৪০০ মিলিয়ন ডলার আব্বাসের নেতৃত্বাধীন ফাতাহ সরকারকে দেওয়া হলো, অথচ গাজাতে অবরোধ থেকেই গেল।

---

[৮৪]. Hamasvs. Fatah : The Struggle for Palestine, Jonathan Schanzer, page 124.

পঞ্চদশ অধ্যায়

ইহুদিবাদের ভবিষ্যৎ ভীতি

'Palestine belongs to the Arabs in the same sense that England belongs to the English or France to the French. It is wrong and inhuman to impose the Jews on the Arabs.' —Mahatma Gandhi

ইজরাইল : যার মানচিত্র নেই

ইজরাইল এখনও তার আনুষ্ঠানিক মানচিত্র ঠিক করেনি। যে মানচিত্র তাদের আছে, তার নেই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। এ নিয়ে ইহুদি নেতাদের কোনো গরজও নেই। নিজ নিজ বাসাবাড়ি থেকে ফিলিস্তিনিরা বিতাড়িত হবেন। তারপর সেখানে গড়ে উঠবে ইহুদি বসতি– এই অবৈধ কর্মটাই এখন সেখানকার রুটিন ওয়ার্ক! ইজরাইলের মানচিত্র স্ফীত হচ্ছে এভাবেই।

ইহুদিদের তাত্ত্বিক গুরু যারা আছেন তারা বিশ্বাস করেন, নীলনদ থেকে শুরু করে ফোরাতের (ইউফ্রেটিস) মধ্যবর্তী যে ভূখণ্ড আছে– পুরোটাই তাদের। আর এই ভূখণ্ডকেই তারা বলছেন 'প্রতিশ্রুত ভূমি' বা প্রমিজল্যান্ড, যার কথা বলা আছে পুরোনো বাইবেলে। জায়োনিস্টরা যদি এই দাবিতেই অনড় থাকেন, তাহলে বর্তমান ইজরাইলের বাইরেও ইহুদি এলাকা বিস্তৃত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এই আগ্রাসী চিন্তা ভবিষ্যতে কিছু আরব রাষ্ট্রের মানচিত্র বদলে দিতে পারে। সে তালিকায় উঠে আসতে পারে মিশর, জর্ডান, সিরিয়া, লেবানন, ইরাক এমনকী সৌদি আরবও।

এখন ইজরাইলের মানচিত্র কেন নেই বললাম তার ব্যাখ্যায় যাই। ১৯৪৭ সালে জাতিসংঘ যে দ্বি-রাষ্ট্রিক প্রস্তাব পাশ করেছে, তাতে ইজরাইল রাষ্ট্রের যে সীমানা টানা হয়েছে, বর্তমানের সঙ্গে তার বিস্তর ফারাক। প্রথম আরব-ইজরাইল যুদ্ধ ও ৬৭-এর লড়াইয়ের পাওয়া গোলানসহ অনেক আরব ভূখণ্ডই তারা মানচিত্রে জুড়ে দিয়েছে। ৪৭-এর পরের সীমানায় স্বীকৃতি নেই জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের। তাই ইজরাইলের এখনকার মানচিত্র অবৈধ।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় আরব ইজরাইল যুদ্ধ এবং (১৯৮২ সালে লেবাননে ইজরাইলপন্থি সরকার বসানোর লক্ষ্যে দেশটিতে আগ্রাসন চালিয়েছিল ইজরাইলি সরকার। এতে লেবাননের রাজধানী বৈরুতের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করা হয় এবং হাজার হাজার বেসামরিক মানুষ নিহত হয় ১৯৮২ সালের সীমিত যুদ্ধে যে জায়গা তারা আরবদের কাছ থেকে দখল করে নিয়েছে, তাতে ইজরাইলের মানচিত্র ইচ্ছে মতো বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। এ ছাড়াও '৪৮ সালের পর আরব প্রতিবেশীদের সাথে বেশ কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও সীমান্ত লড়াই হয়েছে ইজরাইলের। এসব যুদ্ধে যে ভূখণ্ড তারা দখল করতে পেরেছেন, তার সামান্য অংশই পরবর্তী সময়ে প্রকৃত মালিক তথা আরব রাষ্ট্রগুলোকে ফেরত দেওয়া হয়েছে। ইজরাইল ১৯৬৭ এবং '৭৩-এ মিশরের সিনাই (পশ্চিমের ভাষায় সাইনাই) উপদ্বীপ দখল করলেও সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের মধ্যস্থতায় ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির মাধ্যমে তা ফেরত দেয়। কিন্তু সিরিয়ার গোলান মালভূমি কিংবা জেরুজালেম সেই ৬৭ থেকেই দেশটির দখলে আছে। অবশ্য, ২০০০ সালের মে মাসে ও ২০০৬ সালের আগস্টে ইজরাইল দুই দফায় দক্ষিণ লেবানন দখলে নিলেও পরে ফেরত দেওয়া হয়।

ইহুদিদের দাবি, ইজরাইল রাজা ডেভিডের ভূখণ্ড (কল্পিত!) এখনও উদ্ধার হয়নি। ধারণা করা হয়, ইজরাইল যদি আরও অন্তত ৫০ লাখ ইহুদির একটা কলোনি গড়ে তুলতে পারত, তাহলে বর্তমানে মিশরের সিনাই হয়তো তাদের দখলেই থাকত, দেশটির সীমান্ত উত্তরে লিতানি নদী ও পূর্বে জর্ডান নদী পর্যন্ত বিস্তৃত হতো। কিন্তু জার্মানিতে হলোকাস্টপরবর্তী সময়ে ইউরোপে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ইহুদিদের নানান প্রতিশ্রুতি দিয়ে যেভাবে প্যালেস্টাইন (ফিলিস্তিন) ভূখণ্ডে আনা গেছে, পরবর্তী সময়ে প্রভাবশালী ইহুদি নেতারা লোভনীয় প্রচারণা চালিয়েও ইউরোপ কিংবা আফ্রিকার ইহুদিদের প্যালেস্টাইনের দিকে টানতে পারেননি। আর তাই প্রতিশ্রুত ভূমিও উদ্ধার করা যাচ্ছে না!

১৯৫৬ সালে দ্বিতীয় আরব-ইজরাইল যুদ্ধের তৃতীয় দিনে ইজরাইলি পার্লামেন্ট নেসেটে দেওয়া ভাষণে বেনগুরিয়ান বলেছিলেন, তাদের লক্ষ্য হচ্ছে বাইবেলে রাজা ডেভিড এবং সলোমানের যে রাজ্যের সীমানা উল্লেখ করা আছে, তা পুনরুদ্ধার করা।

ইহুদি সমাজেও বিভক্তি

শুধু কি আরব ফিলিস্তিনিরাই ইজরাইলি বৈষম্য বা নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন? ইজরাইলে বসতি গাড়া ইহুদিদের মধ্যেও আছে বৈষম্য, বিভক্তি আর নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব। আজ ইজরাইলে যেসব ইহুদি বসবাস করছেন, প্রধানত তারা তিনটি গ্রুপে বিভক্ত। এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী আসকেনাজিরা; এরা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করে বেশি।[৮৫]

---

৮৫. Israel's Great Divide| Al Jazeera World, Jul 13, 2016.

১. আসকেনাজি মূলত জার্মানি শব্দের হিব্রু রূপ। যেসব ইহুদি জার্মানি, ফ্রান্স এবং পূর্ব ইউরোপ থেকে এসেছেন, তারা আছেন এই দলে। এরাই ইজরাইলি সমাজে সবচেয়ে বেশি সুবিধা ভোগ করে থাকেন। আজকের আমেরিকান ইহুদিদের বেশিরভাগই আসকেনাজি। তারা ১৮০০ থেকে ১৯০০ সালে ইউরোপ থেকে মাইগ্রেট হওয়া ইহুদিদের উত্তরসূরি।

২. সিফার্ডি শব্দটি স্পেন-এর হিব্রু শব্দ। যেসব ইহুদি স্পেন, পর্তুগাল এবং উত্তর আফ্রিকা ও মিডল ইস্ট থেকে ইজরাইলে গিয়ে বসতি গড়েছেন, তারা আছেন এই গ্রুপে– যাদের বলা হয় সেফারডিক/সিফার্ডিক। স্পেনের ইহুদিরা ইজরাইলে এসেছেন ১৪৯২ সালে, সেখানে মুসলিম শাসন অবসানের পর। ইহুদি তথ্যমতে, বহু আগে রোমানদের হাতে বিতাড়িত হয়ে তারা স্পেন-পর্তুগালে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। একটা সময় তারা সেফারডিক নামেই পরিচিতি পান।

৩. আর সেফারডিকদের মধ্যে যারা আবার উত্তর আফ্রিকা (বিশেষ করে মরক্কো, আলজেরিয়া, তিউনিশিয়া) এবং মধ্যপ্রাচ্য (বিশেষ করে সিরিয়া, ইরাক, জর্ডান) থেকে ইজরাইলে গিয়ে বসতি গড়েছেন, তারা মিজরাখি গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত। এরা ইজরাইলের সবচেয়ে নিগৃহীত ইহুদি। অথচ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার কথা বলে ইহুদি নেতারাই তাদের ফুঁসলিয়ে ইজরাইলে এনেছেন।

ইজরাইলের সমাজে মিজরাখি ইহুদিরা নানাভাবে বঞ্চিত। একসময় তাদের ছেলেমেয়েরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পেত না, আইনজীবী হতে পারলেও বিচারক হতে পারত না কখনোই। পশ্চিমের দেশগুলো থেকে আসা ইহুদিরা অর্থাৎ আসকেনাজিরা মিজরাখিদের আরব কালচার পরিত্যাগ করতে প্ররোচনা দিত। পশ্চিমের ইহুদিরা বলত–

> 'ইজরাইল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইউরোপীয় স্পিরিট নিয়ে। অতএব, আরব-আফ্রিকান ইহুদিদেরও তা গ্রহণ করতে হবে। আর যদি তা তারা না করে, তাহলে যেন তারা অন্যত্র চলে যায়।'

জার্মানিতে হলোকাস্টের পর ইউরোপের অনেক ইহুদি যখন আর্থিকভাবে সচ্ছল হলো, তারা আর ইউরোপ ছেড়ে ইজরাইলে আসতে চাইল না। তাই একসময় ইউরোপ থেকে ইহুদি আসা বন্ধ হয়ে যায়, আর তখনই বেনগুরিয়ানের চোখ পড়ে উত্তর আফ্রিকার দিকে। পরিকল্পনা হাতে নেওয়া কীভাবে অন্তত ১০ লাখ ইহুদিকে মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা থেকে এক বছরের মধ্যে ইজরাইলে নিয়ে আসা যায়। অনেকেই এলেন। কিন্তু মিজরাখিরা হতাশ হলো যখন তারা দেখল, ইজরাইলের উন্নত এলাকাগুলোতে আসকেনাজিরা বসবাস করছে, অথচ তাদের এলাকা অনুন্নত রয়ে গেছে; রাস্তা-ঘাট,অবকাঠামো সবকিছুতেই। ক্ষুব্ধ মিজরাখিরা হাইফার ওয়াদি সালিব থেকে কর্মসূচি দিতে শুরু করল বৈষম্যের বিরুদ্ধে। এদের বলা হতো ব্ল্যাক বা মিসারেবল। ১৯৭১ সালে ইজরাইলে শুরু হলো 'ব্ল্যাক প্যান্থার মুভমেন্ট'।

তবে চেহারা বিবেচনায় ইউরোপে দুই ধরনের ইহুদি দেখা যায়। এক গ্রুপকে বলা হয় পূর্বের ইহুদি আর আরেক গ্রুপকে বলা হয় পশ্চিমের ইহুদি। পূর্বের ইহুদিদের মাথার আকৃতি গোল; চোখের তারার রং হালকা। এদের পূর্বসূরিরা বসবাস করত প্রধানত পূর্ব জার্মানি, পোল্যান্ড, রাশিয়া আর রুমানিয়াতে। পেশা বলতে এরা ছিল প্রধানত কৃষক, শ্রমিক, সরাইখানার মালিক কিংবা ছোটোখাটো দোকানদার। ইউরোপের খ্রিষ্টানদের হাতে তারা অমানবিক নির্যাতন ও গণহত্যার শিকার হয়েছেন। জার শাসনের বিরুদ্ধে রাশিয়াতে যে বলশেভিক বিপ্লব হয়, তার বেশিরভাগ নেতা ছিলেন পূর্বের ইহুদি। এদেরই একজন লিও ট্রটস্কি। তার হাতেই গড়ে উঠেছিল রেডফোর্স বা লালফৌজ। একসময় স্ট্যালিনের ক্রোধ থেকে বাঁচতে ট্রটস্কিকেও সোভিয়েত ইউনিয়ন ছাড়তে হয়েছে।

আর যারা পশ্চিমের ইহুদি, এদের মাথার আকৃতি হলো লম্বা; চোখের তারার রং সাধারণত কালো। তারা ধনাঢ্য ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত। পেশা বলতে অধ্যাপক, ডাক্তার, ব্যাংকার ও আইনজীবী। এরাই অতীতে ব্যাংক ব্যবসার সাথে ভালোভাবে জড়িত ছিল। যেমন : রথসচাইল্ড-এর মতো ব্যাংকার পরিবারের লোকজন। ইংল্যান্ডে যেসব ইহুদি বসবাস করেন, তারা প্রধানত পশ্চিমের ইহুদি বিভাগভুক্ত। সব অঞ্চলে ইহুদিদের এক রকম চেহারা ছিল না। যেমন : দক্ষিণ ভারতের কেরালার ইহুদি সম্প্রদায়। এদের গায়ের রং কেরেলার হিন্দুদের মতোই কালো। দেখতেও তারা প্রায় কেরালার হিন্দুদেরই মতো। এখন এদের অনেকে কেরালা ছেড়ে চলে গেছে ইজরাইলে।[৮৬]

প্রথম দিকে ফিলিস্তিনে ইহুদিরাষ্ট্র স্থাপনের আন্দোলন পশ্চিমের ইহুদিদের মধ্যে তেমন সাড়া জাগাতে পারেনি, কিন্তু পূর্বের ইহুদিরা বেশ ভালোভাবেই সাড়া দিয়েছিল। ১৯৩৩ সালে জার্মানির চ্যান্সেলর হন চরম ইহুদিবিদ্বেষী অ্যাডলফ হিটলার, সেখানে শুরু হয় ইহুদি নিধন। হিটলারের ভয়ে-নির্যাতনে অনেক ইহুদিই জার্মানি ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্র বা স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোতে আশ্রয় নেন। বৈধ-অবৈধ পথে এদের অনেকেই আসেন ফিলিস্তিনে। হিটলারের ভয়ে দেশ ছাড়েন সমাজতন্ত্রীরাও। এই তালিকায় ছিলেন সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি অব জার্মানির নেতা ও পরবর্তী সময়ে পশ্চিম জার্মানির চ্যান্সেলর উইলি ব্রান্ডট। জার্মানি ছেড়েছিলেন ইহুদি পদার্থবিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনও।

ইহুদি সন্ত্রাসবাদ.....হাগানা, ইরগুন ও লেহির উদ্ভব

ইউরোপের ইহুদিরা প্যালেস্টাইনে এসে স্থানীয় আরবদের কাছ থেকে জায়গাজমি কিনে গড়ে তুলেছেন বসতি। এসব জমি তারা কিনেছেন পানির দামে, মানে সস্তায়।

---

৮৬. বিশ্ব নিয়ন্ত্রণে ইহুদি সংকল্প, এবনে গোলাম সামাদ, *নয়া দিগন্ত*, ২২ ডিসেম্বর, ২০১৭

শুরুর দিকে এর পরিণতি নিয়ে ভাবার প্রয়োজনও বোধ করেনি আরবরা, কিন্তু ব্যাপারটি 'গোদের ওপর বিষফোঁড়া' হয়ে দাঁড়ায় তখনই, যখন প্রথম ও দ্বিতীয় আলিয়া (ইহুদি পুনর্বাসন) শেষে প্যালেস্টাইনে বহিরাগত ইহুদির সংখ্যা পৌনে এক লাখে পৌছে যায়। বসতি বেড়েছে, বেড়েছে ইহুদি কৃষি ভূমি; এবার তো এসব কিছুর নিরাপত্তা চাই! গড়ে তোলা হলো গুপ্ত সংগঠন 'বার গিওরা'। সময়ের বিবর্তনে বার গিওরা রূপ নেয় হাশোমারে। হাশোমার বাহিনীর চূড়ান্ত পরিণতি 'হাগানা'।

এক

অটোমান সুলতানকে বাগে আনতে না পারার বেদনা আর স্বাধীন ইজরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইহুদিরা যোগ দেয় ব্রিটিশ শিবিরে। যুদ্ধে এই পক্ষই জেতে, কিন্তু যুদ্ধ শেষে ১৯২০ সালের এপ্রিলের আরব দাঙ্গা ও জাফা বিদ্রোহের পর ইহুদিদের মধ্যে নতুন ভাবনার উদয় হয়। ইহুদি নেতারা মনে করলেন, ব্রিটিশরা ইহুদিস্বার্থ রক্ষার জন্য যথেষ্ট না। তারা আরবদের মোকাবিলা করতে চান না। প্যালেস্টাইনে ইহুদি বসতি ও কৃষিজমির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজন পড়ে সুসংগঠিত বড়ো একটি বাহিনীর। এ লক্ষ্যেই ১৯২০ সালের জুন মাসে হাশোমারকে ভেঙে দেওয়া হয়। তার পরের বছর জন্ম হয় নতুন সশস্ত্র সংগঠন 'হাগানা'।

হাগানার প্রতীক, সূত্র : ইন্টারনেট

'হাগানা' শব্দটির অর্থ প্রতিরক্ষা। ইজরাইল রাষ্ট্র জন্মের আগ পর্যন্ত ব্রিটিশ ম্যান্ডেটজুড়ে সক্রিয় থাকে হাগানা। শুরুর দিকে এই ইহুদি প্যারামিলিটারি বাহিনীর বেশিরভাগ সদস্যই ছিলেন কৃষক, যাদের হাতে ভালো মানের অস্ত্রশস্ত্র ছিল না।

১৯২৯ সালে প্যালেস্টাইনে আবার আরব-ইহুদি দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। দাঙ্গা দমনে হাগানাকে ব্যাপকমাত্রায় সক্রিয় করা হয়, বাড়ানো হয় সদস্যসংখ্যা। এবার তরুণ ইহুদিরা ভিড়তে থাকে হাগানার বহরে। সদস্য সংখ্যা কয়েক হাজার ছাড়িয়ে যায়। দেশের বাইরে থেকে অস্ত্র আনার পাশাপাশি নিজেরাই বানাতে থাকে হাতগ্রেনেড। দ্রুতই দক্ষ আন্ডারগ্রাউন্ড আর্মিতে রূপ নেয় হাগানা, হাতে নেয় প্রফেশনাল মিলিটারি যন্ত্রপাতি বানানোর কাজ।

এখন যেমন যুক্তরাষ্ট্রে গালা নাইট ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে ইজরাইলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের জন্য চাঁদা তোলা হয়, তখনকার দিনেও হাগানার অর্থ আসত বিশ্বের বড়ো বড়ো ইহুদি ধনকুবের ও ইহুদিপন্থি সংগঠনগুলো থেকে। সবচেয়ে বেশি আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া যেত ওর্য়াল্ড জায়োনিস্ট অর্গানাইজেশনের কাছ থেকে। এ জন্য এই বিশ্বসংস্থাটি প্যালেস্টাইনে একটি শাখাও খুলেছিল। ধীরে ধীরে গুপ্তহত্যা কমিয়ে আনে হাগানা। অবশ্য, প্রতিষ্ঠার প্রথম দশকে এ ধরনের হত্যাকাণ্ডের সংখ্যা ছিল তুলনামূলক কম। প্রতিষ্ঠার পরপরই হাগানার অপারেশনগুলো অনুমোদনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল হিস্টাডরাট (Histadrut) তথা জেনারেল ফেডারেশন অব লেবারকে, যার নেতা ছিলেন পোলিশ বংশোদ্ভূত ইহুদি নেতা ডেভিড বেনগুরিয়ান। অন্য ইহুদি নেতাদের মতো আগ্রাসী হলেও বেনগুরিয়ান ছিলেন যথেষ্ট পরিণত ও কৌশলী।

১৯০৯ সালে হাশোমার গঠিত হলে একজন স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে, তাতে যোগ দিয়েছিলেন বেনগুরিয়ান। দ্রুতই প্যালেস্টাইনের ইহুদিদের অন্যতম প্রধান নেতা হয়ে উঠেন তিনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বেনগুরিয়ান অবস্থান নেন রাশিয়ার বিরুদ্ধে। কারণ, জারদের হাতে ইহুদি নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছিল বহু। এমনটাও বলা হয়ে থাকে– বেনগুরিয়ান অটোমানদের পক্ষ হয়ে লড়াই করার জন্য ১০০০০ ইহুদি সদস্যের একটি বাহিনী গঠনের জন্য কাজ করেছিলেন, কিন্তু যুদ্ধ চলাকালে বেলফোর ঘোষণা তার ওপর প্রভাব ফেলে। সমমনা ইহুদিদের নিয়ে পক্ষ ত্যাগ করে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর কমান্ডে 'জিউইশ লেজিয়ন' ব্রিগেড গঠন করেন বেনগুরিয়ান এবং অংশ নেন যুদ্ধে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক উপায়ে ইজরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় মনোযোগ দেন বেনগুরিয়ান। কেউ কেউ বলেছেন, বেনগুরিয়ান আর সহিংসতা করতে চাননি। ব্রিটিশদের কাছে তার 'মডারেট' সাজার কারণ হতে প্যারে জায়োনিস্ট আন্দোলনের প্রতি তাদের সমর্থন আদায় করা।

নিজেকে নমনীয় ও উদার প্রমাণ করতে গিয়ে গুপ্তহত্যা সীমিত করেন বেনগুরিয়ান। গুপ্তহত্যার বহু প্রস্তাব তিনি ফিরিয়ে দেন আর হাগানাকে একটি নিয়মিত আধা সামরিক বাহিনীতে রূপ দেন। কিন্তু বেনগুরিয়ানের রাজনৈতিক কৌশলের বিরোধিতায় নামেন

অন্য ইহুদি নেতারা। তারা চাইছিলেন, সহিংসতার মাধ্যমে আরব আর ব্রিটিশদের তাড়িয়ে ইজরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে। এদেরই একজন আভ্রাহাম তেহোমি। তিনি বেনগুরিয়ানের মধ্যপন্থি নীতির বিরোধিতা করে হাগানা ছেড়ে দেন।

তেহোমির অনুসারী গ্রুপটি ১৯৩১ সালে হাগানা থেকে বেরিয়ে যায়। এই গ্রপটি ইরগুন (ন্যাশনাল মিলিটারি অর্গানাইজেশন) নামে আত্মপ্রকাশ করে। তারা হাগানার 'ডিফেন্সিভ' ও 'ধীরে চলো' নীতি প্রত্যাখ্যান করে আরও বেশি চরমপন্থার আশ্রয় নেয়। আরবদের আক্রমণ প্রতিহত করার চেয়ে 'আগে-ভাগেই হামলা'র নীতি গ্রহণ করে। পরে এই বাহিনীর নেতৃত্ব দেন উগ্র জায়োনবাদের প্রবক্তা হিসেবে খ্যাত জিব জাবোতিনস্কি।

ছবিতে ইরগুন সদস্যরা, ইন্টারনেট।

কিন্তু ইরগুনেও দেখা দেয় বিভাজন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইরগুনের ব্রিটিশদের পক্ষ অবলম্বন করার নীতির বিরোধিতা করে সেখান থেকে বেরিয়ে যায় আরেকটি চরমপন্থি গ্রুপ, যার নেতৃত্বে ছিলেন আভ্রাহাম স্টার্ন। তাদের গঠিত নতুন দলটি পরিচিতি পায় 'স্টার্ন গ্যাং' তথা 'লেহি' নামে। চরমপন্থায় হাগানা ও ইরগুনকে ছাড়িয়ে যায় লেহি। ১৯৪০ সালের আগস্টে উত্থান হওয়া লেহির একসময়কার অপারেশন বিভাগের প্রধান আইজ্যাক শামির পরবর্তী সময়ে ইজরাইলের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। শামির কিছুদিন কাজ করেছেন মোসাদেও।

লেহির প্রতীক

ইরগুন এবং লেহি চল্লিশের দশকজুড়ে প্যালেস্টাইনে আরব এবং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী তৎপরতা অব্যাহত রাখে। লেহির আলোচিত হত্যাকাণ্ডের মধ্যে ছিল ব্রিটিশ ম্যান্ডেটের সিআইডি কমান্ডার টম উইলকিন হত্যাকাণ্ড। উইলকিন ছিলেন সিআইডির বিশেষ একটি ইউনিটের প্রধান। এই ইউনিট লেহির মতো গুপ্ত ইহুদি সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে নিয়মিত অপারেশনে যেত। হিব্রুতে কথা বলতে পারে– এমন লোকদের নিয়ে একটি বিশাল গুপ্তচরের নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছিলেন উইলকিন। এর মাধ্যমে ইহুদিদের গোপন অপারেশনের সংবাদ আগেই পেয়ে যেতেন তিনি। তার বাহিনীর অভিযানে ধরা পড়ে চরমপন্থি ইহুদিদের অনেকে। অনেকের সাজা হয়, কাউকে কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। এভাবে লেহির বেশ কয়েকটি গোপন অস্ত্রভান্ডার বাজেয়াপ্ত হয় উইলকিনের তৎপরতায়। ফলে উইলকিন পড়ে যান লেহির বিশেষ টার্গেটে। অপারেশন বিভাগের প্রধান আইজ্যাক শামির স্বয়ং টম উইলকিনকে হত্যার নির্দেশ জারি করেছিলেন।

প্যালেস্টাইনে জাতিসংঘের প্রতিনিধি কাউন্ট বার্নাডোটকেও খুন করা হয় শামিরের নির্দেশে। ১৯৪৮-এর যুদ্ধের পর সুইডিশ কূটনীতিক বার্নাডোট এসেছিলেন ইজরাইল-ফিলিস্তিন সংকট সমাধানের মধ্যস্থতা করতে। সংকট সমাধানে তার দেওয়া প্রস্তাব ক্ষুব্ধ করেছিল চরমপন্থি ইহুদিদের। কারণ, বার্নাডোট জাতিসংঘের দ্বি-রাষ্ট্রিক প্রস্তাবনাকে দেখেন অবাস্তব ও দুর্ভাগ্যজনক হিসেবে। উলটো প্রস্তাব করেন দুটি রাষ্ট্রের পরিবর্তে আরব ও ইহুদি প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি ইউনিয়ন গড়ার। এই ইউনিয়নে ইহুদিদের জন্য অপেক্ষাকৃত ছোটো ভূমি আর আরবদের জন্য ফিলিস্তিন ও ট্রান্সজর্ডানের সমন্বয়ে

বড়ো ভূমি দেওয়ার প্রস্তাব ছিল। বার্নাডোট গ্যালিলিকে ইহুদি আর নেগেভ ও জেরুজালেমকে আরবদের হাতে ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব করেছিলেন। সেইসঙ্গে হাইফা আর লিদ্দা এয়ারপোর্টকে ইহুদিদের হাতে ছেড়ে না দিয়ে উভয়পক্ষের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। আরব ও ইজরাইল প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করলে দ্বিতীয় দফায় আরেকটি প্রস্তাব আনেন তিনি, কিন্তু এই প্রস্তাবও মানেনি ইহুদিরা। ইহুদি চরমপন্থিরা বার্নাডোটকে হত্যা করে ১৯৪৮ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর।

একসময় হাগানাও লেহির পথেই হাঁটে। বেনগুরিয়ান প্রথমে হাগানাকে বাধা দেন, কিন্তু ইউরোপে ইহুদিদের ওপর নাৎসি বাহিনীর নির্যাতনের সংবাদ ছড়িয়ে পড়তে থাকলে অবস্থান পালটান তিনি। এরপর থেকে হাগানা রূপ নেয় কুখ্যাত বাহিনীতে।

দুই

১৯৩৬ সালে আরবরা ব্রিটিশ ম্যান্ডেটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে। ব্রিটিশদের সহযোগী হয়ে কাজ করে হাগানা। তারা দশ হাজার সদস্য মোতায়েন করে এবং আরও ৪০ হাজার রিজার্ভ সেনা প্রস্তুত রাখে। এ সময় ব্রিটিশ সেনাদের কেউ কেউ অতি উৎসাহী হয়ে হাগানাকে সামরিক পরামর্শ দেয়। ব্রিটিশ অফিসার Orde Charles Wingate ইহুদিদের উদ্দেশ্যে বলেন, ফিলিস্তিনিদের সম্ভাব্য প্রতিরোধ ঠেকাতে হাগানাকে প্রফেশনাল সামরিকীকরণ করতে হবে। হাগানাকে ব্রিটিশ সেনাদের সংস্পর্শে এনে আরবদের বিরুদ্ধে সামরিক কৌশল শেখানোর অন্যতম কারিগর তিনি। বেয়োনেট দিয়ে কীভাবে নিরীহ ফিলিস্তিনি গ্রামবাসীকে চার্জ করতে হয়, সেটা ব্রিটিশ সেনারাই হাগানাকে শিখিয়েছে।[৮৭]

ব্রিটিশরা হাগানাকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়নি ঠিকই, কিন্তু তারা হাগানার তত্ত্বাবধানে প্যালেস্টাইনে ইহুদি পুলিশ বাহিনী ও অন্যান্য স্কোয়াড গঠনে সহায়তা করেছিল। ১৯৪৮ এর প্রথম আরব-ইজরাইল যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ বাহিনীর কাছ থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণ কাজে লাগায় এসব ইহুদি বাহিনী।

১৯৩৯ সালে ব্রিটিশরা একটা শ্বেতপত্র প্রকাশ করে, যাতে প্যালেস্টাইনে ইহুদি অনুপ্রবেশে কঠোরতা আরোপ করা হয়। এতে ক্ষেপে যান বেনগুরিয়ানসহ অন্যান্য ইহুদি নেতারা। শ্বেতপত্রের জবাবে হাগানা পালমাখ নামে একটি এলিট স্ট্রাইকিং ফোর্স গঠন করে। তাদের কাজ ছিল অবৈধ ইহুদি অনুপ্রবেশকারীদের প্যালেস্টাইনে নিয়ে আসার পথ পরিষ্কার করা। ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে– বেনগুরিয়ান প্যালেস্টাইনের ব্রিটিশবিরোধী সব তৎপরতা বন্ধ রাখেন। ইরগুনও সব বন্ধ রাখে।

---

৮৭. The Ethnic Cleansing of Palestine Ilan Pappé, page-16

জুইস এজেন্সির সে সময়কার সভাপতি বেনগুরিয়ান ১৯৩৯ সালে ঘোষণা করেন- 'আমরা হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব এমনভাবে, যেন শ্বেতপত্র নেই। আর শ্বেতপত্রের এমনভাবে বিরোধিতা করব, যেন যুদ্ধ নেই।' এজেন্সি সকল ইহুদিকে যুদ্ধ পরিচালনায় ব্রিটিশদের সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের আহ্বান জানায়। ইহুদিরা বুঝতে পেরেছিল, জার্মানির বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষের বিজয় ব্যতীত বিশ্বে ইহুদি অস্তিত্ব বজায় রাখা কঠিন। ইহুদিরা লড়াইয়ে শামিল হয়। বিটিশ সামরিক বাহিনীতে সাতাশ হাজার ইহুদি যোগ দেয়।

অন্যদিকে, আরবদের দিক থেকে ব্রিটিশ শিবিরে যোগ দেয় বারো হাজারের মতো যোদ্ধা। ১৯৪৪ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর একটি ইহুদি ব্রিগেড গঠন করা হয়েছিল। ব্রিটিশরা ইহুদি কমান্ডো ইউনিটকে প্রশিক্ষণ দেয়, এরাই পরে পালমাখের মূল ধারার ভূমিকা পালন করে। এ ছাড়া নাশকতা, বিধ্বংসী কৌশল ও শত্রুর দখলকৃত এলাকায় সশস্ত্র যুদ্ধের ওপর নিবিড় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ভাগ্যের পরিহাস এই যে, এই প্রশিক্ষণই পরবর্তীকালে ব্রিটিশ শক্তিকে প্যালেস্টাইন থেকে উৎখাত করতে ইহুদিরা অত্যন্ত কার্যকরভাবে প্রয়োগ করে।

তিন

১৯৪২ সালের মে মাসে নিউইয়র্কের বিল্টমোর হোটেলে ইহুদিরা এক সম্মেলনে বসে। ওয়ার্ল্ড জিওস অর্গানাইজেশনের সভাপতি খেইম ওয়াইজম্যান ও জুইস এজেন্সির কার্যনির্বাহী সভাপতি বেনগুরিয়ান তাতে যোগ দেন। সম্মেলনে হাজির ছিলেন প্রায় ৬শ মার্কিন ও ইহুদি প্রতিনিধি। এই সম্মেলনেই পরিষ্কার হয় ব্রিটেন নয়, নিজেদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আমেরিকাকেই ইহুদিদের বেশি দরকার।[৮৮]

সম্মেলনে আটটি প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়। এই প্রস্তাবগুলো ইতিহাসে বিল্টমোর প্রোগ্রাম/বিল্টমোর ডিক্লারেশন নামে পরিচিত। প্রস্তাবে ১৯৩৯ সালের শ্বেতপত্র প্রত্যাখ্যান করা হয়। ব্রিটেন ইহুদি অভিবাসন সীমিত করে দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তার নিন্দা জানানো হয়। বেলফোর ঘোষণার মূল উদ্দেশ্যে ও ম্যান্ডেট বাস্তবায়নের আহ্বান জানানো হয়। অবশ্য, ১৯২২ সালের শ্বেতপত্রে প্যালেস্টাইন নয়; বরং প্যালেস্টাইনের একটি অংশে ইহুদি আবাসভূমি স্থাপনের কথা বলা হয়েছিল।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে দিয়ে বিল্টমোর প্রোগ্রামের সমর্থনে একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়। তখন থেকেই যুক্তরাষ্ট্রকে জায়োনিস্ট কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রধান সহায়ক বিদেশি শক্তি হিসেবে গড়ে তোলার তৎপরতা শুরু হয়। মার্কিন ইহুদিদের বিপুল অর্থনৈতিক শক্তি ও প্রচার মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে রাজনীতিতে দ্রুত তাদের তাদের প্রভাব বলয় তৈরিতে সক্ষম হয়। পরে এটি আমেরিকার মূলধারার পররাষ্ট্রনীতির একটা অংশই হয়ে যায়।

---

৮৮. Al-Nakba: The Palestinian catastrophe -Episode 2| Featured Documentary, Al Jazeera English.

চার
ইহুদি সন্ত্রাসবাদ কখনো কখনো হয়েছে আত্মঘাতী বা ভ্রাতৃঘাতী। ঠিক এ রকমই একটি ঘটনা ঘটে ১৯৪০ সালের ২৫ শে নভেম্বর। ইউরোপ থেকে ফরাসিদের নির্মিত একটি জাহাজে করে প্যালেস্টাইনে অভিবাসনের উদ্দেশ্য প্রায় ১৮০০ ইহুদি হাইফা বন্দরে পৌছায়। ব্রিটেন এদেরকে মরিসাসের ডিটেনশন সেন্টারে পাঠানোর জন্য জাহাজে তোলে। কিন্তু ইহুদি নেতারা চেয়েছিলেন, এরা প্যালেস্টাইনেই থাকুক। তাই জাহাজটি যখন মরিসাসে যাওয়ার অপেক্ষায় ছিল, তখন তাদের প্যালেস্টাইনে থাকার অনুমতি দেওয়ার জন্য ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ সৃষ্টি করে ইহুদিরা। ব্রিটিশদের সিদ্ধান্ত বদলাতে হাইফা বন্দরে ধর্মঘট ডাকা হয় ইহুদিদের তরফ থেকে, কিন্তু ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত থেকে একচুলও নড়েনি। পরিস্থিতি যাই হোক, মরিসাসেই নেওয়া হবে ইহুদি অভিবাসীদের। সিদ্ধান্ত বদলাতে না পেরে যাতে বন্দর ত্যাগ করতে না পারে, সে জন্য জাহাজটিকে অকেজো করার জন্য বোমা পুঁতে রাখে হাগানা সদস্যরা। হাগানার পোঁতা বোমাটি বিস্ফোরিত হয়, কিন্তু ক্ষমতার হিসাব ভুল করায় বিস্ফারণের পরে মাত্র ১৬ মিনিটের মধ্যে সম্পূর্ণ জাহাজটি তলিয়ে যায় পানিতে। সেদিনের ঘটনায় ২৬০ ইহুদি অভিবাসী মারা যায়। এ ঘটনার ১৭ বছর পর এই তথ্যটি ফাঁস করে দেয় বোমা পুঁতে রাখা ব্যক্তি নিজেই।

জুইস এজেন্সির নিয়ন্ত্রণে ইউরোপে সবচেয়ে বড়ো বেসামরিক বাহিনী ছিল হাগানা। সেখানে ছিল দুই লাখ সেনাসহ বিশেষ বাহিনী পালমাখ। এর সাথে ছিল ২৫ হাজার সদস্যের এক আধা সামরিক বাহিনী– যাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিল ব্রিটিশ বাহিনী। বেনগুরিয়ান ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত তার বাহিনীকে ব্রিটিশদের সহায়তায় নিয়োজিত রেখেছিল। কিন্তু সন্ত্রাসী দল ইরগুন এবং এই দল থেকে বেরিয়ে আসা স্টার্ন গ্যাং (লেহি) ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে কিছুটা নিম্নমাত্রার যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। ইরগুন কমান্ডার জাবোতনিস্কি ১৯৪০ সালে হৃদরোগে মৃত্যুবরণ করেন। আর স্ট্যার্ন গ্যাং নেতা আব্রাহামকে ব্রিটিশরা বন্দি অবস্থায় গুলি করে হত্যা করে ১৯৪২ সালে।

ইরগুনের নেতৃত্বে বেগিন

মেনাখেম বেগিন; যিনি পরবর্তী সময়ে ইজরাইলের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন, তাকে ইরগুন বাহিনীর অধিনায়ক বানানো হয় ১৯৪৪ সালে। বেগিন প্যালেস্টাইনে এসেই ইরগুনকে সক্রিয় করার যাবতীয় কর্মকৌশল হাতে নেন। বেগিনের দায়িত্ব নেওয়ার বছরেই জেরুজালেমের পুলিশ স্টেশনগুলোতে হামলা চালিয়ে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ইরগুন। একজন সিআইডি কর্মকর্তা যখন শহরের রাস্তায় হাঁটছিলেন, তখন তাকে হত্যা করে ইরগুন সদস্যরা। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ বেগিনকে জীবিত বা মৃত ধরিয়ে দেওয়ার জন্য ১০ হাজার পাউন্ড পুরস্কার ঘোষণা করে।

আত্মগোপনে চলে যান বেগিন। তবে লম্বা দাড়িওয়ালা তালমুদ পণ্ডিতের ছদ্মবেশ ধারণ করে আত্মগোপনে থেকেই ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সহিংসতা অব্যাহত রাখেন। ১৯৪৪ সালের শেষের দিকে প্যালেস্টাইনে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার হ্যারল্ড ম্যাক মাইকেলকে জেরুজালেমের রাস্তায় দুই দফা হত্যার চেষ্টা চালায় ইরগুন। একই বছরের নভেম্বরে কায়রোতে ব্রিটিশ স্টেটমন্ত্রী ও চার্চিলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু লর্ড ময়নিকে হত্যা করে তারা। আসলে বিল্টমোর সম্মেলনের পরেই পরিস্থিতি আরও জটিল হয়। ব্রিটেন ছেড়ে আমেরিকাকে অধিকতর নির্ভরশীল ভাবতে থাকে তারা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে ১৯৪৫ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুমান জায়োনিস্টদের এজেন্ডা বাস্তবায়নে এগিয়ে আসেন। তিনি ইউরোপ থেকে প্যালেস্টাইনে ১ লাখ ইহুদি অভিবাসীর আগমন অনুমোদন করেন। অথচ ব্রিটেন নতুন পলিসি নিয়েছিল। কারণ, তারা চেয়েছিল ইহুদি অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ করতে। ফলে ১৯৪৫ সালের পহেলা নভেম্বর ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত আক্রমণে যায় হাগানা, ইরগুন ও লেহি।[৮৯] ওই রাতে হাগানার ইউনিটসমূহ একই সময়ে প্যালেস্টাইনের রেল সিস্টেমের দেড় শতাধিক স্থানে নাশকতা চালায় এবং হাইফা ও জাফা বন্দরের দুটি টহল লঞ্চ ডুবিয়ে দেয়। হাগানা যাতে নিজস্ব অস্ত্র ও বোমা বানাতে পারে, সে জন্য পশ্চিমের ফান্ডের দিকে তাকিয়ে থাকেন বেনগুরিয়ান।

ব্রিটেন পরিস্থিতি বুঝতে পারে। ব্রিটিশ পরিবারগুলোকে সরিয়ে নেওয়া হয় প্যালেস্টাইন থেকে। জায়োনিস্ট মুভমেন্ট ও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা চলতে থাকে। ১৯৪৬ সালের মার্চ ও জুলাইয়ে খেইম ওয়াইজম্যান ও ব্রিটিশ হাইকমিশনার এলান কানিংহামের মধ্যে গোপন আলাপ-আলোচনা হয়। ১৯৪৬ সালের প্রথম ছয় মাসে ৩৩১ জন ফিলিস্তিনিকে অস্ত্র রাখার জন্য গ্রেফতার করা হয়। এই সময়ে জেরুজালেমের গ্র্যান্ড মুফতি আমিন আল হোসাইনি ফ্রান্সে ছিলেন। তিনি ইতালি ও জার্মানি সফর করেন। তার আশা ছিল, অক্ষশক্তি যুদ্ধে জিতলে ফিলিস্তিনের বিজয় ত্বরান্বিত হবে।

ইরগুন ও লেহির একটি যৌথ ইউনিট লিদ্দায় প্রধান রেলস্টেশনে হামলা চালায়। এই অভিযান পরিচিতি পায় 'নাইট অব দ্য ট্রেইনস' নামে। এবার ব্রিটিশ বাহিনী চড়াও হয়, সরকার হাগানা দমনের নির্দেশ দেয়। বহু ইহুদি নেতাকে আটক করা হয়। বেনগুরিয়ান অবশ্য তখন দেশে ছিলেন না। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ যখন হাগানা দমনে অলআউট অপারেশনে, তখন ইরগুন ও লেহি মেনাখেম বেগিনের নেতৃত্বে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত সন্ত্রাসী আক্রমণ চালাতে থাকে। জেরুজালেমের রুশ প্রাঙ্গনে জার আমলে নির্মিত বিশাল হোস্টেলগুলোতে প্যালেস্টাইনের পুলিশ হেড কোয়ার্টার্স স্থাপন করা হয়েছিল।

---

[৮৯]. Al-Nakba: The Palestinian catastrophe -Episode 2| Featured Documentary, Al Jazeera English.

দুর্গম এই রুশ প্রাঙ্গন ইরগুন আক্রমণের টার্গেটে পরিণত হয়। ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৪৫ সালে রুশ প্রাঙ্গনের সিআইডি সদর দপ্তর উড়িয়ে দেয় ইহুদি সন্ত্রাসীরা। পরের বছর ১৭ জুন প্যালেস্টাইন ও প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে যোগাযোগের ১১টি সেতু ধ্বংস করে হাগানা। ব্রিটিশরা ইহুদি সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে, যা দুই সপ্তাহব্যাপী ধরে চলে। সারা দেশব্যাপী কারফিউ জারি করে নামানো হয়েছিল ১৭ হাজার সেনা। সেনারা ইহুদি বসতি, যৌথ খামার ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অস্ত্র উদ্ধার ও ইহুদি নেতাদের আটকের উদ্দেশ্যে অভিযান পরিচালনা করে। যদিও বড়ো মাপের কোনো ইহুদি নেতাকে আটক করা যায়নি, অস্ত্রভান্ডারও উদ্ধার করা যায়নি। কারণ, এসব অভিযানের খবর আগেই পেয়ে যেত হাগানা। প্রশাসন ও সেনাবাহিনীর ভেতরে ছিল বেতনভুক্ত ইহুদি এজেন্ট।

কিং ডেভিড হোটেলে সন্ত্রাসী আক্রমণ

'দ্য কিং ডেভিড হোটেল' জেরুজালেমের প্রথম বিলাসবহুল হোটেল, যা ১৯৩১ সালে নির্মাণ করা হয়। ১৯৩৮ সাল থেকে এই হোটেলের দক্ষিণ অংশে ছিল প্যালেস্টাইনে ব্রিটিশ বাহিনীর সদর দপ্তর। একই সঙ্গে ভবনটি ব্রিটিশ ম্যান্ডেট সরকারের সচিবালয় হিসেবেও ব্যবহার করা হতো।

বেগিনের নেতৃত্বাধীন ইরগুন ১৯৪৬ সালের ২২ জুলাই বোমা হামলা চালায় কিং ডেভিডে। সেদিন ভোরে ২০ ইহুদি সন্ত্রাসী একটি লরি থেকে কয়েকটি দুধের বোতলের বাক্স নামিয়ে হোটেলের বেইজমেন্টে রেখে দেয়। এসব সন্ত্রাসীর পরনে ছিল আরব পোশাক। আর বাক্সগুলোতে সাড়ে তিনশো কেজি বিস্ফোরক ছিল।[৯০] প্রথমেই ব্রিটিশ বাহিনীর মেজর মেকিন্টশকে গুলি করে হত্যা করা হয়। খানিকবাদে তার ভাগ্যবরণ করে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা এক পুলিশ সদস্য। এরপর শুরু হয় দুই পক্ষের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধ। কয়েকজন ইরগুন সন্ত্রাসী গুলিবিদ্ধ হলেও তাদের সবাই পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। গোলাগুলির মধ্যেই হোটেলের বেইজমেন্টে প্রচণ্ড বিস্ফারণে ঘটে। মারা যায় ৯১ জন, আহত হয় আরও ৬০ জন। নিহতদের মধ্যে ছিল ২৮ জন ব্রিটিশ, ৪১ জন আরব, ১৭ জন ইহুদি।[৯১]

---

৯০. Rise and Kill First: The Secret History of Israel's Targeted Assassinations, Ronen Bergman, page-19, 20.

৯১. Al-Nakba: The Palestinian catastrophe -Episode 2| Featured Documentary, Al Jazeera English.

দ্য কিং ডেভিড় হোটেল। ছবি : ইন্ডিপেন্ডেন্ট

ব্রিটিশ ম্যান্ডেট সরকারের বিরুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্যে বড়ো আকারে প্রথম পরিকল্পিত সন্ত্রাসী হামলা এটি। ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানির দিক দিয়েও হামলাটি ছিল সবচেয়ে মারাত্মক। হামলার মুহূর্তে হোটেলটিতে ছিলেন সুশানা লেভি ক্যাম্পোস নামের এক ইহুদি মহিলা; কাজ করতেন ব্রিটিশ প্রশাসনের একজন টাইপিস্ট হিসেবে। সেদিন তিনি প্রাণে বেঁচে যান। বিবিসির মাইক লানচিনের কাছে সেই হামলার স্মৃতিচারণ করেছেন সুশানা।

২২ জুলাই, ১৯৪৬। ঘড়ির কাঁটা মাত্র দুপুর বারোটার ঘর পেরিয়েছে। সুশানা হোটেলের অফিসে নিজের টেবিলে কাজে ব্যস্ত। তারপর যেন হঠাৎ দুনিয়ায় একটা ওলট-পালট ঘটে গেল। সুশানা বলেন–

> 'আমি আমার জায়গা থেকে উঠে দাঁড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ একটি বিকট বিস্ফোরণের শব্দ শুনি। তারপর একেবারে অন্ধকার। আমি কিছুই দেখিনি, আর সব যেন নিস্তব্ধ। একটু পরে শুনি, কেউ যেন কাশছে। আমার মনে হলো, সবাই বুঝি মারা গেছে।

তারপর আমি করিডোর ধরে হেঁটে যেতে লাগলাম। একটা জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। জানালাটি ছিল একটু নিচের দিকে, সেখান দিয়ে লাফ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব। পুরো হোটেলের চার-পাঁচতলাজুড়ে যে ধ্বংসযজ্ঞ, সেটা আমি দেখতে পাচ্ছিলাম। আমি জানতাম, নিহতের সংখ্যা হবে অনেক। আমি কাঁদতে শুরু করলাম। আমার বস মিস্টার জ্যাকব ছিলেন একজন ইহুদি ব্রিটিশ। তিনি ছিলেন খুবই ভালো মানুষ। ওই হামলায় তিনি মারা যান। বাবা এর মধ্যে খবর পেলেন যে, কিং ডেভিড হোটেলে হামলা হয়েছে। তিনি জানতেন, আমি এই হোটেলেই কাজ করি। আমি যখন দৌড়ে বেরিয়ে এলাম, তখন আমার অনেক প্রতিবেশী আমাকে দেখেছিলেন। তারা আমার বাবাকে গিয়ে বললেন– "আপনার মেয়ে বেঁচে আছে, আপনার মেয়ে বেঁচে আছে।"'[৯২]

এত কড়া নিরাপত্তার মধ্যে থাকা একটি বিলাসবহুল হোটেলে কী করে এত বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক জড়ো করা সম্ভব হলো– এই প্রশ্ন তাড়িয়ে আজও বেড়ায় ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীকে। হামলাকারীদের ধরতে তেলআবিবসহ বিভিন্ন জায়গায় চালানো হয় তল্লাশি। যখন-তখন ইহুদিদের দেহ তল্লাশি, বাসস্থানে হানা দিয়েও হামলাকারী কিংবা মূল হোতাদের চিহ্নিত কিংবা ধরা যায়নি; বরং ব্রিটিশ বাহিনীর এমন পদক্ষেপকে সাধারণ ইহুদিরা দেখে বাড়াবাড়ি আচরণ হিসেবে। ফলে ইহুদি সমাজে ম্যান্ডেট সরকারের গ্রহণযোগ্যতায় ধ্বস নামে। আর ইরগুনের প্রাথমিক উদ্দেশ্যেও ছিল এ রকমই। এদিক দিয়ে তাদের সাফল্য বেশ পরিষ্কার।

তবে কিং ডেভিড হোটেলে হামলার পর ইহুদি সন্ত্রাসবাদের নিন্দায় মাতল সারা বিশ্ব। এতদিন ইউরোপজুড়ে ইহুদিবিরোধী হলোকাস্টের কারণে আন্তর্জাতিকভাবে তাদের প্রতি যে সহানুভূতির জন্ম হয়েছিল, এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের ঘটনায় তাতে ভাটা পড়ল। চাপের মুখে ইহুদি রাজনীতিকরা হামলার নিন্দা জানাতে বাধ্য হয়। হাগানা, ইরগুন ও লেহির কার্যক্রম নিষ্ক্রিয় করা হয়। এ নিয়ে বাধে আরেক বিপত্তি। ইহুদি রাজনৈতিক নেতৃত্ব আর এসব সশস্ত্র সংগঠনের মধ্যে মতবিরোধ ও দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। ইহুদি নেতারা সবাইকে বোঝাতে চাইলেন, তারা হামলার ব্যাপারে কিছুই জানেন না; যদিও হাগানা সদর দপ্তরের নির্দেশেই যে কিং ডেভিড হোটেল হামলা চালানো হয়েছিল– তা আর গোপন থাকেনি।

এই হামলা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ও ইহুদিদের মধ্যে সংঘাত চরম পর্যায়ে পৌঁছায়। হামলার পর ব্রিটিশ সেনা ও ইহুদি বেসামরিক ব্যক্তিদের সামাজিক মেলামেশা সীমিত হয়ে যায়।

---

৯২. ইতিহাসের সাক্ষী : জেরুসালেমে ইহুদিগোষ্ঠীর প্রথম সন্ত্রাসবাদী বোমা হামলা, বিবিসি বাংলা, ৬ মে, ২০১৯।

ব্রিটিশদের প্যালেস্টাইন ম্যান্ডেট চালিয়ে যাওয়ার আগ্রহ কমিয়ে দেয় এবং তাদের প্যালেস্টাইন ত্যাগ ত্বরান্বিত করে। ঘটনার দুই মাসের মধ্যে প্যালেস্টাইন ম্যান্ডেট সরকারের চিফ সেক্রেটারি স্যার জন শ'-কে ত্রিনিদাদ ও টোবাগ্যোর হাইকমিশনার পদে বদলি করা হয়। কিন্তু ত্রিনিদাদে পৌঁছামাত্র ইরগুন সন্ত্রাসীরা পত্রবোমা দিয়ে জনকে হত্যার চেষ্টা চালায়।

একজন ইরগুন সন্ত্রাসীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার প্রতিশোধ হিসেবে ১৯৪৭ সালের পহেলা মার্চ ব্রিটিশদের জেরুজালেম গোল্ডস্মিথ অফিসার্স ক্লাব উড়িয়ে দেয় ইরগুন। কিং ডেভিড হোটেলে বোমা হামলার তিন মাস পর ১৯৪৬ সালের ৩১ অক্টোবর লেহির একটি দল ইতালির রাজধানী রোমে অবস্থিত ব্রিটিশ দূতাবাসে প্রায় ব্যর্থ একটি বোমা হামলা চালায়। এ ঘটনার পরপরই লেহি লন্ডনে অবস্থিত ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার প্রত্যেক সদস্যের কাছে পত্রবোমা পাঠায়। অবশ্য এই অভিযানও ব্যর্থ হয়। এর একটি বোমাও বিস্ফোরিত হয়নি।

তিন ইহুদি যোদ্ধাকে আটকের প্রতিবাদে ১৯৪৭ সালের জুলাইয়ে ব্রিটিশ বাহিনীর দুই সার্জেন্টকে অপহরণ করে ইরগুন। এই তিনজনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হলে পরদিন দুই ব্রিটিশ নাগরিকের ঝুলন্ত মরদেহ পাওয়া যায় নেতানিয়া এলাকার একটি মাঠে। ইহুদি চরমপন্থি সংগঠন লেহির সদস্যরাও ছোটোখাটো বিভিন্ন হামলায় অংশ নেওয়ার মধ্য দিয়ে নিজেদের শক্তিমত্তার জানান দিতে থাকে। প্রায় একই সময় ব্রিটেনে একটি শাখা গড়ে তোলে ইরগুন তার কার্যক্রম শুরু করে। এমনকী সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লেমেন্ট অ্যাটলি ও তার মন্ত্রিসভার সদস্যদের হত্যা করতে চেয়েছিল ইহুদি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী ইরগুন ও লেহি। ইজরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে হাগানাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে ইজরাইলি প্রতিরক্ষা বাহিনী। হাগানার প্রধান ডেভিড বেনগুরিয়ান হন ইজরাইলের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। আর ইরগুনের প্রধান মেনাখেম বেগিন এবং লেহির প্রধান আইজ্যাক শামির পরবর্তী সময়ে হন যথাক্রমে ইজরাইলের ষষ্ঠ ও সপ্তম প্রধানমন্ত্রী।

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

ইজরাইলি গোয়েন্দা সংস্থা ও মোসাদ

'ইজরাইলের কোনো বিবেক নেই, সম্মান নেই, বড়াই করার মতো কিছু নেই। তারা দিন-রাত হিটলারকে অভিশাপ দেয়, অথচ বর্বরতায় তারা হিটলারকে ছাড়িয়ে গেছে।' —রেজেপ তাইয়্যিপ এরদোয়ান

মালয়েশিয়ায় হামাসের ড্রোনবিজ্ঞানী খুন

২১ এপ্রিল, ২০১৮। মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুর। ফজরের নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে মসজিদের দিকে হাঁটছেন অধ্যাপক ফাদি আল বাৎস। পথ আগলে দাঁড়ায় দুই বন্দুকধারী। ১০ রাউন্ড গুলি ছোড়ে মুহূর্তেই সটকে পড়ে তারা। রাস্তায় পড়ে থাকে বাৎসের মরদেহ। মোটরসাইকেলে করে আসা এই খুনিদের চেহারার সাথে মিল আছে ইউরোপীয়দের। মালয়েশিয়ার পুলিশ নিশ্চিত হয়– এটা বিদেশি গুপ্তচরদের কাজ। এই বিদেশি গুপ্তচর কারা? ফাদির পরিবারই প্রথমে অভিযোগ করে কাজটা ইজরাইলি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের! ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসও দায় চাপায় মোসাদের ওপর। সত্যিই কি মোসাদ দায়ী? কেনই-বা এমন কাজ করবে মোসাদ? এর কারণ ব্যাখ্যা করবে ইতিহাস। চলুন ঘুরে আসি মোসাদ সাম্রাজ্যে।

হামাস সদস্য ফাদি আল বাৎস ছিলেন ড্রোন বিশেষজ্ঞ। গাজাতে তড়িৎ প্রকৌশল বিষয়ে পড়াশোনা শেষ করে পিএইচডি অর্জনের জন্য গিয়েছিলেন মালয়েশিয়াতে। জ্বালানি ও শক্তি বিষয়ে বিভিন্ন জার্নালে বেশ কিছু পেপার বেরিয়েছিল বাৎসের। মালয়েশিয়ার একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পাশাপাশি করতেন মসজিদে ইমামতি।

ফাদি আল বাৎসের কফিনের পাশে ইসমাইল হানিয়াসহ হামাস নেতারা, ফটো : মালয় মেইল

হামাসের নিরাপত্তা কর্মীরা ফাদির কফিন বহন করে নিয়ে যাচ্ছে, ফটো-মালয় মেইল।

উইয়র্ক টাইমস লিখেছিল, মোসাদই ফাদি আল বাৎসকে হত্যা করেছে। হামলার দেশ্য ছিল হামাসের বৈদেশিক কার্যক্রম বন্ধ করা। হত্যার নির্দেশ আসে মোসাদপ্রধান য়োসি কোহেন-এর কাছ থেকে। বাৎস ড্রোনের ওপর গবেষণা করছিলেন। তিনি ড্রোন অ্যাপ্লিকেশনসংক্রান্ত একটি পেপার মালয়েশিয়াতে পাঠিয়েছিলেন। হত্যাকাণ্ডের আগে উত্তর কোরিয়া থেকে আসা একটি যোগাযোগ যন্ত্রের চালান আটক করেছিল মিশর, যা গাইডেড অস্ত্রের জন্য ব্যবহার করা হতো। ধারণা করা হয়, এই অস্ত্র চোরাচালানের সাথে জড়িত ফাদি। আর এভাবেই মোসাদের টার্গেটে পড়ে যান এই তরুণ ফিলিস্তিনি বিজ্ঞানী।

সন্দেহভাজন হত্যাকারীদের স্কেচ প্রকাশ করেছিল মালয়েশিয়ার সরকার। কুয়ালালামপুরের তখনকার পুলিশপ্রধান মাজলান লাজিম সাংবাদিকদের বলেছেন– সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করে দেখা গেছে, বন্দুকধারীরা আক্রমণ চালানোর আগে প্রায় ২০ মিনিট ধরে ঘটনাস্থলে ফাদির জন্য অপেক্ষা করছিল। মালয়েশিয়ার সাবেক ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী আহমেদ জাহিদ বলেছেন– 'আক্রমণকারীরা ছিল শ্বেতাঙ্গ এবং তাদেরও বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থার সাথে যোগাযোগ ছিল।'

কেন এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে মোসাদের সম্পৃক্ততা আছে বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে? এ বিষয়ে ইজরাইলের অনুসন্ধানী সাংবাদিক রোনেন বার্গম্যান-এর বক্তব্য– 'ফাদি আল-বাৎসকে যে প্রক্রিয়ায় খুন করা হয়েছে, এমনটা মোসাদ করে থাকে।' বার্গম্যান ইজরাইলের এই গোয়েন্দা সংস্থার কার্যক্রমের বিষয়ে বেশ ভালোভাবেই ওয়াকিবহাল। এ বিষয়ে *Rise and Kill First : The Secret History of Israel's Targeted Assassinations* নামে তার একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী বইও আছে।

ইজরাইল অতীতেও বিদেশের মাটিতে হামাস সদস্যদের হত্যা করেছে। ২০১৬ সালে ড্রোন বিশেষজ্ঞ এবং তিউনিসিয়ান নাগরিক মোহাম্মদ জায়ারিকে তার গাড়িতে বসা অবস্থায় গুলি করে মারা হয়। এ ছাড়া, দুবাইয়ের একটি হোটেলে মাহমুদ আল-মাবহার নামে এক হামাস সদস্য খুন হন। এই দুজনের হত্যার পেছনে মোসাদের হাত ছিল বলে ধারণা করা হয়। এ ছাড়া ১৯৯৭ সালে জর্ডানে মোসাদের এজেন্টরা হামাস নেতা খালিদ মিশালের কানের ভেতর বিষ ছিটিয়ে দিয়ে তাকে হত্যার এক ব্যর্থ চেষ্টা চালায়। তবে এই সকল গুপ্তহত্যার কথা ইজরাইল বা মোসাদ কখনোই স্বীকার করেনি।

মোসাদ যেভাবে কাজ করে

এক

৭ জুন, ১৯৪৭।

তেলআবিবের নিজ কার্যালয়ে সহযোগীদের নিয়ে বৈঠকে বসেছেন বেনগুরিয়ান। ইহুদি সামরিক বাহিনীকে কীভাবে আরও বেশি দক্ষ ও প্রফেশনাল করা যায়, নিজেরা নিজেদের মধ্যে মতামত শেয়ার করছেন। বেনগুরিয়ান বললেন– 'এখনই আমাদের গোয়েন্দা সংস্থা গঠন করা জরুরি, যদি আমরা আরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জিততে চাই।'

সেদিনই তিনটি সংস্থা গড়ে তোলার নির্দেশ দেন তিনি। আসলে বেনগুরিয়ান নয়া রাষ্ট্র 'ইজরাইল' রক্ষায় প্রতিরক্ষা বাহিনীর (আইডিএফ) ওপর পূর্ণ আস্থা রাখতে পারেননি। তার মনে হয়েছিল, নতুন রাষ্ট্রের সীমানা রক্ষা আর ইহুদিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এই বাহিনীর পক্ষে অসম্ভব; যদি না নিজস্ব গোয়েন্দা বাহিনী থাকে।

সেদিন যে তিনটি গোয়েন্দা সংস্থা প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত আসে, এগুলোর একটি হলো 'ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট অব দ্য ইজরাইল ডিফেন্স ফোর্সেস জেনারেল স্টাফ', যাকে পরবর্তী সময়ে হিব্রু নামে 'আমান' হিসেবে ডাকা শুরু হয়। দ্বিতীয়টি হলো– 'জেনারেল সিকিউরিটি সার্ভিস' বা 'শিনবেত'। যদিও বেশিরভাগ আরব ও ইজরাইলিদের কাছে শিনবেত পরিচিত 'সাভাক' নামে; এর দায়িত্ব হলো অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা দেওয়া। এফবিআই ও এমআই ফাইভ-এর আদলে সাজানো হয় শিনবেতের কার্যক্রম। পরবর্তী সময়ে এর নাম 'ইজরাইলি সিকিউরিটি এজেন্সি' করা হলেও সাভাক নামে এখনও বেশ পরিচিত এই গোয়েন্দা সংস্থা। আর তৃতীয় আরেকটি সংস্থা খোলা হয়েছিল 'পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্ট' নামে; এর নিয়ন্ত্রণ ছিল সদ্য খোলা পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের হাতে।

আগে ইহুদিদের পররাষ্ট্র দিকটা দেখত ইন্টারন্যাশনাল জিউস এজেন্সি। পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্ট খোলার ফলে এখন তা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দেখভাল করতে থাকে। পররাষ্ট্র মন্ত্রী Moshe Sharet-এর সাথে বিবাদে জড়িয়ে ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসে পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্টের ওপর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ উঠিয়ে নেন বেনগুরিয়ান। তিনি তা নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেন। পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্টের নতুন নাম দেওয়া হয় 'দ্য ইন্সটিটিউট ফর ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড স্পেশাল অপারেশনস'। এটিই আজকে মোসাদ নামে পরিচিত। বর্তমানে তার পূর্ণ নাম 'সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব কো-অর্ডিনেশন'। মোসাদের কাজ হলো– সীমানা পেরিয়ে গোয়েন্দা কার্যক্রম চালানো ও বিশেষ অপারেশনে অংশ নেওয়া। কাগজে-কলমে মোসাদ, আমান আর শিনবেতের কার্যক্রমে ভিন্নতা থাকলেও এই তিন সংস্থার মধ্যে একটা জায়গায় বেশ মিল রয়েছে : সবগুলোই টার্গেট কিলিংয়ের সাথে জড়িত।

দুই

গুপ্ত হত্যায় পৃথিবীতে সবচেয়ে আলোচিত গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ। কৌশল ও টার্গেট নির্ধারণে মোসাদ সদস্যরা সিআইএ, কেজিবি, এমআই-৬ এর মতো গোয়েন্দা সংস্থাকে সুপারসিড করতে জানে। ফিলিস্তিনের হামাস ও পিএলও এর বহু নেতা মোসাদের টার্গেটের শিকার হয়েছেন, কেউ মারা গেছেন, কেউ মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে এসেছেন। প্রতিষ্ঠার পর থেকে আড়াই হাজারের ওপরে গোপন অভিযান পরিচালনা করেছে মোসাদ। একে আখ্যায়িত করা হয় বিশ্বের সবচেয়ে নিখুঁত গুপ্তহত্যার মেশিন হিসেবে। ইজরাইলি রাষ্ট্র ও জায়োনিস্টবিরোধী সক্রিয় নেতা অথবা ব্যক্তি, যাদের দ্বারা ইজরাইল রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে অথবা হতে পারে এমন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সাধারণত এই গুপ্তহত্যার পথ বেছে নেওয়া হয়।

১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠার পর খুব অল্প সময়ে মোসাদ তাদের বিস্তৃতি সারা বিশ্বে ছড়াতে পেরেছে। রনেন বার্গম্যান তার বইয়ে মোসাদের গুপ্তহত্যার প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিশদভাবে লিখেছেন। তবে সত্যি বলতে কী, মোসাদ সম্পর্কে মানুষ ঠিক ততটাই জানে, যতটা মোসাদ জানতে দেয়। আল জাজিরা বার্গম্যানের বইয়ের কিছু বিষয় উল্লেখ করে ফাদি আল-বাৎসের হত্যাকাণ্ড নিয়ে পর্যালোচনা করেছে। সেই অনুবাদ থেকে চলুন মোসাদের কার্যক্রমের প্রক্রিয়াটা দেখে আসি।

শুরুতে ঠিক করা হয় কাকে সরিয়ে দেওয়া হবে। এটা মোসাদ বা ইজরাইলের অন্য গোয়েন্দা সংস্থাগুলোই করে থাকে। কখনো বা উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতৃত্ব থেকে হত্যার নির্দেশনা আসে। যেমন : হামাস নেতা খালেদ মিশালকে হত্যার নির্দেশ এসেছিল তখনকার প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে।

মোসাদের মধ্যে বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক ধাপ পেরিয়ে টার্গেট নির্ধারণ করা হয়। এতে গোয়েন্দা ও রাজনৈতিক নেতাদের যোগসূত্র থাকে। ফাদি আল-বাৎসের ক্ষেত্রে যা ঘটেছে তা হলো– হামাসকে নজরে রাখে ইজরাইলের যেসব গোয়েন্দা সংস্থা ও মিলিটারি বাহিনী, তারাই তাকে নিশানা বানায়।

গাজার সাথে তেহরান, ইস্তাম্বুল, দোহা এবং বৈরুতের যোগাযোগের বিষয়টি ইজরাইলের গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক কঠোর নজরদারিতে রাখে। প্রাথমিকভাবে ওই নেটওয়ার্কই বেছে নিয়েছিল ফাদি আল-বাৎসকে। হামাসের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক কখনোই লুকাতেন না বাৎস। ফিলিস্তিনি কমিউনিটিতেও এই বিষয়টি কারও অজানা ছিল না।

টার্গেট ঠিক হয়ে গেলে মোসাদের এবারের কাজ হলো কোথায়, কীভাবে কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিটিকে হত্যা করা হবে, সেটি পর্যালোচনা করা। এ হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে কী সুবিধা পাওয়া যাবে, সেটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক নেতারা দেখে থাকে,

কিন্তু হত্যার সবচেয়ে সুবিধাজনক উপায় নিয়ে ভাবে মোসাদ নিজেই। টার্গেটের বিষয়ে সব তথ্য নিয়ে মোসাদের বিশেষ ইউনিট তাদের ফলাফল ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস কমিটি 'ভাড়াসকে দেয়। ভারাস তখন অপারেশনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়, তবে অনুমোদন দেওয়ার ক্ষমতা ভারাসের নেই। কেবল ইজরাইলের প্রধানমন্ত্রী এই ধরনের গুপ্ত হত্যায় অনুমোদন দিতে পারেন। বার্গম্যান মনে করেন, ইজরাইলি প্রধানমন্ত্রী সাধারণত রাজনৈতিক কারণে নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পছন্দ করেন না। বেশিরভাগ সময়ই এই বিষয়ে আরও দু-একজন মন্ত্রীকে যুক্ত করা হয়, তবে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর পরামর্শই বেশিরভাগ সময় নেওয়া হয়। অনুমোদনের পর বাস্তবায়নের কাজটি চলে যায় মোসাদের হাতে। মোসাদ হত্যার ছক সাজায়। অনেক সময় এটা করতে সপ্তাহ, মাস এমনকী বছরও লেগে যায়। আবার এমনও হতে পারে, বহু বছর পেরিয়ে যাচ্ছে।

মোসাদের গোপন অপারেশন গুলো করে থাকে 'সিজারিয়া বিভাগ'। বিশ্বব্যাপী বিশেষ করে আরব দেশগুলোতে গুপ্তচর নিয়োগ এবং গুপ্তচরবৃত্তির দায়িত্বে থাকে এই বিভাগ। ১৯৭০ সালে এটি প্রতিষ্ঠা করেন ইজরাইলের জনপ্রিয় ব্যক্তি মাইক হারারি। টার্গেটের সব তথ্য নিতে এবং তার ওপর নজর রাখতে সিজারিয়া বিভাগ আরব ও মধ্যপ্রাচ্যে তার বিশাল গুপ্তচর নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে। মোসাদের সিজারিয়া বিভাগের একটি ইউনিট হলো 'কিডন'। এই ইউনিটটিই মূলত গুপ্তচরবৃত্তির কাজ করে। এতে নিয়োগ দেওয়া হয় ইজরাইলের বিশেষ বাহিনীর সদস্যদের। অসম্ভব গোপনীয়তা রক্ষা করা হয় এই ইউনিটে। ধারণা করা হচ্ছে, কিডন বাহিনীর সদস্যরাই ফাদি আল-বাৎসের হত্যাকাণ্ডে অংশ নেয়।

বার্গম্যান বলেছেন, ২০০০ সালের আগ পর্যন্ত ইজরাইল ৫০০ গোপন অপারেশন চালায় যেসব অপারেশনে নিহত হয় এক হাজারেরও বেশি মানুষ। মূলত আশির দশকের শেষ দিকে এবং নব্বইয়ের দশকের শুরুর দিকে পশ্চিম তীর গাজা এলাকায় ইজরাইলি দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে প্রথম ইন্তিফাদা শুরু হয়। ২০০০ সালে দ্বিতীয় ইন্তিফাদার সময় ইজরাইল প্রায় এক হাজার গুপ্ত অপারেশন চালায়, তার মধ্যে ১৬৮টিতে সফল হয়।

বিশ্বজুড়ে মোসাদের ২৭০০ গোপন টার্গেট কিলিং মিশন

ইজরাইলি সাংবাদিক রনেন বার্গম্যান পড়াশোনা করেছেন যুক্তরাজ্যের ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। ইজরাইলের মোস্ট সার্কুলেটেড দৈনিক Yedioth Ahronoth-এর প্রধান প্রতিরক্ষাবিষয়ক প্রতিবেদক হিসেবে বর্তমানে কাজ করছেন তিনি। 'রাইস অ্যান্ড কিল ফার্স্ট : দ্য সিক্রেট হিস্টোরি অব ইজরাইলস টার্গেটেড অ্যাসাসিনেশনস' নামে যে বইটি তিনি লিখেছেন, তাতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে। লেখক দাবি করেছেন,

জন্মের পর গত ৭০ বছরে ইজরাইল কমপক্ষে ২৭০০টি গুপ্তহত্যার অভিযান পরিচালনা করেছে। শুধু ফিলিস্তিনি নয়, ইজরাইলের গুপ্তহত্যার শিকার হয়েছে ইরান, সিরিয়া, মিশরসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নাগরিক।

লেখকের তথ্য অনুযায়ী, ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাত হত্যায় ইজরাইল 'রেডিয়েশন পয়জনিং' ব্যবহার করেছিল। ফিলিস্তিনি নেতারাও আরাফাতকে হত্যা করা হয়েছে বলে দাবি করে আসছেন।[৯৩]

ইজরাইল গুপ্তহত্যার জন্য যে সকল পদ্ধতি ব্যবহার করে, তার মধ্যে রয়েছে বিষাক্ত টুথপেস্ট, সশস্ত্র ড্রোন, সেলফোন ও রিমোট কন্ট্রোল বোম্ব। বইটি লিখতে গিয়ে বার্গম্যান মোসাদ ও ইজরাইলি সামরিক বাহিনীর এজেন্টদের সাথে কথা বলেছেন, সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। তাদের কেউ কেউ প্রকৃত নাম ব্যবহার করতে রাজি হয়েছেন, অনেকে পরিচয় লুকাতে চেয়েছেন। এভাবে রাষ্ট্রীয় মদদে কীভাবে হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়, তার একটি চিত্র পেয়ে যান তিনি। ১০০০ সাক্ষাৎকার ও হাজার হাজার ডকুমেন্টের ভিত্তিতে লেখা এই বইয়ে উঠে এসেছে কীভাবে সরাসরি সামরিক হামলার পরিবর্তে অর্ধ ডজন ইরানি পরমাণুবিজ্ঞানীকে হত্যা করা হয়েছিল।

ইজরাইলের সাবেক প্রধানমন্ত্রী এহুদ বারাক ও এহুদ ওলমার্টের সাক্ষাৎকারও নিয়েছেন সাংবাদিক বার্গম্যান। লেখক অভিযোগ করেন, তিনি যখন ইজরাইলি গোয়েন্দা সংস্থার গুপ্তহত্যা নিয়ে গবেষণা করছিলেন, তাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। ২০১০ সালের দিকে রীতিমতো বৈঠক করে গোয়েন্দা সংস্থার লোকদেরকে লেখকের সঙ্গে কথা বলতে বারণ করেছিল মোসাদের কর্তা ব্যক্তিরা।

আমেরিকাও নানা সময়ে ইজরাইলি কৌশল প্রয়োগ করে থাকে বৈরী বিশ্বনেতাদের লাগাম টেনে ধরতে। ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলার পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াকার বুশ বিভিন্ন ইজরাইলি কৌশল প্রয়োগ করতে শুরু করেন। প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা শত শত টার্গেট কিলিং মিশন চালিয়েছিলেন বলে বার্গম্যানের বইয়ে দাবি করা হয়েছে। কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সিস্টেম, ওয়াররুম, তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়া, পাইলটবিহীন বিমান বা ড্রোন প্রযুক্তি, এসব কিছুই মার্কিনিরা ইজরাইলের কাছ থেকে রপ্ত করেছে। সত্তরের দশকে মোসাদ বিদেশে বিভিন্ন বাণিজিক প্রতিষ্ঠান খুলেছিল সামরিক ও গোয়েন্দা কার্যক্রমের উদ্দেশ্যে। তাদেরই একটি মিডল ইস্ট ইস্টার্ন শিপিং বিজনেস। ইয়েমেন উপকূলে মোসাদের একটি টিমকে সহায়তায় এই প্রতিষ্ঠান ভূমিকা রেখেছিল।

---

৯৩. What Killed Arafat? l Al Jazeera Investigations, Killing Arafat l Al Jazeera Investigations

পত্রবোমায় লন্ডভন্ড মিসরের মিসাইল ও পরমাণু কার্যক্রম

এক
২১ জুলাই, ১৯৬২।

সকাল বেলা।

ইজরাইলের জন্য দুঃস্বপ্নের এক সকাল। মিশরের পত্রিকাগুলোতে খবর বেরিয়েছে, দুই ধরনের চারটি সার্ফেস টু সার্ফেস (ভূমি থেকে ভূমিতে নিক্ষেপণযোগ্য) মিসাইলের সফল পরীক্ষা চালিয়েছে তাদের সেনাবাহিনী। এর দুদিন পরই বিশটি মিসাইল জাতীয় পতাকা মুড়িয়ে কায়রোর সড়কে প্রদর্শন করা হয় বিপ্লব দিবসের প্যারেডে। তিন শতাধিক বিদেশি কূটনীতিককে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়। বিশাল জনতার সামনে প্রেসিডেন্ট জামাল আবদেল নাসের ঘোষণা দিলেন এখন থেকে বৈরুতের দক্ষিণ পর্যন্ত যেকোনো টার্গেটে মিসাইল হামলা চালাতে সক্ষম মিশরের আর্মি।

প্যারেডে যে দুই ধরনের মিসাইল প্রদর্শন করা হয়, তার মধ্যে একটির পাল্লা সাড়ে তিনশো মাইলের মতো, অপর মিসাইলটি দেড়শো মাইলেরও বেশি দূরত্বে আঘাত হানতে সক্ষম। জাতীয়তাবাদী নাসেরের মিসাইল তৈরির ঘোষণায় হতাশা বাড়ে ইজরাইল শিবিরে। কারণ, এই মিসাইল ইজরাইলের যেকোনো স্থানে সহজেই আঘাত হানতে পারবে। নাসেরের হাতে এ ধরনের অস্ত্র থাকা মানে ইজরাইলের জন্য বড়ো হুমকি। কারণ, জায়োনিস্টদের চোখে সে 'মধ্যপ্রাচ্যের হিটলার'। ইহুদিদের দুশ্চিন্তা আরও বাড়ে যখন তারা জানতে পারে, এই মিসাইল তৈরির পেছনে আছে জার্মানির একদল বিজ্ঞানী। ইজরাইলের গণমাধ্যমগুলোতে খবর বেরোয়, সাবেক নাৎসি নেতারা নাসেরের ইজরাইলবিরোধী গণহত্যা প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করছেন। ইহুদি প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়ের মহাপরিচালক তখন আশের বেন নাতান। মিসরের মিসাইল প্রজেক্টের খবরে তার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে।

সব ক্ষোভ গিয়ে পড়ে মোসাদপ্রধান ইসার হ্যারেলের ওপর। মোসাদ কেন আগেভাগে মিশরের মিসাইল কার্যক্রমের তথ্য জানাতে পারেনি, এ নিয়ে বিদ্রুপাত্মক মন্তব্য ও কটূক্তি আসতে থাকে রাজনীতিকদের দিক থেকে। প্রধানমন্ত্রী ডেভিড বেনগুরিয়ান হ্যারেলকে তার অফিসে তলব করেন, জানতে চান মিশরের মিসাইল প্রকল্পের আপডেট। সময় চেয়ে নেন মোসাদপ্রধান। মাসখানেকের মধ্যেই মিশরের চারটি মিসাইলসংক্রান্ত তথ্য তুলে দেওয়া হয় বেন গুরিয়নের হাতে। আর এ জন্য মোসাদকে পাগলা কুকুরের মতো দৌড়াতে হয়েছে।

দুই

মোসাদ এজেন্টরা ইউরোপজুড়ে মিশরের দূতাবাসগুলো থেকে ফটো, ডকুমেন্টস সংগ্রহ করার কাজে নেমে যায়। স্থানীয় কিছু সোর্সকেও এ কাজে নিয়োগ দেওয়া হয়। সুইজারল্যান্ডে থাকা ইজিপ্ট এয়ারের কার্যালয়ে একজন সুইস নাগরিককে কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ দিতে সক্ষম হয় মোসাদ। এই কার্যালয়টি নাসেরের গোয়েন্দা সংস্থার ইউরোপীয় ছায়া অফিস হিসেবে কাজ করত। সুইস নাগরিকের মাধ্যমে মিশরীয় মিসাইল প্রজেক্টসংক্রান্ত বহু তথ্য জোগাড় করে ফেলে তারা। মিসাইল ছাড়াও আরও অস্ত্রশস্ত্র তৈরির তথ্য বেরিয়ে আসে।

মোসাদের পাওয়া তথ্যে দেখা যায়, ১৯৫৯ সালে আনকনভেনশনাল (গতানুগতিক অস্ত্র নয় এমন) অস্ত্র বানানোর জন্য একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছেন নাসের। এই প্রকল্পের দায়িত্বে আছেন নাসেরের সামরিক উপদেষ্টা জেনারেল ইসলাম আল দ্বীন মাহমুদ খলিল। বিমানবাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগের সাবেক এই কর্মকর্তা নাসেরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বন্ধুর নির্দেশনায় জেনারেল খলিল যুদ্ধবিমান, রকেট-মিসাইল ও তেজস্ক্রিয় রাসায়নিক তৈরির উদ্যোগ নেন। প্রচুর অর্থ ঢালা হয় এই খাতে।

খলিল শুরুতেই এক্সপার্টদের খোঁজে নেমে পড়লেন। লোভনীয় বেতন-ভাতা, বোনাস ও হাজারো সুবিধা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মিশরে এনে জড়ো করলেন তিন শতাধিক জার্মান বিজ্ঞানী বিশেষজ্ঞ ও স্টাফকে। এরা সবাই নাৎসি আমলে হিটলারের মিলিটারি প্রজেক্টে কাজ করতেন। জেনারেল খলিল সমান্তরাল তিনটি প্রকল্প হাতে নেন। এর একটির নাম 'প্রজেক্ট ৩৬'। এখানে যুদ্ধবিমান বানাতে যোগ দেন উইলি মেসেরস্পিট। এই ব্যক্তি জার্মান বিমানবাহিনীতে কাজ করার সময় মারাত্মক যুদ্ধবিমান তৈরির জনক হিসেবে খ্যাতি পেয়েছিলেন।

মিসরের আরেকটি প্রকল্প ছিল 'ফ্যাক্টরি-৩৩৩'। উত্তর কায়রোতে এই গোপন প্রকল্পটি গড়ে তোলা হয়, সেখানে মিসাইল তৈরি করা হতো। এখানেও জার্মান বিশেষজ্ঞরা কাজ করতেন। জার্মানিতে রকেট বানাতেন যেসব বিজ্ঞানী তাদের প্রধান ছিলেন– অধ্যাপক ইউজেন স্যাঙ্গার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউজেন ফ্রান্সে কয়েক বছর কাটান, সেখানে তিনি জার্মান ভি-২ মিসাইলের আদলে তৈরি করেন ভেরোনিক রকেট। এই মিসাইল জার্মানির ইউরোপীয় শত্রুদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি করেছিল। ইউজেন তার সঙ্গী-সাথিদের নিয়ে মিশরীয় মিসাইল প্রজেক্টে যোগ দিতে মিশর আসেন ১৯৬১ সালে। একই বছরে আসেন তার সাথে কাজ করা জার্মান অস্ত্রবিজ্ঞানী ডক্টর উলফ গ্যাংগ পিলৎস ও ডক্টর পল গোয়ের্কে। তারা নিয়ে আসেন ৩৫জন বড়োমাপের জার্মান বিজ্ঞানী ও টেকনিশিয়ানকে।

প্রকল্পের কাজ এগিয়ে নিতে কয়েকটি ফ্রন্ট অফিস খোলেন জার্মান ও মিশরীয় বিশেষজ্ঞরা। হাসান কামিল নামে এক ধনকুবের বাস করতেন সুইজারল্যান্ডে। তিনি মিশরীয় প্রকল্পে লিয়াজোঁ করতেন। তারা সুইজারল্যান্ডে দুটি ডামি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন। ছয়টি কোম্পানির কাজ ছিল মিশরীয় প্রকল্পের জন্য নানা রকম যন্ত্রপাতি ও উপকরণ সরবরাহ করা। অন্যদিকে, জার্মানিতে খোলা হয়েছিল ইন্টা কমার্শিয়াল নামে একটা ডামি কোম্পানি যা এই প্রকল্পের ইউরোপীয় ফ্রন্ট হিসেবে কাজ করত।

১৯৬১ সালে মিসাইল নির্মাণ শুরু হয়। বছরের শেষ দিকে এসে এ ঘটনা টের পায় জার্মান সরকার। তারা জানতে পারে, তাদের লোকজন মিশরীয় প্রকল্পে কাজ করছে। অধ্যাপক স্যাঙ্গারকে জার্মানি যেতে বাধ্য করা হয়। এবার এই প্রকল্পের প্রধান হন অধ্যাপক ডক্টর উলফ গ্যাং পিলৎস।

১৯৬২ সালের জুলাইয়ে 'ফ্যাক্টরি-৩৩৩' দুই ধরনের ত্রিশটি মিসাইল বানিয়ে ফেলে। এদের মধ্যে কুড়িটি মিসাইল মিশরের জাতীয় পতাকা জড়িয়ে কায়রোর রাজপথে দেখানো হয়।

তিন

মোসাদপ্রধান ইশার হ্যারেলের কাছে একটি চিঠি এসেছে। অধ্যাপক ডক্টর উলফ গ্যাং পিলৎস চিঠিটি লিখেছেন 'ফ্যাক্টরি-৩৩৩'-এর পরিচালক কামিল আজবের উদ্দেশ্যে। গুপ্তচররা সেই চিঠি উদ্ধার করে তুলে দেন হ্যারেলের হাতে। গুরুত্বপূর্ণ ওই চিঠি নিয়ে ১৯৬২ সালের ১৬ই আগস্ট হ্যারেল দেখা করেন প্রধানমন্ত্রী বেনগুরিয়নের সাথে। এই চিঠির সূত্র ধরেই ইজরাইল বুঝতে পারে, নয়শোর মতো মিসাইল বানাচ্ছে মিশর। এটা ইজরাইলের জন্য ছিল আরেকটা ধাক্কা। ইজরাইলি কর্তা-ব্যক্তিদের তখন মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। মোসাদপ্রধান আশঙ্কা করেন, নাৎসি আমলের জার্মান বিজ্ঞানীরা প্রতারণার মাধ্যমে ইজরাইলকে ধ্বংস করতে চায়। প্রধানমন্ত্রী বেনগুরিয়ান, পররাষ্ট্রমন্ত্রী গোল্ডামেয়ার ও মোসাদপ্রধান ইশার হ্যারেল তেলআবিবে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়– যে করেই হোক মিসাইল প্রজেক্টে কাজ করা জার্মান বিজ্ঞানীদের কায়রো থেকে ফেরাতে হবে, কিন্তু কীভাবে?

ইশার চেয়েছিলেন শক্তি প্রয়োগ বা গুপ্তহামলা চালিয়ে এর সমাধান করতে। বাধ সাধলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী শিমন প্যারেজ। তিনি বললেন, মোসাদের কথামতো এগোলে জার্মানদের কাছ থেকে বিনামূল্যে প্রতিশ্রুত ট্যাংক, কামান, হেলিকপ্টার ও যুদ্ধবিমান পাওয়া যাবে না। ইহুদি রাজনীতিকরা জার্মান চ্যান্সেলরের সঙ্গে কথা বলে কূটনৈতিক উপায়ে সমস্যা সমাধানের তাগাদা দিলেন; যদিও মোসাদপ্রধান নিজ সিদ্ধান্তে সন্ত্রাসবাদের রাস্তা ধরেন। ইশার ভাবলেন– জার্মান বিজ্ঞানীদের ছাড়া প্রজেক্ট কন্টিনিউ করতে পারবে না মিশর। তাই পরিকল্পনা করলেন– হয় জার্মান বিজ্ঞানীদের কিপন্যাপ করতে হবে, নতুবা দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে হবে।

কিন্তু মোসাদের প্রতিদ্বন্দ্বী আরেক গোয়েন্দা সংস্থা 'আমান'-প্রধান মেজর জেনারেল মেইর অমিত ভাবছেন, জার্মান বিজ্ঞানীদের এত গুরুত্ব দেওয়ার দরকার। তারা বড়ো কোনো হুমকি নয়। তিনি বললেন– 'মিশরীয় প্রজেক্টের ব্যাপারটা আমানের ইউনিট-১৮৮কে দেওয়া হোক। আমরা এটা অঙ্কুরেই বিনাশ করে দেবো।' প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল, কে কত জার্মান বিজ্ঞানী মারতে পারে– মোসাদ না আমান?

আমানের ১৮৮ ইউনিটের প্রধান একটি বিতর্কিত প্রস্তাব সামনে নিয়ে আসেন। ইউসেফ ইয়ারিভ সিদ্ধান্ত নিলেন, পত্রবোমায় জার্মান বিজ্ঞানীদের শায়েস্তা করবেন। ডক্টর উলফ গ্যাং পিলৎসকে প্রধান টার্গেট বানানো হয়। পিলৎসের সেক্রেটারির দায়িত্বে তখন হ্যানিলোর ওয়েন্ডি। পিলৎ প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন বার্লিনে থাকা স্ত্রীকে ডিভোর্স দিয়ে ওয়েন্ডিকে বিয়ে করার। ইজরাইলি গোয়েন্দারা এই তথ্য জেনে যায়। ডিভোর্সের আইনি প্রক্রিয়া সারতে হামবুর্গের এক আইনজীবীকে পরামর্শক নিয়োগ দিয়েছিলেন পিলৎসের স্ত্রী। ওই আইনজীবীর কাছ থেকে চিঠি যাওয়ার কথা পিলৎসের কাছে। এই সুযোগটাই কাজে লাগালো ইহুদি এজেন্টরা।

চার

১৯৬২ সালের ২৭ নভেম্বর হামবুর্গ থেকে পিলৎসের ঠিকানায় ৩৩৩ ফ্যাক্টরির অফিসে একটি চিঠি আসে। প্রেরক হিসেবে উল্লেখ করা হয় হামবুর্গের বিশিষ্ট একজন আইনজীবী। পিলৎস কায়রোতে অবস্থান করলেও সেদিন কারখানায় ছিলেন না। তার সেক্রেটারি ওয়েন্ডি খামটি খোলা মাত্রই বিস্ফোরণ ঘটে। ওয়েন্ডির কয়েকটি আঙুল আলগা হয়ে যায়, এক চোখ পুরোপুরি অন্ধ ও আরেকটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মাঁড়ি থেকে কয়েকটি দাঁত পড়ে বিকৃত হয়ে যায় পিলৎসের হবু বউয়ের মুখমণ্ডল ও চেহারা।

২৮ নভেম্বর আরও একটি প্যাকেট এলো ৩৩৩ ফ্যাক্টরির ঠিকানায়। প্যাকেটে লেখা ছিল বই। এক মিশরীয় ক্লার্ক সতর্কতার সাথে সেটি খুললেন। আবার বিস্ফারণ, সাথে সাথে নিহত হয় পাঁচজন। জার্মানি ও মিশরের ভেতর থেকে এ রকম আরও প্যাকেট আসতে থাকে। হতাহতের সংখ্যাও বাড়ছিল। ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত ইশারের নির্দেশে অপারেশন নেটওয়ার্ক কায়রো থেকে জার্মানি নিয়ে গেল মোসাদ।

পিলৎসের পর হ্যারেলের হিটলিস্টে ছিলেন ডক্টর হেনস ক্লেইনওয়াচার। মিশরীয় মিসাইলের গাইডেন্স সিস্টেম ডেভেলপের জন্য ইউরোপে একটি কার্যালয় ভাড়া করে দেওয়া হয়েছিল ক্লেইনওয়াচারকে। হ্যারেল শিনবেতের আলোচিত বার্ড ইউনিটকে অপারেশনের জন্য ইউরোপে পাঠালেন। হ্যারেলের আদেশ ছিল– তাকে ইজরাইলে তুলে নিয়ে আসতে হবে আর যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে মেরে ফেলতে হবে।[৭৪]

[৭৪]. Rise and Kill First: The Secret History of Israel's Targeted Assassinations, Ronen Bergman, page-70

যদিও পরে বার্ড ইউনিটকে বাদ দিয়ে আইজ্যাক শামিরের কমান্ডে থাকা মোসাদের একটা টার্গেট কিলিং ইউনিটকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়।

২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৩। কয়েক সপ্তাহ ধরে জার্মানিতে আছেন মিসরের ৩৩৩ ফ্যাক্টরির গাইডেড বিশেষজ্ঞ ডক্টর ক্লেইনওয়াচার। সুইস সীমান্তঘেঁষা লোয়েরাখ অঞ্চলে নিজের ল্যাবরেটরিতে কাজ শেষে একটি সরু গলি দিয়ে গাড়িযোগে ফিরছেন বাসায়। হঠাৎ কালো একটি মার্সিডিজ পথ আগলে ধরে। গাড়ি থেকে একজন লোক নেমে ক্লেইনওয়াচারের দিকে এগোতে থাকে। আগত ব্যক্তিটি ক্লেইনওয়াচারের কাছে জানতে চান ডক্টর সেনকার কোথায় থাকে। উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই লোকটি রিভলবার দিয়ে ক্লেইনকে গুলি করে পালিয়ে যায়। অবশ্য বেঁচে যান এই জার্মান বিজ্ঞানী। আততায়ী পালিয়ে যাওয়ার সময় মিশরকে বিপদে ফেলতে সে দেশের গোয়েন্দা বাহিনীর প্রধান কর্নেল আলি সামির পাসপোর্ট ফেলে যায়। সামির তখন কায়রোতে। খবরের কাগজগুলো লিখল এ কাজ মোসাদের! ক্লেইনওয়াচারকে হত্যাচেষ্টার মিশনে অংশ নেওয়া মোসাদ সদস্যের নাম আকিভা কোহেন। সে ইরগুনের সাবেক গুপ্ত ঘাতক। তার সহযোগিতায় ছিল জাভি আহারনি নামের আরেকজন। ক্লেইনওয়াচারকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়েছিলেন কোহেন। সৌভাগ্যক্রমে সেই গুলি গাড়ির গ্লাসেই আটকে যায়। ততক্ষণে রাস্তায় নেমে নিজের পিস্তল তাক করে ধাওয়া শুরু করেন ঘাতকদের। দৌড়ে পালায় মোসাদের ঘাতকদল।

পাঁচ

মোসাদের এবারের টার্গেট সুইজাল্যান্ডের জার্মান বংশোদ্ভূত বিজ্ঞানী ডক্টর পল গোয়েরকে হত্যা করা। তিনিও মিশরের মিসাইল প্রজেক্টে কাজ করেন। পলের নাগাল পাওয়ার জন্য মেয়ে হেইদিকে তুরুপের তাস বানানো হয়। হেইদির বসবাস সুইস সীমান্তের কাছে। ক্লেইনওয়াচারের ওপর হামলার পর ডক্টর জোকলিক, হেইদিকে ফোন করে বলেন– তার বাবার সাথে জোকলিকের মিশরে দেখা হয়েছে, সেখানে তিনি ইজরাইল ধ্বংসের জন্য মারাত্মক সব অস্ত্র বানাচ্ছেন। জোকলিক হেইদিকে হুঁশিয়ার করেন, তার বাবা ওই কাজ থেকে না ফিরলে জীবনহানির আশঙ্কা আছে। তার ভাষায়– 'তুমি যদি তোমার বাবাকে ভালোবাস, তাহলে শনিবার দোসরা মার্চ বিকেলে বেজেলের থ্রি কিংস হোটেলে দেখা করো।' হেইদি বিষয়টি সাবেক নাৎসি কর্মকর্তা এইচ মানকে জানিয়ে দেয়। এইচ মান মিসরের অস্ত্র প্রকল্পে নিয়োজিত বিজ্ঞানীদের দেখভাল করতেন। জোকলিকদের পিছু নিল সুইস পুলিশ। থ্রি কিংস হোটেলে যখন হেইদি ও জোকলিকের মধ্যে বৈঠক চলছিল, তখনও পুলিশ তাদের ফলো করছিল। আলোচনার টেবিলে আগে থেকেই টেপরেকর্ডার সংযুক্ত করা ছিল। সবই জানতেন হেইদি; জোকলিকরা এসব ধারণাও করতে পারেননি।

বৈঠক হলো, জোকলিক ও মোসাদ গোয়েন্দারা হেইদিকে কায়রোর একটি বিমান টিকেট দিতে চাইলেন, যাতে তিনি তার বাবাকে বুঝিয়ে জার্মানিতে নিয়ে আসেন। সাদা পোশাকের পুলিশ হেইদির সঙ্গে বৈঠকে অংশ নেওয়া জোকলিক ও অপর মোসাদ গোয়েন্দা বেন গালকে ফলো করতে থাকে। স্টেশনে ট্রেনের জন্য অপেক্ষারত জোকলিক গ্রেফতার হন সাদা পোশাকের পুলিশের হাতে আর বেনগালকে আটক করা হয় ইজরাইলি কনস্যুলেটের কাছ থেকে।

গ্রেফতারের দিনই ওই দুজনকে প্রত্যর্পণ করার অনুরোধ জানায় জার্মান পুলিশ। হেইদিকে ভয়ভীতি প্রদর্শন ও ক্লেইনওয়াচারের ওপর হামলায় অংশ নেওয়ার অভিযোগ আনা হয় তাদের বিরুদ্ধে। এদিকে মোসাদপ্রধান ইসার হ্যারেল বেনগাল ও জোকলিককে ছেড়ে দিতে সুইস কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানায়। কিন্তু জার্মানির অ্যাক্সট্রাডিশন অনুরোধের কারণে এটা সম্ভব নয় বলে জানায় সুইস সরকার। দুই মাস সাজা ভোগের পর বেরিয়ে যান বেনগাল ও জোকলিক।

ছয়

এবার অট্টো স্করজেনিকে টার্গেট করা হয়। তবে হত্যা নয়, তার সহযোগিতার দরকার পড়েছিল এইচমানকে ধরতে। স্করজেনি ছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলারের পছন্দের ব্যক্তি ও স্পেশাল অপারেশন কমান্ডার। নাৎসিবিরোধী ইতালি সরকার মুসোলিনিকে জেল দিয়েছিল। ক্যাপ্টেন স্করজেনি মুসোলিনিকে উদ্ধার করে হিটলারের সামনে নিয়ে এসেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্যারাসুট দিয়ে ইরানে নেমেছিলেন স্করজেনি; স্থানীয় উপজাতিদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন মিত্রশক্তির কাজে ব্যবহার করা তেল সরবরাহের পাইপ উড়িয়ে দিতে। চার্চিল, স্ট্যালিন আর রুজভেল্টকেও খুন করার ছক একেছিলেন স্করজেনি। মুসোলিনিকে উদ্ধার করাসহ এ রকম আরও অনেক সফল অপারেশনের জন্য তাকে ইউরোপের সবচেয়ে ভয়ংকর মানুষ হিসেবে খেতাব দেওয়া হয়েছিল। স্ত্রীর মাধ্যমে ফাঁদে ফেলে তাকে বাগে আনতে পেরেছিল মোসাদের জার্মান শাখার প্রধান আব্রাহাম ও রাফি এইতান।

এই স্করজেনির হাতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অসংখ্য ইহুদি খুন হয়েছিল। জার্মান বিজ্ঞানীদের ডাটা ও মিশরের মারণাস্ত্র প্রকল্পের সবশেষ খবর মোসাদের হাতে পৌঁছে দিলেন স্করজেনি। তবে শর্ত ছিল– প্রতিদান হিসেবে অর্থ দিতে হবে, একটি অস্ট্রিয়ান পাসপোর্ট করে দিতে হবে আর তার অতীত কর্মকাণ্ডের জন্য বিচার করা হবে না এই গ্যারান্টি দিতে হবে। সবই করা হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী লেভি এশকলের সহায়তায়। তিনি এসব শর্ত অনুমোদন করেছিলেন।

ইজরাইল নাৎসি নেতাদের ধরতেও নানা রকম অপারেশন চালিয়েছিল। অ্যাডলফ আইখম্যান ছিলেন এ রকমই এক অপারেশনের শিকার। হিটলারের ইহুদি নিধন প্রজেক্টের

অন্যতম হোতা আইখম্যানকে ১৯৬০ সালে আর্জেন্টিনার বুয়েন্স আয়ারস থেকে তুলে ইজরাইলে নিয়ে এসেছিল মোসাদ এজেন্টরা। আইখম্যান নিজের আসল পরিচয় লুকিয়ে রিকার্ডো ক্লেমেন্টে নামে প্রায় দশ বছর ধরে আর্জেন্টিনায় বসবাস করছিলেন। তাকে জেরুজালেমে বিচার করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। পবিত্র নগরীর কেন্দ্রীয় স্কয়ারে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যার পর তার দেহ আগুনে পুড়িয়ে দেহাবশেষ সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়।

সাত

মোসাদ যেভাবে মিশরীয় প্রকল্পের তথ্য তুলে ধরে উত্তেজনা তৈরি করেছিল, তার বিরোধিতায় নেমেছিল আরেক ইহুদি গোয়েন্দা সংস্থা আমান, যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলল, মিশরে জার্মান বিজ্ঞানীরা যেসব মারণাস্ত্র বানাচ্ছে, সেগুলো মাঝারি মানের। ইজরাইলের সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান জেনারেল মেইরও অনরূপ অভিমত দিলেন।

আমানের রিপোর্ট হাতে পান বেনগুরিয়ান। ডাকলেন মোসাদপ্রধান হ্যারেলকে। তার কাছে মোসাদের প্রতিটি সংবাদের উৎস ও ব্যাখ্যা জানতে চান ইজরাইলের প্রধানমন্ত্রী। মোসাদপ্রধান জানান, মিসরের বিষাক্ত গ্যাস কিংবা নিকেলের তৈরি বোমা বানানোর ব্যাপারে তার কাছে তথ্য নেই। পরদিন আমানপ্রধান প্রধানমন্ত্রীকে আরও বলেন, মিশরের কর্মকাণ্ড বিপজ্জনক বটে, কিন্তু ইজরাইলি শাসকদের যেভাবে আতঙ্কিত করা হয়েছে– সে রকম কিছু নয়।

এদিকে জার্মান সরকারও জেনে যায়, তাদের বিজ্ঞানীদের বিরুদ্ধে ইজরাইলি বাহিনীর গুপ্তহত্যার মিশন সম্পর্কে। তারা ইজরাইল সরকারকে আশ্বাস দেন, জার্মান বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞরা কায়রো ছেড়ে চলে আসবে। সম্পর্ক খারাপ হতে থাকল ইজরাইল ও জার্মানির। এসব ঘটনায় বিরক্ত বেনগুরিয়ান তলব করলেন মোসাদপ্রধানকে। দুজনের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হলো। জার্মানির সঙ্গে ইজরাইলের সম্পর্ক খারাপ হওয়ার প্রসঙ্গ তোলেন বেনগুরিয়ান। ১৯৬৩ সালের ২০ জুন পদত্যাগপত্র জমা দেন মোসাদপ্রধান ইশার হ্যারেল। জুন শেষে মোসাদের নতুন প্রধান হন জেনারেল মেইর অমিত। ইশারের বন্ধু অমিতও সন্ত্রাসবাদের পথেই হাঁটলেন।

আট

ফ্যাক্টরি-৩৩৩-এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন ডক্টর জোসেফ আইজিং। তার কাছে এলো এক চিঠি। চিঠির মূলকথা– 'দ্রুত কায়রো ছাড়ুন।' আরেক বিজ্ঞানী ডক্টর কিরমায়ার, তিনি এসব উড়োচিঠিকে গুরুত্বই দেননি। ১৯৬৩ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর তার কাছেও এলো এক উড়োচিঠি। পত্র খোলামাত্র মাথা থেকে আলাদা হয়ে গেল দেহ। সেপ্টেম্বর শেষে দেখা গেল– ডক্টর উলফ গ্যাং পিলৎসসহ প্রায় সব জার্মান বিজ্ঞানী কায়রো ছেড়ে চলে গেছেন।

মিশরীয়দের আরেকটা প্রকল্পের নাম ছিল ক্লিওপেট্রা। এই প্রকল্পের অধীনে দুটো পরমাণু বোমা বানানোর কথা ছিল, যেগুলো মিসাইলের ওয়ারহেডে সংযুক্ত করা যাবে। দায়িত্বে ছিলেন ডক্টর অট্টো জোকলিক। অস্ট্রিয় এই বিজ্ঞানী পরমাণু রেডিয়েশনে বিশেষভাবে দক্ষ ছিলেন। জোকলিকের জন্য তেজস্ক্রিয় পদার্থ কিনতে অস্ট্রিয়ায় একটি ফ্রন্ট অফিস খোলে মিশর সরকার। জোকলিক চেয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বা ইউরোপ থেকে ২০ ভাগ সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম কিনে জার্মানি ও হল্যান্ডে তা আরও সমৃদ্ধ করে বিশেষ পরমাণু শক্তিতে রূপান্তর করতে। এ ক্ষেত্রে জার্মানি ও হল্যান্ডের তিনজন বিজ্ঞানীকে তিনি তালিকাভুক্ত করেন। আর ওই সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম দিয়েই বানানো হবে পরমাণু বোমা, তবে জোকলিকের ফর্মূলাকে অনেকেই ভুল বললেন। তারা বললেন– ২০ ভাগ সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম পাওয়া কঠিন ব্যাপার।

২৩ অক্টোবর, ১৯৬২। ইউরোপে ইজরাইলি দূতাবাসের কলিং বেলটিপে এক লোক নিরাপত্তা কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলতে চাইলেন। তিনি বলে বসেন– 'আমিই অট্টো জোকলিক।' আগ বাড়িয়ে ইজরাইলকে মিশরীয় মারণাস্ত্রের তথ্য দিতে চাইলেন তিনি। মূলত মোসাদ তাকে খুঁজছিল। আর সে তথ্য আগেই হাতে পান জোকলিক। তাই নিজেই এসে ধরা দেন মোসাদের কাছে; চাইলেন নিরাপত্তা, বিনিময়ে মোসাদ পেল মিশরের পরমাণু বোমা প্রজেক্টের সব তথ্য। এরপর থেকে জোকলিক পরিণত হলেন মোসাদের গুরুত্বপূর্ণ এজেন্টে।

ইজরাইল যেভাবে সিরিয়ার পরমাণু প্রকল্প গুঁড়িয়ে দেয়

৫ সেপ্টেম্বর, ২০০৭।

সিরিয়ায় আঘাত হানতে প্রস্তুত আটটি ইজরাইলি যুদ্ধবিমান। এসব অ্যাটাক বিমানের সহায়তায় রাখা হয় আরও কিছু এয়ারক্রাফট। উড়ে যেতে হবে কয়েকশ মাইল। রাত সাড়ে দশটায় গন্তব্যের দিকে যাত্রা শুরু। র‍্যামন এবং হাটজেরিম বিমানঘাঁটি থেকে উড়তে শুরু করে যুদ্ধবিমানগুলো। ভূমধ্যসাগরের তীরঘেঁষে উত্তর দিক দিয়ে উড়ে গিয়ে সিরিয়ার পরমাণু প্রকল্পে আঘাত হানার পরিকল্পনা করা হয়। তবে বহরে থাকা বেশিরভাগ বিমানকেই প্রথমে সিরিয়া-তুরস্ক সীমান্তে যেতে বলা হয়। পরে সেখান থেকেই দেইর আল জোরের পরমাণু প্রজেক্টের দিকে বিমানগুলো অগ্রসর হয়। ফোরাত নদীর তীর থেকে পশ্চিমে এক কিলোমিটারেরও কম দূরত্বে আল কিবার নামক স্থানে গড়ে তোলা হয়েছিল পরমাণু স্থাপনাটি। পথিমধ্যে সিরিয়ার একটি রাডারব্যবস্থা ধ্বংস করতে সক্ষম হয় ইজরাইলি পাইলটরা।

গোপনীয়তার স্বার্থে সমুদ্রপৃষ্ঠের মাত্র ১০০ মিটার ওপর দিয়ে উড়ে যায় বিমানগুলো। পাইলটরা পূর্বসিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিজেদের মধ্যকার আন্তঃযোগাযোগ বন্ধ রাখেন। প্রতিটি বিমানকেই আলাদা আলাদাভাবে সেন্ট্রাল কমান্ডের সাথে যোগাযোগ কন্টিনিউ করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

পাইলটদের মনে ছিল 'গ্রাউন্ড টু এয়ার' মিসাইল আক্রমণের ভয়, যদিও পুরো অপারেশনই ছিল নিঝর্ঞ্ঝাট। প্রতিটি বিমান থেকে ছুড়ে ফেলা হলো দুটি করে বোমা। এমন নির্দেশনা আগেই ছিল। বোমার আঘাতে বড়ো ধরনের ঝাঁকুনি তৈরি হয় ঘটনাস্থল ও তার আশপাশে। ভবনের বিভিন্ন অংশ খসে পড়ল, প্রকল্প কাঠামোগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ হলো। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল পুরো এলাকা।

মাত্র দু-তিন মিনিটেই অপারেশন শেষ করে ইজরাইল অভিমুখী বিমানগুলো ফিরে চলল। পেছনে রেখে গেল ধ্বংসযজ্ঞের চিহ্ন। অপারেশনস্থলে ছুটে যাওয়া আর কাজ শেষ করে ফিরে আসা পুরো ঘটনা যেন হাল আমলের কোনো হলিউড সিনেমার চিত্রায়ন। বিমানগুলোকে শত শত মাইল পাড়ি দিতে হয়েছে। কোথাও কোথাও আবার সিরীয় বিমান প্রতিরক্ষাব্যবস্থা বসানো ছিল, রাডার বসানো ছিল। রাডারের চোখ ফাঁকি দিতেই অপেক্ষাকৃত কম উচ্চতা দিয়ে উড়ে যায় বিমানগুলো। এমনটা করা হয়েছিল ওসামা বিন লাদেনের বেলায়ও। ইউ এস নেভি সিলের সদস্য বহনকারী হেলিকপ্টারগুলো সেদিন খুবই কম উচ্চতায় আফগান ভূখণ্ড পেরিয়ে পাকিস্তানের অ্যাবটোবাদে ঢুকে পড়েছিল।

অপারেশন শেষ না করা পর্যন্ত বিমানের পাইলটরা নিশ্চুপ ছিলেন। কেউ কারও সাথে কোনো কথা বলেননি। পরমাণু প্রকল্পে নিখুঁত হামলার পরপরই নিজেদের মধ্যে যোগাযাগ শুরু করেন পাইলটরা। তারা একে অন্যকে সাকসেসফুল অপারেশনের তথ্য জানান। তেলআবিবের নিয়ন্ত্রণ কক্ষে অপারেশনে অংশ নেওয়া একটি এফ-১৬ বিমান থেকে বার্তা যায়, 'Arizona' মানে অপারেশন সফল![৯৫] ধীরে ধীরে অ্যাটাক বিমানের আটটি থেকেই নিখুঁত আঘাত হানার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। পাইলটরা যখন সফল অপারেশনের খবর নিয়ন্ত্রণ কক্ষে পৌছে দেন, তখন রাত ১২ টা ২৫ মিনিট। ইজরাইলের স্থানীয় সময় ৬ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার।

ইজরাইলি কর্নেল আমির, যিনি এই অপারেশনে অংশ নিয়েছিলেন তিনি বলছিলেন- 'অপারেশন শেষ করে আমরা সবাই উত্তেজনায় লাফালাফি করছিলাম, ঠিক যেমন হলিউড সিনেমার মতো।'

---

৯৫. No Longer a Secret: How Israel Destroyed Syria's Nuclear Reactor, Mar 23, 2018, www.haaretz.com.

রাত দেড়টার দিকে বিমানগুলো ইজরাইলে ফিরতে সক্ষম হয়। কর্নেল আমিরের ভাষ্য–

> 'আমরা ধারণা করেছিলাম, আমাদের এই অপারেশনের কথা জনসম্মুখে প্রকাশ করা হবে। সিরিয়া পালটা জবাব দেবে এবং এভাবেই হয়তো একটা যুদ্ধের সূচনা হবে। আমাদের বিমানটি যখন হাটজেরিম ঘাঁটির আন্ডারগ্রাউন্ড হ্যাঙারে এসে পৌঁছাল, ঘাঁটির কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শেলি গাটম্যান সেখানে আগে থেকেই হাজির ছিলেন। কমান্ডার আমাদের জড়িয়ে ধরলেন এবং অভিনন্দন জানালেন। আর্মিতে কমান্ডার শেলি একজন গম্ভীর প্রকৃতির কর্মকর্তা হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। তিনি এর আগে কখনো কোনো অনুষ্ঠানে আমায় এভাবে জড়িয়ে ধরেছিলেন কি না মনে নেই, অথচ সেদিন তিনি ছিলেন বেশ হাসিখুশি। বললেন– "তোমরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছ।"'

ইজরাইলি এয়ারফোর্সের কমান্ডার Eliezer Shked ও অভিযান সম্পর্কে বলেন–

> 'যখনই শুনলাম, আমাদের বিমানগুলো অভিযান শেষ করে নিরাপদ দূরত্বে চলে এসেছে, তখনই আমি কমান্ড পোস্ট থেকে বের হয়ে আসি। আমি এহুদ ওলমার্টের (সাবেক ইজরাইলি প্রধানমন্ত্রী) কাছে গেলাম। আমরা দুজনই উত্তেজিত ছিলাম এবং একে অপরকে জড়িয়ে ধরলাম। আমি ওলমার্টকে বললাম, বিমানবাহিনীকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তা তারা ঠিকমতো পালন করতে পেরেছে।'

এ ঘটনার পর ওলমার্টের এক সহযোগী তাকে মজা করে বলেছিলেন–

> 'আপনি এখন পদত্যাগ করতে পারেন। কারণ, ইজরাইলের জনগণের জন্য যা করার দরকার ছিল, তা আপনি করে ফেলেছেন।'

তবে একটা বিপত্তি দেখা দিয়েছিল। আক্রমণ শেষে ঘাঁটিতে ফেরার পথে জ্বালানি বাঁচানোর পাশাপাশি ওজন কমাতে একটি বিমান থেকে খালি একটি ট্যাংকার ছুড়ে ফেলা হয়। এই ট্যাংকার গিয়ে পড়ে সিরিয়া-তুরস্ক সীমান্তের তুর্কি অংশে। এতে দুটি সমস্যা হলো। প্রথমত, ট্যাংকারের গায়ে হিব্রু ভাষায় লেখাযুক্ত ছবি থাকায় এ অঞ্চল দিয়ে ইজরাইলি বিমান উড়ে যাওয়ার চিহ্ন থেকে গেল। দ্বিতীয়ত, তুরস্কের সঙ্গে বিব্রতকর পরিস্থির তৈরি হলো। রেজেপ তাইয়্যিপ এরদোয়ান তখন তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী থাকলেও ইজরাইলের সাথে দেশটির উষ্ণ সম্পর্ক ছিল। তুরস্কের সার্বভৌমত্ব তাতে ক্ষুণ্ন হয়নি– এমন আশ্বাস দিতে সে দেশে ছুটে যান খোদ ইজরাইলি গোয়েন্দাপ্রধান Yadlin। তুরস্ক এতে কিছুটা অখুশি হলেও সংকট বেশি দূর এগোয়নি। কারণ, সিরিয়া পরমাণু শক্তির অধিকারী হলে প্রতিবেশী তুরস্কের জন্যও একটা হুমকি তৈরি হতো। ২০১৮ সালের মার্চে ইজরাইল আনুষ্ঠানিকভাবে সিরিয়ার পরমাণু প্রকল্প ধবংস করার কথা স্বীকার করে নেয়।[৯৬]

---

৯৬. Israel admits striking suspected Syrian nuclear reactor in 2007, 21 March 2018, BBC.

মোসাদ যেভাবে সিরিয়ার পরমাণু প্রকল্পের সন্ধান পায়

১৯ ডিসেম্বর, ২০০৩। সকালবেলা। রেডিও শুনছেন মোসাদের গোয়েন্দা শাখার প্রধান আমনন সুফরিন। হঠাৎ একটি খবরে চমকে যান আমনন। খবরটি লিবিয়াকে নিয়ে। যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন লিবিয়াকে পরমাণু কার্যক্রম বন্ধে চাপ দিচ্ছে। আট মাস ধরে তারা লিবিয়ার সাথে দেন-দরবার করে যাচ্ছে। এমন খবরে রীতিমতো উদ্‌বেগ ফুটে উঠে আমননের চেহারায়। দেরি করেননি এই মোসাদ কর্মকর্তা। পরদিনই নিজের অফিসে ডেকে পাঠান সহকর্মী ও জুনিয়রদের। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বলেন– 'লিবিয়ার পরমাণু কার্যক্রম সম্পর্কে কোনো ধারণা না থাকা আমাদের প্রথম ব্যর্থতা। আর দ্বিতীয় ব্যর্থতা হচ্ছে পশ্চিমাদের সাথে এ নিয়ে লিবিয়ার আলাপ-আলোচনার বিষয়টি না জানা– যা কিনা আট মাস ধরে চলছে।'

আড়মোড়া ভেঙে সক্রিয় হয় মোসাদ। লিবিয়ার মতো আর কোন কোন দেশ গোপনে এই কার্যক্রম চালাচ্ছে– সেটাই এখন খুঁজে বের করা তাদের গুরুদায়িত্ব। দেড় মাসের অনুসন্ধানের পর সিরিয়ায় অনুরূপ একটি প্রকল্প সম্পর্কে তথ্য পায় মোসাদের গবেষণা ইউনিট। ২০০৪ সালের ফেব্রুয়ারির দিকে তারা বেশ কিছু নথিপত্র হাজির করে মোসাদপ্রধান মেইর দাগানের কাছে। তবে এ নিয়ে সংশয়ে ছিলেন মোসাদপ্রধান। কারণ, এসব নথিপত্র সিরিয়া পরমাণু কার্যক্রম চালাচ্ছে– এমনটা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট ছিল না।

তবে মোসাদ বসে থাকেনি। তারা ঠিকই প্রকল্প এলাকা খুঁজে বের করে ফেলে। সিরিয়া এই প্রকল্পটি চালু করেছিল দেইর আল জোরের মরুভূমিতে আল কিবার এলাকায়। এটি ইউফ্রেটিস তথা ফোরাত নদীর তীর থেকে পশ্চিমে মাত্র এক কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত। স্যাটেলাইট ছবি বিশ্লেষণ করে তারা এই প্রকল্পের অবস্থান বের করতে সক্ষম হন বলে জানান ইজরাইলের সামরিক গোয়েন্দাপ্রধান।

আমনন বলেন–

> 'পরমাণু চুল্লিটির ওপর উত্তর কোরিয়া ও সিরিয়ার কর্মকর্তারা যে কাঠামো দাঁড় করিয়েছেন, তাতে বাইরে থেকে এটিকে কারখানা মনে হতো। আমরা সন্দেহ করতে থাকলাম যে, প্রকাশ্য দিবালোকে একটি পরমাণু রিঅ্যাক্টরকে আড়াল করা হচ্ছে।'

যে জায়গায় প্রকল্পটি গড়ে তোলা হয়, সেখানে মানুষের খুব একটা আনাগোনা ছিল না। যারাই সেখানে যেতেন, বেশিরভাগই মোটর সাইকেল ব্যবহার করতেন। প্রকল্প এলাকার চারপাশে না ছিল কোনো বেড়া, না ছিল কোনো নিরাপত্তারক্ষী। এ ছাড়া সম্ভাব্য বিমান হামলা ঠেকাতে গ্রাউন্ড টু এয়ার মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেম বসানোর ব্যাপারটিও মাথায় রাখেনি সিরিয়া কর্তৃপক্ষ। হয়তো ভেতরে যে বৃহৎ কর্মযজ্ঞ চলছে– সেটা আড়াল করাই ছিল তাদের লক্ষ্য।

জানুয়ারি, ২০০৭।
স্যাটেলাইট ছবি বিশ্লেষণ করে ইজরাইলি গোয়েন্দারা একটি পাইপলাইনের সন্ধান পায়। এই পাইপলাইন প্রকল্প এলাকা থেকে ফোরাত নদী অভিমুখে গেছে। গোয়েন্দারা বুঝতে পারে, প্রকল্পটিতে কুলিং সিস্টেম রয়েছে– যা পরমাণু রিঅ্যাক্টরের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সন্দেহ আরও বাড়ল।

মার্চ, ২০০৭।
আন্তর্জাতিক আনবিকশক্তি সংস্থা আইএই-এর একটি কনফারেন্সে যোগ দিতে অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা গেছেন সিরিয়ার আণবিকশক্তি কমিশনের প্রধান ইবরাহিম ওতমান। তাকে আগে থেকেই ফলো করছে মোসাদের একটি দল। নিজের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে ইবরাহিম কনফারেন্সে যোগ দিতে গেলে মোসাদের চররা তার রুম ভেঙে ঢুকে পড়ে। এই সিরীয় কর্মকর্তার ব্যক্তিগত কম্পিউটার থেকে গুরুত্বপূর্ণ নথি হাতিয়ে নেয় মোসাদ এজেন্টরা। এসব নথি ইজরাইলে পৌছালে রীতিমতো আঁতকে উঠেন নীতি-নির্ধারকরা। তারা ৩৫টি ছবি পায়, যেগুলো রি-অ্যাক্টরের ভেতর থেকে তোলা। ছবিতে কোরীয় ও সিরীয় কর্মকর্তাদের একসঙ্গে কাজ করতে দেখা যায়। এরপরই ইজরাইল নিশ্চিত হয়– সিরিয়া পরমাণু প্রজেক্ট হাতে নিয়েছে।

মোসাদপ্রধান মেইর দাগান ছুটে যান ইজরাইলি প্রধানমন্ত্রী এহুদ ওলমার্টের কাছে। দাগান বলেন– 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, এখন আমরা কী করব?' ওলমার্টের জবাব– 'আমরা এটা ধ্বংস করে দেবো।'[৯৭]

ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর

ষাটের দশকের শেষভাগে জর্ডানে অবস্থান করা সশস্ত্র ফাতাহ কর্মীরা ক্ষমতাসীনদের কাছে দেখা দেয় উটকো ঝামেলা হিসেবে। ১৯৭০-র সেপ্টেম্বরে তারা ইহুদি যাত্রী বহনকারী বেশ কয়েকটি বিমান ছিনতাই করে নিয়ে আসে জর্ডানের ভূমিতে। বিমানগুলো থেকে লোকজন নামিয়ে দিয়ে বোমা মেরে উড়িয়ে দেয় ফাতাহ কর্মীরা। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে বিমান পুড়ে যাওয়ার সেই ছবি ফলাও করে প্রচার হয়। ইমেজ সংকটে পড়েন জর্ডানের বাদশাহ হোসেন বিন তালাল। জর্ডানের ওপর রাজপরিবারের নিয়ন্ত্রণ আছে কি না, এ নিয়ে উঠে প্রশ্ন। আসলেই তো, কারা চালাচ্ছে জর্ডান?

বাদশাহ ভাবলেন– আরাফাত ও তার লোকজন জর্ডানে এমনভাবে চলাফেরা করছে, কার্যক্রম চালাচ্ছে, যাতে মনে হতে পারে দেশটা তাদের। বহিরাগতদের দ্বারা

---

৯৭. No Longer a Secret: How Israel Destroyed Syria's Nuclear Reactor, Mar 23, 2018, www.haaretz.com.

ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার টেনশন তাকে পেয়ে বসে। ক্ষুব্ধ হোসেন সেপ্টেম্বরে জর্ডানি সেনা, পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে আরাফাতের বাহিনীর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেন। এই অপারেশনে জর্ডানে আশ্রয় নেওয়া কয়েক হাজার ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী/ ফেদাইন মিলিশিয়া নিহত হয়। পিএলও তার কার্যক্রম জর্ডান থেকে লেবাননে সরিয়ে আনে। এই ঘটনা ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর হিসেবে পরিচিত ফিলিস্তিনিদের কাছে। এর বদলা নিতে পরবর্তী সময়ে একই নামে একটি সংগঠনও গড়ে তোলা হয়, যার নেতৃত্বে ছিলেন সালাহ খালাফ। খালাফ ছিলেন পিএলও'র গোয়েন্দা শাখা 'রাশেদ'-এর কমান্ডার। ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের সদস্যরা ১৯৭১ সালের ২৮ নভেম্বর কায়রোতে জর্ডানের প্রধানমন্ত্রী ওয়াশফি আল তালালকে হত্যা করে। তিনি এক বছর আগে জর্ডানে ফাতাহর বিরুদ্ধে ক্র্যাকডাউনে ভূমিকা রেখেছিলেন।

১৯৭২ সালের জুলাইয়ের শুরুর দিকে ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের আটজন সদস্য লিবিয়ার মরুভূমির একটা ট্রেনিং ক্যাম্পে পৌছান। এই দলটি দেখভাল করছিলেন মোহাম্মদ ইউসেফ আল নাজার। নাজার ছিলেন ফাতাহর নিরাপত্তা বিভাগের কর্মকর্তা। এই আটজন সদস্যের ছিল বিশেষ বিশেষ গুণ। এদের কারও কারও যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ছিল, কেউ কেউ ইউরোপে বিশেষ করে জার্মানিতে বেশ পরিচিত ছিলেন। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন মোহাম্মদ মাশালহা। মাশালহা জার্মান ও ইংরেজি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তাকে গ্রুপটির মুখপাত্র করা হয় আর কোড নাম দেওয়া হয় 'ঈসা'।

লিবিয়ার মরুভূমিতে তারা ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের প্রতিষ্ঠাতা সালাহ খালাফ ওরফে আবু ইয়াদের সঙ্গে দেখা করেন। খালাফের বিশ্বস্ত সহযোগী মোহাম্মদ ওদেহ ওরফে আবু দাউদও তার সাথে ছিলেন। এই আবু দাউদ-ই ছিলেন জার্মানির মিউনিখ হামলার মূল পরিকল্পনাকারী। গ্রুপটিকে জানানো হয়– তারা একটি গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনে অংশ নিতে যাচ্ছেন। তবে কী অপারেশন তা গোপন রাখা হয়। কয়েক সপ্তাহ ধরে তাদের পিস্তল, সাবমেশিনগান চালানো, গ্রেনেড চার্জ ও হাতাহাতি লড়াইয়ের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়; শেখানো হয় ছদ্মবেশ ধারনের কৌশল।

গ্রুপ সদস্যদের সবারই আলাদা কোড নাম দেওয়া হয়, দেওয়া হয় লিবিয়ার ভুয়া পার্সপোর্ট। অপারেশন চলাকালে মুখ ঢেকে রাখতে বলা হয় আর বারবার পোশাক পরিবর্তনের নির্দেশনা দেওয়া হয়। ইজরাইলি গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এর কিছুই জানত না।

জুলাইয়ের সাত তারিখে মোসাদের এক ফিলিস্তিনি চর (কোড নাম লুসিফার) সতর্ক করে দেয় যে, ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর ইউরোপে ইজরাইলি স্বার্থে হামলা করতে যাচ্ছে। আগস্টের ৫ তারিখকে সম্ভাব্য হামলার দিন উল্লেখ করা হলেও লুসিফার বিস্তারিত কিছুই জানাতে পারেননি।

সেপ্টেম্বরের তিন ও চার তারিখে গ্রুপটির আটসদস্য আলাদা কয়েকটি ফ্লাইটে করে পশ্চিম জার্মানিতে পৌঁছায়। তারা সবাই মিউনিখে গিয়ে মিলিত হয়, সেখানে তখন অলিম্পিক চলছিল। অপারেশন শুরুর প্রাক্কালে মিউনিখের একটি রেস্টুরেন্টে পুরো পরিকল্পনাটি জানানো হয় সদস্যদের। চূড়ান্ত পরিকল্পনাটির কথা জানান খালাফের সহযোগী ওদেহ। তারা অস্ত্র ও বিস্ফোরক সংগ্রহ করেন, যা সুইডেন ও স্পেন থেকে চোরাই পথে আনা হয়েছিল।

টিম মেম্বাররা দেয়াল বেয়ে অলিম্পিক ভিলেজ-এর ভেতরে ঢুকে পড়েন– যেখানে ইজরাইলি ক্রীড়া প্রতিনিধি দলটি অবস্থান করছিল। সেখানে নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিল ৩২ জনের মতো পুলিশ সদস্য, তবে মাত্র দুজন ছিলেন সশস্ত্র। কারণ, জার্মানি একটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ রাখতে চেয়েছিল। আর তারা তো জানত না-কী ঘটতে যাচ্ছে।

৫ সেপ্টেম্বর ভোর চারটায় আঘাত হানে ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের সদস্যরা। একজন ইজরাইলি অ্যাথলেট পালিয়ে যেতে সক্ষম হন, কিন্তু মোশে উইনবার্গ নামের এক রেসলিং কোচ ও ইউসেফ রোমানো নামে আরেকজন ভারোত্তলক গুলিতে নিহত হন। বাকি নয়জনকে জিম্মি করা হয়। এদের ছেড়ে দেওয়ার বিনিময়ে ইজরাইলের কারাগার থেকে দুইশো ফিলিস্তিনি বন্দির মুক্তি চাওয়া হয়। এদিন সকালে গোল্ডামেয়ার নেসেটকে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেন।

ফিলিস্তিনি বন্দিদের মুক্তি দেওয়ার প্রস্তাব মানেনি ইজরাইল। তবে আপসরফার অংশ হিসেবে হেলিকপ্টারযোগে জিম্মি নয়জন ক্রীড়াবিদ ও গেরিলা দলটিকে জার্মানির একটি বিমানঘাঁটিতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাদের নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল মিশরের রাজধানী কায়রোতে, কিন্তু এরই মধ্যে হঠাৎ জার্মানি বাহিনী ফিলিস্তিনি গেরিলাদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। গেরিলারাও পালটা গুলি চালায়। এতে পাঁচ গেরিলা, একজন জার্মানি পুলিশ কর্মকর্তা ও নয়জন ইজরাইলি খেলোয়াড় মারা যান।

মিউনিখ অলিম্পিকে হামলার মূল পরিকল্পনাকারী আবু দাউদ মারা গেছেন ২০১০ সালের জুলাইয়ের দিকে। সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কের একটি হাসপাতালে তিনি মারা যান। ২০০৮ সালে বার্তা সংস্থা এপির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে দাউদ মিউনিখ অলিম্পিকে গেরিলা হামলার পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির দায় স্বীকার করেন। অবশ্য, ১৯৯৯ সালেই নিজের লেখা *প্যালেস্টাইন : ফ্রম জেরুজালেম টু মিউনিখ* বইয়ে এ হামলার পরিকল্পনা কথা স্বীকার করে নিয়েছিলেন দাউদ।[৯৮] মোসাদ এই অপারেশনের প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল, কিন্তু তাদের ভুল নিশানায় মারা যায় কিছু নিরপরাধ ব্যক্তি।

---

[৯৮]. রনেন বার্গম্যানের লেখা বই *রাইস অ্যান্ড কিল ফার্স্ট* অবলম্বনে, মিউনিখ অলিম্পিকে হামলার মূল পরিকল্পনাকারীর জীবনাবসান, *প্রথম আলো*, ৫ জুলাই, ২০১০

মোসাদের সুদান মিশন

৮০-এর দশকের একটি ঘটনা।

ওমর আল বশির তখনও সুদানের ক্ষমতায় আসেননি। লোহিত সাগরের তীরে মরুভূমিতে ছোট্ট একটি পর্যটন স্পট গড়ে তোলা হয়েছে, নাম- অ্যারোস। মরুভূমিতে চড়া ও সমুদ্রে সাতার কাঁটার জন্য এখানে রাখা হয় নানান উপকরণ। সাঁতারের পোশাক, মুখোশ, ডুবুরির জুতা দিয়ে ভরে ফেলা হয় রিসোর্টের গুদাম। কিন্তু এই রিসোর্টের মূলে যে মোসাদ, তা কেউ ভাবতেও পারেনি। ইউরোপীয় ব্যবসায়ী দলের ছদ্মাবরণে জায়গাটি লিজ নিয়েছিল তারা। ব্যবসায়ের আড়ালে এটি হয়ে উঠে মোসাদের একটি ফ্রন্টবেইজ।

এই রিসোর্টে হাজারখানেক লোক অবস্থান করতে পারত। পর্যটক আকর্ষণে কর্তৃপক্ষের ভরসা ছিল- চটকদার বিজ্ঞাপন। পশ্চিমের বিভিন্ন ট্রাভেল এজেন্সির মাধ্যমে বুকিং দেওয়া হতো। ফলে এখানে বিদেশি পর্যটকদের আনাগোনা ছিল বেশ ভালোই। কিন্তু মোসাদের কেন দরকার পড়ল- এ রকম একটি রিসোর্ট গড়ে তোলার?

রিসোর্টটি ছিল মোসাদের একটি মানবিক মিশনের অংশ। তারা সুদানের শরণার্থী শিবিরগুলোতে থাকা হাজার হাজার ইথিওপিয় ইহুদিকে ইজরাইলে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। তাদের রাষ্ট্রীয় নীতি- বিশ্বের সব ইহুদিকে ইজরাইলে নিয়ে আসা। ছোটো ছোটো নৌ-যানে করে ইহুদি শরণার্থীদের সুদান থেকে বের করে নিয়ে যেত মোসাদ এজেন্টরা। তারা এ ব্যাপারে এতটাই চুপ ছিল যে, নিজেদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও এই তথ্য শেয়ার করেনি।

ইথিওপিয়ার ইহুদিরা ছিল সারা বিশ্ব থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন। বসবাস করত পাহাড়ে পাহাড়ে আর উপত্যকায়। এরা বেটা ইজরাইল গোত্রের সদস্য, যাদের সত্যিকারের অতীত এখনও অজানা। অনেকে মনে করেন, এরা প্রাচীন ইজরাইলের তথাকথিত হারিয়ে যাওয়া ১০টি গোত্রের একটি অথবা কুইন অব শেবা (ইয়েমেনের রানি) এবং কিং সলোমনের একজন পুত্রের বংশধর, যিনি ইথিওপিয়ায় ফিরে গিয়েছিলেন। আরেক পক্ষের দাবি, ৫৮৬ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে তখনকার জেরুজালেম এলাকা থেকে এই ইহুদিরা ব্যাবিলন সম্রাটের আক্রমণের কারণে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। বেটা ইজরাইলিরা মনে করত, তারাই বিশ্বের একমাত্র জীবিত ইহুদি এবং তারা বাইবেলে বর্ণিত ধর্মীয় বিশ্বাসকে অবিকৃতভাবে পালন করে আসছেন। বাইরের বিশ্বে যেসব ইহুদি আধ্যাত্মিক নেতা বা র‍্যাবাই/রাব্বি ছিলেন, তাদের মতে- ইথিওপিয়ার ইহুদিরা প্রকৃত ইহুদি নন, তবে ১৯৭৩ সালে ইজরাইলের প্রধান রাব্বি ওভাদিয়া ইউসেফ ইথিওপিয়ার ইহুদিদের পরিপূর্ণ ইহুদি ঘোষণা দিলে তাদের ইজরাইলে নিয়ে আসার উদ্যোগ নেয় সে দেশের সরকার।

ইথিওপিয়ায় গৃহযুদ্ধ শুরু হলে ১৯৭৭ সালে অন্য অনেকের মতো ফেরেডে আকলুম নামের এক ইহুদি শিক্ষক সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ঢুকে পড়েন সুদানে। আকলুম শরণার্থী সংস্থাগুলোর কাছে সহায়তা চেয়ে বেশ কিছু চিঠি লেখেন, যার একটি সৌভাগ্যক্রমে মোসাদের হাতে পড়ে। তখনকার ইজরাইলি প্রধানমন্ত্রী মেনাখেম বেগিন মোসাদকে আদেশ দেন, এই ইহুদিদের বের করে ইজরাইলে নিয়ে আসার। কারণ, অন্য ইহুদি নেতাদের মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন, ইজরাইল হলো সব ইহুদির আশ্রয়কেন্দ্র। আকলুমের মাধ্যমে ইথিওপিয়ার ইহুদিদের কাছে বার্তা পাঠানো হয়- জেরুজালেমে যাওয়ার একটি ভালো উপায় রয়েছে।

এরপর প্রায় ১৪ হাজার বেটা ইজরাইলি পায়ে হেঁটে কয়েকশো কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে সুদানে আসেন। এই পথে আসতে গিয়ে অন্তত দেড় হাজার মানুষ পথেই মারা যান। মুসলিমপ্রধান সুদানের সঙ্গে ইজরাইলের সম্পর্ক ভালো ছিল না। ১৯৭৩ সালের আরব-ইজরাইল যুদ্ধে সুদানের আর্মিরাও লড়েছিল। সেই যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন সুদানিজ আর্মির প্যারাট্রুপার পরবর্তী সময়ে দেশটির প্রেসিডেন্ট ওমর আল বশির। যেহেতু সেখানে ইহুদিদের বসবাস নেই, তাই তাদের বলা হয়- যেন তারা সুদানি কর্তৃপক্ষের কাছে নিজেদের ধর্ম-পরিচয় গোপন রাখে।

ইথিওপিয় ইহুদিদের ইজরাইলে নিয়ে আসতে হলে লোহিত সাগর পাড়ি দিতে হবে। এ জন্য ইজরাইলি নৌ-বাহিনীর সহায়তা নেন মোসাদ এজেন্টরা। মোসাদের কয়েকজন এজেন্ট লোহিত সাগরের তীরে গিয়ে একটি সুবিধামতো জায়গা খুঁজে বের করেন।

ইতালীয় ব্যবসায়ীরা ১৯৭২ সালে সেখানে ১৫টি বাংলো তৈরি করেছিল, কিন্তু পানি আর বিদ্যুতের অভাবে রিসোর্টটি চালু করা যায়নি। সুইস অপারেটিং কোম্পানির ছদ্ম পরিচয়ে একদল মোসাদ এজেন্ট সুদান সরকারের কাছে থেকে তিন বছরের জন্য প্রায় সোয়া তিন লাখ ডলারের বিনিময়ে ভাড়া নেয় সেই পরিত্যক্ত গ্রামটি। পুরো গ্রামটি নতুন করে সাজানো হয়। এখানে স্থানীয় ১৫ জনকে চালক, পাচক, ওয়েটার ইত্যাদি পদে চাকরি দেওয়া হয় আকর্ষণীয় বেতনে। তারা যে মোসাদের অধীনে চাকরি করছেন, এই তথ্য নিজেরাও জানতেন না। সন্দেহ এড়াতে দিনের বেলায় কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য কয়েকজন নারী এজেন্ট নিয়োগ করা হয়েছিল। আর রাতের বেলায় এজেন্টরা গিয়ে ইথিওপিয় ইহুদিদের ছোটো ছোটো দলকে রিসোর্টটিতে নিয়ে আসত। রিসোর্টের দায়িত্ব দেওয়া হয় মোসাদ এজেন্ট ইয়োনাতান সেফাকে।

ইহুদিদের ট্রাকে করে তাদের রিসোর্টের উত্তর প্রান্তে নিয়ে আসার পর ইজরাইলি নৌ-বাহিনী, বিমানবাহিনী আর নৌ-সদস্যরা ছোটো নৌকায় করে দেড় ঘণ্টা দূরের জাহাজে নিয়ে যেত। সেখান থেকে লোহিত সাগরের মাঝ দিয়ে তাদের ইজরাইলে পৌঁছে দেওয়া হতো।

১৯৮২ সালের মার্চে তাদের তৃতীয় অভিযানটি ধরে ফেলে সুদানের সেনা সদস্যরা। ধরা পড়েন মোসাদ এজেন্ট ড্যানি লিমুরও। ড্যানিকে ইথিওপিয়ার ইহুদিদের সুদান হয়ে ইজরাইলে নিয়ে আসার মূল সুপারভাইজার করে পাঠানো হয়েছিল।

তবে মোসাদ এজেন্ট-এর এই দলটিকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তারপর থেকে সাগর পাড়ি দেওয়ার পরিকল্পনাটি স্থগিত করা হয়। তার বদলে মরুভূমির মাঝে একটি সুবিধাজনক বিমান অবতরণ ক্ষেত্র খুঁজে বের করে এজেন্টরা। সেখান থেকে হারকিউলিস বিমানে করে শরণার্থীদের ইজরাইলে নিয়ে আসা হতো। কিন্তু এরপরেও ওই রিসোর্টটি পরিচালনা অব্যাহত রাখে মোসাদ এজেন্টরা। সেখানে বেড়াতে গেছে মিশরের সেনাবাহিনী, ব্রিটিশ সৈন্যরা, সুদানি আর ব্রিটিশ কূটনীতিকরা– কেউ জানত না এর পরিচালকদের আসল পরিচয়। এরপর কিছুদিন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ আর বড়ো অঙ্কের অর্থ লেনদেনের বিনিময়ে সুদানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল জাফর নিমেইরি সরাসরি খার্তুম থেকেই ইহুদিদের ইউরোপে যাওয়ার অনুমতি দেন। ইউরোপের ব্রাসেলস হয়ে ইজরাইলে পৌঁছাত তারা, কিন্তু অন্য কোনো আরব শাসক এই তথ্য জানতেন না।

তবে সুদান থেকে ইহুদি শরণার্থীদের বিমানে করে বের করে আনার এই খবর ১৯৮৫ সালের ৫ই জানুয়ারি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোতে প্রকাশিত হয়। এরপর সুদানিজ সরকার ইহুদি স্থানান্তরের এই প্রক্রিয়ায় আর সায় দেয়নি। এরপরও টিকিয়ে রাখা হয়েছিল রিসোর্টটি। কিন্তু ১৯৮৫ সালের এপ্রিল মাসে সুদানে সামরিক অভ্যুত্থানে নিমেরি সরকারের পতনের পর রিসোর্ট থেকে মোসাদ এজেন্টদের চলে আসার নির্দেশ দেন সংস্থাটির প্রধান। কারণ, নতুন সামরিক সরকার এই রিসোর্ট আর মোসাদ এজেন্টদের নিয়ে সন্দেহ করতে শুরু করেছিল।

সাবেক এক মোসাদ এজেন্ট বিবিসিকে জানায়– 'এক রাতেই আমাদের ছয়জন সদস্য সেখান থেকে চলে আসে। তখনও রিসোর্টে অনেক পর্যটক ছিলেন। কিন্তু তারা সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখেন, স্থানীয় কর্মীরা রয়েছে, কিন্তু ডাইভিং ইন্সট্রাকটর, নারী ম্যানেজার আর সবাই লাপাত্তা হয়ে গেছে।'

ইজরাইলকে যেভাবে বোকা বানাল ফিলিস্তিনি যুবক

ইয়াসির আরাফাতকে হত্যার ধারাবাহিক মিশনে ছিল মোসাদ। হত্যার উদ্যোগগুলো এক এক করে যখন ব্যর্থ হচ্ছিল, তখন অভিনব এক পরিকল্পনা নিয়ে শীর্ষ গোয়েন্দাদের মুখোমুখি হন নৌ-বাহিনীর কর্মকর্তা বেনিয়ামিন শালিত। সুইডিশ বংশোদ্ভূত এই ইহুদি অফিসার একজন সাইকোলজিস্টও। আরাফাতসহ তারকা ফিলিস্তিনি যোদ্ধাদের হত্যা পরিকল্পনার জন্য তিন সদস্যের যে গোপন কমিটি করা হয়েছিল,

তাদের কাছে নিজের পরিকল্পনা পেশ করেন বেনিয়ামিন। ১৯৬২ সালে মুক্তি পাওয়া সিনেমা The Manchurian Candidate থেকে হত্যা কৌশলের ধারণা নেন এই সাইকোলজিস্ট। এই সিনেমায় দেখানো হয়েছে কীভাবে একজন চীনা গোয়েন্দা কর্মকর্তা এক মার্কিন যুদ্ধ বন্দিকে ব্রেনওয়াশ করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিবার্চনে অংশ নেওয়া এক প্রার্থীকে হত্যার জন্য পাঠায়।

বেনিয়ামিন শালিত প্রস্তাব করেন, তিনিও আরাফাত হত্যায় এমন কিছু করতে চান। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কারাবন্দি এক ফিলিস্তিনিকে চাইলেন কমিটির সভায়। ইজরাইলের কারাগারে তখন হাজারো ফিলিস্তিনি। সভায় হাজির ছিলেন গোয়েন্দাসংস্থা আমানের প্রধান মেজর জেনারেল আহারুন ইয়ারিভ। তিনি ওই কমিটির সদস্য ছিলেন। বেনিয়ামিন কমিটির সদস্যদের বোঝালেন তিনি ফিলিস্তিনি বন্দিকে ব্রেনওয়াশ করে তাকে কিলারে পরিণত করতে পারবেন, যে কিনা আরাফাতকে হত্যা করতে দ্বিধা করবে না। প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়।

শিনবেত সদস্যরা বেনিয়ামিনের কাছে বেশ কজন ফিলিস্তিনি বন্দিকে নিয়ে আসে। তাদের মধ্য থেকে বেথেলহেমে জন্ম নেওয়া ২৮ বছরের এক যুবককে বাছাই করা হয়। এই যুবককে দেখে মনে হয়েছিল তিনি আরাফাতের নেতৃত্বে ক্ষুব্ধ। তাকে যখন আটক করে জেলে নিয়ে আসা হয়েছিল, তখন তিনি হেবরনের কাছের একটি ছোট্ট গ্রামে বসবাস করতেন। যুবকটি ছিল ফাতাহর তৃণমূল কর্মী। আরাফাত হত্যা মিশনে তার কোড নাম দেওয়া হয় ফাতখি (Fatkhi.)।

আমানের আলোচিত ইউনিট-৫০৪-কে দায়িত্ব দেওয়া হলো এই প্রজেক্টে সব ধরনের লজিস্টিক সাপোর্ট দিতে। কিন্তু এই ইউনিট থেকেই উঠেছিল কট্টর বিরোধিতা। জেরুজালেম ভিত্তিক ইউনিটটির প্রধান রাফি (Rafi Sutton) একে পাগলামি বলে মন্তব্য করেন। তার মতে, এটা একটা বন্য কল্পনা, যা সায়েন্স ফিকশনের কথা মনে করিয়ে দেয়। অবশ্য আমান কমান্ডারের কথা আমলে নেওয়া হয়নি।

বেনিয়ামিন শালিত তিনমাস ধরে ফাতখিকে নিয়ে কাজ করেন। তার নিজস্ব সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা কমানোর চেষ্টা চালান শালিত। এমনভাবে ব্রেনওয়াশ করতে থাকেন যেন সে পরিচালিত হবে অন্য কারও নির্দেশনায়। ফাতখির মাথায় ঢোকানো হয়–

> 'ফাতাহ ভালো, পিএলও ভালো। আরাফাত খারাপ, তাকে সরাতে হবে।'

এভাবে ফিলিস্তিনি যুবককে Programmed Killer বানানোর দিকে এগিয়ে যান সাইকোলজিস্ট শালিত। দুই মাস পর নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করতে থাকে ফাতখি। বেনিয়ামিন বুঝতে পারেন, তার পরিকল্পনা কাজ করছে ঠিকঠাকমতো।

ব্রেনওয়াশের দ্বিতীয় ধাপে ফাতখিকে বিশেষভাবে তৈরি একটি কক্ষে রাখা হয়, হাতে দেওয়া হয় পিস্তল। রুমের বিভিন্ন কোনায় আরাফাতের ছবি টাঙিয়ে তাকে বলা হতো 'Shoot to kill Arafat'... ব্রেনওয়াশের এই প্রশিক্ষণ আমানপ্রধানসহ তিন সদস্যের কমিটির অন্যান্যরা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করে যেতেন।

১৯৬৮ সালের মধ্য ডিসেম্বরে বেনিয়ামিন শালিত জানালেন, এবার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। ১৯ ডিসেম্বর মধ্যরাতে জর্ডান নদী সাঁতরিয়ে তাকে জর্ডানে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়। রাত ১টা নাগাদ ইজরাইলি গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের সহায়তায় জর্ডানে প্রবেশ করে ফাতখি।

কিন্তু পাঁচ ঘণ্টা পর যে তথ্য আসে, তার জন্য ইজরাইলি গোয়েন্দারা মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না। জর্ডানে ইজরাইলের এক এজেন্ট ইউনিট-৫০৪-কে এক বার্তায় জানায়, ফাতাহর এক যুবক কর্মী পিস্তলসহ কারামেহ পুলিশ স্টেশনে পৌঁছেছে। তিনি পুলিশ সদস্যদের জানিয়েছেন, ইজরাইল তার ব্রেনওয়াশ করে তাকে দিয়ে আরাফাতকে হত্যা করতে চেয়েছিল। হতবাক হয়ে যান ইহুদি গোয়েন্দারা। কদিন পরই ইয়াসির আরাফাতের সমর্থনে এক আবেগঘন বক্তব্য দেন ফিলিস্তিনি ওই যুবক।

ছয়দিনের আরব-ইজরাইল যুদ্ধের সময় ও পরবর্তীকালে ইয়াসির আরাফাতকে হত্যার কয়েক দফা চেষ্টা চালায় ইজরাইল। যুদ্ধ শেষে শিনবেতের এক ইনফরমার তথ্য দেয়, আরাফাত জাফা গেটের অদূরে জেরুজালেমের ওল্ড সিটিতে লুকিয়ে আছেন। ইজরাইলি একটা কন্টিনজেন্ট আরাফাতকে ধরতে সেখানে যায়। তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছার মাত্র কয়েক মিনিট আগে আরাফাত পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।

এর দুদিন পর আরেকটি গোপন খবরের ভিত্তিতে জেরুজালেমের পূর্বে বেইত হানিয়া নামের একটি গ্রাম ঘিরে ফেলে একদল ইহুদি সেনা। তারা একটি অ্যাপার্টমেন্টে প্রবেশ করে। তবে আরাফাত এ দফায়ও পালাতে সক্ষম হন। পরদিন একজন সঙ্গীকে সাথে নিয়ে নারীর ছদ্মবেশে ক্যাবে চড়ে একটি ব্রিজ হয়ে জর্ডান নদী অতিক্রম করেন তিনি।

দিনদিন ইজরাইলের বিরুদ্ধে ফাতাহর প্রতিরোধ আক্রমণ মারাত্মক আকার ধারণ করল। এই আক্রমণগুলো সমন্বয় করা হতো জর্ডান উপত্যকার দক্ষিণে অবস্থিত কারামেহ থেকে। এখানেই সদর দপ্তর স্থাপন করেছিল ফাতাহ। ইজরাইলি প্রতিরক্ষাবাহিনী ফাতাহর বিরুদ্ধে বড়ো ধরনের অপারেশন পরিচালনা করার অনুমতি চেয়েছিল, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী লেভি এ ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। এ নিয়ে হতাশ ছিল মোসাদ। কায়সারেয়ার প্রধান জাভি আহারনি আরাফাতকে হত্যা করতে ভিন্ন উপায় খোঁজার পরামর্শ দেন।

এরপরই আরেকটি পরিকল্পনা হাজির করা হয় ১৯৬৮ সালে। ইউরোপ থেকে একটি বিস্ফোরক বোঝাই গাড়ি বৈরুতে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। এই গাড়িটি চালিয়ে নিয়ে যাবেন কায়সারেয়ার একজন সদস্য, তিনি ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে এটা করবেন। গাড়িটি আরাফাতের বাসার কাছেই রাখা হবে আর সময়মতো রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে বিস্ফোরণ ঘটানো হবে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী লেভি এই প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করেন ইজরাইলি পলিটিশিয়ানদের ওপর পালটা আক্রমণের আশঙ্কায়। কারণ, আরাফাত ততদিনে আর মিলিটারি কমান্ডার নেই, হয়ে উঠেছেন রাজনৈতিক নেতা। অবশ্য ফাতাহর আক্রমণ বেড়ে গেলে আরাফাত হত্যার অনুমোদন দেন ইজরাইলি প্রধানমন্ত্রী।

২১ মার্চ, ১৯৬৮। ইজরাইলি কমান্ডোরা হেলিকপ্টারে চড়ে কারামেহর কাছে মরুভূমি এলাকায় অবস্থান নেয়। এর আগের রাতে ফাতাহর সদর দপ্তর গুঁড়িয়ে দেওয়ার অনুমতি দেয় ইজরাইলি মন্ত্রিসভা। দিনের আলোতেই অভিযানের সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু যতটা সহজ ভাবা হয়েছিল, ইজরাইলের পক্ষে অভিযানটি তত সহজ হয়নি। ফাতাহ কঠোর প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ৩৩ ইজরাইলি সেনা নিহত হয় লড়াইয়ে। একশোর বেশি ফিলিস্তিনি আর ৬১ জর্ডানি নাগরিক নিহত হয়। ফাতাহ দাবি করে পালটা হামলায় ইজরাইলি প্রতিরক্ষামন্ত্রী মোশে দাওয়ান আহত হয়েছেন। এ ঘটনার পর ইয়াসির আরাফাত ফিলিস্তিনিদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতায় পরিণত হলেন। কারামেহ অভিযান ব্যর্থ হওয়ার পর আরও বিধ্বংসী ও বিকল্প হামলার উপায় খুঁজতে থাকে ইজরাইল। এমনই একটি অভিনব উপায় নিয়ে হাজির হয়েছিলেন সুইডিশ বংশোদ্ভূত নৌবাহিনীর সাইকোলজিস্ট বেনিয়ামিন শালিত।

ইয়াসির আরাফাত হত্যাচেষ্টা; ইহুদি সাংবাদিককে অনুসরণ করছিল মোসাদ

১৯৮২ সাল, লেবাননের বৈরুত।

লেবানন-ইজরাইল যুদ্ধে এক দিনের বিরতি চলছে। হাজার হাজার মানুষ শহরের পূর্ব ও পশ্চিমে আসা-যাওয়ার চেকপয়েন্টগুলোতে হাজির হয়েছেন। তাদেরই একজন উরি আভনেরি। আভনেরি কাজ করেন বামপন্থি এক ম্যাগাজিনে। রুপালি চুলের এই ভদ্রলোকের ওপর আদেশ হয়েছে, বৈরুত জাদুঘরের কাছে পিএলও'র একটি চেকপোস্টে স্বশরীরে হাজির হতে হবে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আভনেরি হবেন প্রথম ইজরাইলি; যিনি আনুষ্ঠানিকভাবে পিএলও নেতা ইয়াসির আরাফাতের সঙ্গে দেখা করেছেন।
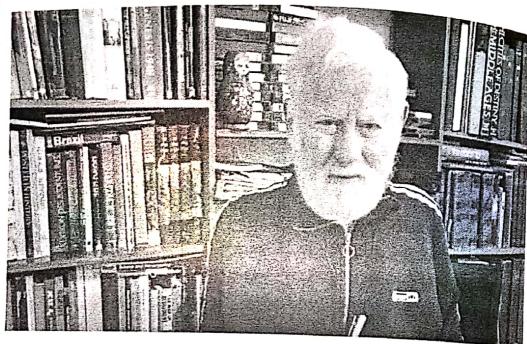
উরি আভনেরি, ছবি বিবিসি বাংলা

নিজের দেশ যাকে সবচেয়ে বড়ো শত্রু ভেবে থাকে, সেই আরাফাতের সাথে কীভাবে দেখা হয় সাংবাদিক আভনেরির? সে কথা শোনা যাক তাঁর নিজ মুখেই।

'একটু বিপজ্জনক ছিল।' বলছেন আভনেরি।

একটি সাঁজোয়া মার্সিডিজ গাড়ি তাকে তুলে নেয়। এরপর আকাবাঁকা পথ বেয়ে দক্ষিণ বৈরুতে পিএলও'র একটি ভবনে শেষ পর্যন্ত পৌছেও যায়। 'আমরা অবশ্যই কথা বলেছিলাম শান্তি নিয়ে। ইজরাইল ও ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তি।' যোগ করেন আভনেরি।

৩৬ বছর পরে এসে সেই সাক্ষাৎকার নিয়ে চমকপ্রদ কিছু তথ্য বের হয়ে আসছে। অভিযোগ উঠেছে, ইজরাইলি কমান্ডোরা পিএলও নেতার সঙ্গে আভনেরির বৈঠক অনুসরণ করার চেষ্টা করছিল। আরাফাতকে লক্ষ্যবস্তু বানানোর উদ্দেশ্য ছিল তাদের। সেক্ষেত্রে যদি তাদের স্বদেশি সাংবাদিককে বিসর্জন দিতে হয়, তাহলেও ..... কিন্তু সবকিছুই ঘটছে আভনেরির অজান্তে।

সম্প্রতি প্রকাশিত একটি বইয়ে ইজরাইলি সাংবাদিক রনেন বার্গম্যান আরাফাতকে হত্যার এ ধরনের অনেকগুলো চেষ্টার কথা লিখেছেন। বার্গম্যান ১৯৮২ সালের ওই ঘটনা জানতেন এমন অনেকের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। বার্গম্যান বইয়ে দাবি করেছেন, তিনি তাঁর গবেষণার সময় বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন, এমনকী একজন সেনাপ্রধান তাঁর বিরুদ্ধে 'উত্ত্যক্তকারী গুপ্তচরবৃত্তি'র অভিযোগও এনেছেন।

বার্গম্যানের বইতে আছে– ১৯৮২ সালে যখন বৈরুত অবরোধ করা হয়, তখন 'সল্ট ফিশ' কোডনামের একটি অভিজাত কমান্ডো ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য– আরাফাতকে হত্যা করা। পিএলও নেতার সঙ্গে উরি আভনেরির বৈঠকের সুযোগ নিতে চেয়েছিল এই ইউনিট। তারা চেয়েছিল, ওই সাংবাদিক যেন নিজের অজান্তেই আরাফাতের সন্ধান দিয়ে দেয়। এ নিয়ে সল্ট ফিশ টিমের মধ্যে এমন একটি তর্ক বেধে যায়, ইজরাইলি নাগরিকদের বিপদে ফেলা– যার পরিণতি সম্ভবত মৃত্যু– কতটা সঠিক? উত্তর ছিল– তাদের সিদ্ধান্ত মতে সঠিক। কিন্তু সল্ট ফিশের সদস্যরা শেষ পর্যন্ত বৈরুতের অলিগলিতে আভনেরিকে হারিয়ে ফেলেন।

উরি আভনেরি এখনও ইয়াসির আরাফাতের সঙ্গে তাঁর আলোচনার সবকিছু স্মরণ করতে পারেন। প্রশ্ন উঠেছে, ইজরাইল কি উরি আভনেরিকে হত্যার জন্য প্রস্তুত ছিল? বার্গম্যানের বইটি প্রকাশের পর উরি আভনেরির একটি সাক্ষাৎকার নেয় বিবিসি। তেলআবিবে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে বিবিসির টম বেটম্যানের সঙ্গে কথা বলেন ৯৪ বছর বয়সি এই সাংবাদিক। এবার টম বেটম্যানের সাক্ষাৎকারের অংশবিশেষ তুলে ধরা হলো–

আভনেরির ওই অ্যাপার্টমেন্টের দেয়ালে টাঙানো আরাফাত, বিল ক্লিনটন এবং হত্যাকাণ্ডের শিকার ইজরাইলের সাবেক প্রধানমন্ত্রী আইজাক রবিনের অনেক ছবি– ওইসব ব্যক্তি, যারা মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির পরিকল্পনা করেছিলেন। ১৯৮২ সালে তাঁর আরাফাতের সাক্ষাৎকার নেওয়ার বিষয়টি অনেক ইজরাইলিকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। আভনেরি বলছেন, সরকার একটি তদন্ত করারও নির্দেশ দিয়েছিল।

'অ্যাটর্নি জেনারেলের সিদ্ধান্ত ছিল আমি কোনো আইন ভাঙিনি। কারণ, ওই সময় এমন কোনো আইন ছিল না যে পিএলও'র সঙ্গে কোনো ধরনের বৈঠক করা যাবে না।'

কিন্তু অভিযোগ উঠেছে, ইয়াসির আরাফাতের সঙ্গে ওই বৈঠক এমনকী তাঁর জীবনও চলে যাওয়ার কারণ হতে পারত। 'আমার অবশ্য এ ব্যাপারে খানিকটা সন্দেহ আছে।' বলছিলেন আভনেরি। তাঁর ব্যাখ্যা– তিনি বৈঠকটি হওয়ার ২৪ ঘণ্টারও কম সময় আগে ফোন করে এর আয়োজন করেছিলেন।

'কিন্তু ... তারা যদি খুব দক্ষ হতো, তাহলে তারা ফোনে আমাদের কথা শুনতে পারত। এরপর যেখানে আমি সীমানা পেরিয়েছি, সেখান থেকে তারা আমাদের গাড়ি অনুসরণ করতে পারত। এটা সম্ভব ছিল।'

সল্ট ফিশ ইউনিটের প্রধান ছিলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল উজি দায়ান, যিনি একসময় ইজরাইলি সেনাবাহিনীর উপপ্রধান হয়েছিলেন। তিনি বিবিসির টম বেটম্যানকে বলেন–

তার টিম আট থেকে দশবার চেষ্টা চালিয়েছিল ইয়াসির আরাফাতকে হত্যা করতে। বেসামরিক মানুষ এসব হামলায় মারা গিয়েছিল কি না– এমন এক প্রশ্নে তিনি বলেন– 'আমি যতদূর জানি, না।'

'সুতরাং আমি যদি জানতাম যে সেখানে কোনো বেসামরিক মানুষ আছে, তাহলে আমরা তাকে লক্ষ্যবস্তু করতাম না। কিন্তু আপনি জানেন, যুদ্ধ একেবারেই অন্ধ। আপনি বলতে পারবেন না, যেকোনো একটি এলাকায় একটি মানুষও আহত হবে না।'

বৈরুতে ইজরাইলের অবরোধ এতটা কঠোর ছিল যে, মন্ত্রিসভার অনেক সদস্য প্রতিরক্ষামন্ত্রী অ্যারিয়েল শ্যারনের ক্ষমতা খর্ব করেছিলেন।

কর্নেল দায়ান তার নিজের মিশন সম্পর্কে আপসহীন ছিলেন। তিনি স্মরণ করছিলেন পিএলও'র হাতে ইজরাইলিদের সহিংস মৃত্যু অথবা লেবানন থেকে পিএলও'র সহযোগী কোনো বাহিনীর হামলার কথা।

কিন্তু রনেন বার্গম্যান যে অভিযানের কথা লিখেছেন, তার পেছনে নিজের ইউনিটের কেউ জড়িত ছিল– এমন অভিযোগ তিনি নাকচ করে দেন। তিনি বলেন–

> 'এটা একেবারে একটা পাগলাটে একটি ধারণা যে একজন ইজরাইলি কর্মকর্তা কিংবা একজন ইজরাইলি প্রতিরক্ষামন্ত্রী বা একজন ইজরাইলি প্রধানমন্ত্রী আরাফাতকে হত্যার অনুমোদন দেবেন, আবার একইসঙ্গে উরি আভনেরির মতো ইজরাইলিকেও হত্যার আদেশ দেবেন।'

কর্নেল দায়ান 'গুপ্তহত্যা' শব্দটি এড়িয়ে যান। তিনি বারবার বলেন যে, তার লক্ষ্য ছিল এটা নিশ্চিত করা যে আরাফাত জীবিত থাকবেন না।

অনেক বছর পরে যখন ইজরাইল ও ফিলিস্তিনিরা শান্তি আলোচনা চালাচ্ছিলেন, তখন এই দুজনের মধ্যে অনেকবার দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছিল।

কর্নেল দায়ান বলছেন, তিনি যে পিএলও নেতাকে হত্যাচেষ্টার সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তা তিনি কখনোই ইয়াসির আরাফাতকে বলেননি। 'কিন্তু আমার মনে হয় তিনি জানতেন।' যোগ করেন দায়ান।

(ফিলিস্তিন নেতা ইয়াসির আরাফাত হত্যায় ইহুদি সাংবাদিককেও বলি দিতে রাজি ছিল ইজরাইল?-এমন শিরোনামে বিবিসির একটি প্রতিবেদন অনুবাদ করে, ২৩ মার্চ, ২০১৮ তারিখে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেছিল বিবিসি বাংলা। এটি আংশিক পরিবর্তন পরে এখানে দেওয়া হলো)

হামাস নেতা খালিদ মেশাল হত্যাচেষ্টা

এক

১৯৯৭ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর।

সকালবেলা। জর্ডানে নির্বাসিত খালিদ মিশাল। হামাসের রাজনৈতিক শাখার প্রধান তিনি। মিশাল এ দায়িত্ব পেয়েছেন বছরখানেক আগে। আজই তার শরীরে বিষ ছিটিয়ে দেবে মোসাদ সদস্যরা। কিলিং মিশন সম্পন্ন করতে সপ্তাহখানেক আগেই জর্ডানের রাজধানী আম্মানে এসে পৌঁছেছে মোসাদের কিডন ইউনিটের ছয় সদস্যের একটি টিম। তারা কানাডীয় পাসপোর্ট ব্যবহার করে কয়েকটি ভাগে ভাগ হয়ে ট্রাভেলার হিসেবে আমস্টারডাম, টরেন্টো ও প্যারিস থেকে রানি আলিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দিয়ে জর্ডানে প্রবেশ করে।[৯৯]

আম্মানের এক রাস্তায় খালিদ মিশালকে টার্গেট করা হয়, যখন তিনি তার অফিসে যাচ্ছিলেন। সেদিন সকাল ১০টার দিকে তিন বাচ্চা (ওয়ালিদ, ওমর, বিল্লাল) ও চালক-কাম এক দেহরক্ষীসহ বাসা থেকে বেরিয়ে একটি গাড়িতে উঠেন মিশাল। জর্ডানে তখন ছুটির মওসুম চলছিল। বাচ্চাদের স্কুল বন্ধ থাকায় খালিদকে তার অফিসে নামিয়ে দিয়ে তাদেরকে সেলুনে নিয়ে গিয়ে চুল কাটানোর কথা ছিল।

মিশালের গাড়িটিকে অনুসরণ করছিল কিডন সদস্যদের ভাড়া করা একটি গাড়ি। এই গাড়িটি বের হয়েছে খুব সকালেই আম্মানের ইজরাইলি দূতাবাস থেকে। মিশাল যখনই গাড়ি থেকে নেমে অফিস ভবনে ঢুকছেন, সাথে সাথেই দুই আততায়ী কেনডাল ও বেডস তার পেছনে ছুটে যান। কিন্তু তারা এটা খেয়াল করেননি, মিশালের গাড়িতে তখনও তাঁর দেহরক্ষী মোহাম্মদ আবু সাইফ বসা ছিলেন।

মোসাদ সদস্যরা হামাস নেতার বাম কানে বিষ ছিটিয়ে দিয়ে দ্রুতই পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। আলজাজিরাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে খালিদ মিশাল হামলার ঘটনা বর্ণনা করেন এভাবে–

> 'আমার শরীরে ইলেকট্রিক শকের মতো অনুভূতি হয় এবং বাম কানে তীব্র শব্দের মতো অনুভূত হয়। আমার সন্দেহ বাস্তবতায় রূপ নেয়। আমি নিশ্চিত হই এটা আমাকে হত্যার চেষ্টা, কিন্তু একটু পরই আমি নিজেকে অক্ষত অবস্থায় আবিষ্কার করি।'

মিশালের কানে যে বিষ দেওয়া হয়, তাতে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু হওয়ার কথা ছিল। ততক্ষণে গাড়ি থেকে নেমে দুই ইজরাইলি আততায়ীকে ধাওয়া শুরু করেন আবু সাইফ।

---

৯৯. Kill Him Silently: Mossadvs Khaled Meshaal: Part 1| Al Jazeera World.

অনেকটা পথ দৌড়ে জর্ডানে অবস্থানরত পিএলও'র একজন আর্মি অফিসারের সহায়তায় দুজনকে ধরে ফেলেন। প্যালেস্টাইন লিবারেশন আর্মির কর্মকর্তা সাদ নাইম আল খতিব সেদিন ঘটনাচক্রে ধাওয়ার দৃশ্যটি দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি ভিড় দেখে ট্যাক্সি থেকে নেমে এগিয়ে যান। আবু সাইফ তখন চিৎকার করে সাহায্য চেয়ে বলছিলেন– 'এরা মোসাদ এজেন্ট, খালিদ মিশালকে এরা হত্যা করেছে।' সাদ আল খতিব এগিয়ে এলেন। দুজনে মিলে মোসাদ এজেন্টদের ধরে নিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিলেন।

মোসাদ সদস্যদের বহন করা যে গাড়িটি খালিদ মিশালের গাড়িকে অনুসরণ করছিল, সেই গাড়ির ব্যাকআপে ছিল আরেকটি গাড়ি। দুই আততায়ী ধরা পড়ে যাওয়ার পর পেছনের গাড়িতে থাকা ব্যাকআপ টিমটি সাথে সাথেই ঘটনাস্থল থেকে সরে যায় এবং আম্মানের ইজরাইলি দূতাবাসে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

মিশাল হত্যাচেষ্টার ঘটনায় তখনও অন্ধকারে জর্ডান, তবে হামলার খবর দ্রুতই চলে যায় জর্ডানে অবস্থান করা হামাস নেতাদের কাছে। জর্ডানের হামাস প্রতিনিধি মুহাম্মাদ নাজ্জাল যখন এই খবর পান, তখন তিনি বাসার বাইরে। নাজ্জাল দ্রুত ঘরে ফিরে হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্যদের নিয়ে জরুরি বৈঠকে বসেন। ঘটনার বিস্তারিত তুলে ধরে একটি 'সংবাদ বিজ্ঞপ্তি' প্রচারের সিদ্ধান্ত নেন তারা। এএফপির প্রতিনিধি রান্দা হাবিবের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় হামাসের পক্ষ থেকে। রান্দা হাবিব হয়ে হামলার তথ্য যায় জর্ডানের তথ্যমন্ত্রী সামির মুতাভির কাছে। জর্ডানের বাদশাহ তখনও কিছু জানেন না। মুতাভি রান্দা হাবিবকে পরে ফোনে জানান–

> 'এই ধরনের কোনো ঘটনাই ঘটেনি! কানাডার পাসপোর্টধারী ওই দুই ব্যক্তি (হিট টিমের দুই সদস্য) আসলে নিরীহ। তারা কেনাকাটা করছিল। খালিদ মিশালের সাথে তাদের বাদানুবাদ হয়েছিল, যার মূল কারণ হলো তাঁর দেহরক্ষী আবু সাইফ তাদের হয়রানি করেছিল।'

কিন্তু ঘটনা চাপা থাকেনি। কারণ, এরই মধ্যে এএফপি হামাসের প্রেস বিজ্ঞপ্তিটি প্রচার করে দিয়েছে। তথ্যমন্ত্রীর মতো গোয়েন্দাসংস্থার পরিচালক সামিহ আল বাত্তিখিও বিষয়টি অত গুরুত্ব দিলেন না। তার মতে– 'এটি বানোয়াট কাহিনি। আসলে কানাডার দুই পর্যটক আর খালিদ মিশালের দেহরক্ষীদের মধ্যে বাদানুবাদ ছাড়া সেদিন আর কিছুই হয়নি!'

হামাস ও মুসলিম ব্রাদারহুডের নেতাদের চেষ্টায় খালিদ মিশালের ওপর আক্রমণের ঘটনাটি যখন বাদশাহ হোসেনের কানে এসে পৌঁছায়, সাথে সাথেই তিনি পুরো বিষয়টি দেখভালের দায়িত্ব নিয়ে নেন। এরই মধ্যে আটক দুই মোসাদ সদস্য জর্ডানের নিরাপত্তা বাহিনীর কাছে স্বীকার করে যে, তারা খালিদ মিশালকে হত্যা করার জন্যই এসেছে এবং ইতোমধ্যে তারা তাঁর ওপর এক ধরনের বিষ প্রয়োগ করেছে।

মিশালকে প্রথমে অন্য একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও বাদশাহ হোসেনের নির্দেশে আল হোসেন মেডিকেল সেন্টারে স্থানান্তর করা হয়। মেডিকেল বোর্ড গঠন করে মিশালের শারীরিক অবস্থা পর্যালোচনা করা হয়। বাদশাহ হোসেন তার দেশের নিরাপত্তা বাহিনীকে ইজরাইলের দূতাবাস ঘেরাওয়ের নির্দেশ দেন। জর্ডানের বাহিনী ইজরাইলি দূতাবাস ঘিরে সশস্ত্র অবস্থান নিলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে, দূতাবাসের আশপাশে জড়ো করা হয় সাঁজোয়া গাড়ি। ইজরাইলের সাথে শান্তি-চুক্তির পরেও জর্ডানের মাটিতে এমন ঘটনা ঘটায় ক্ষুব্ধ বাদশাহ জরুরি ভিত্তিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনকে ফোন করেন। প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন ঘটনা শুনে অবাক হন। ইজরাইলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুকে নিয়ে ক্লিনটন মন্তব্য করেন– 'দিস ম্যান ইজ ইমপসিবল।' বাদশাহ হোসেন ক্লিনটনের কাছে বিষের প্রতিষেধক চান এবং হুমকি দেন– যদি মিশাল মারা যান, তাহলে ইজরাইল ও জর্ডানের মধ্যকার শান্তি-চুক্তি থেকে তিনি বেরিয়ে যাবেন।[১০০]

৪৮ ঘন্টার মধ্যেই মোসাদপ্রধান ইয়াতম স্বয়ং হেলিকপ্টারে চড়ে জর্ডানে আসেন। তিনি বাদশা হোসেনের সাথে বৈঠক করেন। প্রতিষেধক তুলে দেওয়া হয় চিকিৎসকদের হাতে। ২৭ সে সেপ্টেম্বর কোমা থেকে ফিরে আসেন খালিদ মিশাল। প্রথম দিকে বিভিন্ন বইয়ে দাবি করা হয়েছিল, সেদিন মোসাদপ্রধান বিষের প্রতিষেধক নিয়ে জর্ডানে এসেছিলেন। যদিও পরবর্তী সময়ে জানা যায়, প্রতিষেধক দিয়েই হিট টিমকে পাঠানো হয়েছিল।

ঘটনার পাঁচ দিন পর ৩০ সেপ্টেম্বর বাদশাহ হোসেন জর্ডানে এক জনসমাবেশে ভাষণ দেন। তিনি মিশালের ঘটনায় দুই দেশের সম্পর্কে ফাটল ধরায় সম্পর্ক স্বাভাবিক করার শর্ত হিসেবে অবিলম্বে শেখ আহমেদ ইয়াসিনসহ আরও কিছু ফিলিস্তিনি বন্দির মুক্তি দাবি করেন ইজরাইলি প্রধানমন্ত্রীর কাছে। পরে জর্ডান কর্তৃপক্ষ তাদের দেশে আটক হওয়া মোসাদের ওই দুই এজেন্টকে ছেড়ে দেয়। ৬ অক্টোবর আম্মান থেকে দুটি হেলিকপ্টার উড়ে যায়। এর একটি উড়ে আল হোসেইন মেডিকেল সেন্টার থেকে– যাতে চড়ে শেখ ইয়াসিন গাজায় ফিরে যান। আরেকটি হেলিকপ্টার উড়ে যায় জর্ডানের গোয়েন্দা কার্যালয়ের সামনে থেকে, যেটাতে চড়ে মোসাদের দুই এজেন্ট তেলআবিবে চলে যান। ইজরাইলের সাথে চুক্তি হিসেবে সেদিন ইজরাইলের বিভিন্ন কারাগার থেকে জর্ডান ও ফিলিস্তিনের ৪০ জন বন্দিকেও মুক্তি দেওয়া হয়।

---

[১০০]. Mossad spy who saved Khaled Meshaal's life urges Hamas leader to end Gaza war, Richard Johnson, August 24, 2014, National Post

দুই

খালিদ মিশালকে হত্যার এই অভিযানটি সফল হওয়ার দ্বারপ্রান্তে গিয়েও ব্যর্থ হলো। নিজের পদ থেকে সরে দাঁড়াতে হয় মোসাদের তৎকালীন প্রধান ড্যানি ইয়াতমকে। ব্যর্থতার কারণ খতিয়ে দেখতে তিন সদস্যের একটি কমিটি করে দেয় ইজরাইল সরকার। তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ১৯৯৮ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি– যাতে মূল নির্দেশদাতা প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে ব্যর্থতার দায় থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। সমস্ত দায় গিয়ে পড়ে মোসাদপ্রধানের ওপর। এ নিয়ে বিতর্কের মুখে এর সপ্তাহখানেক বাদেই ড্যানি ইয়াতমের পদত্যাগের খবর আসে।

ইজরাইলের গোয়েন্দাসংস্থার ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ো ব্যর্থতা হিসেবে দেখা হয় এই ঘটনাকে। মোসাদের যে কয়জন গুপ্তচর খালিদ মিশাল হত্যাচেষ্টায় অংশ নিয়েছিলেন, তাদের একজন মিশকা বেন ডেভিড বিবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জানান–

> 'মোসাদের সিদ্ধান্ত, অভিযানের কৌশল, পরিচালনা পদ্ধতি, সবকিছুই সঠিক থাকলেও কোনো কিছুই সফল হয়নি।'

এখন প্রশ্ন হলো– কেনই-বা খালিদ মিশালকে টার্গেট করা হলো? এই অপারেশনের মূল নির্দেশদাতা কে? মোসাদ কি নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল মেশালকে হত্যা করার? চলুন সেসব তথ্য জেনে আসি।

১৯৯৭ সালের জুলাইয়ে জেরুজালেমের এক বাজারে আত্মঘাতী জোড়া বোমা হামলায় ১৬ জন ইজরাইলি নিহত এবং বহু মানুষ আহত হয়। সেবারই প্রথম ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ আন্দোলন 'হামাস' হামলার দায়দায়িত্ব স্বীকার করে। পিএলও এবং বেশ কজন হামাস নেতার মতো খালিদ মিশালও তখন জর্ডানে নির্বাসিত। জেরুজালেমে হামলার পর ইজরাইল সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে মোসাদকে বলা হয়, হামাস সম্পর্কে গোয়েন্দা তথ্য জোগাড় করতে।

এই ঘটনার মাত্র দুবছর আগে ইজরাইল ও জর্ডানের মধ্যে একটি শান্তি-চুক্তি হয়েছিল। তাই মোসাদ সদস্যদের ওপর কড়া নির্দেশ ছিল, তারা জর্ডানের ভেতর যেন কোনো গুপ্তচরবৃত্তি না করেন। এই নির্দেশ মেনেও চলছিল মোসাদের চররা। কিন্তু একই বছরের ৪ সেপ্টেম্বর ইজরাইলে আরেক দফা আত্মঘাতী হামলা হয়। ইজরাইল নিশ্চিত হয়, 'এটাও হামাসের কাজ।' এরপরই নির্দেশ আসে, খালিদ মিশালকে সরিয়ে দিতে হবে। কারণ, হামলার মূলে তিনি!

মিশালকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন খোদ ইজরাইলের প্রধানমন্ত্রী।[১০১] আসলে মোসাদ যেসব গুপ্তহত্যার মিশন পরিচালনা করে থাকে, তাতে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ের হাত থাকে। প্রধানমন্ত্রীকে ডিঙিয়ে কখনোই রাজনৈতিক হত্যার নির্দেশ আসে না। ইজরাইলে ধারাবাহিক হামলার ঘটনায় ক্ষুব্ধ তখনকার প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের সাথে জরুরি বৈঠকে বসেন। তখন নেতানিয়াহুর প্রথম মেয়াদ চলছিল। তিনি মূলত প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন, আর তাই মোসাদকে অপারেশন চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে নির্দেশ ছিল কোনো বোমা বা বন্দুক ব্যবহার করা যাবে না। যা করতে হবে তা হলো- বিষাক্ত পদার্থ খালিদ মিশালের চামড়ার ওপর ছিটিয়ে দিতে হবে, যাতে এই বিষ হামাস নেতার শ্বাসযন্ত্রকে বিকল করে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়।

দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয় ছয় গুপ্তচরকে। এই দলটিতে ছিলেন মিশকা বেনডেভিড। তিনি সঙ্গে নিয়ে যান ওই বিষের অ্যান্টিডোট বা প্রতিষেধক। জর্ডানে ঢোকা এবং খালিদ মিশালের শরীরে বিষ প্রয়োগ করা পর্যন্ত সবই ঠিক ছিল, কিন্তু বড়ো বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল মিশালের দেহরক্ষী সাইফ।

পালমাখ-ইহুদিদের গোপন সেনাবাহিনী

ইজরাইলের আজকের যে প্রতিরক্ষাবাহিনী (আইডিএফ), এটি একসময় 'হাগানা' নামে পরিচিত ছিল। স্বাধীন ইজরাইলরাষ্ট্র ঘোষণার পরই তার নাম পালটে রাখা হয় আইডিএফ। অবশ্য হাগানা ছাড়া আরও কিছু সশস্ত্র সংগঠন আইডিএফে একীভূত করা হয়েছিল। হাগানার যে গোপন সেনাবাহিনী ছিল, তার নাম ছিল- 'পালমাখ।' সফলতার সাথে আরব বিদ্রোহ দমনের দুই বছর পর ১৯৪১ সালের ১৫-ই মে (আনুষ্ঠানিক, প্রকৃত জন্ম আরও আগেই হয়েছে) পালমাখের জন্ম। শুরুর দিকে শ'খানেক সদস্য ছিল পালমাখের। ৪৮-এ অর্থাৎ ইজরাইল রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষণার বছরে এর সদস্যসংখ্যা বেড়ে হয় দুই হাজারের মতো। আইডিএফ প্রতিষ্ঠায় বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা পালমাখে নারী সদস্যও ছিল।

পালমাখের নৌ ও বিমান ইউনিট ছিল। নৌবিভাগকে বলা হতো পালায়াম (palyam)। পালায়াম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৫ সালের এপ্রিলের দিকে। এই পালায়াম থেকেই ইজরাইলি নৌবাহিনীর সৃষ্টি। জার্মানিতে নাজিদের ইহুদি-বিদ্বেষ আর চিরশত্রু আরবদের ঠেকাতে জার্মান বিভাগ আর আরবি বিভাগ নামে দুটি বিভাগ খোলা হয়েছিল পালমাখে।

---

[১০১]. Khaled Meshaal: How Mossad bid to assassinate Hamas leader ended in fiasco, David Blair, theTelegraph, December 7, 2012.

পালায়ামের মূল কাজ ছিল আলিয়া বাস্তবায়নে সহায়তা করা। সেটা কীরকম? ইউরোপ থেকে যেসব জাহাজে করে ইহুদিদের প্যালেস্টাইন ভূখণ্ডে নিয়ে আসা হতো, সেসব জাহাজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব ছিল তাদের। ইহুদিরা আলিয়া বলতে বোঝায়, বিশ্বের বিভিন্ন ভূখণ্ডে ছড়িয়ে থাকা ইহুদি জনগোষ্ঠীকে ইজরাইল ভূখণ্ডে নিয়ে আসা এবং তাদের নাগরিকত্ব নিশ্চিত করাকে।

পালায়াম ১৯৪৫ থেকে ৪৮ এই কয়েক বছরে অর্ধশতাধিক জাহাজে করে ৭০ হাজারের মতো ইহুদিকে ইউরোপ থেকে প্যালেস্টাইন ভূখণ্ডে নিয়ে আসতে সমর্থ হয়। এই সময়ে উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ থেকেও টোপ দিয়ে শত শত ইহুদিকে নিয়ে আসা হয়। যদিও আধুনিক ইজরাইলি সমাজে ইউরোপ ও আফ্রিকা থেকে আসা ইহুদিদের মধ্যে বৈষম্য দেখা যায়। পশ্চিম থেকে আসা ইহুদিরাই সেখানে বেশ দাপুটে জীবন পার করে। ৪৮-এর প্রথম আরব-ইজরাইল যুদ্ধের সময় আরবদের ওপর নৌপথে আক্রমণের কর্তৃত্ব দেওয়া হয় পালায়ামকে। জাহাজে করে ইউরোপ থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ আনার কাজটিও তারাই করত।

ইজরাইল যেদিন স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা করে, তার কয়েক ঘন্টা আগে হাইফা বন্দর হয়ে সাইপ্রাসের উদ্দেশ্যে প্যালেস্টাইন ছেড়েছিলেন ম্যান্ডেটপ্রাপ্ত ব্রিটিশ শাসক। এই হাইফায় আরবদের ভালোই জনবসতি ছিল। এখনও হাইফাতে অনেক আরব বসবাস করেন। ব্রিটিশরা যখন প্যালেস্টাইন ছাড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, পালায়ামের সদস্যরা সতর্ক থাকলেন কোনোভাবেই যাতে ব্রিটিশদের ফেলে যাওয়া অস্ত্র আরবদের হাতে না পড়ে। কোনো আরবকে অস্ত্রসহ পাওয়া গেলে হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয় ওপর থেকে। পালায়াম ছাড়াও পালমাখের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ ছিল, নাম তার মুস্তারেবিন। এই মুস্তারেবিন এখনও আছে এবং বেশ কয়বছর ধরে বেশ আলোচনায় রয়েছে।

ভয়ংকর মুস্তারেবিন

মুস্তারেবিন ইজরাইলের একটি গুপ্তচর সংস্থা; যার সদস্যরা আরব বা ফিলিস্তিনিদের ছদ্মবেশ ধারণ করে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে যান অথবা নিজেদের পরিচয় আড়াল করে ফিলিস্তিনিদের মিছিল বা সমাবেশে অংশ নেন। মুস্তারেবিন শব্দটি এসেছে হিব্রু শব্দ মিস্তারাভিম (Mistaravim) থেকে। এটিও একই অর্থ প্রকাশ করে। আরব বা ফিলিস্তিনিরা ঠিক যে ধরনের পোশাক পরেন, যেভাবে অন্যদের সাথে আচরণ করেন; এমনকী যে ঢঙে উচ্চারণ করে কথাবার্তা বলেন, মুস্তারেবিন সদস্যরা তাই করেন বা করতে পারেন।

এই গুপ্তচর সংস্থার সদস্যরা এমন এমন পোশাক পরেন, যাতে মুখ, ঘাড় সবই ঢাকা থাকে। তারা ফিলিস্তিনিদের সাথে মিশে নিজ দেশের সেনাদের বিরুদ্ধে স্লোগান দেন,

এমনকী সেনাদের লক্ষ্য করে কখনো কখনো পাথরও ছুড়ে মারেন। এভাবেই তারা প্রতিবাদকারী ফিলিস্তিনিদের নজর কাড়েন এবং ফুঁসলিয়ে ইজরাইলি সেনাদের খুব কাছাকাছি নিয়ে যান প্রতিবাদকারীদের। এরপরই পালটে যায় দৃশ্যপট। রুদ্রমূর্তি ধারণ করেন এই ইহুদি গুপ্তচররা। তারা নিজেদের পোশাকের ভেতরে লুকিয়ে রাখা অস্ত্র বের করেন এবং ফিলিস্তিনিদের জাপটে ধরে গ্রেফতার করে ফেলেন। পরে ইজরাইলি সেনারা কাছাকাছি পৌঁছে আটক ফিলিস্তিনিদের ধরে নিয়ে যায়। আর তখনই বাকি ফিলিস্তিনিরা বুঝতে পারেন এরা মুস্তারেবিনের সদস্য। এবার রুদ্ধশ্বাসে পালাতে থাকেন প্রতিবাদকারীরা।

মোসাদের মতো এদেরও ফিলিস্তিন বসতি ও আরব দেশগুলোতে পাঠানো হয় আরবদের হাবভাব বোঝার জন্য। তাদের কঠিন কঠিন সব প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়; ফিলিস্তিনিদের মতো কথা বলতে, আচরণ করতে ও ভাবতে বলা হয়। এই ইউনিটগুলোর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করা আর ফিলিস্তিনিদের সাথে মিশে তাদের গ্রেফতার করা।

মুস্তারেবিন বাহিনীর প্রথম ইউনিটটি ১৯৪২ সালে গড়ে তোলা হয়। তখন অবশ্য ইজরাইল রাষ্ট্রের জন্মই হয়নি। প্রথম দিকে এটি পালমাখের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার হলো– আলাদা আলাদা মিশনের জন্য মুস্তারেবিন-এর ইউনিটগুলো সাজানো হয়। মিশন শেষ হলে পুনরায় নতুন করে ইউনিট গড়া হয়। এই গুপ্তচর সংস্থার সবাইকে বাধ্যতামূলকভাবে আরবি জানতে হয়। যাদের যেসব আরব দেশে মিশনের জন্য পাঠানো হয়, সেসব দেশের আঞ্চলিক উপভাষার ওপরও তাদের কোর্স করানো হয়। যেমন : কাউকে তিউনিশিয়া পাঠালে সেখানকার মানুষ যেভাবে আরবি উচ্চারণ করে সেভাবে তাকেও শিখতে হয়, আবার ইয়েমেনে পাঠানো হলে তাদের মতো করেই উচ্চারণ জানতে হয়।

এই কোর্সগুলো সাধারণত চার থেকে ছয় মাস মেয়াদি হয়ে থাকে। এ ছাড়া, তাদের আরবদের মতো ধর্মীয় প্রথা জানতে হয়; এমনকী আরবরা যে কায়দায় নামাজ পড়েন, মুনাজাত করেন এসব শেখানো হয়। তাদের ছদ্মবেশ ধারণ করা শেখানো হয়, তবে ছদ্মবেশের ধরন কী হবে সেটা সংশ্লিষ্ট দেশ বা অঞ্চলের সাথে মানানসই হতে হয়। সদস্যদের দেহের সাথে মানানসই কি না সেটাও দেখা হয়। সব মিলে তাদের ১৫ মাসের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। কীভাবে স্নাইপিং করতে হয়, কীভাবে ফিলিস্তিনি জনবসতিগুলোতে ঘুরে বেড়ানো যায় সেগুলো শেখানো হয়।

রিমন নামে এই বাহিনীর একটি ইউনিট ছিল, যা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল ১৯৭৮ সালে আর ভেঙে দেওয়া হয় ২০০৫ সালে। এই ইউনিটকে গাজা উপত্যকায় কাজে লাগানো হয়েছিল। ৮০ ও ৯০-এর দশকে সিমশন নামে গাজায় অপর একটি ইউনিট কাজ করত।

তবে 'The Duvdevan ২১৭ নামের ইউনিটটি সবচেয়ে সক্রিয় যা ৮০'র দশকে ইজরাইলের সাবেক প্রধানমন্ত্রী এহুদ বারাকের হাত ধরে গড়ে ওঠে। এটি বর্তমানে পশ্চিম তীরে বেশ সক্রিয়।

১৯৪৮ সালে মুস্তারেবিন সদস্যরা মুসলিম ব্রাদারহুড নেতা শেখ নিমর আল-খাতিবকে হত্যার টার্গেট করে। হত্যার নির্দেশটি এসেছিল হাগানা থেকে। আরব হায়ার কমিটি এবং ইসলামিক অর্গানাইজেশন অফ প্যালেস্টাইনের নেতা হওয়ায় স্থানীয় মুসলমানদের ওপর শেখ নিমরের ব্যাপক প্রভাব ছিল। হাগানার কিছু ইউনিট কয়েকদফার চেষ্টায় তাকে হত্যা করতে চেয়ে ব্যর্থ হলে পরবর্তী সময়ে দায়িত্ব এসে পড়ে মুস্তারেবিনের ওপর।

১৯৪৮ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি। সিরিয়ার দামেস্ক থেকে ফিলিস্তিনে ফিরছেন শেখ নিমর। এ খবর আগেই জেনে যায় ইজরাইলি গুপ্তচররা। মুস্তারেবিন সদস্যরা ব্রাদারহুডের এই নেতাকে টার্গেট করে আরব অধ্যুষিত হাইফা এলাকায়। তারা শেখ নিমরের গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। গুরুতর আহত হন শেখ নিমর। এ ঘটনার পরই তিনি ছাড়েন ফিলিস্তিন। সেই যে গেলেন, প্রথম আরব-ইজরাইল যুদ্ধের পুরো সময় আর ফেরেননি।

মুস্তারেবিন হাইফাতে এ রকম আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনে অংশ নেয় বেশ কয়েকদিন বাদেই। ইহুদি গুপ্তচররা নিশ্চিত হয়, ফিলিস্তিনি আরবদের একটি গ্রুপ ক্যাফেতে বসে হাইফার একটি ইহুদি বসতির ওপর গাড়িবোমা হামলার পরিকল্পনা করছে। খবরটা এ রকম, আরবরা একটি ব্রিটিশ অ্যাম্বুলেন্স জোগাড় করেছে এবং নাজারেত রোডের একটি গ্যারেজে সেটিকে বিস্ফোরকসহ প্রস্তুত করছে।

ইহুদিদের কাছে পবিত্র হিসেবে পরিচিত নাজারেত এলাকাটি তুলনামূলক আরব অধ্যুষিত, তাই আরবদের গাড়িবোমা হামলা ঠেকানোর দায়িত্ব দেওয়া হলো মুস্তারেবিনকে। ভিন্ন কৌশলে এগোলো মুস্তারেবিন। তারা নিজেরাই আগে ভাগে ট্রাক বোমা হামলার পরিকল্পনা ফাঁদল। বিস্ফোরক বোঝাই একটি ট্রাক নিয়ে গ্যারেজের দিকে যাত্রা শুরু করল এর সদস্যরা। আরব শ্রমিকদের ছদ্মবেশে কোনোরকম বাধা ছাড়াই ঠিক ওই গ্যারেজের দেয়ালের সামনে গিয়ে ট্রাকটি পার্ক করা হয়। এরপর আগে থেকে সেখানে রাখা অন্য একটি গাড়িতে করে ফিরে আসে তারা।

কয়েক মিনিট পরেই বিস্ফোরিত হয় গাড়িতে রাখা বোমাটি। একই সঙ্গে বিস্ফোরিত হয় গ্যারেজের ভেতরে থাকা অ্যাম্বুলেন্সের ভেতরের বোমাটিও। নিহত হয় বোমা নিয়ে আসা পাঁচ ফিলিস্তিনি।

ইজরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হাগানাসহ আগের সকল সশস্ত্র ইউনিটগুলো নিজেদের নাম-পরিচয় বিলীন করে প্রতিরক্ষাবাহিনীতে একীভূত হলেও মুস্তারেবিন এখনও রয়ে গেছে এবং দিন দিন এই বাহিনীকে যোগ্য ও দক্ষ করে গড়ে তোলা হচ্ছে।

শিনবেত

ইহুদি গোয়েন্দাসংস্থা 'শিনবেত'। আরবদের কাছে এই সংস্থা 'সাভাক' নামে পরিচিত। সাভাক নামে ইরানের শাহ মোহাম্মদ রেজা শাহ পাহলভিরও একটা গোপন বাহিনী ছিল।

শিনবেত (Shin Bet) গঠন করেছে হাগানা। ইজরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগেই বেন গুরিয়নের নির্দেশে শিনবেত গঠন করা হয় যা ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত পরিচিত ছিল Taboo নামে। টার্গেটকৃত ব্যক্তির ফোন ট্র্যাক করা, ই-মেইল হ্যাক করা, আটক করা, আর ব্যক্তির মেডিকেল ও ব্যক্তিগত তথ্য হাতিয়ে নেওয়া ছিল বাহিনীর নিত্যকার কর্ম। কাউকে আটক করার আগেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যাবতীয় তথ্য তারা নিয়ে নিত, যাতে ইন্টারোগেশনে সুবিধা হয়। এ ক্ষেত্রে তারা স্যাটেলাইট প্রযুক্তিও ব্যবহার করে থাকে। বিশেষত কালো তালিকাভুক্ত আর ইজরাইল-ফিলিস্তিনি রাজনৈতিক নেতাদের তারা টার্গেট করত বা এখনও করে থাকে।

শিনবেত ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাকে নিয়ন্ত্রণের কোনো আইন ছিল না। সংবিধান দিয়েও নিয়ন্ত্রণ করা যেত না। জনগণ এই বাহিনীকে ঈশ্বরতুল্য ভাবত। ইজরাইলিরা মনে করত, এরা তো কোনো ভুল করতেই পারে না!

কিন্তু আশির দশকের একটি ঘটনায় সাধারণ ইজরাইলিদের ভুল ভাঙে। ১৯৮৪ সালের ১২ এপ্রিল সন্ধ্যায় একটি ইজরাইলি বাস হাইজ্যাক করে চার আরব ফিলিস্তিনি। তারা গাজার খান ইউনিস এলাকা থেকে এসেছিল। বাসটি যাচ্ছিল তেলআবিব থেকে আস্কেলনের দিকে। চার ফিলিস্তিনিসহ এতে ছিল ৪৪ জন যাত্রী। ২০ বছর বয়সি জামাল মাহমুদ কাবালানের নেতৃত্বে হাইজ্যাকাররা এটি নিতে চেয়েছিল মিশর সীমান্তের কাছে। বাকি তিন ফিলিস্তিনি হলেন মোহাম্মদ বারাকা, মাজদি এবং সুভি আবু জুমাআ। এরা কোনো সন্ত্রাসী সংগঠনের সাথে জড়িত ছিল না; এমনকী সেদিন তাদের কাছে কোনো বিস্ফোরকও ছিল না। তারা ছুরি আর এসিড জাতীয় পদার্থ বহন করছিল। যদিও বাসযাত্রীদের ভয় দেখাতে তারা বলেছিল তাদের কাছে বোমা রয়েছে।

খবর পেয়ে নিরাপত্তা বাহিনী গাজার দেইর আল বালাহ এলাকায় বাসটি ঘিরে ফেলে। স্নাইপারের গুলিতে মারা যান দলনেতা কাবালান। পরে ইজরাইলি সেনাদের গুলিতে নিহত হন বারাকাও। বাকি দুজন হাইজ্যাকারকে জীবিত ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। এই দুজনকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে প্রধান প্যারাট্রুপার ও পদাতিক বাহিনীর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আইজ্যাক মরদেখাই শিনবেতের কাছে হস্তান্তর করে। কিন্তু ইজরাইলি রেডিওতে জানানো হয়, বাসটি উদ্ধার করা হয়েছে এবং এ সময় সংঘর্ষে চার ফিলিস্তিনি হাইজ্যাকার নিহত হয়েছে।

আব্রাহাম শ্যালম তখন ছিলেন শিনবেত প্রধান। তিনি ছিলেন বেশ উগ্র, একগুঁয়ে ও রগচটা। ১৮ বছর বয়সে এই ব্যক্তি ইহুদি আন্ডারগ্রাউন্ড বাহিনী পালমাখে যোগ দিয়েছিল। শ্যালম শিনবেত চালাচ্ছিলেন ইচ্ছেমতো, তাকে তার অধীনস্থদের কেউ কেউ স্বেচ্ছাচারী বলে ডাকত।

রেডিওতে সব নিহতের খবর এলেও বিপত্তি বাধায় এক ইজরাইলি সাংবাদিক। ফটো সাংবাদিক Alex Levac বাস উদ্ধারের সময়কার কয়েকটা ফটো তুলতে পেরেছিলেন। তারই একটা ফটোতে ধরা পড়ে এক হাইজ্যাকারকে জীবিত ধরে নিয়ে যাচ্ছে শিনবেত সদস্যরা। অবশ্য ফটো তোলার সময় বাধার মুখে পড়েছিলেন আলেক্স। পরে আরও এক হাইজ্যাকারকে জীবিত ধরে নিয়ে যাওয়ার খোঁজ পান তিনি। এই দুজনকে পরে খুন করা হয়েছে ঠান্ডা মাথায়। শিনবেত প্রধান আব্রাহাম এদের একজনকে খুলি বরাবর গুলি করেছিলেন। পরে দুজনকে নিয়ে যাওয়া হয় শিনবেতের ইন্টারোগেশন সেলে।

এদের প্রহরা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল বার্ড ইউনিটের সদস্যরা। আব্রাহাম শ্যালম এই ইউনিটের কমান্ডার এহুদ ইয়াতমকে সংকেত দিলেন– 'শেষ করে দিয়ো।' শ্যালম তাদের বিচারের মুখোমুখি করতে চাননি। তার ধারণা ছিল, এতে সন্ত্রাসী তৎপরতা উৎসাহ পাবে। ইয়াতম ও তার সহযোগীরা দুজনকে নিয়ে গেল ঘটনাস্থলের কয়েক কিলোমিটার দূরের নির্জন এক মাঠে। সেখানে পাথর আর লোহার দণ্ড দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হয় মাজদি আর সুভিকে।

রেডিওতে বলা হলো চার হাইজ্যাকার নিহত অথচ দুজনকে জীবিত ধরে নিয়ে যাওয়ার ফটো আছে আলেক্সদের কাছে! ছবিসহ একটি অনুসন্ধানী রিপোর্ট ছেপে দেন পত্রিকায়। ছবিতে যাকে ধারণ করতে পেরেছিলেন তিনি ছিলেন মাজদি।

এর মাত্র দুদিন পর শ্যালম ও শিনবেতের ১০ সদস্য; যারা এই হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিল, তারা তেলআবিবের উত্তরে নেতানিয়া এলাকার এক বনাঞ্চলে একত্রিত হন। ঘটনা ফাঁস না করার শপথ নেন তারা। কারণ, ঘটনা ফাঁস হয়ে গেলে তাদের বিচার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তারা এর দায় চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আইজ্যাক মরদেখাইয়ের ওপর।

প্রধানমন্ত্রী আইজ্যাক শামির ও আব্রাহাম শ্যালমের বিরোধিতা সত্ত্বেও প্রতিরক্ষামন্ত্রী মোশে আরিন্স একটি ইনকোয়ারি কমিশন করার নির্দেশ দেন। আইন মন্ত্রণালয়ও আরেকটি কমিটি করে। ইনকোয়ারি কমিশন মরদেখাইয়ের বিরুদ্ধে কোর্ট মার্শালের সুপারিশ করে যা থেকে পরে নির্দোষ প্রমাণিত হন তিনি। সবশেষ বিচার মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আরও দুটি তদন্ত কমিটি হয়। অ্যাটর্নি জেনারেল জামির দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নেন। চাকরি চলে যায় শিনবেতপ্রধান আব্রাহাম শ্যালমের। বরখাস্ত হয় আরও কিছু শীর্ষ কর্মকর্তা।

ইজরাইলিদের ভুল ভাঙে। তার তিন বছর পর একটি সংসদীয় কমিশন (লান্দাউ কমিশন) গঠন করা হয়। কমিশনের প্রতিবেদনে শিনবেতের কিছু অপকর্ম উঠে আসে। তবে তারা জানায়, কারও কাছে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য থাকলে 'Moderate and reasonable physical Torture' করা যাবে!

১৯৯৯ সালে ইজরাইলের সুপ্রিমকোর্ট বাহিনীটির কিছু ক্ষমতা কেড়ে নেয়। ২০০২ সালের মে মাসে এর ওপর চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে ইজরাইলি পার্লামেন্ট নেসেট। এখন কোনো কিছু করতে হলে শিনবেতকে 'ইনস অ্যান্ড আউটস' জানাতে হয় নেসেটের ফরেন অ্যান্ড সিকিউরিটি কমিটিকে। এই কমিটিকে ওভারটেক করার কোনোও সুযোগ নেই।

সরকারের চিফ লিগাল অ্যাডভাইজার এই সংস্থার কার্যক্রম অ্যাপ্রুভ করে থাকেন।

শিনবেত এ পর্যন্ত হাজার হাজার ফিলিস্তিনিকে আটক করেছে, জিজ্ঞাসাবাদের নামে টর্চার করেছে। শত শত ফিলিস্তিনিকে এরা তুলে নিয়ে গেছে, যারা আর কখনোই ফিরে আসেনি।

সপ্তদশ অধ্যায়

মিডিয়া ও আরব রাজনীতিতে উপেক্ষিত প্যালেস্টাইন

'By God, we will not leave one Jew in Palestine. We will fight them with all the strength we have. This is our land, not the Jews.'—Abdel Aziz Rantisi

ইঞ্জিনিয়ারিং অব কনসেন্ট

ওয়াশিংটন পোস্ট, নিউইয়র্ক টাইমস, বিবিসি ও ব্লুমবার্গের মতো মিডিয়া কি পশ্চিমাদের প্রচার কৌশলের সহযোদ্ধা? এ প্রশ্নগুলো বারবারই উঠেছে এবং এগুলো উড়িয়ে দেওয়ার মতোও নয়।

কেন বলছি? চলুন একটু আলোচনা করি। গুয়েতেমালার অভ্যুত্থানে নিউইয়র্ক টাইমস উৎসাহ দিয়েছিল। এমনকী ১৯৫৩ সালে ইরানের মোসাদ্দেক সরকারকে উৎখাতের প্রশংসা করেছিল পত্রিকাটি। তারা তাদের সম্পাদকীয়তে এই ঘটনাকে 'মহান' বলে উল্লেখ করেছিল। ইরাকের হাতে ব্যাপক গণবিধ্বংসী অস্ত্র রয়েছে, দেশটির সরকারের সাথে আল-কায়েদার সম্পর্ক রয়েছে; এমনকী ইরাক সরকার ৯/১১ হামলার সাথে সম্পৃক্ত এমন অভিযোগগুলো যখন হালে পানি পাচ্ছিল না, তখন জুনিয়র বুশকে ভিন্ন কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়েছিল। আর তা হলো– মধ্যপ্রাচ্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার তথাকথিত মিশন।

তথাকথিত বলছি কারণ– যুক্তরাষ্ট্র ফেরি করে এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা আর লাতিন আমেরিকায় গণতন্ত্র বিক্রি করলেও দেশটির চাইতেও অধিকতর গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসা পৃথিবীর অনেক দেশের সরকারকে তারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে হটিয়ে দিয়েছে। কেবল গত তিনদশকেই এ রকম বহু নজির তারা গড়েছে। অন্তত দুটি উদাহরণ চোখের সামনে স্পষ্ট ভাসছে– হাইতি (১৯৯০) ও মিশর (২০১৩)। যুক্তরাষ্ট্র মিডিয়াকে ব্যবহার করে ভিনদেশে আক্রমণের বৈধতা জনগণের কাজ থেকে আদায় করে নেওয়ার উদাহরণ তৈরি করেছে।

বুশের অজুহাতগুলো ভেস্তে যাওয়ার পর ইরাক আক্রমণের বৈধতা পেতে তিনি যখন নতুন পরিকল্পনা সামনে নিয়ে এলেন, তখন ওয়াশিংটন পোস্টের স্বনামধন্য সম্পাদক ডেভিড ইগনাটিস অভিভূত হয়ে পড়েন। তিনি ইরাক যুদ্ধকে ওই সময়ের সবচেয়ে আদর্শবাদী যুদ্ধ বলে সার্টিফিকেট দেন। এই যুদ্ধের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য যুক্তি ছিল এটা- একজন স্বৈরশাসকের অবসান ঘটিয়ে গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করেছিল! নোয়াম চমস্কি এক সাক্ষাৎকারে ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন–

'চেঙ্গিস খানের নথিপত্র ঘাঁটলেও তার লাখ লাখ মানুষ হত্যার পেছনে এ রকম কোনো মহৎ উদ্দেশ্যের সন্ধান পাওয়া যেত!' এ প্রসঙ্গে রুশ বংশোদ্ভূত মার্কিন সাংবাদিক আন্দ্রে ভিচেকের একটি মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে–

'পশ্চিমা প্রোপাগান্ডা (মিডিয়া) চাইলে দুনিয়ার যেকোনো প্রান্ত থেকে মানুষকে এক করে ফেলতে পারে, জড়ো করতে পারে যেকোনো উদ্দেশ্যে, যেকোনো লক্ষ্যে। যেকোনো কারণেই হোক এরা দেশে দেশে পরিবর্তনের সংগ্রাম তৈরি করতে পারে। এটা পৃথিবীর সবচেয়ে শান্তিপ্রিয় দেশকে বলতে পারে বিশ্বশান্তির জন্য এক ভয়াবহ হুমকি এবং এরা পশ্চিমের একগাদা দেশ– যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সারা দুনিয়াকে আতঙ্কের সভ্যতা বানিয়ে রেখেছে, তাদেরকেই তুলে ধরতে পারে দুনিয়ার শান্তি ও গণতন্ত্রের প্রধান রক্ষক হিসেবে এবং বেশিরভাগ মানুষ তা বিশ্বাসও করে। পশ্চিমের প্রায় সকল মানুষ এসব বিশ্বাস করে থাকে। এই গ্রহের বেশিরভাগ মানুষই তা বিশ্বাস করবে। কারণ, পশ্চিমা প্রচারণা এত নিখুঁত, উন্নত ও অগ্রসর। আমি জানি, পশ্চিমা প্রচারণা কী ভয়াবহ রকমের দুষ্ট প্রকৃতির হতে পারে। এদের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে আপনাকে তথ্য দিয়ে সচেতন করা নয়; আপনার সমাজকে, দেশকে আঘাত করা, ভেঙে টুকরো টুকরো করা।'[১০২]

আবার প্যালেস্টাইন ইস্যুতে ফেরা যাক। ওয়াশিংটন পোস্টের একটি প্রো-ইজরাইল রিপোর্টের উল্লেখ করা যেতে পারে। পত্রিকাটিতে শিশুদের দৈনন্দিন খবরের জন্য 'কিডস পোস্ট' নামে একটি অংশ আছে। ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাতের মৃত্যুর পর পত্রিকাটির এই অংশে একটি আর্টিকেল ছাপানো হয়; যেখানে বলা হয়– ইজরাইলি জনগণের ওপর তিনি বারবার হামলা চালিয়েছিলেন। এ কারণে মানুষ তাকে ঘৃণা করে! ওয়াশিংটন পোস্টের এমন প্রচারণার কারণ খুঁজে বের করেছিলেন নোয়াম চমস্কি। তিনি বলেছিলেন– 'এর মানে হলো পত্রিকাটি বাচ্চাদের শেখাচ্ছে, দখলকৃত ভূখণ্ড ইজরাইলেরই অংশ।' পশ্চিমারা বিশেষ করে মার্কিনিরা নিজেদের নানা বিতর্কিত কর্মকাণ্ডের পক্ষে সাফাই গাইতে 'ইঞ্জিনিয়ারিং অব কনসেন্ট' তত্ত্বের প্রয়োগ দেখিয়েছেন।

---

[১০২]. On Western Terrorism: From Hiroshima to Drone Warfare, নোয়াম চমস্কি ও আন্দ্রে ভিচেক পশ্চিমা সন্ত্রাসবাদ প্রসঙ্গে হিরোশিমা থেকে ড্রোনযুদ্ধ শিরোনামে অনুবাদ মুহাম্মদ গোলাম সারওয়ার, পৃষ্ঠা-৬০ থেকে ৭০

বিষয়টি সহজভাষায় ব্যাখ্যা করছি। ধরুন, আপনি পলিসি মেকিং-এ আছেন অথবা পলিসি মেকিং-এ আপনি ভূমিকা রাখার ক্ষমতা রাখেন কিংবা প্ররোচিত করতে পারেন। একটা সিদ্ধান্ত আগেই নিয়ে ফেলেছেন অথবা নিজের মতো করে সিদ্ধান্ত নিতে চান। সেইসঙ্গে চান জনমত আপনার সিদ্ধান্তের পক্ষেই থাকুক। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের আগে জনমতকে নিজের পক্ষে নেওয়ার এই যে কায়দা-কানুন, এই পুরো প্রক্রিয়াকেই সরল বাংলায় 'ইঞ্জিনিয়ারিং অব কনসেন্ট' বলা হয়। বুদ্ধিজীবী, সুশীল সমাজ এমনকী মিডিয়াও এই প্রক্রিয়ার একটা অংশ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ১৯১৬ সালের নির্বাচনে জয়ী হয়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন উড্রো উইলসন যাকে উদারবাদের জনক বলা হয়ে থাকে। যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই– এটি ছিল উইলসনের স্লোগান। কিন্তু এই উইলসনরা ক্ষমতায় এসে কী করলেন? যুদ্ধের বিষ ছড়াতে লাগলেন। কয়েক মাসের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্র একটা যুদ্ধবাজের দেশে পরিণত হলো। তারা জার্মানদের কোনো কিছুই মানতে পারছিল না। জার্মানবিষয়ক সবকিছুই তারা ধ্বংস করতে চেয়েছিল।

জার্মানদের প্রতি এমন বিতৃষ্ণা ও ডমিনেন্ট আচরণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ বলে অনেকেই বলেছেন। যাই হোক সে বিষয়ে আমার আলোচনা না। প্রচার বিশেষজ্ঞ অ্যাডওয়ার্ড বার্নেসের নাম হয়তো অনেকেই জানেন। তাকে ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানি নিয়োগ দিয়েছিল ভুয়া সংবাদ তৈরির জন্য। তিনি আর বিংশ শতাব্দীর অন্যতম বুদ্ধিজীবী ওয়াল্টার লিপম্যান উড্রো উইলসনের প্রচার কৌশলের সদস্য ছিলেন। বার্নেসের মতে, কোনোও সম্প্রদায়ের অধিকতর জ্ঞানী গোষ্ঠী জনসাধারণের মতামতকে সুকৌশলে নিজেদের দিকে পরিচালিত করতে পারেন। এটাকে তিনি নাম দিয়েছেন 'ইঞ্জিনিয়ারিং অব কনসেন্ট'। মজার বিষয় হলো, বার্নেস এই থিউরিকে গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হিসেবে মানতেন! লিপম্যান অবশ্য অন্য টার্ম ব্যবহার করেন। তার ভাষায়– এটা 'ম্যানুফেকচার কনসেপ্ট'।

আমেরিকা 'ইঞ্জিনিয়ারিং অব কনসেন্ট' কোথায় অ্যাপ্লাই করেনি– সেটাই এখন গবেষণার বিষয়। গত দুই দশকের মধ্যে এই থিউরির সবচেয়ে সফল ব্যবহার হয়েছে ইরাক যুদ্ধে। ইরাকে গণবিধ্বংসী অস্ত্র ছিল না, কিন্তু বুশ প্রশাসন মার্কিনিদের বোঝাতে পেরেছিল– সাদ্দামের কাছে গণ-মারণাস্ত্র আছে। জাতিসংঘ এমনকী ফরাসি প্রেসিডেন্ট জ্যাক শিরাক ইরাক যুদ্ধের বিরোধিতা করলেও বুশ তার ইউরোপীয় ও ন্যাটো মিত্রদের নিয়ে যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত গিয়েছিলেন। কারণ, বেশিরভাগ মার্কিনিকে তিনি যুদ্ধের পক্ষে টানতে পেরেছিলেন।

এর আগে নিকারাগুয়া, পানামা, সালভাদর আর হন্ডুরাসের মতো জায়গায়ও 'ইঞ্জিনিয়ারিং অব কনসেন্ট'-এর ব্যবহার হয়েছে মার্কিন যুদ্ধবাজ প্রশাসনের মাধ্যমে।

নিউইয়র্ক টাইমস-এর মতো গণমাধ্যমকেও এ কাজে ব্যবহার করা হয়েছে! ১৯৪৭ সালে বার্নেস একই শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। পরবর্তী সময়ে প্রোপাগান্ডা নামে তিনি একটা বইও লিখেন। (ইম্পেরিয়াল অ্যাম্বিশনস, Imperial Ambitions: Conversations with Noam ChomsKz on the Post-9/11 World, conducted and edited by award-winning journalist David Byarsamian of Alternative Radio)

হামাসকে কেন সন্ত্রাসী সংগঠন মনে করে সৌদি আরব

আমেরিকার চোখে এই সময়ে মধ্যপ্রাচ্যে তার জন্য 'বড়ো হুমকি' দুটি। কথিত 'সন্ত্রাসবাদ' আর শিয়া রাষ্ট্র 'ইরান'। এখানে 'সন্ত্রাসবাদ' মানে 'ইসলামি সন্ত্রাসবাদ'। এসব হুমকি মোকাবিলায় যুক্তরাষ্ট্র চাইছে ইরানবিরোধী আরব রাষ্ট্রগুলোকে একই ছাতার নিচে নিয়ে আসতে; আরবদের ঐতিহাসিক শত্রু ইজরাইলের সাথে রাজতান্ত্রিক আরব শাসকদের মিত্রতা গড়ে তুলতে।

কাজটি কি খুব কঠিন? আপাতত ইজরাইলের সাথে আরব মিত্রতা এরই মধ্যে দৃশ্যমান হয়েছে। সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, ওমান আর মিশর প্রকাশ্যেই ইজরাইলের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছে। আরব অফিসিয়ালসরা গোপনে-প্রকাশ্যে তেল আবিব সফর করছেন। মিশর আর লিবিয়া ইস্যুতে ইজরাইল-আমিরাত আর সৌদি একাকার। সৌদি আরব আর আরব আমিরাত সামরিক পরামর্শ আর সমরাস্ত্র নেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে ইহুদি রাষ্ট্রটির কাছ থেকে। যদিও দুই দেশের কোনোটিরই ইজরাইলের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই।

ইরানের সাথে সৌদি আরবের দ্বন্দ্ব ৭৯ সালের ইসলামি বিপ্লবের পর থেকেই। ইরানে বিপ্লবের বছরেই সৌদি আরবে পবিত্র কাবা শরিফ অবরোধ করেছিল একদল বিদ্রোহী। বিদেশি সহায়তায় সেই বিদ্রোহ থামানো হয়; অভিযুক্তদের অনেককে ফাঁসি দেওয়া হয়। ২০১১ সালে আরব বসন্তপরবর্তী সময়ে মিশরে মুসলিম ব্রাদারহুডের (ইখওয়ানুল মুসলিমিন) উত্থান রাজতান্ত্রিক সৌদি আরবকে শঙ্কায় ফেলে দেয়। তখন থেকেই ব্রাদারহুড ঘনিষ্ঠ সব শক্তি আর রাজনৈতিক ইসলামকে হুমকি মনে করে আসছে সৌদি রাজ পরিবার। যেহেতু ব্রাদারহুড ঐতিহ্যগতভাবেই ইজরাইলি দখলদারিত্বের ঘোর বিরোধী। সেই হিসেবে 'শত্রুর শত্রু আমার বন্ধু' নীতিতেই ইজরাইল-সৌদি ঘনিষ্ঠতা বাড়ছে। আরব বসন্তের সময় সৌদি আরবের শিয়া অধ্যুষিত কাতিফেও দেখা দেয় গণ-অসন্তোষ। গণ-বিদ্রোহ দমন করা হয় শক্ত হাতে। ইরানপন্থি শিয়া নেতা শেখ নিমর আল নিমরসহ অনেককে ফাঁসিতে ঝোলানা হয়।

আমেরিকাও চাইছে মুসলিম ব্রাদারহুডের মতো সংগঠনগুলোর প্রভাব কমাতে। কিন্তু ইরানের ব্যাপারে যতটা প্রকাশ্যে কথা বলা যাচ্ছে, ব্রাদারহুডের ব্যাপারে ততটা খোলাসা হতে চায় না মার্কিন প্রশাসন। ২০১৮ সালের ৩১ শে জানুয়ারি মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর

হামাস নেতা ইসমাইল হানিয়াকে সন্ত্রাসী তালিকায় যুক্ত করে। অবশ্য ২০১৭ সালের জুলাই থেকেই ইউরোপীয় ইউনিয়নের সন্ত্রাসী তালিকায় আছে হামাস। মিশরে ব্রাদারহুড সমর্থিত মোহাম্মদ মুরসিকে উৎখাত করেও সৌদি আরব আর সংযুক্ত আরব আমিরাত স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারছে না। তাই উভয় দেশেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে ব্রাদারহুডের কার্যক্রম।

২০১৩ সালের ২৫ শে ডিসেম্বর মুসলিম ব্রাদারহুডকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে তালিকাভুক্ত করে মিশর। আর সৌদি আরব ২০১৪ সালের ৭ মার্চ এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত ২০১৪ সালের ১৫ই নভেম্বর ব্রাদারহুডকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে তালিকাভুক্ত করে। আরব শাসকরা রাজনৈতিক ইসলামের বিরোধিতা করে ব্রাদারহুডকে সন্ত্রাসী তকমা দিয়েছেন। কিন্তু তারা এ ক্ষেত্রে কতটুকু বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন কিংবা তাদের সিদ্ধান্ত কতটা যৌক্তিক ছিল– সেই প্রশ্নটি ছুড়ে দেওয়া যেতেই পারে। কারণ, পশ্চিমের যুক্তরাষ্ট্রও এটা মানছে যে ব্রাদারহুড একটি শান্তিপূর্ণ সংগঠন, যারা তাদের মতোই গণতান্ত্রিক। যুক্তরাষ্ট্রের মতো ইউরোপীয় ইউনিয়নও মনে করে না, মুসলিম ব্রাদারহুড কোনো সন্ত্রাসী সংগঠন। তাদের সন্ত্রাসী তালিকাতেও নেই ব্রাদারহুডের নাম।

আরবরা হামাসের মতো একটি প্রতিবাদী সংগঠনকে সন্ত্রাসী বলছে, যারা ইজরাইলি দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। এই সংগঠন কখনোই ইজরাইল অধিকৃত ভূখণ্ডে ঢুকে সামরিক অভিযান চালায়নি। এটা পরিষ্কার– সৌদি আরব, মিশর ও সংযুক্ত আরব আমিরাত হামাসকে সন্ত্রাসী তালিকায় রাখার বিষয়ে সম্ভাব্য জটিলতার বিষয়ে সচেতন। তারা হামাস ও ফাতাহর মধ্যে সমঝোতা সংলাপ করেছে। একই সঙ্গে তারা সন্ত্রাসবিরোধী লড়াইয়ে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ইজরাইলের পাশে থাকতে চায়।

২০১৭ সালের মে মাসে রিয়াদে যে আরব-ইসলামিক শীর্ষ সম্মেলন হয়, সেখানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হামাসকে আলকায়েদা ও দায়েশের (আইএস) সঙ্গে তুলনা করেন; এমনকী হামাস সদস্যদের তাদের ভূখণ্ড থেকে বহিষ্কার করতে আরব শাসকদের প্রতি আহ্বান জানান। সৌদি আরবের তখনকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আদেল আল জুবায়ের ইউরোপীয় পার্লামেন্টে হামাসের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের ভুলপথে চালিত করার অভিযোগ আনলে হামাস বিবৃতি দিয়ে এর নিন্দা জানায় এবং বলে, এটি সৌদি আরবের জনগণের বক্তব্য নয়।

২০১৮-তে সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান যুক্তরাষ্ট্র সফরের সময় AIPAC-এর (American Israel Public Affairs Committee) ও অ্যান্টি-বিডিএস নেতাদের সাথে বৈঠক করেছেন।[১০৩] তিনি এমন সব ইহুদি নেতাদের সাথে বৈঠক করেছেন,

---

[১০৩]. MBS meets AIPAC, anti-BDS leaders during USvisit, Aljazeera. 29 Mar 2018.

যারা প্যালেস্টাইনে ইহুদি বসতি নির্মাণে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার অর্থ খরচ করছেন। এ ছাড়া তিনি বৈঠক করেছেন Stand Up for Israel (ADL), the Jewish Federations of North America (JFNA). B'nai B'rith, the American Jewish Committee (AJC)-এসব সংগঠনের নেতাদের সাথেও।

Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman meets Thursday in Riyadh, Saudi Arabia, with author Joel Rosenberg, part of a delegation of American evangelical leaders. (Reuters)

এগুলোর মধ্যে জেফনা (JFNA) ২০১২ থেকে ২০১৫ সালে প্যালেস্টাইনে ইহুদি বসতি নির্মাণে ৬ মিলিয়ন ডলার অর্থ খরচ করেছে। একই বছরের শেষে যুবরাজ রিয়াদে মার্কিন ইভানজেলিক অ্যাডভাইজারদের সাথেও বৈঠক করেছেন।[১০৪] এই বৈঠক হয়েছে সাংবাদিক জামাল খাশোগি খুনের পর যখন হত্যাকাণ্ডের জন্য তাকেই দায়ী করা হচ্ছিল।

যুবরাজ বিন সালমান রাজনৈতিক ইসলাম ও ব্রাদারহুড দমাতে কতটা মরিয়া, তা সৌদি ভিন্ন মতাবলম্বী সাংবাদিক জামাল খাশোগি হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়েই প্রমাণিত হয়। সৌদি আরব থেকে বিশেষ বাহিনীর সদস্য পাঠিয়ে তুরস্কের ইস্তাম্বুলের সৌদি কনস্যুলেটে খুন করে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয় খাশোগির মরদেহ।

১০৪. Trump's evangelical advisers meet with Saudi Crown Prince and discuss Jamal Khashoggi's murder, Òhuman rights," spokesman says, washingtonpost, November 2, 2018.

আরবদের কাছে হালকা হয়ে যাচ্ছে প্যালেস্টাইন ইস্যু

২০১৮ সালের দিকে গণমাধ্যমে কিছু ছবি ও ভিডিও প্রকাশ পায়, যাতে দেখা যায়– আল আকসা মসজিদ কম্পাউন্ডের 'দামাস্কাস গেইটে' পর্যবেক্ষণ টাওয়ার বসিয়েছে ইজরাইলি প্রতিরক্ষাবাহিনী। খোদ ইজরাইলি পত্রিকা লিখে, মুসলমানদের সবচেয়ে পুরোনো এই কেবলার প্রবেশপথে সম্প্রতি যে ইজরাইলি সামরিক উপস্থিতি বেড়েছে, এটা তারই একটি নমুনা বা নিদর্শন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কতৃক জেরুজালেমকে ইজরাইলের চিরস্থায়ী রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া এবং আল আকসা মসজিদের প্রবেশপথে ইজরাইলের পর্যবেক্ষণ টাওয়ার বসানোর মাঝে সময়ের পার্থক্য খুব বেশি না। ইজরাইল নতুন করে হাজার হাজার ইহুদি বাড়ি নির্মাণের পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে। আর যুক্তরাষ্ট্র শিগগিরই জেরুজালেমে দূতাবাস স্থানান্তরের কথা জানিয়েছে।

আল আকসা মসজিদের প্রবেশপথে ইজরাইলের পর্যবেক্ষণ টাওয়ার নির্মাণের পর প্রতিক্রিয়ার বিষয়টি আমলে নিলে দেখা যায়– প্যালেস্টাইন ও জেরুজালেম ইস্যুটি আরব তথা মুসলিম বিশ্বের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার তালিকা থেকে ছিটকে পড়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরাইলের সাম্প্রতিক পদক্ষেপের বিপরীতে নিন্দা আর ছোটোখাটো কিছু বিক্ষোভ-প্রতিবাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল মুসলিম প্রতিক্রিয়া।

হতাশার খবর আরও আছে। যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে জেরুজালেমকে ইজরাইলের স্থায়ী রাজধানী ঘোষণার পর পালটা প্রতিক্রিয়া হিসেবে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে ৫৭ সদস্যের ওআইসির যে শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে মাত্র ১৬টি দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানের অংশগ্রহণই এটা পরিষ্কার করে দেয়– প্যালেস্টাইন এখন আর আরব ও মুসলিম বিশ্বের অগ্রাধিকার বিষয় নয়। ওআইসির ওই সম্মেলনে আরব ও মুসলিম নেতাদের উপস্থিতির চিত্র সত্যিই বেদনাদায়ক। অথচ আরব বিশ্ব আর মুসলমানরা জেরুজালেম ইস্যুকে তাদের জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু বলে মনে করত।

ট্রাম্পের ঘোষণার পর প্যালেস্টাইন কর্তৃপক্ষ তিন দিনের প্রতিবাদ কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছিল। কিন্তু এরাই যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরাইলবিরোধী আন্দোলনকারী ও বন্দিদের তথ্য ইজরাইলি গোয়েন্দা সংস্থার কাছে সরবরাহ করছিল! প্যালেস্টাইনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস অনেক ইজরাইলি কর্মকর্তার সাথে ফোনে কথা বলেছেন, দেখা করেছেন। তাদের আশ্বস্ত করেছেন– তিনি কখনোই নতুন কোনো ফিলিস্তিনি ইন্তিফাদা সহ্য করবেন না।

প্যালেস্টাইন আর জেরুজালেম ইস্যু যে এখন মুসলিম ও আরব দুনিয়ায় অগুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে পরিণত হয়েছে, তার আরেকটি লক্ষণ হচ্ছে কতিপয় আরব রাষ্ট্রের ইজরাইল কানেকশন। এই ইজরাইল কানেকশন বেড়েছে ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতায় আসার পর।

ট্রাম্পের ঘোষণার মাত্র দুই সপ্তাহ আগে মিশরের প্রেসিডেন্ট জেনারেল আবদেল ফাত্তাহ আল সিসির প্রশংসা করেন ইজরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। তিনি বলেন- মিশর ইজরাইলের উত্তম বন্ধু। ২০১৬ সালের জুলাইয়ে নেতানিয়াহু ও মিশরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শামেহ শুকরি জেরুজালেমে বসে ইউরো ফাইনাল-২০১৬ উপভোগ করেন।

কায়রোতে নিযুক্ত সাবেক ইজরাইলি রাষ্ট্রদূত ডেভিড গভরিন ২০১৭ সালের মার্চে নেতানিয়াহু ও সিসির মধ্যকার গোপন সম্পর্কের খবর ফাঁস করে দেন। নেতানিয়াহু এবং তার বিরোধী নেতা ইসহাক হারজগ কায়রোতে সিসির সাথে গোপনে মিলিত হয়েছিলেন। সিসি দুজনের মধ্যে মধ্যস্থতা করছিলেন। এই দুই নেতার সমঝোতায় ইজরাইলে একটি কোয়ালিশন সরকার গঠনে আরও কিছু আরব দেশ মধ্যস্থতা করে বলে আল-জাজিরায় ফাঁস হয়। আরব মুসলিম রাষ্ট্রগুলো স্থিতিশীল ইজরাইল রাষ্ট্র সমর্থন করছে, আর চাপ দিয়ে যাচ্ছে ইজরাইলে একটি শক্তিশালী সরকার গঠনের।

সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে ২০১৭ সালে গোপনে ইজরাইল সফরে যান। ইজরাইলের যোগাযোগমন্ত্রী আইয়ুব কারা বলেছিলেন, 'অনেকগুলো আরব দেশের সঙ্গে ইজরাইলের ভালো সম্পর্ক রয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে মিশর, জর্ডান ও সৌদি আরব।' এ ছাড়া উত্তর আফ্রিকার কিছু দেশ, আরও কিছু উপসাগরীয় দেশ ও ইরাকের একটি অংশের সাথেও ঘনিষ্ঠতার কথা জানান ইজরাইলি মন্ত্রী।

আরব দেশগুলোতে ইজরাইল এরই মধ্যে মিলিটারি অপারেশনও চালিয়েছে। নিউইয়র্ক টাইমস এক প্রতিবেদনে জানায় ইজরাইলি ড্রোন ও হেলিকপ্টার মিশরে শতাধিকবার হামলা চালিয়েছে এবং তাতে প্রেসিডেন্ট সিসির সম্মতি ছিল। পত্রিকাটি লিখে- 'তিন তিনটি যুদ্ধে একে অপরের বিপক্ষে থাকা মিশর এবং ইজরাইল এখন গোপন মিত্র জোট এবং তারা একটি কমন শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করছে।'

ফিলিস্তিনি সংগঠন হামাসের সাথে দায়েসের (আইএস) সম্পর্ক আছে, যুক্তরাষ্ট্র আর ইজরাইল এমন অভিযোগ তুলে আরব ও মুসলিমদের হামাস থেকে মুখ ফেরানোর চেষ্টা করছে। গাজাতে ইজরাইল সবশেষ যে বড়ো ধরনের হামলা চালায়, তখন নেতানিয়াহু বলেছিলেন- 'হামাসই আইএস, আইএসই হামাস।'

প্যালেস্টাইন ও জেরুজালেম ইস্যুতে মুসলিম ও আরবদের প্রতিক্রিয়া নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে ইজরাইল যা খুশি তাই করছে। কারণ, দেশটি আরব শাসকদের মনের কথা জানে।

অষ্টাদশ অধ্যায়

বিডিএস আন্দোলন

"People who call themselves supporters of Israel are actually supporters of its moral degeneration and ultimate destruction."
—Noam ChomsKz

বিডিএস কর্মীর নোবেল পুরস্কার অর্জন

২০১৮ সালে রসায়নে যৌথভাবে নোবেল পেয়েছেন তিনজন। তাদেরই একজন জর্জ পি স্মিথ, যিনি যুক্তরাষ্ট্রের মিসৌরি ইউনিভার্সিটির জীবতাত্ত্বিক বিভাগের অধ্যাপক। নোবেল পাওয়ার পরই ভালোভাবে আলোচনায় আসেন স্মিথ। তবে নোবেল বিজেতা হিসেবে নয়; তার আলোচনায় আসার কারণ তিনি ইজরাইলবিরোধী সংগঠন-বিডিএসের সাবেক একজন কর্মী। ইজরাইলি পত্রিকা হারেজ এক প্রতিবেদনে জানায়– জর্জ পি. স্মিথ ইজরাইল বয়কট আন্দোলন বিডিএস'র পুরোনো সমর্থক। বিডিএস আন্দোলনের যে নিজস্ব ওয়েবসাইট আছে, সেখানেও বিষয়টি স্বীকার করা হয়েছে এবং নোবেল পাওয়ার জন্য তাকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে। অভিনন্দন বার্তায় উল্লেখ করা হয়েছে–

> 'Professor Smith has consistently spoken out against Israel's egregiousviolations of Palestinian human rights, and taken the extremely important step of calling on his government in the United States to end arms sales to the Israeli military. His call to end military aid to Israel is not only deeply principled, but a critical and effective form of solidarity that we hope to see multiplied. The US government should be investing in human needs, including health, education and dignified jobs, rather than giving Israel $3.8 billion in military aid a year to repress and destroy Palestinian life.'

হারেজ দাবি করেছে, নিজের ফিলিস্তিনপন্থি রাজনৈতিক অবস্থানের কারণে মিসৌরি ইউনিভার্সিটিতে স্মিথ কিছুটা বিতর্কিত। ইজরাইল-বিরোধী ব্যক্তিদের তালিকা করে থাকে এমন বিতর্কিত একটি ওয়েবসাইট ক্যানারি মিশনেও তার নাম উল্লেখ আছে। পশ্চিমা গণমাধ্যম মতে– জর্জ পি. স্মিথ বিতর্কের জন্ম দেন ২০১৫ সালে। ওই বছর তিনি নিজের বিষয় জীবতত্ত্ব বাদ দিয়ে একবার 'জায়োনবাদ' নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ে স্নাতক পর্যায়ে ক্লাস নেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

জায়োনবাদবিরোধী লেখক ও ইতিহাসবিদ ইলান পাপ্পে *The Ethnic Cleansing of Palestine* নামে যে বই লিখেছেন তাতে স্মিথের ওইটিউটোরিয়াল অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা ছিল। ইজরাইলি মিডিয়ার ভাষায়, স্মিথ অন্য জাতিগোষ্ঠীর ওপর ইহুদি জাতির সার্বভৌমত্বের ধারণার বিরোধী। তবে সমালোচনা ও বিতর্কের মুখেও স্মিথ দমে যাননি। তিনি ইজরাইল-ফিলিস্তিন ইস্যুতে বিভিন্ন পত্রিকায় মতামত-নিবন্ধ লিখে গেছেন।
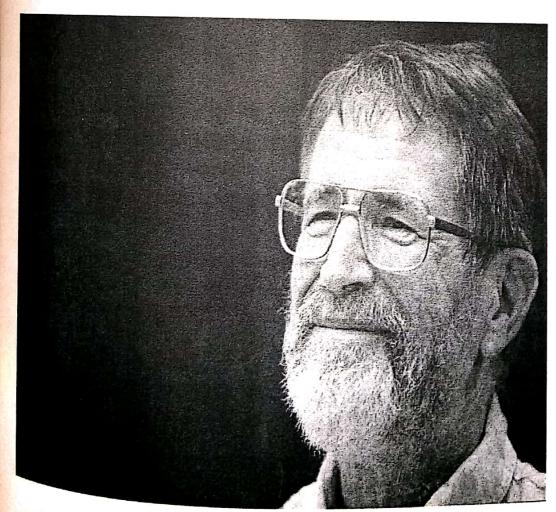
অধ্যাপক স্মিথ, ছবি-বিডিএস মুভমেন্টের ওয়েবসাইট

বিডিএস আন্দোলন কী

অধ্যাপক স্মিথের নোবেল প্রাপ্তির পরই নতুন করে বিডিএস আন্দোলনের ব্যাপারটি সামনে চলে আসে। যারা এই আন্দোলনের সাথে জড়িত, তারা মনে করেন ফিলিস্তিনিদের প্রতি 'অন্যায়' করছে ইজরাইল। বিশ্বজুড়ে ইজরাইল রাষ্ট্রের যেমন সমর্থক আছে, তেমনি ফিলিস্তিনি নির্যাতন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে নানা প্লাটফর্ম দাঁড়িয়ে গেছে। এদেরই একটি হচ্ছে বিডিএস মুভমেন্ট (BDS movement)।

প্যালেস্টাইনের সুশীল সমাজের আড়াইশোজনের মতো সদস্য ছোট্ট পরিসরে ২০০৫ সালে বিডিএস আন্দোলনের ডাক দেয়। আন্দোলন গোছানোর দায়িত্ব নেয় 'প্যালিস্টিনিয়ান বিডিএস ন্যাশনাল কমিটি'। ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থনে ২০০৫ সালের ৯ জুলাই ৭১টি ফিলিস্তিনি এনজিও এই আন্দোলন শুরু করে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে ইজরাইলি পণ্য বয়কট, ইজরাইল থেকে বিনিয়োগ সরিয়ে নেওয়া এবং ইজরাইলের ওপর অবরোধ আরোপের আহ্বান জানানোর মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল বিডিএসের কার্যক্রম। The Boycott, Divestment, Sanctions এই তিন শব্দের প্রথম অক্ষর নিয়ে সংক্ষেপে আন্দোলনটির নামকরণ করা হয় বিডিএস। সংস্থাটির ওয়েবসাইটে (https://bdsmovement.net/) বলা হয়েছে, তাদের লক্ষ্য হচ্ছে– ফিলিস্তিনিদের ওপর নির্যাতন-নিপীড়নে ইজরাইলের পেছনে থাকা আন্তর্জাতিক সমর্থন বিনষ্ট করা এবং ইজরাইলকে আন্তর্জাতিক আইন মানতে বাধ্য করা।

বিডিএসের আন্দোলন কৌশল ও অর্জন

১৪ বছরে পা রেখেছে বিডিএস আন্দোলন। এ আন্দোলনে ইজরাইল এখন পর্যন্ত বড়ো ধরনের কোনো ক্ষতির মুখে না পড়লেও তাতে যে দেশটি বেশ শঙ্কিত– এটা বোঝা যায় তাদের নেওয়া বেশ কিছু পদক্ষেপে। এর আগে (অক্টোবর, ২০১৮) লারা আল কাসিম নামে ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত এক মার্কিন ছাত্রীকে ইজরাইলের বেনগুরিয়ান বিমানবন্দরে আটক করা হয় বৈধ ভিসা থাকা সত্ত্বেও। লারা জেরুজালেমের হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ে মানবাধিকারের ওপর মাস্টার্স করতে এসেছিলেন। ২২ বছর বয়সি এই মার্কিনি বিডিএস আন্দোলনের সাথে যুক্ত– এমন অভিযোগে তাকে আটক করা হয়। পরে অবশ্য আদালতের হস্তক্ষেপে মুক্তি পান লারা।

ইজরাইল বিডিএস আন্দোলনকে কতটা ভয় পায়, তার প্রমাণ মেলে ২০১৭ সালের আরেক ঘটনায়। সে বছর আমেরিকার ডিকিনসন ও টেক্সাস অঙ্গরাজ্যে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানলে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করে ইজরাইল। সেখানে তাদের পক্ষ থেকে শর্ত দেওয়া হয়, ত্রাণ গ্রহণকারীরা বিডিএস আন্দোলনকে কখনো সমর্থন করবে না। ২০১৭ সালে ইজরাইল একটি আইন প্রণয়ন করে, যাতে যে সকল বিদেশি 'ইজরাইল বয়কট' আন্দোলনে জড়িত, তাদের দেশটিতে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞার বিধান রাখা হয়।

বিডিএস আন্দোলনে যেকোনো দেশের নাগরিক শরিক হতে পারেন। এই আন্দোলনের ফলে কারও চেতনায় পরিবর্তন এলে এবং সে একটু সচেতনভাবে সব ধরনের ইজরাইলি পণ্য ত্যাগ করলে তার চিহ্নিত হয়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। কারণ, চাইলেই পরিচয় গোপন রাখা যাবে। মোটা দাগে এই আন্দোলনের লক্ষ্য তিনটি–ফিলিস্তিনে ইজরাইলি দখলদারিত্বের অবসান, ফিলিস্তিনি নাগরিকদের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সব ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তুর নিজ মাতৃভূমিতে পুনর্বাসন। কেবল ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে কীভাবে এক সম্প্রদায়ের লোকেরা রাষ্ট্রীয়ভাবে নিষ্পেষিত হচ্ছে, মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, সেটা তুলে ধরাই আন্দোলনকারীদের কাজ। প্যালেস্টাইনে মানবাধিকার রক্ষার ওপর গুরুত্ব দেওয়ার কারণে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যারা মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করছেন, তাদের সাথে বিডিএস আন্দোলনের একটি সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ আমেরিকায় কালো মানুষের অধিকার নিয়ে সংগ্রাম করা ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার আন্দোলনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

ইজরাইল নানাভাবে বিডিএস আন্দোলনকে দমনের চেষ্টা করেছে। সদস্যদের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়েছে, হয়রানি করেছে। এই আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত বেশ কজনকে দেশটিতে ঢুকতেও দেওয়া হয়নি। কিন্তু তারপরও বিশ্বজুড়ে বিডিএস আন্দোলনের জনপ্রিয়তা বাড়ছে। এর ফলে ইজরাইলি অর্থনীতি হুমকির মুখে পড়ছে। বহির্বিশ্বে ইজরাইলের বিনিয়োগ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। তাই এই আন্দোলনকে অজনপ্রিয় করতে প্রচুর অর্থ খরচ করা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন কলেজ ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিডিএস আন্দোলনের ব্যাপারে নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টি এবং মার্কিন সরকারকে বিষয়টি বোঝাতে যে লবিস্ট নিয়োগ করেছে ইজরাইল, তার পেছনেই এরই মধ্যে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার অর্থ ব্যয় করা হয়েছে।

ফিলিস্তিনিদের অধিকার আদায়ের এই আন্দোলনে উদাহরণ হিসেবে সামনে নিয়ে আসা হয়েছে জাতিসংঘের এ সম্পর্কিত বিভিন্ন সময়ে পাস হওয়া প্রস্তাব এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বিগত শতাব্দীর সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গ শাসনবিরোধী বয়কট আন্দোলনকে। এই আন্দোলনকারীরা মনে করে ইজরাইলের বিরুদ্ধে ততক্ষণ বয়কট ও অবরোধ চালিয়ে যেতে হবে, যতক্ষণ না দেশটি আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ফিলিস্তিনের ওপর থেকে দখলদারিত্বের অবসান ঘটাবে।

বিডিএস সমর্থকদের মধ্যে রয়েছেন শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, রাজনীতিবিদসহ ইজরাইলি কিছু নাগরিকও। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী শাসনকালের বয়কট আন্দোলনের মতোই লক্ষ্য অর্জনে বিভিন্ন দেশে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ ও সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিডিএসের তৎপরতায়। পশ্চিমের দেশগুলোতে জায়োনিস্ট আন্দোলন ও ইজরাইলি সমর্থনের বিপরীতে আগের চেয়ে এখন অনেক বেশি সক্রিয় এই আন্দোলন।

ভারত ও ইন্দোনেশিয়ায় বিডিএস আন্দোলন

২০১৬ সালের ৬ মার্চ নয়া দিল্লির গান্ধি পিস ফাউন্ডেশনে আয়োজন করা হয় 'বিডিএস ইন্ডিয়া কনভেনশন'। এই কনভেনশন থেকে ইজরাইলকে সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে পুরোপুরি বয়কটের আহ্বান জানানো হয়। ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ইজরাইলের অব্যাহতভাবে চলা বর্ণবাদী নীতি অবলম্বন ও গণহত্যা অভিযান চালিয়ে যাওয়ার প্রতিবাদ হিসেবে এই বয়কটের আহ্বান জানানো হয়।

'ইন্ডিয়ান পিপল ইন সলিডারিটি উইথ প্যালেস্টাইন' নামের একটি সংগঠনের আয়োজনে ভারতের বিভিন্ন অংশ থেকে আসা বুদ্ধিজীবী ও অ্যাক্টিভিস্টরা এই কনভেনশনে যোগ দেন। তারা ঐকমত্যের ভিত্তিতে ইজরাইলবিরোধী বয়কটের প্রস্তাব পাস করেন। বয়কট প্রস্তাবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রস্তাবিত ইজরাইল সফরও বাতিল করার আহ্বান জানানো হয়; যদিও এই সফর ঠেকানো যায়নি। কনভেনশনে আহ্বান জানানো হয়– ইজরাইলের সাথে করা সব সহযোগিতা চুক্তি বাতিলসহ সব ধরনের অর্থনৈতিক, শিক্ষাসম্পর্কিত ও সাংস্কৃতিক বয়কটের। আলোচকরা একমত হন ইহুদিবাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযানই কার্যকরভাবে পরিচালনা করা যাবে না, যদি না এদের আদর্শগত সাথি হিন্দুত্ববাদী ফ্যাসিস্টদের দমন করা না যায়। কনভেনশনে যোগদানকারীরা বলেন–

> 'আমাদের প্রয়োজন সাধারণ মানুষকে বোঝানো, গাজার ইজরাইলি খুনিরা ও গুজরাটের হিন্দুত্ববাদী খুনিদের মধ্যকার ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতা প্রমাণ করে– এরা জনগণের শত্রু।'

কনভেনশনে 'ইন্ডিয়ান পিপল ইন সলিডারিটি উইথ প্যালেস্টাইন'-এর পক্ষে রিপোর্ট উপস্থাপন করেন আনন্দ সিং। রিপোর্টে বলা হয়, গাজা একটি অব্যাহত কারাগারে রূপ নিয়েছে। পশ্চিম তীরে অবাধে চলছে অবৈধ ইহুদি বসতি গড়ে তোলার কাজ। ইজরাইলি সরকার ও সেনাদের নির্লজ্জ সহযোগিতা পেয়ে বসতি স্থাপনকারী ইহুদিরা এতটাই দুর্বিনীত হয়ে উঠেছে যে, এরা ফিলিস্তিনিদের ওপর শুধু নগ্ন হামলাই করছে না; হামলা করছে সংহতি আন্দোলনকারী ও সাংবাদিকদের ওপরও।

ইজরাইলি অর্থনীতির শক্তিশালী খাত অস্ত্র রফতানি। যার সবচেয়ে বড়ো ক্রেতা ভারত। বিডিএস কনভেনশনের দাবি, ভারতীয়দের উচিত প্রতিবাদ জানিয়ে সরকারকে বলা–

> 'আমরা আমাদের কষ্টার্জিত করের অর্থ ফিলিস্তিনি শিশুদের হত্যার কাজে ব্যবহার করতে ইজরাইলের হাতে তুলে দিতে পারি না।'

বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো মুসলিম দেশ ইন্দোনেশিয়ায় ২০১৬ সালের ৬-৭ মার্চ অনুষ্ঠিত হয় ফিলিস্তিন ও আল-কুদস আল-শরিফ সম্পর্কিত ওআইসির পঞ্চম অতিরিক্ত বিশেষ সম্মেলন। এ সম্মেলনে বিশ্ব ইসলামি নেতারা ওআইসির সদস্য দেশগুলো ও আন্তর্জাতিক

সমাজের প্রতি ইজরাইলের ভেতরে ও বাইরে তৈরি ইজরাইলি পণ্যের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারির জন্য আহ্বান জানান। দুই দিনব্যাপী এই ওআইসি সম্মেলনের শেষ দিনে ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট জোকো উইদোদো বলেন–

> 'আজ আমরা, ইসলামি বিশ্বের নেতারা একমত হয়েছি প্যালেস্টাইনের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিতে। ওআইসি সদস্যরা ইজরাইলের কর্মকাণ্ডের নিন্দা জানাচ্ছে। আমরা আহ্বান জানাচ্ছি, অবৈধ ইজরাইলি বসতি স্থাপন অবসানের। সমর্থন ঘোষণা করছি দুই-রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানের মাধ্যমে ফিলিস্তিনি স্বাধীনতার প্রতি।'

৫৫টি দেশের ও দুই আন্তর্জাতিক সংস্থা জাতিসংঘ ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মোট ৬০৫ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশ নিয়েছিল। যোগ দিয়েছিলেন ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস, সুদানের প্রেসিডেন্ট ওমর আল বশির, সৌদি আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আদেল আল জুবায়ের।

বিডিএস আন্দোলন সরাসরি বিরূপ প্রভাব ফেলছে ইজরাইলি অর্থনীতির ওপর। ইহুদিবাদীরা বেপরোয়া হয়ে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ব্রিটেন ও ফ্রান্সসহ বিভিন্ন দেশকে চাপ দিচ্ছে বয়কট অবৈধ ঘোষণা করতে। যদিও বাইরে ইজরাইলি প্রচারণা সত্ত্বেও এরই মধ্যে ভেনিজুয়েলা, বলিভিয়াসহ আরও কয়েকটি দেশ ইজরাইলকে বর্ণবাদী দেশ হিসেবে ঘোষণা করেছে।

ইজরাইল যেভাবে বিডিএস আন্দোলনকে চ্যালেঞ্জ করছে

বিডিএস আন্দোলনের সমর্থনে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে রয়েছে ফিলিস্তিনিদের পক্ষে নানান সংগঠন। বিপরীতে ইজরাইলের সমর্থনেও বাহারি সংগঠন গড়ে তোলা হয়েছে ক্যাম্পাসগুলোতে। ইজরাইলপন্থি এসব সংগঠন আবার ইহুদি লবি AIPAC-এর সাথে সংযুক্ত। মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইজরাইলের হয়ে কাজ করে– এমন একটি সংগঠন হচ্ছে, ইজরাইল অন ক্যাম্পাস কোয়ালিশন (Israel on Campus Coalition) এই সংগঠনের কাজই হলো ইজরাইলকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কাছে ফ্রেন্ডলি হিসেবে তুলে ধরা, ইজরাইলবিরোধী প্রচার ও কর্মকাণ্ডের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা, যেসব শিক্ষার্থী জায়োনিস্টবিরোধী প্রচারণায় যুক্ত, তাদের ডাটা সংগ্রহ করা। প্রয়োজনে সভা-সেমিনার আয়োজন করা। এই সংগঠনের তথ্য বিভিন্ন চ্যানেল হয়ে পৌঁছে যায় ইজরাইলি নজরদারি সংস্থাগুলোর কাছে। যেমন : কোনো একটি ক্যাম্পাসে বা কোনো সড়কে দেখা গেল ইজরাইলবিরোধী একটি ব্যানার বা বিলবোর্ড। হতে পারে এটা বিডিএসের কাজ। ক্যাম্পাস কোয়ালিশনের সদস্যরা এর তথ্য পৌঁছে দেবে ইজরাইলপন্থি সংস্থাগুলোর কাছে। হয়তো দুই-একদিনের মধ্যেই দেখা যায়, ব্যানার বা বিলবোর্ডের অস্তিত্ব নেই।

স্ট্যান্ড উইথ ইজরাইল, ইজরাইল-এমেরিকান কাউন্সিল, দ্য ফাউন্ডেশন ফর ডিফেন্স অব ডেমোক্রেসিস (এফডিডি)সহ আরও অনেক সংগঠন আছে, যা পশ্চিমে ইজরাইলের স্বার্থে কাজ করে থাকে। এগুলোর সবকটিরই কানেকশন রয়েছে এ AIPAC-এর সাথে, যাকে বলা হয় এলিট জায়োনিস্টদের ফোরাম। এই রকম আরেকটি সংগঠন আছে- দ্য ওয়াশিংটন পলিটিক্যাল অ্যাকশন কমিটি।

বিডিএস মুভমেন্টের সাথে কানেকশন আছে সুডেন্টস ফর জাস্টিস ইন প্যালেস্টাইন (এসজেপি)ও আমেরিকান মুসলিস ফর প্যালেস্টাইন (এএমপি) নামের বেশ কিছু ফিলিস্তিনপন্থি সংগঠনের। কিন্তু এসব সংগঠনের কাজকর্ম কঠোর তদারকির মধ্যে আছে। ইজরাইল মার্কিন নাগরিকদের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি করছে এমন অভিযোগ তো রয়েছেই।

The Algemeiner। এটি নিউইয়র্ক-ভিত্তিক ইজরাইলপন্থি একটি ম্যাগাজিন। এর কাজই হলো ইজরাইলের পক্ষে প্রচার-প্রোপাগান্ডা চালানো। তবে সবচেয়ে বিতর্কিত কাজটি করে থাকে Canary Mission নামের একটি ওয়েবসাইট। এর কাজ হলো উত্তর আমেরিকায় থাকা ফিলিস্তিনপন্থি অ্যাক্টিভিস্ট, অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবী ও সংগঠনগুলোর ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেওয়া, তাদের প্রোফাইল তৈরি করা। বিশেষ করে বিডিএস মুভমেন্টের সাথে জড়িতদের প্রতি তাদের বিশেষ নজর থাকে।

এই ওয়েবসাইটের তথ্য ব্যবহার করে থাকে ইজরাইলের গোয়েন্দা সংস্থা ও সীমান্তরক্ষী বাহিনী। এসব তথ্য ব্যবহার করে বিডিএস অ্যাক্টিভিস্টদের ইজরাইলে প্রবেশ ঠেকানো হয়। ওয়েবসাইটটি যারা চালায় তাদের পরিচয় জানা যায়নি। কারণ, তারা নাম প্রকাশ করে না। তবে আলজাজিরার একটি অনুসন্ধানে জানা যায়, এই ওয়েবসাইটের পেছনে অর্থায়ন করে থাকেন Adam Milstein নামের এক ব্যক্তি।[১০৫] তিনি মূলত একজন রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী, যিনি ইজরাইল-আমেরিকান কাউন্সিলেরসহ প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। এডামের ফাউন্ডেশন (Adam and Gila Milstein Family Foundation-MFF) থেকে ইজরাইলপন্থি সংগঠনগুলোকে অর্থ সহায়তা দেওয়া হয়। এখান থেকে অর্থ যায় স্ট্যান্ড উইথ ইজরাইল, ইজরাইল অন ক্যাম্পাস ও কোয়ালিশন, ইজরাইল-আমেরিকান কাউন্সিল ও AIPAC-এর মতো সংস্থায়। ইজরাইলপন্থি ওয়েবসাইট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আরেকটি কূটকৌশলের আশ্রয় নেওয়া হয় বিডিএস আন্দোলন ঠেকাতে। আর তা হলো– বিডিএস কর্মীদের চরিত্র হনন।

---

[১০৫]. The Israel Lobby in the U.S. -Documentary by Al Jazeera (Part 1 -4).

উনবিংশ অধ্যায়

পশ্চিমে ইজরাইলের পক্ষে প্রচার-প্রচারণা ও অর্থসংগ্রহ

'It is untenable for Israeli citizens to live in terror. It is untenable for Palestinians to live in squalor and occupation. ... Myvision is two states, living side by side in peace and security.'—George W. Bush

ইহুদি সেনাদের পক্ষে আমেরিকায় গালানাইট এবং ইহুদি লবি

২০১৮ সালের ১৮ই অক্টোবর মিডল ইস্ট মনিটরের একটি শিরোনাম ছিল এ রকম–New York Gala raises $32m for Israel army| Friends of the Israel Defence Forces (FIDF) নামের একটি সংগঠন আগের দিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, যেখানে অংশ নিয়েছিলেন ১২'শ-এর মতো মার্কিন ব্যবসায়ী ও দাতা। অংশগ্রহণকারীরা ইজরাইলি প্রতিরক্ষাবাহিনীর সদস্যদের কল্যাণে ৩২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দিতে রাজি হয়।

সেদিনের গালানাইটে কেবল Or Lachayal নামের একটি সংগঠন একাই দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় আড়াই মিলিয়ন ডলার। Nefesh B'Nefesh নামের আরেকটি সংগঠন দিতে রাজি হয় এক দশমিক তিন মিলিয়ন ডলার। প্রথম সংগঠনটি ইজরাইলি আর্মিতে ইহুদিদের অবস্থান শক্তিশালী করতে কাজ করে থাকে। আর দ্বিতীয় সংগঠনটি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা ইহুদিদের ইজরাইলে নিয়ে আসার জন্য উদ্বুদ্ধ করে থাকে। বাইরের দুনিয়ায় থাকা ইহুদিদের প্যালেস্টাইনে নিয়ে আসার এই প্রক্রিয়ার নাম 'আলিয়া'। বিশ্বব্যাপী এ ধরনের আরও বহু সংগঠন আছে, যারা কাজ করছেন ইহুদি জাতীয়তাবাদের প্রচারমেশিন হিসেবে। ইহুদিদের পক্ষে কেউ কেউ নিয়োজিত আছেন অর্থ সংগ্রহের কাজে। আমেরিকাতে ইহুদিবাদের পক্ষে অর্থ সংগ্রহের যে কার্যক্রম চলে, তাতে বিভিন্ন সময় ধর্মপ্রচারক, ব্যবসায়ী ও রাজনীতিকদের পাশাপাশি হলিউড তারকাদের অংশগ্রহণের খবরও পশ্চিম ও আরব সংবাদমাধ্যমগুলো দিয়ে থাকে।

ইজরাইলের পক্ষে অর্থ সংগ্রহ করে, গুপ্তচরবৃত্তি করে, জনমত তৈরি এবং মিডিয়া কাভারেজ দিয়ে থাকে এ রকম বহু সংগঠন আছে আমেরিকা জুড়ে। এমনই একটি সংগঠন দ্য ইজরাইল-আমেরিকান কাউন্সিল। এই সংগঠন যাত্রা শুরু করে ২০০৭ সালে। প্রধানত ক্যাসিনো মোগল শেলডন এডেলসনের টাকায় চলে এটি। আমেরিকায় যেসব ইজরাইলি নাগরিক বসবাস করছে, তাদের ইজরাইলি রাষ্ট্রের পক্ষে প্রচার ও কার্যক্রমে সক্রিয় করার কাজ করে থাকে দ্য ইজরাইল-অ্যামেরিকান কাউন্সিল।

এই সংগঠন করার চিন্তা আসে ইহুদি কূটনীতিক এহুদ ডানকের মাথা থেকে। এহুদ চেয়েছিলেন ২০০৬ সালে লেবাননের বিরুদ্ধে ইজরাইলি বোমা বর্ষণের পক্ষে সমর্থন জোগাতে। যদিও লেবানন যুদ্ধে ইরান সমর্থিত হিজবুল্লাহর কাছে একরকম নাকে খত দেওয়ার মতো অবস্থা হয়েছিল ইজরাইলি বাহিনীর। ৩৪ দিনের এই যুদ্ধ আসলে ছিল ইরান-ইজরাইল প্রক্সি ওয়ার। যুদ্ধ চলাকালে বারবার ইজরাইলি সেনাবাহিনীর রেডিও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে রীতিমতো চমক দেখায় হিজবুল্লাহ। ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েও হিজবুল্লাহকে কাবু করা যায়নি। এটি যেমনি ইজরাইলের কর্তধারদের উদ্বেগ বাড়িয়ে দেয়, তেমনি তা তখনকার মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের 'নতুন মধ্যপ্রাচ্য' গড়ার পরিকল্পনাকে অনেকটাই গড়বড় করে দেয়।

ইন্টারন্যাশনাল ইজরাইল এলাইস ককাস ফাউন্ডেশন-এ ধরনের একটি সংগঠন রয়েছে, যারা মার্কিন কংগ্রেসসহ সারা বিশ্বেই কাজ করে থাকে। ককাসের সদস্যদের এই কথা মানতে হয় যে, অখণ্ড জেরুজালেম ইজরাইলের রাজধানী, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উচিত তাদের রাজধানী জেরুজালেমে নিয়ে যাওয়া। আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি, ইতালি, ঘানা, গুয়েতেমালাসহ অন্তত ৩৬টি দেশে এর তৎপরতা রয়েছে।

২০১০ সালে কিউবাতে আটক হয়েছিলেন এলান ফিলিপ গ্রস নামে এক ইহুদি মার্কিনী। তার বিরুদ্ধে মার্কিন গোয়েন্দাসংস্থার হয়ে কাজ করার অভিযোগ আনা হয়েছিল। আরও বলা হয়েছিল, তিনি কিউবার জিউস কমিউনিটির জন্য কম্পিউটার ও স্যাটেলাইট প্রযুক্তি নিয়ে গিয়েছিলেন। ২০১০ সালে আটকের পর ৫ বছরের কারাবাস থেকে ২০১৪ সালের ১৭ ডিসেম্বর মুক্তি পান গ্রস। তার পক্ষে ক্যাম্পেইন করেছিল জিউস কমিউনিটি রিলেশন কাউন্সিল (JCRC)। তারা হামাসের হাতে আটক হওয়া ইজরাইলি সৈনিক গিলাত শালিতের ক্ষেত্রেও তাই করেছিল।

আমেরিকায় জিউসদের পক্ষে কাজ করে থাকে এ রকম আরেকটি সংগঠন হলো এডিএল (Anti-Defamation League) এই সংগঠনের জন্ম ১৯১৩ সালে B'nai B'rith International নামের আরেকটি সংগঠনের ছকে, যারা ইহুদি ও ইজরাইল রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করে থাকে। এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো ইহুদিদের ঐক্যবদ্ধ করা।

১৯৬৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রে আরব ছাত্রদের একটা সমাবেশ হয়। সেখানে ছদ্ম পরিচয়ে ঢুকে পড়ে এডিএল সদস্যরা। তারা গুপ্তচরবৃত্তি করছিল ইজরাইলের হয়ে। মার্কিন তদন্ত সংস্থা এফবিআইয়ের একটি গোপন নথি ফাঁস হয়ে গেলে এই গুপ্তচরবৃত্তির কথা জানা যায়। এডিএল কীভাবে যুক্তরাষ্ট্রে পড়তে যাওয়া আরব ছাত্রদের সংগঠন Organization ofArab Students (OAS)-এর বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি করছিল সব তথ্য ফাঁস হয়ে যায়।

আরব ছাত্রদের একক প্লাটফর্ম হিসেবে ওএএস প্যালেস্টাইনের পক্ষে জনমত তৈরি করত। এটি গড়ে উঠেছিল ১৯৫২ সালে। ১৯৬৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ওহিও স্টেট ইউনিভার্সিটিতে তারা আয়োজন করে। ১৮ তম বার্ষিক সম্মেলন যাতে যোগ দেয় ২০০-এর মতো আরব ছাত্র। এই সম্মেলনে এডিএলের সঙ্গে যুক্ত কয়েকজন ছদ্ম পরিচয়ে যোগ দিয়েছিল; তারা ব্যবহার করেছিল ভিন্ন ভিন্ন কোড নাম। তিনটি কোড নাম এ রকম– Buckeye, Adam and Eve. Buckeye। তারা সম্মেলনে ঢুকেছিল সাংবাদিক পরিচয়ে।

১৯৬৩ সালে সিনেট ফরেন রিলেশন কমিটি (Senate Foreign Relations Committee) একটা তদন্ত করে জানতে পারে আমেরিকান জায়োনিস্ট কাউন্সিল নামে একটা সংগঠন স্থানীয় ইহুদি এজেন্সিগুলো থেকে ৮ বছরে ৫০ লাখ ডলার অর্থ নিয়েছিল আমেরিকায় ইজরাইলের পক্ষে জনমত তৈরি করতে। সিনেট তদন্ত দল এই কার্যক্রম অবশ্য বন্ধ করে দিয়েছিল, কিন্তু তাদের থামানো যায়নি।[১০৬]

কয়েকজনের উদ্যোগে ২০০৩ সালে The Israel Project (TIP) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল মিডিয়ার সাথে ইজরাইলের সম্পর্ক উন্নয়ন করা। ইজরাইলি অফিসিয়ালসদের নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা তাদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এসব সাংবাদিক সম্মেলনে ইরানের পারমাণবিক প্রকল্প নিয়ে তথ্য দেওয়া হতো। তারা আমেরিকাকে ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপে উসকানি দিত। China Affairs program (established in 2011), 'India Programs' হাতে নিয়েছিল। ইরানের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক যুদ্ধে সমর্থন আদায়ে চীনা প্রকল্পটি নেওয়া হয়েছিল আর ইন্ডিয়া প্রকল্পটি নিয়েছিল ইরানের সাথে ভারতের গভীর বাণিজ্য সম্পর্ক উপড়ে ফেলতে।[১০৭] টিআইপির প্রধান নির্বাহী যশ ব্লক; যিনি একসময় AIPAC-এর মুখপাত্র ছিলেন, তিনি প্রায়ই সংবাদ সম্মেলনে বিডিএস মুভমেন্টের বিরুদ্ধে রাগ ঝাড়তেন। এইপেকের আগে তিনি ক্লিনটন প্রশাসনে মুখপাত্র হিসেবে কাজ করেছেন। টিআইপি হামাস ও হিজবুল্লাহকে সন্ত্রাসী তালিকায় রাখতে বিভিন্ন দেশের প্রতি আহ্বান জানাত। এমনকী মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ইজরাইল ইস্যুটাকে সামনে নিয়ে আসেটিআইপি। তারা মার্কিন রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে জরিপ চালিয়ে থাকে।

---

[১০৬]. Big Israel: How Israel's Lobby Moves America, Grant F. Smith, page 170-200
[১০৭]. Big Israel: How Israel's Lobby Moves America, Grant F. Smith, page 216

টিআইপির তরফ থেকে আমেরিকাকে বোঝানো হতো তারা উভয়ই কমন শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ছে। সেটা কী? সন্ত্রাসবাদ, হামাস, হিজবুল্লাহ ও ইরান। টিআইপি মাঝে মাঝে বিদেশি কূটনীতিকদের তরফে ট্যুর আয়োজন করে থাকে। ২০১১ সালে এমনই একটি ট্যুরের আয়োজন করে হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত ২০ বিদেশি কূটনীতিককে নিয়ে যাওয়া হয় ইজরাইলে পাঁচদিনের সফরে। তারা নেতানিয়াহু ও ইহুদি কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাতের পাশাপাশি ধর্মীয় স্থাপনা ও বিজনেস সাইট পরিদর্শন করেন। এই সফরে লাইবেরিয়া, আলবেনিয়া, বেলিজ, হাইতি, মেসিডোনিয়া, বুরকিনা ফাসো, উগান্ডা ও সেন্ট লুসিয়ার মতো অনেক দেশের প্রতিনিধি ছিল। কিন্তু এই সফরের পেছনের কারণ কী? জাতিসংঘে প্যালেস্টইন ইজরাইলের পক্ষে দল ভারী করা, ভোটাভুটিতে সুবিধা নেওয়া।

আমেরিকায় গড়া জিউস সংগঠনগুলোর অনেকেই ইজরাইলের হয়ে নানা জরিপ করে থাকে। আমেরিকান জিউস কমিটি ১৯৯১ সালে একটা জরিপ করেছিল– যাতে বলা হয়েছিল, অস্ট্রিয়ার এক-তৃতীয়াংশ মানুষ ইহুদিদের ঘৃণা করে এবং তাদের বড়ো বড়ো চাকরিগুলোতে নিষিদ্ধ দেখতে চায়। ১৯৯২ সালে করা আরেকটি জরিপে বলা হয়, নিউইয়র্কের ৪৭ শতাংশ মানুষ মনে করে মার্কিন রাজনীতি ও শহুরে জীবনে ইহুদিদের বড়ো ধরনের প্রভাব রয়েছে।

AIPAC-এর বিরুদ্ধে মার্কিন প্রতিরক্ষাবাহিনীর তথ্য চুরির অভিযোগ রয়েছে। ২০০৫ সালে কর্নেল লরেন্স ফ্রাঙ্কলিন থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তাদের প্রতি দুর্বল এক ওয়াশিংটন পোস্টের সাংবাদিকদের দিয়ে দেয়। পরে এটা ধরা পড়ে যায়। লরেন্সকে কারাগারে যেতে হয়েছিল। AIPAC এটা করেছিল ইরানের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য মার্কিন যুদ্ধ এগিয়ে আনতে।

হোয়াইট হাউজে ইহুদি প্রভাব

বুশ যাতে ইরাকে হামলা চালিয়ে কথিত বিদ্রোহী সাদ্দামের ডানা ছেটে দেন, সে মিশন বাস্তবায়নে হোয়াইট হাউজে দৌড়ঝাঁপ ছিল আমেরিকার জায়োনিস্ট নেতাদের। এই জায়োনিস্টদের একজন হলেন জন বোল্টন; তিনি এখন ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপদেষ্টা। ট্রাম্প আমলে কেবলই হোয়াইট হাউজ নয়; পুরো মার্কিন প্রশাসনই জায়োনিস্টদের কবজায়। এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করা অনেকটা যুদ্ধ ঘোষণার মতো। ট্রাম্পের নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি অর্থ ঢেলেছেন যে ক্যাসিনো ব্যবসায়ী, তিনি পুরোদস্তুর একজন জায়োনিস্ট। নাম শেলডন অ্যাডেলসন।

বোল্টন, মাইক পেন্স ও তাদের ধ্যানধারণায় বিশ্বাসী লোকদের ট্রাম্প প্রশাসনে ঢুকিয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রের দাবিদার যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিতে হস্তক্ষেপ করছে জায়োনিস্টরা। ২০১৭ সালের ১৮ই জুলাই ক্রিশ্চিয়ানস ইউনাইটেড ফর ইজরাইল (সিইউএফএল)-এর বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনে কি-নোট (মূল প্রবন্ধ) পেপার উপস্থাপন করেছিলেন মাইক পেন্স।

এই সংগঠনটি ২০০৬ সালে জন চার্লস হাগি নামে এক ধর্মপ্রচারকের হাত ধরে গড়ে ওঠে। যারা দাবি করে থাকে, এটি যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদি সমর্থকদের সবচেয়ে বড়ো গ্রুপ। এর অন্তত ৩০ লাখ সদস্য রয়েছে। সংগঠনটির যিনি প্রতিষ্ঠাতা, তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সবশেষ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্পকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। ইজরাইলকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষায় ট্রাম্প যখন যথেষ্ট অগ্রগতি দেখাতে পারছিলেন না, মাইক পেন্স তখন ইহুদিদের আশ্বাস দিয়েছিলেন– তারা জেরুজালেমে মার্কিন দূতাবাস সরিয়ে নেবেন। পেন্সের বক্তব্য এই বার্তা দিচ্ছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ইজরাইলের সম্পর্ক সুরক্ষার জন্যই যেন তিনি নিয়োগ পেয়েছেন। সম্মেলনে দেওয়া তার বক্তব্য হোয়াইট হাউজে ক্রিশ্চিয়ান জায়োনিস্টদের প্রভাবেরই ইঙ্গিত। এই পেন্স একজন ঘোরতর ক্রিশ্চিয়ান জায়োনিস্ট হিসেবে পরিচিত যিনি প্রকাশ্যেই প্যালেস্টাইনের ওপর ইজরাইলি মালিকানার দাবিকে সমর্থন করে থাকেন।

যুক্তরাষ্ট্রে ২০ লাখের মতো খ্রিষ্টান জায়োনিস্ট রয়েছেন, যারা দশকের পর দশক ধরে ইজরাইল রাষ্ট্রের আকার বাড়াতে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ব্যয় করছেন। রাশিয়া, ইথিওপিয়াসহ বিভিন্ন দেশ থেকে হাজার হাজার ইহুদির মাইগ্রেশনে তারা স্পন্সর করে যাচ্ছেন, প্যালেস্টাইনে নয়া ইহুদি বসতি নির্মাণে অর্থ ঢালছেন। ট্রাম্পের জামাতা জ্যারেড কুশনারও তার পরিবারের সদস্যরা পশ্চিম তীরে ইহুদি বসতি নির্মাণে মিলিয়ন ডলার অর্থ সহায়তা দিয়েছেন– এই খবর গণমাধ্যমে এসেছে। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার একবার বলেছিলেন–

> ‘খ্রিষ্টানদের মধ্যে অনেক প্রভাবশালী ও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গ্রুপ আছে, যারা পশ্চিম তীর ও গাজা থেকে অইহুদিদের পুরোপুরি বিতাড়ন চায়।’ এই গ্রুপ জর্জ ডব্লিউ বুশের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

ইভানজেলিকদের ইহুদিপ্রীতির নেপথ্যে

পশ্চিমের ইভানজেলিক খ্রিষ্টানরা ইজরাইল রাষ্ট্রকে সমর্থন করে থাকেন। এই সমর্থনের প্রধানতম কারণ ‘বাইবেল’। এসব খ্রিষ্টানের দাবি, ‘বাইবেলে বলা আছে–

> ‘যারা ইহুদিদের আশীর্বাদ করবে, তাদের জন্য রয়েছে পুরস্কার। আর যারা ইহুদিদের অভিশাপ দেবে, তাদের জন্য রয়েছে শাস্তি।’

অনেক মার্কিন ইভানজেলিক মনে করেন, ইহুদি ও ইজরাইলকে আশীবাদ করার জন্যই যুক্তরাষ্ট্র ঈশ্বরের আশীবাদ পাচ্ছে। এদের বিশ্বাস– 'যদি মার্কিনিরা ইজরাইলের ওপর থেকে আশীবাদ বা সমর্থন ফিরিয়ে নেয়, তাহলে ঈশ্বরও যুক্তরাষ্ট্রের ওপর থেকে আশীবাদ ফিরিয়ে নেবেন, নারাজ হবেন।' মার্কিন ব্যাপ্টিস্ট ধর্মযাজক জেরি ফালওয়েলও (১৯৩৩-২০০৭) এমনটাই ভাবতেন। জেরির ভাষ্য–

> 'যদি যুক্তরাষ্ট্র তার শস্যসমৃদ্ধ ফসলের মাঠ ধরে রাখতে চায়, বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে চায়, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে চায়, তাহলে অবশ্যই তাকে ইজরাইলের প্রতি সমর্থন ধরে রাখতে হবে।'

রিচার্ড ল্যান্ড নামে আরেক মার্কিন ধর্মপ্রচারক বলেছেন–

> 'আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, ঈশ্বর তাদেরই আশীবাদ করেন, যারা ইহুদিদের আশীবাদ করেন। আর তাদেরই অভিশাপ দেন, যারা ইহুদিদের অভিশাপ দেন।' রিচার্ড ল্যান্ড যুক্তরাষ্ট্রের এথিকস অ্যান্ড রিলিজিয়াস লিবার্টি কমিশনের (ইআরএলসি) প্রেসিডেন্ট ছিলেন। এই সংগঠনটি যুক্তরাষ্ট্রে নন রোমান ক্যাথলিকদের প্রতিনিধিত্বকারী সাউদার্ন ব্যাপ্টিস্ট কনভেনশনের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান; যাদের আছে দেড় কোটিরও বেশি সদস্য। অন্তত ৪৩ হাজার চার্চ (গির্জা) এর তালিকাভুক্ত।

ল্যান্ড ওয়াশিংটনে খুবই প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ডব্লিউ বুশ প্রশাসনের সাথে প্রতি সপ্তাহে বসতেন, আর প্রেসিডেন্ট বুশের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। এই ব্যক্তি জার্মানি, রাশিয়া কিংবা পোলান্ডের সাথে নিজ দেশের তুলনা করে বলতেন– 'এসব দেশের চেয়ে যুক্তরাষ্ট্র স্রষ্টার বেশি আশীবাদপুষ্ট। কারণ, আমাদের মধ্যে ইহুদিবিরোধী মনোভাব নেই এবং আমরা ইজরাইলকে সমর্থন করেছি।' তিনি মনে করেন–

> '১৯৪৮ সালের ইজরাইল রাষ্ট্র সৃষ্টিতে সহায়তা করেছিল হ্যারি ট্রুমান, আর রিচার্ড রিক্সন ১৯৭৩ সালের ইয়োম কিপুর যুদ্ধের সময় ইজরাইলে জরুরি অস্ত্র সহায়তা দিয়ে আরবদের বিরুদ্ধে টিকিয়ে রেখেছিল।'

২০০৭ সালে ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত এই AIPAC-এর একটা সম্মেলনে ইহুদি লবি গ্রুপ 'ক্রিশ্চিয়ান ইউনাইটেড ফর ইজরাইল'-এর প্রতিষ্ঠাতা ইহুদিদের শত্রুদের পরিণতির কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন– ফারাও, ব্যাবিলন, গ্রিক, রোমান, অটোমান কিংবা অ্যাডলফ হিটলার-– যারাই ইহুদিদের অত্যাচার-নির্যাতন করেছে, এরাই সবাই মানব ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। গ্লেন প্লম্মের নামে একজন আমেরিকান ধর্মপ্রচারক আছেন, যিনি ক্রিশ্চিয়ান টেলিভিশন নেটওয়ার্ক নামে একটিটিভি স্টেশন খুলেছেন। এর উদ্দেশ্যই হলো কৃষ্ণাঙ্গ মার্কিনিদের মধ্যে ইজরাইলের পক্ষে ভালোবাসা তৈরি করা। ১৯৯৬ সালে প্রথমবারের মতো ইজরাইল সফরে গিয়ে দেশটির প্রতি তার এই আবেগ তৈরি হয়।

তবে ক্রিশ্চিয়ান জায়োনিজমের সমালোচনাও হয়। খ্রিষ্টান ধর্মযাজকরাই তা করে থাকেন। ২০০৪ সালে জেরুজালেমে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়– যেখানে ৩২টি দেশের ৬৫০ জন বাইবেল স্কলার অংশ নেন। তারা ইজরাইলের প্রতি ইভানজেলিক সমর্থনের নিন্দা জানান। তাদেরই একজন রুসমেরি ওয়েথের, যিনি ইজরাইলের কড়া সমালোচক। ওয়েথের, বাইরে থেকে ইজরাইলের প্রতি ধর্মীয়, রাজনৈতিক যে সমর্থন দেওয়া হচ্ছে তার বিরোধিতা করেন আর বলেন– 'এটা একটা বিপজ্জনক বিষয়।' স্টিফেন সিজার নামে আরেকজন এই সম্মেলনেই বলেন– 'যুক্তরাষ্ট্রে ক্রিশ্চিয়ান জায়োনিজম সবচেয়ে প্রভাবশালী ও ধ্বংসাত্মক শক্তি। এটি যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপ্রাচ্যনীতি ঠিক করে দেয় এবং মুসলমানদের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টিতে উসকানি দেয়।' সম্মেলন থেকে আওয়াজ তোলা হয়– বাইবেলে যে দয়া, ভালোবাসা ও ন্যায়বিচারের বার্তা আছে, তার বিপরীত একটি ডকট্রিন হলো ক্রিশ্চিয়ান জায়োনিজম।[১৮৮]

১৯৭৭ সালের মে মাসে হৃদরোগে আক্রান্ত হন ইহুদি নেতা মেনাখিম বেগিন। তিনি জেরুজালেমের হাদাশ হাসপাতালের চিকিৎসক সেভি ন্যাবুয়েলের অধীনে ভর্তি হন। সেভি যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয়েসের বাসিন্দা, যিনি ১৯৭৬ সালে ইজরাইলে আসেন ইহুদিদের একজন কট্টর সমর্থক হিসেবে। এই ব্যক্তি বেগিনকে জানান, ইজরাইলে তার (বেগিনের) যত সমর্থক রয়েছে, তার চেয়েও বেশি সমর্থক রয়েছে উত্তর আমেরিকার খ্রিষ্টানদের মধ্যে। এরপরই বেগিন তাদের সঙ্গে সখ্য তৈরি করেন।

সেভি ইজরাইলে বসবাস করা খ্রিষ্টানদের নিয়ে একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলেন; যাদের কাজই ছিল বিদেশে গিয়ে ইজরাইলের পক্ষে জনমত গড়ে তোলা। তারা ইহুদিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলে বেড়াতেন। ১৩টি দেশ যখন পূর্ব জেরুজালেমে ইজরাইলের সম্প্রসারণের প্রতিবাদ জানিয়ে ১৯৮০ সালে জেরুজালেম থেকে দূতাবাস তেলআবিবে সরিয়ে নেয়, তখন ডাচ ইভানজেলিক জ্যান উইলেম ভেন ডের হ্যাভেন (ফাউন্ডার)সহ অন্যদের সঙ্গে নিয়ে ন্যাবুয়েল গড়ে তোলেন ইন্টারন্যাশনাল ক্রিশ্চিয়ান অ্যাম্বাসি জেরুজালেম (আইসিইজে)। ইজরাইলে খ্রিষ্টান জায়োনিস্টদের যে দুটো বড় সংস্থা আছে, তার মধ্যে এটি একটি।

২০০৫ সালের আগস্টে যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরাইলের কিছু ইভানজেলিক ও ইহুদি ঘোষণা দেয়, গাজায় ইহুদি বসতি নির্মাণ থেকে ইজরাইলের সরে আসার সমর্থন জানানোর স্রষ্টা কাটরিনার মতো হারিকেন দিয়ে নিউ অরলিন্সের ব্যাপক ক্ষতি করেছেন– এটা একটা শাস্তি। খ্রিষ্টান জায়োনিস্টদের অনলাইন সংবাদমাধ্যম জেরুজালেম নিউজওয়ার একটি সম্পাদকীয় ছাপে– 'কাটরিনা-দ্য কিস্ট অব গড' শিরোনামে। ক্রিশ্চিয়ান ফ্রেন্ডস অব ইজরাইল নামে জেরুজালেমে আরেকটি সংস্থা আছে।

---

১৮৮. Evangelicals and Israel The Story of American Christian Zionism. Stephen Spector. Oxford University press, 2009, page 150-155.

জন হাগি যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের সান এন্টনিও-এর করনারস্টোন চার্চের যাজক, যার ১৭ হাজারের মতো সদস্য রয়েছে। হাগি একজন স্পষ্টবাদী আমেরিকান ক্রিশ্চিয়ান জায়োনিস্ট। তিনি শান্তির জন্য প্যালেস্টাইনকে ইজরাইলের নিয়ে নেওয়ার সমর্থক!

১৯৭৮ সালের জুনের দিকে পর্যটক হিসেবে ইজরাইলে আসেন জন, কিন্তু ফেরেন একজন জায়োনিস্ট হিসেবে। ১৯৮১ সালে ইজরাইলি বাহিনী যখন ইরাকের ওসিরাক পরমাণু প্রকল্প গুঁড়িয়ে দেয়, তখন থেকে তিনি ইজরাইলের পক্ষে গোটা বিশ্বে কথা বলে আসছেন। তার মতে, ইজরাইল ওসিরাক ধ্বংস করে বিশ্বের জন্য ভালো কাজ করেছে। এ নিয়ে আন্তর্জাতিক যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, তাতে ব্যথিত হয়েছিলেন জন। তিনি ইজরাইলের পক্ষে ২০০৭-এর দিকে আট মিলিয়ন ডলারের মতো অর্থ সংগ্রহ করেন নানান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। ইহুদিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্‌যাপন করতে গালা নাইট আয়োজন করেছিলেন জন হাগি। ২০০৬ সালে 'ক্রিশ্চিয়ান ইউনাইটেড ফর ইজরাইল' (সিইউএফআই) গঠন করেন তিনি। তার মতে– 'এটা হবে পলিটিক্যাল আর্থকুয়েক।' তিনি এমন এমন ইভানজেলিক পলিটিক্যাল কর্মীদের এই সংগঠনে নিয়ে আসছিলেন, যারা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মার্কিন সিনেটর ও কংগ্রেসম্যানদের কাছে পৌঁছানোর ক্ষমতা রাখে। তারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইজরাইলের পক্ষে ইজরাইল নাইট সেলিব্রেট করতেন।

সংস্থাটির ৫০ হাজার সদস্য আছে বলে দাবি করা হয়। ২০০৬ সালের জুলাইয়ে ওয়াশিংটনের হিলটন হোটেলে সাড়ে তিন হাজারের মতো ক্রিশ্চিয়ান জায়োনিস্ট একত্রিত হয়েছিল হাগির আমন্ত্রণে। যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি অঙ্গরাজ্য থেকে তারা জড়ো হয়। তারা সেখানে ইজরাইলি ও মার্কিন পতাকা উড়ায়। হাগি ইসলামিক ফ্যাসিজমকে সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেন। বলেন– 'এটা পশ্চিমা দুনিয়ার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত।'

জুনিয়র বুশকে চাপ দিয়েছিল ইভানজেলিকরা। তারা শান্তির বিনিময়ে ইজরাইলকে ভূমি ইস্যুতে ছাড় না দেওয়ার পক্ষে অবস্থান নেয়। তারা চাননি, জেরুজালেম বিভক্ত হোক আর একটা অংশ ফিলিস্তিনিদের দিয়ে দেওয়া হোক। এদের সাফ কথা, যেভাবে হোক পুরো রাজধানীকে পুনর্দখলে নিতে হবে। তারা বুশকে হুমকি দেয়– তিনি যদি জেরুজালেম বিভক্তিতে সহায়তা করেন, তাহলে ইভানজেলিকরা তাকে দেওয়া সমর্থন প্রত্যাহার করে নেবেন এবং তৃতীয় একটি দল গঠন করবেন।

ইভানজেলিক নেতা রবার্টসন এই ঘোষণা দেন ২০০৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মাত্র এক মাস আগে। জেরুজালেম ইস্যুতে হাগি শক্ত অবস্থান নেন। ১৯৯৮ সালে *ফাইনাল ডন ওভার জেরুজালেম* বইয়ে লিখেন– 'এ শেয়ারড জেরুজালেম নেওয়ার, নেভার এ শেয়ারড জেরুজালেম। কারণ, আমি আরব ও ফিলিস্তিনিদের ঘৃণা করি!' রোডম্যাপের জন্য জেরুজালেম ভাগ হতে পারে না। গ্যারি বুয়ার– যিনি রিগ্যান প্রশাসনে কাজ করেছেন

এবং ২০০০ সালে রিপাবলিকান দল থেকে প্রেসিডেন্ট পদে মনোনয়ন চেয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, জুডা এবং সামারিয়া (প্যালেস্টাইন) প্রতিশ্রুত ভূমি এবং তা আব্রাহাম ও তার উত্তরসূরিদের। এই ব্যক্তির দাবি, পশ্চিম তীরের আরবদের জর্ডানে নিয়ে যাওয়া হোক। তার মতে– সেটাই ফিলিস্তিনিদের ভূমি।

২০০৩ সালে পিউ রিসার্চ সেন্টারের এক জরিপে বলা হয়, মার্কিন শ্বেতাঙ্গদের ৫৫ ভাগই ইহুদিরাষ্ট্রটির প্রতি সহানুভূতিশীল, যেখানে মাত্র ছয় ভাগ লোক প্যালেস্টাইনকে সমর্থন করছে। শুধু যে ধর্মের কারণেই শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানরা ইজরাইলের পক্ষ নেয় তা নয়; অনেকে গণতন্ত্রের জন্য, কেউ সন্ত্রাসবিরোধী মিত্র হিসেবে আবার কেউ কেউ তাদের সমর্থন করে থাকে। কারণ, জেরুজালেম খ্রিষ্টানদের কাছেও পবিত্রতম জায়গা।

বুশ কি ইভানজেলিক

প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশকে কেউ কেউ ইভানজেলিক বলে থাকেন। ডেভিড ব্রগ বলেছেন, তিনি ইভানজেলিক, ক্রিশ্চিয়ান জায়োনিস্ট। কীভাবে? বুশ তার পররাষ্ট্রনীতি পরিবর্তন করেছিলেন। ইহুদিরাষ্ট্র ইজরাইলকে সমর্থন করার পেছনে কিছু অভ্যন্তরীণ ও ভূ-রাজনৈতিক কারণ ছিল। রিচার্ড ল্যান্ড মনে করতেন, প্রেসিডেন্ট ইজরাইলের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ, কিন্তু সেটা ধর্মীয় কারণে নয়; মানবিক ও ভূ-রাজনৈতিক কারণে। ২০০৩ সালের জুলাইতে ইভানজেলিক ইচেইল একস্টেইন একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে হোয়াইট হাউজে যান। তিনি গোপনে কন্ডোলিজা রাইসসহ নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের সঙ্গে গোপন মিটিং করেন। তারা রোডম্যাপ পরিকল্পনার বিরোধিতা করেন।

মিটিংয়ে একজন ইভানজেলিক সরাসরি বলেন– বুশ, ডিকচেনি, রামসফেল্ড ও উলফয়েজ ইজরাইলের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য গ্রাস করেছে; যদিও বুশের মধ্যপ্রাচ্য পলিসি বিচার করলে স্পষ্টই এটা বোঝা যায়– তিনি কতটা ইজরাইলপন্থি ছিলেন। থমাস পিকারিং যিনি ইজরাইল, রাশিয়া ও জাতিসংঘে মার্কিনদূত হিসেবে কাজ করেছেন, তার ভাষায়– 'বুশ অনেকটা প্রকাশ্যেই ইজরাইলপন্থি ছিলেন, যা অতীতে কোনো মার্কিন প্রেসিডেন্ট বা রাজনৈতিক নেতার মধ্যে দেখা যেত না।' রিপাবলিকান জিওস কোয়ালিশনের নির্বাহী পরিচালক ম্যাট ব্রুকস মনে করেন, বুশ শুধু ইজরাইলপন্থিই ছিলেন না; বরং সর্বোচ্চ কতটা ইজরাইলপন্থি হওয়া সম্ভব বা ইজরাইল ঘনিষ্ঠতার যদি কোনো সংজ্ঞা দিতে হয়, বুশই তার প্রমাণ।

২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে জেরুজালেমে টেম্পল মাউন্ট পরিদর্শনে যান এরিয়েল শ্যারন। প্রতিবাদে ফিলিস্তিনিরা গর্জে উঠল। কয়েকদিনের মধ্যেই ইজরাইলি বাহিনীর হাতে অনেক ফিলিস্তিনি মারা যায়। অস্থিতিশীলতার জন্য ইয়াসির আরাফাত ও ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষকে দায়ী করল ইজরাইল; যদিও এটা স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন বলে জানালেন আরাফাত।

এমনই সময়ে তেলআবিবে এক ক্লাবে হামাসের আত্মঘাতী হামলায় ২১ জন মারা যায়। ২০০১ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর নিরাপত্তা জোরদার করতে চাইলেন শ্যারন। শক্তি প্রয়োগ করে তিনি ফিলিস্তিনি ইন্তিফাদা গুঁড়িয়ে দিতে চাইলেন। সৌদি যুবরাজ আব্দুল্লাহসহ পশ্চিমাপন্থি আরব নেতারা বুশকে সতর্ক করলেন, ইজরাইলকে থামাতে বললেন; নতুবা আরবদের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক খারাপ হবে। ২০০১ সালে হোয়াইট হাউজ সফরে গিয়ে আব্দুল্লাহ বললেন, তিনি বুশের সাথে ছবি তুলতেও আগ্রহী নন। এক জরিপে দেখা গেল– ৯৫ শতাংশ সৌদি নাগরিক ফিলিস্তিন সমস্যাকে নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ অভ্যন্তরীণ সমস্যা হিসেবে দেখে, যাতে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরের জন্য মাথাব্যথার কারণ হয়। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েল জানিয়েছেন– 'স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গড়তে তিন বছরের মধ্যে একটি সময়সীমা ঘোষণা করা হবে।'

পরবর্তী সময়ে ২০০১ সালের আগস্টে এক বৃদ্ধা ফিলিস্তিনিকে এক ইজরাইলি সেনা দ্বারা লাঞ্ছিত হওয়ার ভিডিও ছড়িয়ে পড়লে আব্দুল্লাহ সৌদি কূটনীতিক বন্দর বিন সুলতানকে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠান কড়া বার্তা দিয়ে। বন্দর বলেন, প্রেসিডেন্ট বুশ শ্যারনকে যাচ্ছেতাই করার অনুমতি দিয়েছেন। বন্দর এটাও বলেন– বুশ এমনভাবেই শ্যারনকে সমর্থন দিচ্ছেন, যেন এক ইহুদির এক ফোঁটা রক্তের সমান হাজারো ফিলিস্তিনির জীবন। এর দুদিন পর ২৯ আগস্ট আব্দুল্লাহকে এক চিঠিতে বুশ ফিলিস্তিনিদের আলাদা নিজস্ব রাষ্ট্রের প্রতি সমর্থন জানান। এটা খুবই গুরত্বপূর্ণ পদক্ষেপ; এমনকী ক্লিনটনও কখনো এ ধরনের পদক্ষেপ নেওয়ার সাহস দেখাননি।

২০০১ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর প্রকাশ্যে এমন ঘোষণা দিতে চেয়েছিলেন বুশ, কিন্তু পরের দিনই সব উলট-পালট করে দেয়। ১১ই সেপ্টেম্বরে টুইন টাওয়ারে বিমান হামলা চালায় সন্ত্রাসীরা। অক্টোবরের শুরুর দিকে আলাদা ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করেন বুশ। এমন ঘোষণায় বেশ চটে যান শ্যারন। ঘোষণা দেন, এখন ইজরাইল নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য গড়বে। বুশ এটি ভালোভাবে নেননি, শ্যারন অবশ্য পরে নমনীয় হন এবং ক্ষমা চান।

বুশ যখন রোডম্যাপ বাস্তবায়নের জন্য চাপ দিতে থাকলেন, ক্রিশ্চিয়ান জায়োনিস্টরা এর বিরোধিতায় নামলেন। তারা বলতে থাকেন– 'এটা রোডম্যাপ নয়; বরং রোডট্রাপ। এর বাস্তবায়ন মানে হলো ইজরাইল রাষ্ট্রের ধ্বংসের সূচনা হওয়া।' তারা প্রচার করতে থাকলেন, প্রেসিডেন্ট কেবল বাইবেলের ম্যান্ডেটের বিরুদ্ধেই যাচ্ছেন না; ইজরাইলকে অনিরাপদ করার পদক্ষেপ নিচ্ছেন। ইভানজেলিকরা এর বিকল্প প্রস্তাব নিয়ে হাজির হলো। সেটা কীরকম? ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষকে ভেঙে দিতে হবে, সামারিয়া ও জুডিয়ায় সন্ত্রাসীদের ভবনগুলোকে গুঁড়িয়ে দিতে হবে, জর্ডানকে ফিলিস্তিনিদের

জাতীয় রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া এবং ফিলিস্তিনিদের বিভিন্ন আরব দেশে পাঠাতে হবে। ইজরাইলের পর্যটনমন্ত্রী বেনি এলন ঘোষণা দেন–

'মসজিদে মসজিদে যেতে হবে। মুসলমানদের প্রকাশ্যে ধরে এনে খ্রিষ্টান বানাতে হবে।'

মাইকেল মেলকিওর নামে এক ইজরাইলি সংসদ সদস্য– যিনি রোডম্যাপ সমর্থন করেছিলেন তিনি বলেছিলেন– 'এলন একটা পাগল।' মাইকেল বলেছেন, মুসলমানদের প্রতি এর চেয়ে বড়ো অপমান আর হয় না। ২০০৪ সালের জুনে এলটনকে মন্ত্রিসভা থেকে বরখাস্ত করেছিলেন শ্যারন। পরে নেসেটে শ্যারনের সমালোচনা করে এলন বলেন–

'ইভিল, ইভিল, ইভিল।'

বরখাস্তের পরেও মার্কিন ইভানজেলিকদের সাথে সখ্যতা ধরে রাখেন এলন। ২০০৫ সালে ইজরাইলি পত্রিকা *হারেজ* জানায়, ইজরাইলিদের চাইতেও বেশি সময় তিনি ইভানজেলিকদের জন্য ব্যয় করেন।

২০০২ সালের মার্চে উত্তর ইজরাইলের একটি হোটেলে হামাসের আত্মঘাতী বোমা হামলার পর ২০ হাজার রিজার্ভ ফোর্স দিয়ে অপারেশন ডিফেন্সিভ শিল্ড ঘোষণা করেন শ্যারন। ২০ বছর আগে লেবানন অভিযানের পর এটাই সবচেয়ে বড়ো ইজরাইলি স্থল অভিযান। ইজরাইলি বাহিনী ট্যাংক সহকারে ফিলিস্তিনি শহরগুলোকে ঢুকে পড়ে; বাদ যায়নি শরণার্থী শিবিরগুলোও। তারা জেনিন ক্যাম্পে ব্যাপক ধ্বংস ও হত্যাযজ্ঞ চালায়। বুশ প্রশাসন চাপ দেয় সেনা ফিরিয়ে নিতে, কিন্তু ইভানজেলিকরা শ্যারনের পাশেই থাকল। ২০০২ সালের এক জরিপে দেখা যায়, ৬৭ শতাংশ রিপাবলিকান সমর্থক ইজরাইলকে সমর্থন করছে– যেখানে মাত্র ৮ শতাংশ লোক ফিলিস্তিনের পক্ষে। *ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের* মতো পত্রিকা সম্পাদকীয় ছেপে বুশকে ধুয়ে দিলো।[১০৯]

২০০২ সালের এপ্রিলে ওয়াশিংটনে ইজরাইলের প্রতি সমর্থন জানিয়ে একটি র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়, এতে এক লাখের মতো মানুষ অংশ নেয়। যেখানে আরাফাতের সমালোচনা করেন নেতানিয়াহু বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের মতোই তার দেশ ইসলামি চরমপন্থিদের সাথে লড়াই করছে। বুশ প্রশাসনের পক্ষে র‍্যালিতে যোগ দিয়েছিলেন মার্কিন সহকারী প্রতিরক্ষামন্ত্রী পল উইলফোজ। এখান থেকে ঘোষণা আসে–

'আমরা কখনোই গোলান ছাড়ব না, জেরুজালেমকে ভাগ হতে দেবো না। আমরা ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা একসঙ্গে আছি।'

---

১০৯. Evangelicals and Israel The Story of American Christian Zionism, Stephen Spector, Oxford University press, 2009, page 238-249.

গেরি বুয়ার, পেট রবার্টসন আর জেরি ফালওয়েল ইজরাইল রাষ্ট্রের পক্ষে ই-মেইল প্রচারণা চালান। বুশের ওপর চাপ বাড়তে থাকে। ফালওয়েল তার সমর্থকদের বলেন–

'হোয়াইট হাউজে ইজরাইলের সমর্থনে ই-মেইল ও ফোনের বন্যা বইয়ে দিন।'

এপ্রিলের ১৮ তারিখে মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকায় দশ দিনের সফর শেষ করে কলিন পাওয়েল বললেন, ইজরাইল তার অভিযান সমাপ্ত করা না পর্যন্ত সমঝোতা কার্যক্রম আগানো সম্ভব নয়। এপ্রিলে ইজরাইলি অভিযান সমাপ্ত করতে বুশকে প্ররোচিত করতে থাকেন পাওয়েল। বুশ যখন প্রত্যাখ্যান করলেন, তখন তিনি বললেন কার্ল রোভ পলিসি ঠিক করছেন।

২০০৭ সালে গাজার দখলে হামাসের কাছে যাওয়ার পর বুশ প্রশাসন ফাতাহ-সমর্থিত পিএ-কে সমর্থন করল। জুলাই যুক্তরাষ্ট্র পিএ-কে ১৯০ মিলিয়ন ডলার অর্থ-সাহায্য আর ৮০ মিলিয়ন নিরাপত্তা সহযোগিতা দিলো। বুশ ম্যারিল্যান্ডের অ্যানাপোলিসে একটি শান্তি সমম্মেলন করেন, যার উদ্দেশ্যে একটি ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনে এগিয়ে যাওয়া। ক্রিশ্চিয়ান জায়োনিস্টরা এই উদ্যোগের নিন্দা জানাল। ২০০৩ সালের রোডম্যাপের জন্য গ্যারি বুয়ার অসন্তুষ্ট ছিলেন। ২০০৭ সালের নভেম্বরে অ্যানাপোলিস সম্মেলন হয়, তিন-চতুর্থাংশ আরব এবং ষাট ভাগের মতো ফিলিস্তিনি এই সম্মেলনকে ব্যর্থ বলে দাবি করে। ইভানজেলিকরা মনে করত, অ্যানাপোলিসের শান্তি ঘোষণা মানলে ইজরাইল-ই মানচিত্র থেকে হারিয়ে যাবে।

বিশ্বের প্রভাবশালী ইহুদি ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও মিডিয়া

'কমিউনিজম' মতবাদের স্বপ্নদ্রষ্টা কার্ল মার্কস। তার জন্ম জার্মানির এক ইহুদি পরিবারে। হিটলার যেসব কারণে ইহুদিদের ওপর চড়াও হয়েছিলেন, এসবের একটি কমিউনিজম। রাশিয়াতে ১৯১৭ সালের বলশেভিক বিপ্লবে অনেক ইহুদি নেতার অংশগ্রহণ ছিল। বলশেভিক নেতা লিও ট্রটস্কি একজন ইউক্রেনিয়ান বংশোদ্ভূত ইহুদি। হাঙ্গেরি বংশোদ্ভূত প্রয়াত মার্কিন জাদুশিল্পী (১৮৭৪-১৯২৬) হ্যারি হুডিনি এবং ডেভিড কপারফিল্ডও ইহুদি পরিবারেরই সন্তান।

এদেরই মতো ইহুদি পরিবার থেকে এসেছেন বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ও পদার্থবিদ আলবার্ট আইনস্টাইন। ইজরাইলের রাষ্ট্রপতি হওয়ার অনুরোধ ফিরিয়ে দেওয়া এই বিজ্ঞানীই যুক্তরাষ্ট্রকে প্রলুব্ধ করেন পরমাণু বোমা বানাতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানির বিজ্ঞানীরা যখন ভারী পানি থেকে পরমাণু বোমা তৈরির দিকে মনোযোগ দেয়, তখন আইনস্টাইন ভেবেছিলেন, জার্মানরা সম্ভবত বোমা তৈরির কাছাকাছি চলে এসেছে।

এ অবস্থায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে পরমাণু বোমা তৈরির পরামর্শ দিয়ে চিঠি লিখেন শঙ্কিত আইনস্টাইন। তার চিঠি পেয়েই পরমাণু বোমা তৈরির 'ম্যানহাটন প্রজেক্ট' হাতে নেয় যুক্তরাষ্ট্র।

গত দুই দশক ধরে অধ্যাপক নোয়াম চমস্কিকে বলা হয় পৃথিবীর সেরা বুদ্ধিজীবী ও দার্শনিক। আফগান-ইরাক যুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির সমালোচনা করে আলোচনায় আসা এই বুদ্ধিজীবীও একজন ইহুদি। এমআইটি ও অ্যারিজোনা ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক চমস্কির ঝুলিতে রয়েছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অর্ধশতাধিক ডক্টরেট ডিগ্রি! তিনি প্রথা ভেঙে প্যালেস্টাইনে ইহুদি তাণ্ডবের সমালোচনা করে আসছেন। ১৯০১ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত যে কয়জন নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন, তাদের মধ্যে ১১৭ জন-ই ইহুদি।

ইহুদিদের সমর্থন ছাড়া কোনো আমেরিকান সহজে প্রেসিডেন্ট হতে পারেন না! মার্কিন রাজনীতিতে ইহুদিদের প্রভাব কতটা গভীরে, তার যথার্থ প্রতিফলন দেখা যায় হোয়াইট হাউজে। সেখানে ইহুদি লবির প্রভাব সব সময়ই দেখা গেছে। সাবেক প্রেসিডেন্ট বুশের মতো বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনেও ইহুদিদের দাপুটে অবস্থান বেশ পরিষ্কার। এর নেতৃত্ব দিচ্ছেন স্বয়ং প্রেসিডেন্টের জামাতা জ্যারেড কুশনার।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে নির্বাচনী ফান্ড তহবিল সংগ্রহ একটা বড়ো ধরনের চ্যালেঞ্জ। বারাক ওবামা বা ক্লিনটন নিজের টাকায় প্রেসিডেন্ট হতে পারতেন না। অনুদান আর পার্টির টাকায় তাদের নির্বাচনী ব্যয় মেটাতে হয়েছে, সেখানে প্রেসিডেন্ট প্রার্থীদের সবচেয়ে বড়ো নির্বাচনী ফান্ডদাতা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ইহুদি লবি গ্রুপ-AIPAC।[১১০]

মার্কিন ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও কর্পোরেট হাউজগুলোতেও রয়েছে ইহুদিদের ব্যাপক প্রভাব। সেখানে জুইশ কমিউনিটি বা ইহুদি সম্প্রদায়কে খুশি রাখার চেষ্টা দেখা যায় সব প্রেসিডেন্টের আমলেই।

CNN, Bloomberg, AOL, Cartoon Network, HBO, New Line Cinema, Wamer Bross, People (American Weekly magazine), Sports Illustrated. এই মিডিয়াগুলোতে ইহুদি মিডিয়া ব্যবসায়ী গেরাল্ড লেভিন নিয়ন্ত্রিত।

ওয়াল্ট ডিজনি কর্পোরেশন ইহুদি ব্যবসায়ী রবার্ট এ. আইগার নিয়ন্ত্রিত। এই কর্পোরেশনের অধীনে রয়েছে এবিসি (আমেরিকান ব্রডকাস্টিং কোম্পানি)। আইগারের পূর্বসূরি মাইকেল আইজনারও ছিলেন ইহুদি। Fox Network, National Geographic,

---

১১০. জনপ্রিয় খেলায় ওরা মাতেন না কেন?ইসমাঈল হোসেন দিনাজী। ০৯ জুলাই ২০১৯।

20th Century Fox-রুপার্ট মার্ডক নিয়ন্ত্রিত। ২০০১ সালে ইরাকের বিরুদ্ধে মার্কিন আগ্রাসনকে সাধারণ আমেরিকানদের কাছে বৈধ হিসেবে উপস্থাপন করতে জোর ভূমিকা রেখেছে ফক্স নিউজ। বিশ্ববিখ্যাত মিডিয়া মুগল রুপার্ট মারডকের নিয়ন্ত্রণে থাকা এ রকম প্রতিটি প্রতিষ্ঠান ইহুদিদের সমর্থন দিয়ে এসেছে। মারডকের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে সারা বিশ্বের ১৮৫টি পত্র-পত্রিকা ও অসংখ্যটিভি চ্যানেল। বলা হয়– পৃথিবীর মোট তথ্য প্রবাহের ৬০%-ই কোনো না কোনোভাবে নিয়ন্ত্রণ করে রুপার্ট মারডক। স্পোর্টস চ্যানেল, ইএসপিএন, ইতিহাসবিষয়ক হিস্ট্রি চ্যানেলসহ আমেরিকার প্রভাবশালী অধিকাংশ টিভি-ই ইহুদিরা নিয়ন্ত্রণ করছে।

আমেরিকার পত্রিকাগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রভাব বিস্তারকারী তিনটি পত্রিকা হলো– *নিউইয়র্ক টাইমস* ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল এবং *ওয়াশিংটন পোস্ট*। এ তিনটি পত্রিকার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ইহুদিদের হাতে। ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারীর জন্য প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল ওয়াশিংটন পোস্ট। এই গ্রুপের আরেকটি সাপ্তাহিক পত্রিকা পৃথিবীজুড়ে বিখ্যাত। *টাইম*-এর পরে বিশ্বের দ্বিতীয় প্রভাবশালী এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটির নাম *নিউজউইক*। মার্কিন রাজনৈতিক জগতে প্রভাবশালী *নিউইয়র্ক টাইমস*-এর প্রকাশনার দায়িত্ব প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ইহুদিদের হাতেই রয়েছে। বর্তমান চেয়ারম্যান আর্থার সালজবার্গার ইহুদি। তার ছেলে আর্থার গ্রেগ সালজবার্গার এখন পত্রিকাটির প্রকাশক।

বলা হয়ে থাকে– বিশ্বের অর্থনীতি যারা নিয়ন্ত্রণ করেন, তাদের নিয়ন্ত্রণ করে ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল। এই পত্রিকার ইহুদি প্রকাশক ও চেয়ারম্যান পিটার আরকান তেত্রিশটিরও বেশি পত্রিকা ও প্রকাশনা সংস্থা নিয়ন্ত্রণ করেন।

ইজরাইলের সাইবার তৎপরতা

বিরোধী সব অনলাইন ও অফলাইন তৎপরতা রুখে দিতে ইজরাইল খুলেছে একাধিক সাইবার ইন্টেলিজেন্স ইউনিট। তবে ইউনিট-৮২০০ নিয়ে আছে মুখরোচক সব আলোচনা। বিশ্বের সামরিক সব সাইবার ইউনিট থেকে এর কার্যক্রমের ধরন আলাদা এবং যথেষ্ট বিস্ময়করও। বিস্ময় তার রিক্রুটিং প্রসেসের মধ্যেই। চলুন দেখে আসি ইউনিট ৮২০০ কীভাবে কর্মী রিক্রুট করে থাকে।

ইউনিট ৮২০০-এর বিশেষ টার্গেট স্কুলপড়ুয়া কমবয়সি ছেলেমেয়ে। অন্য গোয়েন্দা বাহিনীর মতো গ্রাজুয়েট বা যুবকদের প্রতি এই সংস্থার আগ্রহ তেমন নেই। তারা স্কুলপড়ুয়া তরুণদের ভেতর রিক্রুটমেন্ট চালায়। খুঁজে বের করা হয় প্রযুক্তি, বিশেষ করে কম্পিউটারে আসক্ত টিনেজদের, যারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সব হ্যাকিংয়ে পারদর্শী। কারণ, ইহুদি আর্মির সাইবার স্পেশালিস্টদের ধারণা– এসব ছেলেমেয়ে গ্রাজুয়েটদের তুলনায় গতানুগতিকের বাইরে (আউট অব দ্য বক্স) চিন্তা করতে পারে।

সবচেয়ে ব্রাইটেস্ট ব্রেইনগুলো থেকে কর্মী নিয়োগ করে ইজরাইলি আর্মি সরাসরি পাঠিয়ে দেয় ইউনিট ৮২০০-এর কাছে। এরপর এদের দেওয়া হয় পর্যাপ্ত ট্রেনিং। মূলত এক ধরনের লম্বা একাডেমিক লাইফ বলা যায় এটাকে। কারণ, কখনো কখনো এই ট্রেনিং চার-পাঁচ বছর ছাড়িয়ে যায়। এদের তৈরি করা হয় স্পাই এজেন্সিগুলোর জন্য, যারা ইজরাইলি সাইবার সিকিউরিটি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ইউনিট ৮২০০-এর কার্যক্রম ও তৎপরতা নিয়ে একাধিক প্রতিবেদন ছাপিয়েছে টেলিগ্রাফ, সিএনবিসি ও ফোর্বস-এর মতো প্রচারমাধ্যম।

ইজরাইল বরাবরই প্রযুক্তি, গোয়েন্দা ও সাইবার কার্যক্রমে দক্ষ। রাজধানী তেলআবিব ও বীরশেবাকে গড়ে তোলা হয়েছে ওয়েস্টার্ন প্রযুক্তি নগরীর আদলে। রণাঙ্গনের বদলে ভবিষ্যতে সাইবার যুদ্ধ যে মারাত্মক হয়ে উঠবে, ইজরাইল তা বহু আগেই টের পেয়েছে। তাই তাদের সাইবার ইউনিটগুলোকে সাজানো হয়েছে আধুনিক সব প্রযুক্তি দিয়ে। কার্যক্রমে ভিন্নতা থাকলেও ইউনিট ৮২০০-কে গড়ে তোলা হয়েছে মার্কিন এনএসএর আদলে। এই দুটি সংস্থা মিলেই ইরানের নাতানজে পরমাণু স্থাপনায় সাইবার হামলা করেছিল। 'স্টাক্সনেট' নামের যে ভাইরাস দিয়ে এই হামলা চালানো হয়, সেটিও এই দুটি সংস্থারই তৈরি।

ইরান এই ভাইরাস সনাক্ত করতে পারেনি, পেরেছিল বেলারুশের একটি প্রতিষ্ঠান। জার্মানির তৈরি এই ভাইরাস সিমেন্সের মেশিনে ছড়িয়ে দেয় ইজরাইল। ফলে বহু বছর পিছিয়ে যায় ইরানের পরমাণু কার্যক্রম। তবে ইউনিট ৮২০০ ইজরাইলের সাইবার নিরাপত্তায় যেমন ভূমিকা রাখছে, তেমনি ভূমিকা রাখছে অর্থনীতিতেও। কারণ, এই ইউনিটে সার্ভিস দিয়ে বের হয়ে আসা ছেলেমেয়েরা বড়ো বড়ো টেক ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করছে। ফলে ইজরাইল পরিণত হয়েছে স্টার্টআপ নেশনে।

টুইটার, ফেসবুকসহ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোতে ফিলিস্তিনবিরোধী প্রোপাগান্ডাকে সহজতর করতে ইজরাইলি কর্মকর্তারা অ্যাকাউন্ট খুলছেন এবং আরবিতে বিভিন্ন পোস্ট দিচ্ছেন। আর এসব পোস্টে আরবি প্রবাদ-প্রবচন; এমনকী পবিত্র কুরআনের আয়াত ব্যবহার করা হচ্ছে। আরবদের টার্গেট করে ইজরাইলের সেনাবাহিনী ও সরকারি কর্মকর্তারা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আরবি ভাষায় যেসব অ্যাকাউন্ট খুলেছেন, এগুলোর মূল উদ্দেশ্য একটাই– আরব যোগাযোগের দুনিয়ায় প্রবেশ করা। ফিলিস্তিনিরা মনে করে, আরবদের সাথে তাদের মাতৃভাষায় কথা বলতে এসব ইজরাইলি কর্মকর্তা অ্যাকাউন্ট খুলছেন আর এগুলো দিয়ে ইজরাইলি দখলদারিত্ব স্বাভাবিক করার জন্য মিথ্যা ছড়াচ্ছেন, প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছেন, নিজেদের ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরছেন; এমনকী ফিলিস্তিনিদের চলাফেরায় নজরদারি করছেন।

ইজরাইল নিজেকে মধ্যপ্রাচ্যের একমাত্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে দেখাচ্ছে। এ ছাড়া তারা নিজেকে একটি মানবিক রাষ্ট্র হিসেবে দেখাতে চায়, যারা কিনা তাদের ভাষায় 'সন্ত্রাস ও সহিংসতার' শিকার। আর এর মাধ্যমে ইহুদি ঔপনিবেশিক ইতিহাস, হত্যাকাণ্ড ও গুমের ঘটনা আড়াল করা হচ্ছে।

এসব অ্যাকাউন্ট থেকে প্রয়োজনীয় কিছু তথ্যও সরবরাহ করা হয়। যেমন : চেকপয়েন্টগুলো কখন খুলবে, কখন বন্ধ হবে, ভ্রমণ বা মেডিকেলের উদ্দেশ্যে কীভাবে সেনাবাহিনীর কাছ থেকে পারমিট মিলবে। ফিলিস্তিনিদের প্রয়োজনীয় জায়গাটিতে ফোকাস করে তাদের আকৃষ্ট করার মাধ্যমে ইজরাইল তার রাজনৈতিক এজেন্ডা হাসিল করছে। ২০১১ সালের আরব বসন্তপরবর্তী সময়ে আরবদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অংশগ্রহণ বেড়েছে। যেখানে বেশিরভাগ আরব মিডিয়া আরব শাসকদের মুখপত্র হিসেবে কাজ করছে, সেখানে এসবের বিকল্প হিসেবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম কাজ করে যাচ্ছে। আর আরব ও ফিলিস্তিনিদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ঝুঁকে পড়ার সুযোগ কাজে লাগাচ্ছে ইজরাইল।

২০১৬ সালে অধিকৃত পশ্চিম তীরে ইজরাইলি সেনাবাহিনীর একটি ইউনিট COGAT- Coordination of Government Activities in the Territories নামে একটি অ্যাকাউন্ট খুলেছে।

Israel Speaks in Arabic নামে ফেসবুকে আরও একটি পেইজ আছে। মিশর ও জর্ডানে থাকা ইজরাইলি দূতাবাসেরও এ ধরনের পেইজ রয়েছে। এই উন্মুক্ত যোগাযোগ চ্যানেলগুলো চালু করা হয়েছে ফিলিস্তিনিদের কাছ থেকে আরবদের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করতে এবং ফিলিস্তিনি কর্তৃক ইজরাইলিদের বিরুদ্ধে একক আক্রমণের বিষয়ে ভীতি ছড়াতে এবং তাদের যেকোনো প্রতিরোধ সংগ্রামে কলঙ্ক লেপন করতে।

গাজার বাসিন্দাদের বিভিন্ন রকম প্রতিশ্রুতি বিশেষ করে মেডিকেল সুবিধা, ভ্রমণ সুবিধা ও গরিব ফিলিস্তিনিদের প্রতি আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয় এসব অ্যাকাউন্টে। এসবের বিনিময়ে ফিলিস্তিনিদের কাছে তথ্য চায় ইজরাইলি গোয়েন্দা এজেন্টরা, কিন্তু পরে তারা প্রতিশ্রুতি রাখে না; বরং রিক্রুটমেন্টের আড়ালে চাঁদাবাজি করে। ফিলিস্তিনিরা এটাকে ডিজিটাল দখলদারিত্ব বলে থাকে। এর মাধ্যমে ভার্চুয়াল জগতের মাধ্যমে ইজরাইল তার নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারি বাড়াচ্ছে এবং দমন-নিপীড়ন অব্যাহত রেখেছে। Bidna naeesh নামে আরেকটি আরবি পেইজ আছে যার অর্থ 'আমরা বাঁচতে চাই'। এখানে টেলিফোন নম্বর দেওয়া আছে আর ওয়ান্টেড ফিলিস্তিনি ও অপরাধীদের তথ্য দিতে বলা হয়েছে। এ রকম শ'খানেক পেইজ আছে, যেগুলো ইজরাইলি আর্মি ও গোয়েন্দা কর্মকর্তারা খুলেছেন।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এসব ইজরাইলি অ্যাকাউন্টের সাথে ফিলিস্তিনিদের যোগাযোগ গড়ে উঠার কারণ হচ্ছে অজ্ঞতা এবং স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদে এর ফল কী হতে পারে তা অনুধাবন করতে না পারা। ইজরাইলিরা যে আরবিতে দেওয়া তাদের পোস্টে কেবল আরবি প্রবাদ ও কুরআনের আয়াত ব্যবহার করছে তা নয়; এমনকী তারা এটাও বোঝাতে চান যে, তারা আরব নাগরিকদের মঙ্গলের কথাটি ভাবেন। সন্ত্রাসীদের দেখিয়ে দেওয়া ভুল পথে হাঁটলে এবং ইজরাইলি দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করলে তার বিপদ কী হতে পারে– সেটাও তারা তুলে ধরছেন।

যারা এসব অ্যাকাউন্টের সাথে যোগাযোগ গড়ে তুলছেন, তাদের দুটো ক্যাটাগরি রয়েছে। একটি পক্ষে যারা ফিলিস্তিনি অধিকারের পক্ষে সোচ্চার, ইজরাইলি প্রচারণার বিপরীতে যারা যুক্তি তুলে ধরছেন আর আরেক পক্ষে রয়েছেন তারা, যারা ইজরাইলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণে কোনো সমস্যা দেখছেন না এবং যারা নেহায়েত আগ্রহের জন্যই এসব অ্যাকাউন্টে ঢোকেন। আরব টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে ইজরাইলি কর্মকর্তাদের উপস্থিতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়েছে। আরবরা ইজরাইলিদের ফ্রি সার্ভিস দিচ্ছে। তারা অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইজরাইলি গোয়েন্দাদের কাছে আরবদের সম্পর্কে তথ্য তুলে দিচ্ছে। এর মাধ্যমে ইজরাইলিরা আরবদের অ্যাকাউন্টে ঢুকতে পারছেন। এটা অনেকটা নিজ বাড়ির চাবি শত্রুর হাতে তুলে দেওয়ার মতোই।

বিংশ অধ্যায়

ইজরাইল

'মোট জনসংখ্যার অর্ধেক আরব রেখে আমরা একটি ইহুদিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারি না। এ ধরনের একটি রাষ্ট্র আধাঘণ্টাও টিকবে না।'
—মেনাখেম বেগিন।

ইহুদিরাষ্ট্র ঘোষণা

২০১৮ সালের ১৯ জুলাই থেকে ইজরাইল নিজেকে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি ইহুদিরাষ্ট্রে রূপান্তর করেছে। আধুনিক রাষ্ট্রের যে সংজ্ঞা, এটি তার সম্পূর্ণ বিপরীত, কিন্তু ইজরাইল এটা করতে পেরেছে– তার পেছনে পশ্চিমের আর্শীবাদের কারণে। ইজরাইলে বসবাসরত আরবদের অবস্থা এমনিতেই চিড়ে চ্যাপটা। ভালো নেই আফ্রিকা থেকে আসা ইহুদিরাও। অধিকারের জায়গাগুলো ইউরোপ-আমেরিকা থেকে যাওয়া ইহুদিদের নখদর্পণে। নেসেটে নতুন আইন পাস হওয়ার ফলে ইজরাইলে বসবাসরত আরবসহ অন্যান্য জাতি ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা ভবিষ্যতে ইহুদি জনগোষ্ঠীর সমান অধিকার পাবে না।

ইউনিভার্সিটি অব বনের ইনস্টিটিউট অব অরিয়েন্ট অ্যান্ড এশিয়ান স্টাডিজের ভিজিটিং রিসার্চ ফেলো ডক্টর মারুফ মল্লিক মনে করেন– 'এর মধ্য দিয়ে ইজরাইল আদতে আধুনিক রাষ্ট্রের সংজ্ঞার বিপরীত মেরুতে অবস্থান নিল। আধুনিক রাষ্ট্রে সবাইকে নিয়েই থাকতে হয়– সেখানে ধর্ম, বর্ণ ও জাতিগত কোনো বিভেদ থাকবে না।'[১১১] কিন্তু ইজরাইলে বসবাসরত আরবসহ অন্যান্য জাতি ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা ইহুদি জনগোষ্ঠীর সমান অধিকার পাবে না। কিন্তু ইজরাইল আদৌ আধুনিক রাষ্ট্রের সংজ্ঞায় পড়ে কি না? যে রাষ্ট্রের জন্মই হয়েছে অবৈধভাবে, আর প্রতিদিন ভূমিপুত্রদের খুন করে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে, তার কাছে আধুনিক গণতান্ত্রিক আচরণ আশা করা বোকামি ও বাতুলতামাত্র। নিজেদের ইহুদিদের রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করে ইজরাইল তার বর্ণবাদী আচরণকে সাংবিধানিক বৈধতা দিলো।

---

[১১১]. ইজরাইলের ইহুদিরাষ্ট্র ঘোষণা এবং নয়া বর্ণবাদ, দৈনিক *প্রথম আলো* অনলাইন সংস্করণ, ২৪ জুলাই, ২০১৮।

ইজরাইলের এমন ঘোষণা, অবশিষ্ট প্যালেস্টাইন ভূখণ্ডে ইহুদি বসতি বাড়ানোর অজুহাত হতে পারে। এমনটা হলে আরও অনেক ফিলিস্তিনি বাড়িঘর ও জমি হারাবে, হারাচ্ছেও। বাড়বে শরণার্থীর সংখ্যা।

কিন্তু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ৭০ বছর পরে এসে কেন এমন ঘোষণা এলো ইহুদি নেতাদের কাছ থেকে। এ নিয়ে নানান সমীকরণ হাজির করা হচ্ছে। অর্থনীতি, ভূ-রাজনীতি, তেল রাজনীতি ও প্রতিরক্ষায় নতুন ডাইমেনশন দেখা যাচ্ছে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিভিন্ন বিতর্কিত সিদ্ধান্তের কারণে ইজরাইলের প্রধান মিত্র যুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্বিক প্রভাব-প্রতিপত্তি কমছে। ঐতিহাসিক অনেক মিত্রের (পাকিস্তান, তুরস্ক) সাথেই তার দূরত্ব বেড়েছে। ন্যাটোতে মোড়লিপনা নিয়ে ইউরোপের সাথেও দিন ভালো যাচ্ছে না। চীন, রাশিয়া ও তুরস্ককে ঘিরে নতুন নতুন পাওয়ার হাউজের জন্ম হচ্ছে। এমনকী ২০১৫ সালে সম্পাদিত ইরানের পরমাণু চুক্তি নিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে তিক্ততা চলছে। নড়বড়ে আমেরিকাকে নিয়ে ইজরাইল হয়তো এই শঙ্কায় ভুগছে যে, তাদের জামিনদার হিসেবে আমেরিকা আর রক্ষা করতে পারবে না। সে জন্য টিকে থাকার চেষ্টা হিসেবে ইজরাইলকে আগ্রাসী হতে হচ্ছে।

১৯ জুলাই, ২০১৮ সালে ইজরাইলের পার্লামেন্টে এ-সংক্রান্ত একটি আইন পাস করা হয়। ৬২টি ভোটের মধ্যে ৫৫টি ভোটই আইনটির পক্ষে পড়ে। আইনে হিব্রুকে দেশটির জাতীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া আইনটির মাধ্যমে আরেকটি বিষয় পরিষ্কার করা হয়েছে। তা হলো– 'জাতীয় স্বার্থেই ইহুদিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হলো।'

'ইহুদিজাতি রাষ্ট্র' নামে নতুন এই আইনে সম্পূর্ণ জেরুজালেমকে ইজরাইলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি এবং প্রয়োজনে আরও বসতি স্থাপনেরও অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আইন পাসের পর ঘোষণা এসেছে, ইহুদিরাষ্ট্র হিসেবে এক ঐতিহাসিক যাত্রা শুরু করল ইজরাইল। যার মধ্য দিয়ে ইহুদিরা নিজেদের পরিচয় নির্ধারণের সুযোগ পেল। খোদ ইজরাইলে এই বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক থাকার পরও ইহুদিরাষ্ট্র হিসেবে পার্লামেন্ট সেটির স্বীকৃতি দিয়েছে।

ইজরাইলের পার্লামেন্টে আইনটি পাস হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন– 'এটা সেই ঐতিহাসিক মুহূর্ত, যখন আমাদের ভাষা, আমাদের জাতীয় সংগীত ও আমাদের জাতীয় পতাকার বিজয় রচিত হলো।' অথচ মুসলিম বিশ্ব এটাকে দেখছে আগ্রাসী পদক্ষেপ হিসেবে। ফলে ইজরাইল তাদের চোখে বরাবরের মতো ভিলেনই রয়ে গেছে। ওআইসি, আরব ও অনারব নেতারা এর বিরোধিতা ও নিন্দা করেছেন। তাঁরা বলছেন, এই আইনের মাধ্যমে দেশটির গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়েছে।

ইজরাইলের আরব সংসদ সদস্যরা আইনটির বিরোধিতা করলেও নেতানিয়াহু বিল অনুমোদনের প্রশংসা করে একে 'বাঁকবদলের মুহূর্ত' হিসেবে অ্যাখ্যা দিয়েছেন। নেতানিয়াহু নেতৃত্বাধীন ডানপন্থি সরকার সমর্থিত বিলটিতে ইজরাইলকে 'ইহুদিদের ঐতিহাসিক জন্মভূমি' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে– ইহুদিরা ইজরাইলের জাতিগত আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও বিশেষ অধিকার রাখেন।

ইজরাইলের মোট জনসংখ্যা ৯০ লাখ। এদের প্রায় ২০ শতাংশ আরব; যাদের অধিকাংশই সুন্নি মুসলমান, বাকিরা খ্রিষ্টান ও দ্রুজ। দেশটির আইনে আরব ও ইহুদিদের সমান অধিকার দেওয়া হলেও দীর্ঘদিন ধরেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বৈষম্যের অভিযোগ করে আসছেন ইজরাইলি আরবরা। ভূখণ্ডের ভেতর থাকা আরবদের ইজরাইল দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে গণ্য করে আসছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের মতো পরিষেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের প্রতিনিয়ত বৈষম্যের শিকার হতে হয়। এ পরিস্থিতিতে 'ইহুদি জাতি-রাষ্ট্র' আইন দেশটিতে জাতিগত বিভেদের রাজনীতি উসকে দেবে বলে আশঙ্কা দেশটির আরব নেতাদের।

নেসেটে ইহুদি জাতি-রাষ্ট্র বিল পাসের পরদিনই তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রেজেপ তাইয়্যিপ এরদোয়ান বলেছেন– 'এর মধ্য দিয়ে তেলআবিব বর্ণবাদ ও জাতিবিদ্বেষ ছড়াচ্ছে।' এরদোয়ান বলছেন– ইজরাইল এটা করেছে কারণ, তারা ফিলিস্তিনিদের তাড়াতে চায়। একই দিন ওআইসি মহাসচিব ইউসুফ বিন আহমেদ আল ওতাইমেন এক বিবৃতিতে বলেন, এটি ইজরাইলের বর্ণবাদী আচরণ। এর মধ্য দিয়ে মুসলিম ও খ্রিষ্টানদের ঐতিহাসিক অধিকারকে অস্বীকার করা হয়েছে। তুর্কি প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান তার ক্ষমতাসীন একে পার্টির এক সভায় ইজরাইলকে 'হিটলারের প্রেতাত্মার' সঙ্গে তুলনা করেন। এরদোয়ান বলেন–

> 'এই ঘটনার পর, সন্দেহের আর কোনো অবকাশ নেই যে, ইজরাইল এখন বিশ্বের সবচেয়ে ফ্যাসিবাদী এবং বর্ণবাদী রাষ্ট্র। আর্য বর্ণের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে হিটলারের বাতিক আর এই প্রাচীন জনপদ শুধু ইহুদিদের বলে ইজরাইলের যে বিশ্বাস, তা একই রকম। কোনো পার্থক্য নেই। হিটলারের যে প্রেতাত্মা পৃথিবীকে ধ্বংসের দ্বারে নিয়ে গিয়েছিল, তা নতুন করে ইজরাইলের কিছু নেতার ওপর ভর করেছে।'

হিটলার বা নাৎসি– যাদের কারণে ইউরোপে ৬০ লাখ ইহুদির মৃত্যু হয়েছিল, তাদের সাথে তুলনা করাই ইজরাইলিদের জন্য সবচেয়ে বড়ো অপমানের ব্যাপার। আর সে কারণে মুহূর্ত দেরি না করে ইজরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এরদোয়ানের দিকে কড়া প্রতিক্রিয়া ছুড়ে দেন। টুইটারে এরদোয়ানকে 'সিরীয় এবং কুর্দিদের গণহত্যার' জন্য দায়ী করেন নেতানিয়াহু। তাঁর মতে–

'এরদোয়ানের অধীনে তুরস্ক একটি অন্ধকার একনায়কতন্ত্রে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে নতুন আইনের পরও ইজরাইল তাদের সমস্ত নাগরিকের জন্য সমান অধিকার নিশ্চিত রেখেছে।'[১১২]

ইজরাইলকে ঠেকানোর কেউ নেই

সামরিক শক্তিতে পরাশক্তিগুলোকে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতা রাখে বিশ্বের একমাত্র ইহুদিরাষ্ট্র ইজরাইল। মধ্যপ্রাচ্যেও ইজরাইলকে দেখে নেওয়ার মতো শক্তি এখনও হয়ে উঠেনি। ইরান, মিশর কিংবা সৌদি আরব; বাস্তবে এরা কেহ-ই ইজরাইলের সমকক্ষ নয়। শিয়াপ্রধান রাষ্ট্র ইরান ইজরাইলকে টেক্কা দেওয়ার দৌড়ে এতদিনে হয়তো শক্ত একটা প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াতে পারত, কিন্তু কয়েক দশকের পশ্চিমা বাণিজ্য ও অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা সেই স্বপ্ন গুঁড়িয়ে দিয়েছে। ইজরাইলের তুলনায় ইরানের যুদ্ধবিমানের সংখ্যা বেশি হলেও এগুলোর বেশিরভাগই সেকেলে, যা সত্তর-আশির দশকে কেনা। ইজরাইলি অ্যারো-থ্রি বা ডেভিডস স্লিং-এর তুলনায় ইরানি মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেম কিছুই নয়। তারপরও অবরোধের সাথে লড়াই করে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও সমরশিল্পে ইরানের অগ্রগতি ইজরাইলের জন্য মাথাব্যথার কারণ তো বটেই। সমুদ্রে ইরানি গানবোট খোদ যুক্তরাষ্ট্রের কাছেও আতঙ্কের বিষয়। ইরাকে সাদ্দাম হোসেন এবং লিবিয়ায় মুয়াম্মার গাদ্দাফির পতন ও নিহতের পর একমাত্র ইরানকেই মধ্যপ্রাচ্যে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে ইজরাইল। চলুন ইজরাইলের সামরিক শক্তির রাজ্যে একটুখানি বিচরণ করা যাক।

আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার না করলেও ইজরাইল মধ্যপ্রাচ্যের একমাত্র পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্র; যার প্রতিরক্ষাবাহিনী মিশর, ইরাক ও সিরিয়ার পরমাণু কার্যক্রম গুঁড়িয়ে দিয়েছে। কৌশলে গুপ্তহত্যা চালিয়ে বহু বছর পিছিয়ে দিয়েছে লিবিয়া ও ইরানের পরমাণু কার্যক্রম। আরব পরিবেষ্টিত ইজরাইলের হাতে এখন পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধবিমান। আছে নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি পাইলটবিহীন গোয়েন্দাবিমান ও অ্যারো-থ্রি-এর মতো শক্তিশালী মিসাইল প্রতিরক্ষা সিস্টেম। এককথায় ইজরাইলের আকাশ প্রতিরক্ষা দুর্ভেদ্য, তাকে ঠেকানোর শক্তি সত্যিই আরবদের নেই।

প্রতিষ্ঠার সত্তর বছর পরে এসে এখন বিশ্ব মানচিত্রে অন্যতম 'হাই-টেক' পরাশক্তি ইজরাইল। অস্ত্র বেচেই ইজরাইলের আয় বছরে প্রায় ৬.৫ বিলিয়ন ডলার। সেই হিসেবে এখন বিশ্বের শীর্ষ অস্ত্র রফতানিকারকদের তালিকায় রয়েছে দেশটি। ইজরাইলি অস্ত্রের বড়ো ক্রেতা আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, ভিয়েতনাম ও আজারবাইজানের মতো দেশ।

---

[১১২]. 'হিটলারের ভূতের সাথে তুলনার পর এরদোয়ানের ওপর চরম ক্ষিপ্ত নেতানিয়াহু, বিবিসি বাংলা, ২৫ জুলাই, ২০১৮।

১৯৮৫ সাল থেকেই বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো ড্রোন রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে পরিচিতি পায় ইজরাইল।[১১৩] স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের তথ্যমতে, বিশ্ব বাজারের ৬০ ভাগেরও বেশি ড্রোনের বাজার এখন ইজরাইলের দখলে। যুক্তরাজ্য, চীন ভারত, ইতালি, রাশিয়া, আজারবাইজান, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, জার্মানি, তুরস্ক এবং ব্রাজিলের মতো দেশগুলো ইজরাইলের গ্রাহক। ইজরাইলের পরই যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান। দেশটির দখলে রয়েছে প্রায় ২৪ ভাগ ড্রোন মার্কেট। ইজরাইলের আছে আত্মঘাতী ড্রোন– যার নাম আইএআই হ্যারপ ড্রোন।
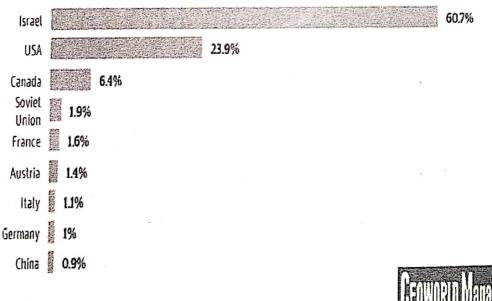
বিশ্বের শীর্ষ ড্রোন রপ্তানিকারক রপ্তানিকারক দেশগুলোর তালিকা। সূত্র : সিও ওয়ার্ল্ড ম্যাগাজিন।[১১৪]

---

১১৩. The Countries Importing The Most Drones, www.forbes.com. Niall McCarthy, Mar 18, 2015.

১১৪. Global Drone Trade: World's Largest Importing And Exporting Countries, ceoworld.biz, March 16, 2015, Dr. Amarendra Bhushan Dhiraj
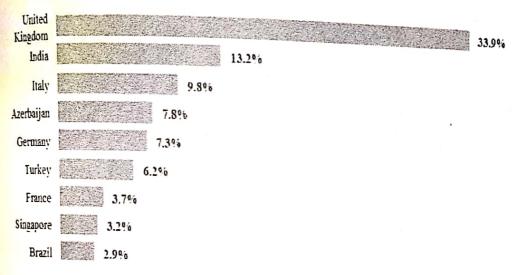
বিশ্বের শীর্ষ ড্রোন আমদানিকারক দেশগুলোর তালিকা। সূত্র : সিও ওয়ার্ল্ড ম্যাগাজিন।

সত্তর দশকের একেবারে শুরু থেকেই ড্রোনের ব্যবহার শুরু হয় ইজরাইলে। ইয়োম কিপুর যুদ্ধের আগে ১৯৭১ সালে মিশরের ওপর নজরদারি বাড়াতে ড্রোন ব্যবহার করে তারা। তারও আগে ইজরাইলি আর্মি খেলনা বিমানের মধ্যে ক্যামেরা লাগিয়ে সুয়েজ খালের আকাশে মিশরের ওপর নজর রাখত। তবে ১৯৮১-৮২-এর দিকে প্রথম লেবানন-ইজরাইল যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের অবস্থান জানতে প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে ড্রোন ব্যবহার করে ইজরাইল। তখন ড্রোন ব্যবহার করে মিসাইল হামলা বাটিয়ারগ্যাস ছোড়া হতো না, এখন যেমনটা গাজার ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে দেখা যায়। ড্রোন থেকে প্রথম মিসাইল হামলার ঘটনা ঘটে ২০০১ সালে আফগান যুদ্ধের সময়, এর আগে কেবল তা গোয়েন্দা নজরদারিতে ব্যবহার করা হতো। যুক্তরাষ্ট্র তালেবানদের অবস্থান লক্ষ্য করে তখন হামলা চালিয়েছিল।

১৯৭৯ সালে প্যারিস এয়ার-শোতে ইজরাইল প্রথমবারের মতো স্কাউট নামে একটি ড্রোন প্রদর্শন করে। এটিই পরে প্রথম লেবানন যুদ্ধে (অপারেশন পিস ফর দ্য গ্যালিলি) ব্যবহার করা হয়। মূলত এর মাধ্যমে সিরিয়ার 'অ্যান্টি এয়ারক্রাফট মিসাইল সিস্টেম'-এর দিকে নজর রাখত ইজরাইল।
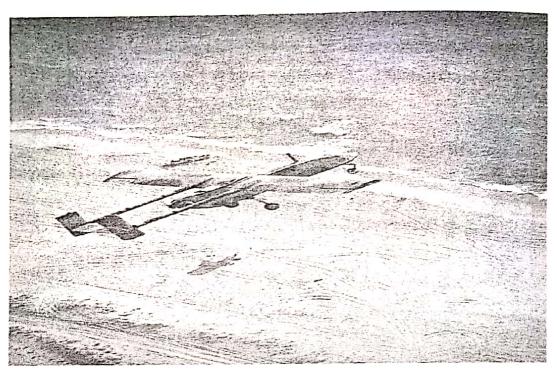
ছবিতে স্কাউট ড্রোন, সূত্র : ইন্টারনেট

১৯৮৬ সালে মার্কিন নৌ-বাহিনী ও মেরিন সেনাদের কাছে প্রথমবারের মতো পাইয়োনিয়ার নামে এক ধরনের ড্রোন সরবরাহ করে ইজরাইল। এটি ১৯৯১ সালে উপসাগরীয় যুদ্ধে সাদ্দামের বিরুদ্ধে (অপারেশন ডেজার্ট স্টর্ম) ব্যবহার করা হয়।

ইজরাইলের হাতে রয়েছে পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধবিমান ও রাডার ব্যবস্থা। আছে ৫০টির মতো সর্বাধুনিক এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান। রণাঙ্গনে স্টিলথ গোত্রের এই বিমানের প্রথম ব্যবহার ইজরাইলই করেছে। ২০১৮ সালে সিরিয়ায় বিভিন্ন ইরানি সামরিক অবস্থানে হামলা চালাতে পঞ্চম প্রজন্মের এই যুদ্ধবিমান ব্যবহার করে ইজরাইলি বিমানবাহিনী। বিমানটিকে এফ-১৬ বিমানের জায়গায় স্থলাভিষিক্ত করতে চায় ইজরাইল।

২০১১ সালে ওয়াশিংটন-তেলআবিব একটি সমঝোতাপত্র সই করেছিল, যাতে ইজরাইলকে ৭৫টি এফ-৩৫ বিমান কেনার অনুমতি দিয়েছিল মার্কিন সরকার। একই বিমান তুরস্ককে দেওয়ার জন্য চুক্তি করা হলেও গড়িমসি করা হচ্ছে। এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান তৈরির গবেষণায় যুক্তরাষ্ট্রের পার্টনার ছিল যুক্তরাজ্য, তুরস্ক, নেদারল্যান্ডসসহ অন্তত দশটি দেশ। প্রতিঘণ্টায় ১২০০ মাইল পথ পাড়ি দিতে পারে এই বিমান।

এই এফ-৩৫ বানাতে যে গবেষণা হয়েছে, তাতে ব্যয় হয়েছে ৫০ বিলিয়ন ডলার। গবেষণার কাজটি করেছে মার্কিন প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠান লকহিড মার্টিন। এটি বিশ্বের অন্যতম প্রধান অস্ত্র বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান; যারা স্যাটেলাইট, রাডার সিস্টেম,

মিসাইল, যুদ্ধবিমান, রোবট প্রযুক্তি তৈরি ও বিক্রি করে থাকে। প্রতিটি এফ-৩৫ লাইটনিং যুদ্ধবিমান তৈরিতে খরচ গড়ে ১০০ মিলিয়ন ডলারের মতো। এফ-৩৫-এ আধুনিক অনেক সিস্টেম সংযুক্ত করা আছে। এটি যে পরিমাণ তথ্য পাইলটের হেলমেটের হেডস আপ ডিসপ্লেতে সরবরাহ করতে পারে, অতখানি তথ্য সামলানো মানুষের পক্ষে একদমই অসম্ভব।

বিমানটি কেবল প্রয়োজনীয় তথ্য দেয় তার পাইলটকে। পাইলট সে তথ্য দেখার জন্য ককপিটের টাচস্ক্রিন আর হেলমেটের ডিসপ্লের সাহায্য নিয়ে থাকেন। আবার বিমানের গঠনেও যুক্ত করা হয়েছে ক্যামেরা। চাইলে সেই ক্যামেরা দিয়ে আশপাশে নজরদারিও করতে পারবেন পাইলট। (প্রথম আলো, ৯ এপ্রিল, ২০১৮)

এতসব তথ্য স্কোয়াড্রনের অন্য ড্রোনের কাছেও পাঠানোর ব্যবস্থা করতে পারে এফ-৩৫। এফ-৩৫ স্কোয়াড্রন লিডার কোনো সুরক্ষিত অবস্থানে নিজে হামলা না করে তার অনুসারী ড্রোন দিয়ে আক্রমণ পরিচালনা করতে পারেন। স্রেফ প্রয়োজনীয় তথ্য পাঠিয়ে দিলেই ড্রোনের কমব্যাট এলগরিদম বাকি কাজ সারবে। তবে ধীরে ধীরে স্কোয়াড্রন লিডার আর ড্রোনের এই যোগাযোগ আরও উন্নত হবে। কোনো কাজের নির্দেশ দেওয়া থেকে শুরু করে এলাকা প্রদক্ষিণের মতো আদেশও দেওয়া যাবে ড্রোনগুলোকে।

মিসাইল প্রতিরক্ষা সিস্টেম

মিসাইল প্রতিরক্ষার দৌড়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মতো দেশকে পেছনে ফেলে দেওয়ার যোগ্যতা রাখে ইজরাইল। পুরোনো প্যাট্রিয়টের পাশাপাশি দেশটির হাতে রয়েছে আয়রন ডোমের মতো স্বল্পপাল্লার মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেম। ২০১১ সাল থেকেই এটি ইজরাইলি আর্মিতে সংযুক্ত আছে। মূলত হামাস-হিজবুল্লাহর ছোড়া রকেট ধ্বংস করতেই ব্যাপকমাত্রায় এই প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ব্যবহার করা হয়। ৭০ কিলোমিটার দূর পর্যন্ত স্বল্পপাল্লার রকেট ধ্বংসে এর ব্যবহার হলেও সম্প্রতি রাষ্ট্রটি এর পাল্লা ২৫০ কিলোমিটারে উন্নীত করার প্রকল্প হাতে নিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি প্যাট্রিয়ট মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেম বা রাশিয়ার S-400 মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেম এর সাথে আয়রন ডোমের তুলনা করা হয়ে থাকে। যুক্তরাষ্ট্র, ভারত ও সিঙ্গাপুর এই প্রযুক্তি সংগ্রহে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

১৯৮০ সালে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান যুদ্ধের ময়দানে 'অ্যারো' মিসাইল ব্যবহারের পরিকল্পনা নিয়ে এসেছিলেন। সেইসঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের পরমাণু মিসাইলকে প্রতিরোধের জন্য 'অ্যারো অ্যান্টি-মিসাইল প্রোগ্রাম' তৈরিতে অন্য দেশের সাহায্যও চেয়েছিলেন। ২০০০ সালে ইজরাইলের বিমান বাহিনী প্রথম এই 'অ্যারো অ্যান্টি-মিসাইল প্রোগ্রাম' বিশ্ববাসীর সামনে তুলে আনে। এর বিশেষত্ব হলো

এটি প্রতিপক্ষের মিসাইলকে ধ্বংস করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরাইল-এর যৌথ অর্থায়নে এটি ইজরাইলেই উৎপাদন করা হয়। এটি এমএম-১০৪ প্যাট্রিয়ট মিসাইলের চাইতেও কার্যকরভাবে যেকোনো ব্যালিস্টিক মিসাইলকে ঘায়েল করতে পারে। ৯০ থেকে ১৫০ কিলোমিটারের মধ্যে খুবই কার্যকরভাবে আঘাত হানতে পারে।

আকারের দিক থেকে ইজরাইল একটি ছোট্ট রাষ্ট্র হওয়ায় নিরাপত্তার স্বার্থে 'দ্য অ্যারো' প্রকল্পটি দেশটির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেশটির প্রতিটি অঞ্চলেই ব্যালিস্টিক মিসাইল মোতায়েন আছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নে বেশ কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে ইজরাইলকে। কিন্তু ১৯৯১ সালে প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধের পর এ প্রকল্পের জন্য বড়ো তহবিল গঠন করতে সক্ষম হয় ইজরাইল, এগিয়ে আসে যুক্তরাষ্ট্র। বর্তমানে তাদের কাছে যে 'অ্যারো' সিরিজ আছে, এসবের তহবিল আংশিকভাবে আমেরিকার কাছ থেকে এসেছে। এ ছাড়া ইজরাইলের কাছে জেরিকো সিরিজের কয়েক রকম ব্যালিস্টিক মিসাইল রয়েছে।

২০১৮ সালে অ্যারো-থ্রি, আয়রন ডোমের নতুন সংস্করণ ও ম্যাজিক ওয়ান্ড (ডেভিডস স্লিং)-এর সফল পরীক্ষা চালিয়েছে ইজরাইল। রাফায়েল অ্যাডভান্স ডিফেন্স সিস্টেমের মাধ্যমে পরীক্ষাগুলো চালানো হয়। এতেও যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতা ছিল। শত্রুপক্ষের যুদ্ধবিমান, ড্রোন, ব্যালিস্টিক মিসাইল, মধ্য ও দূরপাল্লার রকেট ও ক্রুজ মিসাইল ধ্বংস করতে ডেভিডস স্লিং ব্যবহার করা সম্ভব। এটি ৩০০ কিলোমিটার দূর পর্যন্ত আঘাত হানতে পারে। অ্যারো-থ্রি একটি অ্যান্টি ব্যালিস্টিক মিসাইল, যা প্রায় আড়াই হাজার কিলোমিটার দূরে গিয়েও আঘাত হানতে সক্ষম। অ্যারো-থ্রি এবং ডেভিডস স্লিং ২০১৭ সালে উৎপাদন করা হয়। অ্যারো থ্রি ব্যবহার করে স্যাটেলাইট ভূপাতিত করা সম্ভব বলে দাবি করেছে ইজরাইল। ডেভিডস স্লিং-এর মতো এটিও পরমাণু ওয়ারহেড বহনকারী মিসাইলও ধ্বংস করতে সক্ষম।

ইজরাইলের রোবট অস্ত্র

ইজরাইল ভবিষ্যতে রোবটকেই যুদ্ধের ময়দানে প্রধানতম অস্ত্র হিসেবে কাজে লাগাতে চায়। দেশটির রোবোটিক্স অস্ত্রের নতুন বিভাগের একটি অংশ হলো 'দ্য গার্ডিয়াম'। এটি একটি 'আনম্যানড গ্রাউন্ড ভেইকেলস' বা 'ইউজিভি', যা ২০০৮ সাল থেকে ইজরাইল-সিরিয়ার দক্ষিণ সীমান্তে এবং গাজার দক্ষিণে মোতায়েন করেছে ইজরাইল। 'ইউজিভি' মূলত 'ডিউন বাগি' যানগুলোর মতো দেখতে; যা সেন্সর, ক্যামেরা এবং অস্ত্রসামগ্রী দিয়ে সজ্জিত। এতে উচ্চ প্রযুক্তির ক্যামেরা, সেনসিটিভ মাইক্রোফোন ও লাইডস্পিকার সংযুক্ত করা যায়। 'ইউজিভি' চাইলে সৈন্যরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। চাইলেই হয়ে যেতে পারে সম্পূর্ণভাবে স্বশাসিত।

এ ধরনের রোবোটযান যুদ্ধের ময়দানে সৈন্যের ঝুঁকি কমায়। যেখানে সৈন্যদের বিরতির প্রয়োজন পড়ে, দরকার হয় খাবার এবং পানির, সেখানে 'গার্ডিয়াম'-এর প্রয়োজন ট্যাংকভর্তি গ্যাস। আর কিছুই না। শত্রুপক্ষ যদি টানেল করে আক্রমণ করে অথবা সমুদ্রপথ দিয়ে হামলা চালায়, সেই ক্ষেত্রেও 'গার্ডিয়াম' শত্রুদের আক্রমণ প্রতিরোধে সাহায্য করতে পারে। গার্ডিয়াম রাস্তা বা অমসৃণ রাস্তা ধরেও চলতে পারে। প্রতি ঘণ্টায় ৮০ কিলোমিটার পর্যন্ত দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে গার্ডিয়াম, যা ৩০০ কেজির মতো ওজন বহন করতে পারে।

সামরিক শক্তিতে বিশ্বে ইজরাইলের অবস্থান অষ্টম।[১১৫] তবে গ্লোবাল ফায়ার ওয়ারের সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী-এর অবস্থান ১৬-তে। ইজরাইলের রয়েছে ৬ লাখ ১৫ হাজার সৈন্য। দেশটির হাতে রয়েছে ৫৯৬টি জেটবিমান। এর মধ্যে ২৫২টি ফাইটার এয়ারক্রাফট, ২৫২টি অ্যাটাক এয়ারক্রাফট ও ৯৬টি পরিবহন বিমান। এর বাইরে ১৫২টি প্রশিক্ষণ বিমান, ৪৮টি অ্যাটাক হেলিকপ্টারসহ মোট ১৪৭টি সামরিক হেলিকপ্টার রয়েছে ইজরাইলের কাছে। মেইন ব্যাটল ট্যাংকসহ দেশটির রয়েছে ২৭৬০টি ট্যাংক।

এখন পর্যন্ত 'মারকাভা ট্যাংক' হলো ইজরাইলের সবচেয়ে গোপনীয় প্রকল্প। 'মারকাভা ট্যাংক'-কে পৃথিবীর সবচেয়ে মারাত্মক এবং নিরাপদ ট্যাংক বলা হয়। মারকাভা সিরিজের নতুন মডেল 'মারকাভা MK-8' বেশ উন্নত। ১৯৭০ সাল থেকে ইজরাইল

---

[১১৫]. Israel ranked 8th most powerful country in the world, www.timesofisrael.com, MICHAEL BACHNER8 July 2018.

নিজস্ব প্রযুক্তির ট্যাংক বানাচ্ছে। অপেক্ষাকৃত দূরের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম ট্যাংক তৈরি করেছে তারা। আছে ট্যাংকবিধ্বংসী প্রচুর অস্ত্রও।

ইজরাইলের আছে সাড়ে দশ হাজারের মতো সাজোয়া যান। ৬৫০ টি সেলফ প্রপেলড আর্টিলারি, ১৪৮টি রকেট প্রজেক্টর। ইজরাইলের কোনো এয়ারক্রাফট কেরিয়ার না থাকলেও ৬৫টি যুদ্ধজাহাজ রয়েছে। নৌ-বাহিনীর বহরে যুক্ত আছে আরও ৬টি সাবমেরিন। যাদের মধ্যে কয়েকটি জার্মানির তৈরি ডলফিন ডুবোজাহাজ রয়েছে, যা থেকে ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা সম্ভব।

এফ-ফিফটিন ও এফ-১৬ এর পর ইজরাইলি বিমানবাহিনীতে সবশেষ সংযোজন এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান।[১১৬] ইজরাইলের হাতে ভূগর্ভস্থ স্থানে হামলার জন্য রয়েছে 'জিবিইউ-২৮'। যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে এটা পেয়েছে তারা। ১৯৯১ সালে যুক্তরাষ্ট্র এটা প্রথম ব্যবহার করে। দুই হাজার ২৬৮ কেজি ওজনের এ অস্ত্রটি লেজার দিয়ে নিয়ন্ত্রিত। এখন এটা আরও আধুনিক করা হয়েছে।

যেভাবে জোড়া লেগেছিল জার্মানি-ইজরাইল সম্পর্ক

ইজরাইলের সাথে জার্মানির বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক একটা সময় পর্যন্ত ভাবাই যেত না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ও পরে জার্মানি ও তার দখলকৃত দেশগুলোতে যে হারে ইহুদি নিধন হয়েছিল, তাতে দুই দেশের মধ্যে অদূর ভবিষ্যতে সম্পর্ক জোড়া লাগতে পারে–এমন প্রত্যাশা ছিল কল্পনারও অতীত। অথচ দুই দেশের সম্পর্কের বরফ একটা সময় পর গলেছে। ১৯৬৫ সাল থেকে শুরু হয় তাদের কূটনৈতিক যোগাযোগ। সে বছরের ১২ মে তারা আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পর্ক স্থাপন করে।[১১৭]

তবে জার্মানির জন্য সম্পর্কের শুরুটা সুখকর ছিল না। সে বছর প্রথম জার্মান রাষ্ট্রদূত হিসেবে ইজরাইলে যান রল্ফ ফ্রিডম্যান পাউলস। জার্মান সামরিক বাহিনীর সাবেক এই কর্মকর্তা পাউলসকে টমেটো ছুড়ে 'স্বাগত' জানিয়েছিল ইজরাইলের মানুষ। তবে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করে যান তিনি। পরিস্থিতি ধীরে ধীরে বদলাতে থাকে। একসময় শিল্প-সাহিত্য ও চলচ্চিত্র নির্মাণে নির্ভরতা গড়ে উঠে দুই দেশের মধ্যে। নানা উৎসব এবং প্রদর্শনীকে ঘিরে শুরু হয় শিল্পীদের যাতায়াত। বার্লিনসহ জার্মানির অনেক শহরে বসবাসে আগ্রহী হয়ে উঠেন সাধারণ ইজরাইলিরা। অথচ এই বার্লিন একসময় ছিল ইহুদিবিরোধী প্রচারণা কেন্দ্র।

---

[১১৬]. The Multi-variant, Multirole 5th Generation Fighter, https://www.f35.com/about.

[১১৭]. https://www.dw.com/en/german-israeli-relations-what-you-need-to-know/a-41800745

নাৎসিদের হাতে ইহুদি মরেছিল প্রায় ৬০ লাখ। আধুনিক সময়ে ঠান্ডা মাথায় এত বড়ো আকারের গণহত্যার আর কোনো নজির নেই। মানুষকে তুলে নিয়ে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে পাঠানো হয়েছে। তাদের হয় গ্যাস চেম্বারে ঢুকিয়ে, গুলি করে, পিটিয়ে নতুবা অনাহারে রেখে হত্যা করা হয়েছে।

গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকেই জার্মানি ও ইজরাইলের মধ্যে 'ক্ষতিপূরণ চুক্তি' সই হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির ১০ বছর পর এমন এক চুক্তি কল্পনা করা বাস্তবেই কঠিন ছিল। হলোকাস্টের মতো এমন একটি অতীত পেছনে ফেলে দুই দেশ যে, কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পেরেছে, তাকে অবিশ্বাস্য ও বিস্ময়কর ঘটনাই বলতে হয়। কারণ, সাধারণ ইজরাইলিরা এটাকে ভালোভাবে নিচ্ছিল না। পাউলস যখন রাষ্ট্রদূত হয়ে ইজরাইলে আসেন, তখন রাজপথে চলছিল ইহুদিদের প্রতিবাদ-বিক্ষোভ।

বর্তমানে জার্মানি ও ইজরাইলের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। হাজারো তরুণ ইজরাইলি জার্মানিতে আসেন, বার্লিন ভ্রমণ করেন, ছুটি কাটান, অনেকে আবার পাকাপাকি থেকেও যান। প্রায় দুই লাখ ইজরাইলির দ্বিতীয় একটি পাসপোর্ট রয়েছে– সেটা জার্মান পাসপোর্ট। ইজরাইলের মানুষ আজ হলোকাস্টের দেশ জার্মানিকে সবচেয়ে বেশি সমাদর করে, ঠিক যেমনটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেও করে। জার্মানদের তরফ থেকেও আগ্রহের ঘাটতি নেই। ১৯৬০ ও ১৯৭০-এর দশকে অনেক জার্মান এক বছরের জন্য ইজরাইলের 'কিবুৎস' বা সমবায় খামারে কাজ করেছেন।

ইউরোপে জার্মানিই এখন সেই দেশ, যার ওপর ইজরাইল সবচেয়ে বেশি ভরসা করে। ইজরাইলের অধিকৃত এলাকাসংক্রান্ত নীতি নিয়ে দুই দেশের বিবাদ অথবা ইজরাইলের নির্বাচনী প্রচারের সময় নেতানিয়াহু ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কথা বলার কারণে মনোমালিন্য সত্ত্বেও ইজরাইলের নিরাপত্তা জার্মান রাষ্ট্রের অস্তিত্বের সঙ্গে যুক্ত। জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঞ্জেলা মেরকেল ২০০৮ সালে ইজরাইলি সংসদে তার ভাষণে এ কথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন– যে জার্মানি এককালে ইহুদি নিধনযজ্ঞের জন্য দায়ী ছিল, সেই দেশ আজ ইজরাইলের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সহযোগী।

এই সময়ে অনেক ইহুদি নিরাপত্তাবোধের অভাবে ফ্রান্স ছেড়ে চলে গেলেও জার্মানি থেকে ইজরাইলের দিকে অভিবাসনের খুব একটা ঢেউ দেখা যাচ্ছে না। উলটো জার্মানিতে ইহুদিদের অভিবাসন বেড়ে চলেছে। গত ২০ বছরে জার্মানিতে ইহুদিদের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে।

প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদে ইহুদিদের হাত

রোমান ক্যাথলিক চার্চ মনে করত, মার্টিন লুথারের হাত ধরে ষোড়োশ শতকে যে প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদ আসে, তার পেছনে আছে ইহুদি চক্রান্ত। জুডাইজম খ্রিষ্টান চার্চে

ভাঙন ধরিয়েছে– এমন অভিযোগ সামনে এনে ইহুদিদের একঘরে করে ফেলার ডাক দিয়েছিল রোমান ক্যাথলিক চার্চ। এমনকী ইউরোপ থেকে তাদের তাড়িয়ে দেওয়ার কৌশলও হাতে নেওয়া হয়। তাই প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদের বিরুদ্ধে ইউরোপে রোমান ক্যাথলিকরা পালটা সংস্কার কার্যক্রম শুরু করলে, তাদের প্রথম টার্গেটে পড়ে ইহুদিরা। ফলে ক্যাথলিক দুনিয়ায় তাদের টিকে থাকা দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়।

জার্মান ধর্মযাজক মার্টিন লুথার বাইবেলকে কথ্য জার্মানে অনুবাদ করেছিলেন। আর এর মাধ্যমেই উন্মুক্ত হয় রোমান ক্যাথলিক চার্চের ভাঙন। পাপ করে অর্থের বিনিময়ে স্রষ্টার শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। লুথার ছিলেন এই মতের কঠোর বিরোধী। রোমান ক্যাথলিক চার্চ যখন ইউরোপীয় ইহুদিদের ওপর বেজার হয়, তখন ইহুদিদের বসবাস, স্বাভাবিক চলাফেরা ও ব্যাবসা-বাণিজ্য ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যায়। প্রতাপশালী কার্ডিনাল কারাফফা তৎকালীন পোপের এক সভায় ইহুদি গ্রন্থ তালমুদকে ধর্মবিরোধী অ্যাখ্যা দেন। ১৫৫৩ সালের হেমন্তে রোমে তালমুদের কপি খুঁজে খুঁজে বের করে সমস্ত কপি পুড়িয়ে ফেলা হয়। এমনকী ইতালিতে হিব্রু বাইবেল পোড়ানো হয়। এই ঘটনার মাত্র দুই বছরের মাথায় সেই প্রভাবশালী কারাফফা চতুর্থ পল নামে পোপ হন। তার সময়েই নিজেদের ধর্মবিশ্বাসে অনড় ২৪ জন ইহুদি পুরুষ ও একজন মহিলাকে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হয়।

১৫৫৫ সালের জুলাইতে ইহুদিদের জন্য আলাদা বস্তির মতো করে বসতি বানানো হয় যেগুলোকে ঘেটো বলা হতো। এই বস্তিঘরগুলো উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা থাকত। রাতের বেলায় এর প্রধান ফটক বন্ধ থাকত। এমনকী খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় কোনো উৎসবের সময় বের হতে দেওয়া হতো না ঘেটোতে বসবাস করা ইহুদিদের।

বেশ কিছু নিচু স্তরের পেশা ছাড়া ইতালিতে বিশেষ করে রোমে ইহুদিদের জন্য প্রায় সব ধরনের পেশাই নিষিদ্ধ করা হয়। স্থাবর কোনো সম্পত্তির মালিক হওয়ার পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়। তাদেরকে আলাদা করে চিনতে হলুদ টুপি পরতে বলা হয়। অবশ্য পরে এই অপমানের শোধ নেয় রোমের ইহুদিরা। ১৫৫৯ সালে পোপ চতুর্থ পল যখন মারা যান, উল্লাস ছড়িয়ে পড়ে ইহুদি শিবিরে। প্রয়াত পোপের প্রতিকৃতিতে জুড়ে দেওয়া হয় হলুদ টুপি!

ইহুদি-বিদ্বেষী কারাফফা মারা গেলেও দুর্দশা থেকেই যায়। পরবর্তী ক্যাথলিক ধর্মগুরু অষ্টম ক্লেমেন্ট ১৫৯২ সালে ইহুদিদের প্রতি একগুচ্ছ বিধিনিষেধ জারি করেন, যেটি উনিশ শতক অবধি জারি থাকে।

প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদ জন্মের পেছনে যার হাত, সেই মার্টিন লুথার বরং ইহুদি বিদ্বেষ জিইয়ে রেখেই পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন। অথচ সংস্কারের প্রথম দিকে ইহুদিদের পক্ষেই যায় তার কথাবার্তাগুলো। লুথারের সংস্কার বা নয়া প্রোটেস্ট্যান্টতত্ত্ব ভরসা জুগিয়েছিল ইহুদিদের মনে। রোমান ক্যাথলিক চার্চকে উদ্দেশ্য করে এই ব্যক্তি বলতে লাগলেন,

ইহুদিদের সাথে চার্চের অমানবিক ব্যবহারের প্রতিবাদে বহু ভালো খ্রিষ্টান নিজ ধর্ম ত্যাগ করে ইহুদি ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার চিন্তা করছে। লুথার বলতেন– যে ধর্ম (খ্রিষ্টান) তাদের (ইহুদি) ওপর অপরিসীম অত্যাচার করেছে, সে ধর্মে স্বাভাবিক কারণেই ইহুদিদের কোনো আকর্ষণ জন্মায়নি। এর মধ্য দিয়ে ইহুদিদের প্রতি খ্রিষ্টানদের নির্যাতনকে সামনে নিয়ে আসেন প্রোটেস্ট্যান্ট নেতা।

কিন্তু লুথারকেও হতাশ হতে হয়েছে। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন, প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম যিশুর জীবন-কাহিনি মার্জিত ও আদিরূপে প্রকাশ করায় ইহুদিদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হবে। ফলে তিনি তাদের সহজেই ধর্মান্তরিত করতে পারবেন। না, এসব মিষ্টি মিষ্টি কথা ইহুদিদের সাময়িক তুষ্ট করলেও আখেরে তার সংস্কার ইহুদিদের টানতে পারেনি। লুথারের ইহুদিপ্রীতি রাতারাতি ঘৃণায় পরিণত হলো। মৃত্যুর তিন বছর আগে ১৫৪৩ সালে লিখলেন– *on the jews and their lies.* এই বই বিংশ শতাব্দীতেও জার্মানিসহ ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় ইহুদি নিধনে ইন্ধন জুগিয়েছে, অথচ ১৫৩৭ বা তার আগেও লুথারের অবস্থান ছিল ইহুদিদের পক্ষে।

ইহুদিদের টানতে না পেরে হতাশ ও ক্ষুব্ধ লুথার ইহুদিদের ঘৃণা করতে শুরু করেন। তার অনুসারীদের উসকে দিয়ে গেলেন সিনাগগ পুড়িয়ে দিতে, ইহুদিদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করতে, তাদের স্কুলগুলো পুড়িয়ে দিতে, সম্পদ ও অর্থ বাজেয়াপ্ত করতে। ইহুদি ধর্মগ্রন্থ ধ্বংস করে দেওয়ার পাশাপাশি রাব্বি তথা ইহুদি ধর্মপ্রচারকদের নিষিদ্ধ করার পক্ষেও মত দেন তিনি। মৃত্যুর আগে সব খ্রিষ্টান রাজাকে ইহুদি বিতাড়নের আদেশ দিয়ে যান মার্টিন লুথার![১১৮]

ডিল অব দ্য সেঞ্চুরি

আরব শান্তি পরিকল্পনা কোনো পক্ষেরই মন গলাতে পারেনি। না ইজরাইল, না ফিলিস্তিন। অথচ তাতে আশার আলো দেখেছিল ইজরাইলি মিডিয়া। অপেক্ষাকৃত নমনীয় এই পরিকল্পনা যখন ইজরাইলি রাজনীতিকদের হেলায় মরতে বসেছিল, স্থানীয় গণমাধ্যম তাতে ক্ষুব্ধ হয়েছিল। ইহুদি রাজনীতিকরা প্রায়ই গণমাধ্যমে সমালোচনার শিকার হতেন। হোয়াইট হাউসের তরফ থেকে আনা রোডম্যাপ পরিকল্পনাও ব্যর্থ হয় উভয় পক্ষের কট্টরপন্থিদের বিরোধিতায়। ২০১৪ সালের পর সব শান্তি পরিকল্পনাই হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। অতীতের প্রায় সকল উদ্যোগ ভেস্তে গেলেও এই মুহূর্তে আলোচনার কেন্দ্রে 'ডিল অব দ্য সেঞ্চুরি'। নতুন এই শান্তি পরিকল্পনাও রোডম্যাপের মতোই হোয়াইট হাউজেরই উদ্যোগ। আর এই উদ্যোগের নেপথ্যে হোয়াইট হাউজের জায়োনিস্ট চক্র।

---

[১১৮]. ইহুদিকথা, অমিতাভ সেনগুপ্ত, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১২২, ১২৩

দ্বিতীয় দফায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে উতরে যাওয়ার মূলা দেখিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে দিয়ে এই পরিকল্পনা ঘোষণা করিয়ে নিয়েছেন জায়োনিস্ট বোল্টন-কুশনার-মাইক পেন্স চক্র। নেতানিয়াহুকে সঙ্গে নিয়ে ২০২০ সালের ২৮ জানুয়ারি নতুন এই শান্তি পরিকল্পনা ঘোষণা করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। অবশ্য, ঘোষণার আগেই *টাইমস অব ইজরাইল* এই পরিকল্পনার বড়ো একটা অংশ ফাঁস করে দেয়। যে কারণে আনুষ্ঠানিক ঘোষণার আগেও আরবদের মুখে মুখে ছিল হোয়াইট হাউজের ইজরাইল-ফিলিস্তিন শান্তি পরিকল্পনা। কিন্তু এই শান্তি উদ্যোগেও স্পষ্ট হয়েছে ট্রাম্পের একচোখা নীতি। পরিকল্পনার প্রায় পুরোটাই গেছে ইজরাইলের পক্ষে।

ট্রাম্প একে 'নতুন ভোর'-এর সাথে তুলনা করলেও ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস বলছেন– ষড়যন্ত্র। ট্রাম্পের পরিকল্পনাকে একপেশে এবং 'ইতিহাসের ভাগাড়' আখ্যায়িত করে রুখে দেওয়ার ডাক দিয়েছেন ফিলিস্তিন নেতারা। হোয়াইট হাউজের ইস্ট রুমে ইজরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে পাশে নিয়ে ট্রাম্প নতুন মধ্যপ্রাচ্য পরিকল্পনা পেশ করে বলেছেন, দশকের পর দশক ধরে মার্কিন প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও তার এই পরিকল্পনা সফল হতে পারে। দর্শক সারিতে ইজরাইলি ও ইহুদি আমেরিকান অনেক অতিথি থাকলেও ছিলেন না কোনো ফিলিস্তিন প্রতিনিধি। তবে ইজরাইলের সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে থাকা বাহরাইন, ওমান আর আরব আমিরাতের রাষ্ট্রদূতরা সেখানে ছিলেন।

ফিলিস্তিনিরা যে জেরুজালেমকে পবিত্র নগরী বলে মনে করেন, তার পুরোটাই ইজরাইলের রাজধানী হিসেবে ধরা হয়েছে ট্রাম্পের পরিকল্পনাতে। সেইসঙ্গে ইজরাইল পাচ্ছে পশ্চিম তীরে গড়ে তোলা অবৈধ ইহুদি বসতিগুলোর ওপর সার্বভৌমত্ব। ৮০ পৃষ্ঠার ওই পরিকল্পনায় একটি ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের সম্ভাবনা জিইয়ে রেখেছেন ট্রাম্প। তবে ভবিষ্যৎ এই রাষ্ট্রের কোনো সামরিক বাহিনী থাকবে না। এই উদ্যোগ বাস্তবায়নে ৫০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করার অঙ্গীকার করেছেন ট্রাম্প, যা তার মতে– ফিলিস্তিনিদের দুর্দশা দূর করতে পারবে।

নয়া শান্তি পরিকল্পনায় ইজরাইল-ফিলিস্তিন আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে ভবিষ্যৎ প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর জন্য মানচিত্র আঁকা হয়েছে। ট্রাম্প বলেছেন, ইজরাইলও নতুন মানচিত্র প্রকাশে রাজি হয়েছে– তবে সেখানে যে মানচিত্র দেখানো হয়েছে, তাতে পশ্চিম তীরকে ইহুদি বসতি স্থাপনের মাধ্যমে ইজরাইলের সঙ্গেই যুক্ত রাখা হয়েছে এবং একমাত্র একটি দীর্ঘ সড়ক সুড়ঙ্গের মাধ্যমে গাজা উপত্যকার সঙ্গে সংযোগের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। জেরুজালেমকে ইহুদি ও ফিলিস্তিনিদের রাজধানী হিসেবে ভাগ করে দেওয়ার গুঞ্জন শোনা গেলেও ইজরাইলকেই অবিভক্ত রাজধানী হিসেবে জেরুজালেমের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখার কথা বলা হয়েছে। আর এও বলা হয়েছে, অধিকৃত পূর্ব জেরুজালেমের মধ্যে ফিলিস্তিনকে একটি রাজধানী ঘোষণা করতে দেওয়া যেতে পারে!

হামাস ও ফাতাহ জানিয়েছে, তারা জেরুজালেমের ব্যাপারে কোনো ধরনের সমঝোতা মেনে নেবে না। কারণ, জেরুজালেম মুসলমানদের।

ইরান-তুরস্ক ছাড়া বেশিরভাগ আরব-অনারব মুসলিম দেশই ট্রাম্পের পরিকল্পনার গা ছাড়া প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। সৌদি আরব ট্রাম্পের পরিকল্পনার প্রশংসা করে ইজরাইল-ফিলিস্তিন সরাসরি আলোচনার আহ্বান জানিয়েছে। ভারত, পাকিস্তান আর ফ্রান্স বলেছে– তারা জাতিসংঘের দ্বি-রাষ্ট্রিক সমাধানের পক্ষে। পরাশক্তি রাশিয়া পরিকল্পনাটি নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছে। দেশটির উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী মিখাইল বগদানভ বলেছেন– 'আমরা জানি না, আমেরিকান প্রস্তাবটি পরস্পরের কাছে গ্রহণযোগ্য নাকি গ্রহণযোগ্য না।' তুর্কি প্রেসিডেন্ট রেজেপ তাইয়্যিপ এরদোয়ান বলেছেন–

> 'জেরুজালেম মুসলিমদের জন্য পবিত্র স্থান। এই নগরী ইজরাইলকে দিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা মেনে নেওয়া যায় না। এই পরিকল্পনা ফিলিস্তিনিদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে এবং ইজরাইলের অবৈধ বসতিকে বৈধতা দেয়।'

ট্রাম্পের পরিকল্পনায় ইজরাইলি দখলদারিত্বের ফলে শরণার্থীতে পরিণত হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত ফিলিস্তিনিদের তাদের মাতৃভূমিতে ফিরে যাওয়ার অধিকার অস্বীকার করা হয়েছে। ফলে সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান ও মিশরের শরণার্থী শিবিরগুলোতে বসবাস করা ফিলিস্তিনিদের জন্য আপাতত কোনো সুখবর নেই।

ইজরাইল আর আমেরিকার পক্ষ থেকে নতুন শান্তি পরিকল্পনার নাম দেওয়া হয়েছে 'ডিল অব দ্য সেঞ্চুরি' বা শতাব্দীর সেরা চুক্তি। ট্রাম্পের পরিকল্পনায় আছে, পিএলও নিয়ন্ত্রিত পশ্চিম তীরে যেসব ইহুদি বসতি এরই মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে, সেগুলোর ওপর নয়া ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের কোনো কর্তৃত্ব থাকবে না। এসব বসতির সার্বভৌমত্ব থাকবে ইজরাইলের হাতে। ট্রাম্পের ঘোষণাতেই আছে বিস্ময় তিনি বলেছেন, জেরুজালেম হবে ইজরাইলের অবিভক্ত রাজধানী আবার এও বলেছেন, পূর্ব জেরুজালেমে (এখানে পূর্ব জেরুজালেম বলতে আসলে বোঝানো হয়েছে পূর্ব জেরুজালেম সীমান্ত লাগোয়া আবু দিস নামের এক উপশহরকে, যা এখনও ইজরায়েলের নিয়ন্ত্রণেই আছে) হবে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের রাজধানী। এ এক আজব প্রস্তাব!

শেষ বেলায় যা বলতে চাই...

একসময় ধর্মীয় কারণে ইহুদি, খ্রিষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে বিরোধের কেন্দ্রভূমি হিসেবে পরিচিত জেরুজালেম এখন শক্ত একটা রাজনৈতিক ইস্যুতে রূপ নিয়েছে। ধর্মের চেয়ে টিকে থাকার রাজনীতি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠায় আরব নেতাদের কাছে প্যালেস্টাইন এখন 'ডেড ইস্যু'। ইজরাইল বলছে– জেরুজালেমই তাদের রাজধানী, অথচ পূর্ব জেরুজালেমকে রাজধানী করতে চায় ফিলিস্তিনিরা। স্বাধীনতার দাবি থেকে সরে এসে পিএলও বলছে,

'৬৭-এর আগের সীমানায় ফিরে গেলে ইজরাইলকে মানতে আপত্তি নেই তাদের। কিন্তু এই দাবি মানতে হলে ইজরাইলকে ছাড়তে হবে গোলানের মতো কৌশলগত ভূমি ও পূর্ব জেরুজালেম। ইজরাইল-ফিলিস্তিন সংকট ঝুলে থাকার আরেকটি কারণ– অবৈধ ইহুদি অভিবাসী। কেবল জেরুজালেম আর পশ্চিম তীরে আছে ৫ লাখের মতো অবৈধ ইহুদি। আব্বাসদের দাবি– এদের সরিয়ে নিতে হবে, অথচ ইজরাইল সংখ্যাটা আরও বাড়ানোরই পক্ষে। আর সর্বশেষ হোয়াইট হাউজ যে পরিকল্পনা পেশ করল, তাতে এসব বসতির ওপর ইজরাইলের সার্বভৌমত্বের নিশ্চয়তা এলো। মানে, ফিলিস্তিনিরা জেরুজালেম তো পাচ্ছেই না; এবার গাজা ও পশ্চিম তীরের অংশবিশেষও হাতছাড়া হচ্ছে!

স্নায়ুযুদ্ধ

ইংরেজি কোল্ড ওয়ার-এর প্রতিশব্দ হচ্ছে স্নায়ুযুদ্ধ, শীতলযুদ্ধ, ঠান্ডা লড়াই। এটি মূলত দুটি দেশের মতাদর্শের লড়াই। এই টার্মটি ব্যবহার করা হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যকার সামরিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক বর্ণনা করতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্র আর সোভিয়েত ইউনিয়ন সরাসরি যুদ্ধে না জড়ালেও ৯০-এর দশক পর্যন্ত নিজ নিজ দেশের আদর্শ প্রচার ও আধিপত্য বিস্তারে বিশ্বজুড়ে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি, গোয়েন্দা তৎপরতা ও মহাকাশ গবেষণায় প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। সহজ কথায়– দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র বিতর্কে বিশ্বজুড়ে মার্কিন ও সোভিয়েতপন্থি যে দুটি ধারা তৈরি হয়, তাদের মধ্যে চলমান অপ্রকাশ্য যুদ্ধকে স্নায়ুযুদ্ধ বলে অভিহিত করা হয়; যা অব্যাহত থাকে ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। স্নায়ুযুদ্ধের অন্যতম বড়ো আলামত 'ইউরোপ' পূর্ব ও পশ্চিম– এই দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাওয়া এবং ন্যাটো ও ওয়ারশ সামরিক জোটের জন্ম হওয়া। স্নায়ুযুদ্ধের সময়কার একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো– ১৯৬২ সালের কিউবার মিসাইল সংকট।

ইন্তিফাদা

ইন্তিফাদা শব্দটি আরবি। ইজরাইলের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিগণ অভ্যুত্থান বা গণজাগরণকে ইন্তিফাদা হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। ইহুদি অত্যাচার ও দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে নিজেদের আন্দোলন-সংগ্রামকে ইন্তিফাদা নাম দিয়েছেন ফিলিস্তিনি তরুণরা। পশ্চিম তীর ও গাজা এলাকা দখলের প্রতিবাদে প্রথম ইন্তিফাদা শুরু হয় ১৯৮৭ সালে, যা '৯১ সাল পর্যন্ত চলে। দ্বিতীয় ইন্তিফাদা চলে ২০০০ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত। প্রথম ইন্তিফাদা জোরদার হওয়ার কারণেই ১৯৯১ সালে স্পেনের মাদ্রিদে ইজরাইল-ফিলিস্তিন শান্তি আলোচনা শুরু হয় এবং শেষতক অসলো-চুক্তি সই হয়।

উদারনীতি/উদারবাদ

উদারবাদ এমন একটি রাজনৈতিক মতবাদ, যেখানে ব্যক্তির স্বাধীনতা রক্ষা এবং এর উন্নতি সাধনকে রাজনীতির মূল সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন, জনগণের অধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, মুক্ত বাণিজ্য ও ব্যক্তিগত মালিকানার উদ্ভব ঘটেছে এই ধারণার ওপর ভিত্তি করে। উদারবাদ তত্ত্বের উদ্ভব হয় অষ্টাদশ শতকে, যা বিংশ শতকে এসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনের ১৪ দফা-ভিত্তিক আদর্শ প্রচারেরমাধ্যমে পরিপূর্ণতা পায়। উদারবাদের নীতি ছিল শান্তি প্রতিষ্ঠা করা এবং সহযোগিতামূলক মনোভাব বজায় রাখা। এতে বলা হয়েছে– মানুষ শান্তিপ্রিয়, তারা যুদ্ধ চায় না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর অর্থাৎ ১৯১৯ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপন বা নির্ণয়ে প্রভাব বিস্তার করেছিল উদারনীতি।

ইরানি বিপ্লব

মার্কিন মদদপুষ্ট পাহলভি বংশের একনায়কতান্ত্রিক রাজত্বের প্রতিবাদে ইরানে ইসলামি বিপ্লব সংঘটিত হয় ১৯৭৯ সালে। বিপ্লবের নেতৃত্বে ছিলেন ফ্রান্সে নির্বাসিত ইসলামিক নেতা আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনি। এই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে অতি আধুনিক পাশ্চাত্য ধারা থেকে বেরিয়ে ইরান প্রবেশ করে একটি অতি রক্ষণশীল যুগে। বিপ্লবের সাথে ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের একটি অংশ যোগ দিলেও পরবর্তী সময়ে ইরান আজও পর্যন্ত ইসলামিস্টদের ধর্মীয় অনুশাসনের মধ্য দিয়েই এগোচ্ছে।

হরমুজ প্রণালি

এটি ইরান ও ওমানের মধ্যবর্তী একটি সরু জলপথ, যা পশ্চিমের পারস্য উপসাগরকে পূর্বে ওমান উপসাগর ও আরব সাগরের সাথে যুক্ত করেছে। প্রায় ৩৪ কিলোমিটার দীর্ঘ এই চ্যানেলটি আন্তর্জাতিক তেল-বাণিজ্যের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সমুদ্রপথে পুরো পৃথিবীতে যে পরিমাণ তেল-বাণিজ্য হয়, তার ৩০ থেকে ৪০ ভাগই নিয়ে যাওয়া হয় এই রুট দিয়ে। প্রতিদিন এই রুট দিয়ে ২০ লাখ ব্যারেল তেল ও তেলজাত দ্রব্য নিয়ে যাওয়া হয়। হরমুজ প্রণালি দিয়ে পরিবাহিত বেশিরভাগ তেলই যায় এশিয়ার চীন, ভারত, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দেশে।

পলোনিয়াম

'পলোনিয়াম ২১০' বিশ্বের বিরলতম পদার্থগুলোর একটি। ১৮৯৮ সালে বিজ্ঞানী দম্পতি মেরি ও পিয়েরে কুরি এই পদার্থটি আবিষ্কার করে। এই বিজ্ঞানীদ্বয়ের দেশ পোল্যান্ডের নাম অনুসারে সেই পদার্থের নাম রাখা হয় পলোনিয়াম। ভূপৃষ্ঠের শক্ত আবরণে খুব

নিম্ন ঘনত্বে প্রাকৃতিকভাবেই এই পদার্থের সৃষ্টি হতে পারে, তবে পারমাণবিক চুল্লিতেও কৃত্রিমভাবে এটির উৎপাদন সম্ভব। পলোনিয়াম অত্যন্ত বিপদজনক। খুব সামান্য পরিমাণেও যদি মানুষের দেহে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, তাহলেও তা মৃত্যু ডেকে আনতে পারে।

রোমান সাম্রাজ্য

ইউরোপের তখনকার ব্রিহত্তম নগরী রোমকে কেন্দ্র করে এই সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল খ্রিষ্টপূর্ব ৩১ অব্দে (মতান্তরে খ্রিষ্টপূর্ব ২৭ অব্দে)। জুলিয়াস সিজার ও অক্টাভিয়ান সিজারের সময়কাল থেকে শুরু করে এই সাম্রাজ্য অখণ্ডভাবে টিকেছিল ৩৯৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। এর বিস্তৃতি ছিল উত্তর আফ্রিকা, দক্ষিণ ইউরোপ, বলকান এলাকা, বর্তমান তুরস্ক, সিরিয়া, লেবানন, প্যালেস্টাইন, মিশর এবং ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানি পর্যন্ত। তবে ৩৯৫ সালে রোমান সাম্রাজ্য পূর্ব, পশ্চিম দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। পশ্চিমের রোমান সাম্রাজ্য বা ক্লাসিক্যাল/মূল রোমান সাম্রাজ্যটিকে থাকে ৪৭৬ খ্রিষ্টাব্দে জার্মান জাতিগোষ্ঠীর হাতে পতনের আগ পর্যন্ত।

বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য

৩৯৫ খ্রিষ্টাব্দে রোমান সাম্রাজ্য থেকে আলাদা হয়ে পড়া পূর্ব অংশটিকেই বলা হয় বাইজেন্টাইন রোমান সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্য টিকেছিল ১৪৫৩ সাল পর্যন্ত। সে বছর রাজধানী কনস্টান্টিনোপলের পতন হয় উসমানীয়/অটোমান সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহর কাছে; যিনি পশ্চিমে 'ফাতিহ, দ্য কনকোয়ারার' নামে পরিচিত। তখন কনস্টান্টিনোপলের নতুন নাম দেওয়া হয় ইস্তাম্বুল। এই শহরটি এশিয়া ও ইউরোপ উভয় মহাদেশে পড়েছে। সম্রাট থিওডোসিয়াসের মৃত্যুর পর ইউরোপের বলকান অঞ্চল, আনাতোলিয়া (বর্তমান তুরস্ক), সিরিয়া, আফ্রিকা, মিশর ও প্যালেস্টাইনকে ঘিরে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য টিকে থাকে। তাদের হাত থেকেই জেরুজালেম জয় করেছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর (রা.)।

তিন অটোমান পাশা

জামাল পাশা, আনোয়ার পাশা ও তালাত পাশাকে একসঙ্গে অটোমান সাম্রাজ্যের তিন পাশা বা Dictatorial Triumvirate বলা হতো। ১৯১৩ থেকে শুরু করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত এরাই কার্যত সাম্রাজ্য শাসন করেন। এর মধ্য ইসমাইল আনোয়ার পাশা ছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে অটোমান যুদ্ধমন্ত্রী। যুদ্ধমন্ত্রী ও কমান্ডার-ইন চিফ হিসেবে আনোয়ার পাশা সবচেয়ে প্রভাবশালী অটোমান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তুরস্কে তাকে বলা হতো The hero of the Revolution. আর ব্রিটিশদের মতে– তিনি The one whose power was absolute and ambitions were grandiose... তিনি আর্মেনিয়ান গণহত্যার সাথে

জড়িত বলে অভিযোগ করা হয়। মুহাম্মদ তালাত পাশা ছিলেন অটোমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী/ অভ্যন্তরীণ মন্ত্রী। ১৯১৭ সালে তিনি উজিরে আজম বা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পদোন্নতি পান। জামাল পাশা ছিলেন নৌ-মন্ত্রী। এই দুজনও আর্মেনীয় গণহত্যার সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

অ্যান্টি-সেমিটিজম

ইহুদি, আরব আর অ্যাসিরীয়দের বলা হয় সেমিটিক জাতি। সেমিটিক জাতির প্রতি কোনো বৈষম্য, শত্রুতা বা বিদ্বেষ পোষণ করাকে অ্যান্টিসেমিটিজম বলা হয়ে থাকে। এটা এক ধরনের বর্ণ বিদ্বেষ। তবে এই শব্দটি বর্তমানে ব্যাপক মাত্রায় ব্যবহৃত হয় ইহুদিদের ক্ষেত্রে। ইহুদিদের প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষ পোষণ করাকে অ্যান্টিসেমিটিজম বলা হয় এই জমানায়। ইহুদিবাদবিরোধী কোনো মন্তব্য করলেই তাদের অ্যান্টিসেমিট বলে আখ্যা দেয় ইজরাইল।

জিপসি

একটি নৃতাত্ত্বিক যাযাবর গোষ্ঠী; যারা মূলত আফ্রিকা, ইউরোপ ও আমেরিকা মহাদেশে বসবাস করে থাকে। জিপসিরা রোমানি বা রোমা নামেও পরিচিত। এদের উদ্ভব সম্পর্কে নির্ভরযোগ তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। তবে ধারণা করা হয়– বর্তমান ভারতের যে অংশে রাজস্থান, হরিয়ানা ও পাঞ্জাবের অবস্থান এই এলাকাটিই জিপসিদের আদি নিবাস। তারা হাজার বছর আগে পারস্য চলে যায়। সেখানে দুটি দলে বিভক্ত হয়ে একদল যায় মিশরে, আরেকদল উত্তর আফ্রিকা হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে গমন করে। পঞ্চদশ ও ষোড়োশ শতকে তারা উত্তর-পশ্চিম ইউরোপে গিয়ে পৌঁছায়। ইংরেজরা মনে করত যে, এরা মিশর (ইজিপ্ট) থেকে এসেছে, তাই তাদের জিপসি বলত তারা। ইজিপ্ট থেকে জিপসি শব্দের উৎপত্তি। জিপসিরা যে ভাষায় কথা বলে, এটিকে বলে রোমানি। আর এই ভাষার সাথে সংস্কৃতের বেশ মিল রয়েছে। কেবল যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রাজিলে প্রায় ২০ লাখের মতো জিপসি বসবাস করে।

বেনগুরিয়ান

ইজরাইলের প্রতিষ্ঠাতা প্রধানমন্ত্রী বেনগুরিয়ানের জন্ম ১৮৮৬ সালে ইউরোপের পোল্যান্ডে। ১৯০৬ সালে ফিলিস্তিনে এসে জাফাতে বসতি স্থাপন করেন তিনি। বেনগুরিয়ান ছিলেন একজন শ্রমিক, যিনি খেত থকে কমলা তোলার কাজ করতেন।

রুডলফ হেস

পুরো নাম ওয়াল্টার রিচার্ড রুডলফ হেস (১৮৯৪-১৯৮৭), ছিলেন হিটলারের ডেপুটি (ডেপুটি ফুয়েরার)। ১৯৪১ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি ছোট্ট জেট বিমানে চড়ে

গোপনে স্কটল্যান্ড চলে যান। বিমানের জ্বালানি শেষ হয়ে গেলে এতে আগুন ধরে যায়, তবে প্যারাসুটে করে স্কটল্যান্ডের একটি কৃষি জমিতে অবতরণ করতে সক্ষম হন হেস। ঘটনাটি ১৯৪১ সালের ১০ মে'র। বলা হয়ে থাকে, তিনি জার্মানি ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে শান্তিচুক্তি করার জন্য গিয়েছিলেন, কিন্তু তাতে যুক্তরাজ্য সাড়া দেয়নি; বরং হেসকে আটক করা হয়। যদিও এখনও পর্যন্ত তার এই সফরের বিষয়টি রহস্য হিসেবেই থেকে গেছে। জার্মান প্রচারমন্ত্রী জোসেফ গোয়েবলসও হেসের কাণ্ডজ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। বলেছিলেন– 'how such a fool could be second to the Fuhrer.'

আটক হেসকে পরবর্তী সময়ে ন্যুরেমবার্গ আদালতে এনে বিচার করা হয়। সাজা দেওয়া হয় যাবজ্জীবন। কারাগারে থাকা অবস্থায় আত্মহত্যা করেন হেস। হিটলারের মাইন ক্যাম্প নামের যে আত্মজীবনী রয়েছে, এর বেশিরভাগই হেস সম্পাদনা করেছেন।

এস এস বাহিনী

এস এস বাহিনী প্রতিষ্ঠা করা হয় ১৯২৫ সালে। শুরুর দিকে এস এস সদস্যরা হিটলারের ব্যক্তিগত দেহরক্ষীর দায়িত্ব পালন করত। বাহিনীটির প্রধান করা হয়েছিল হিটলারের মতোই আরেক ইহুদিবিদ্বেষী হেনরিক হিমলারকে। তবে ক্রমেই এই বাহিনী আতঙ্কের বাহিনীতে পরিণত হয়। মাত্র আটজন সদস্য নিয়ে গড়া এস এস বাহিনী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আড়াই লাখ সদস্যের বিশাল বাহিনীতে পরিণত হয়। এই বাহিনীতে যারা ঢুকত, তাদের প্রমাণ করতে হতো– তাদের পূর্বপুরুষরা কখনো ইহুদি ছিল না। বিশ্বযুদ্ধের পরে এই বাহিনীকে নুরেমবার্গ আদালত সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং যুদ্ধাপরাধের দায়ে অভিযুক্ত করে।

হলোকাস্ট

Holocaust শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ holokaustos থেকে। আর holokaustos শব্দটি গঠিত গ্রিক শব্দ hólos (whole) এবং kaustós (burnt) একসঙ্গে মিলে। হলোকাস্ট বলতে বোঝায়– জেনোসাইড বা গণহত্যাকে। হিটলারের নাৎসি জার্মান বাহিনী ও এদের সহযোগীদের হাতে নিহত হয় ৬০ লাখ ইহুদি। নাজিদের হাতে আরও ৫০ লাখ অইহুদি খুন হন বলে বলা হয়ে থাকে। এই গণহত্যা জার্মানিসহ অধিকৃত সব দেশেই চলে, তবে হলোকাস্টে নিহতের সংখ্যা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে।

আব্দুল আজিজ রানতিসি

হামাস প্রতিষ্ঠাতাদের একজন ছিলেন তিনি। পেশায় ছিলেন চিকিৎসক। ১৯৯২ সালের ডিসেম্বরে তিনিসহ ৪০০ হামাস নেতা-কর্মীকে দক্ষিণ লেবাননে পাঠিয়ে দিয়েছিল ইজরাইল।

পরের বছর দেশে ফেরত আসেন তিনি। তবে ইজরাইলের সাথে ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের চলমান শান্তি আলোচনার কড়া সমালোচনা অব্যাহত রাখায় প্রায়ই তিনি ফিলিস্তিনি পুলিশ দ্বারা গ্রেফতার হতেন।

আরব বিদ্রোহ

আরবরা জাতীয়তাবাদে উজ্জীবিত হয়ে ব্রিটিশ ম্যান্ডেট সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেছিল ১৯৩৬ সালে। হাজার হাজার লোক কাজে যোগ দেয়নি, ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হতে থাকল। ফলে ফিলিস্তিনি আরব অর্থনীতি ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়ে। ইহুদি ও ব্রিটিশদের সাথে সংঘর্ষে ৫ হাজারের মতো ফিলিস্তিনি মারা যায়, ১৬ হাজারের মতো আহত হয় এবং অন্তত ৫ হাজার লোককে কারাবন্দি করা হয়। এই বিদ্রোহ ৩৯ সালের আগেই দমন করে ফেলে ব্রিটিশরা।

আলিয়া

আলিয়া (Aliyah) হিব্রু শব্দ। একাডেমিকভাবে যার অর্থ হচ্ছে উত্থান বা আরোহণ। তবে ইহুদিরা আলিয়া বলতে বুঝিয়ে থাকে– বিশ্বের অন্যান্য ভূখণ্ড থেকে ইহুদি ধর্মাবলম্বীদের ইজরাইলে চলে আসা এবং এখানকার নাগরিকত্ব অর্জন করা। ১৮৮২ সালে ইহুদিদের একটি বড়ো গ্রুপ প্যালেস্টাইন ভূখণ্ডে আসে। ইহুদিরা সে বছরের ওই আগমনকে বলে থাকে প্রথম আলিয়া। এ রকম আরও পাঁচটি আলিয়ার কথা অফিসিয়ালি স্বীকার করে ইজরাইল। ১৯৫০ সালের ৫ জুলাই গৃহীত একটি আইনে (Law of Return) ইহুদিদের ইজরাইল ভূখণ্ডে এসে নাগরিকত্ব অর্জনের সুযোগ দেওয়া হয়।

ইলান পাপ্পে

ইজরাইলে জন্ম নেওয়া এক ইহুদি ইতিহাসবিদ। যেসব ইজরাইলি ইতিহাসবিদ জায়োনিজম-এর পক্ষে একতরফা লিখে গেছেন, তিনি তাদের ব্যতিক্রম। তার ভাষায়– ইজরাইল রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে জোর-জবরদস্তির মধ্য দিয়ে। তিনি ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ইজরাইলি আগ্রাসনকে দেখেন জাতিগত নিধন হিসেবে। পাপ্পের স্পষ্ট কথা– 'We have just kicked out the palestinians from their own land.' প্যালেস্টাইন নিয়ে যেসব ইহুদি ইতিহাসবিদ ইহুদিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে ইতিহাস টুইস্ট করেছেন, তাদের বাইরে গিয়ে যারা নতুন ইতিহাস তুলে আনছেন, ইজরাইলে তাদের দেখা হয় New Historian হিসেবে। ইলান পাপ্পে ছাড়াও এই গ্রুপে আছেন Benny Morris, আর Shlaim Ges Simha Flapan. এদের বাইরে আরও কিছু তরুণ ইহুদি লেখক-এর বিপক্ষে বই লিখছেন, ইতিহাস তুলে ধরছেন। ইভানজেলিকরা তাদের দেখেন এন্টি-জায়োনিস্ট হিসেবে।

ইলানপাপ্পের জন্ম ইজরাইলের হাইফায়। তিনি হাইফা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন শিক্ষকতা করেছেন। বর্তমানে যুক্তরাজ্যের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপক তিনি। ইলান Anti-Zionist হিসেবে পরিচিতি পেলেও তার পরিবারকে দেখা হয় Zionism-এর সফল বিজ্ঞাপন হিসেবে। তার বাবা একজন Zionist ছিলেন বলে অভিযোগ আছে; যদিও এই অভিযোগ পুরোপুরি মানেন না পাপ্পে। পাপ্পের বাবা-মা ছিলেন জার্মান। ৩০-এর দশকে নাজিবাদীরা ইহুদিদের ওপর চড়াও হলে তারা জার্মানি ছাড়েন।

আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট...

আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট ইতিহাসে এক বহুল আলোচিত নাম। পারস্যের কাছে তিনি পরিচিত ইস্কান্দার বাদশাহ হিসাবে আর ভারতবর্ষে ইস্কান্দারের অপভ্রংশ সেকান্দার বাদশাহ হিসেবেও বহুল পরিচিত তিনি। আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের জন্ম হয়েছিল প্রাচীন গ্রিসের মেসিডোনিয়াতে খ্রিষ্টপূর্ব ৩৫৬ অব্দে।

তার পিতা ছিলেন মেসিডোনিয়ার রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ আর তার মা ছিলেন উচ্চাভিলাষী রানি অলিম্পিয়া। দার্শনিক এরিস্টটল ছিলেন তার শিক্ষক। খ্রিষ্টপূর্ব ৩৩৬ অব্দে আলেকজান্ডার বসেন মেসিডোনিয়ার সিংহাসনে। সিংহাসন লাভের পর তিনি জয় করে নেন পারস্য, মিশর, ব্যবিলন ও ভারতের পাঞ্জাব। আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের মৃত্যু আজও এক বিরাট রহস্য। ব্যাবিলনে থাকা অবস্থায় নেবুচাদনেজারের প্রাসাদে অকস্মাৎ মৃত্যুবরণ করেন তিনি। ধারণা করা হয়– ম্যালেরিয়া অথবা বিষ প্রয়োগে তার মৃত্যু হয়। ৩২৩ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের ১০ বা ১১ জুন পরলকগমন করেন এই মহাবীর।

থিওডর হার্জেল

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ইউরোপে এক রাজ্য ছিল, ইংরেজিতে যাকে ডাকা হতো অস্ট্রো-হাঙ্গেরি নামে। এই রাজ্যে অস্ট্রিয়া অংশের ভাষা ছিল জার্মান। আর হাঙ্গেরি অংশের ভাষা ছিল হাঙ্গেরিয়ান। অস্ট্র-হাঙ্গেরি রাজ্যটির রাজধানী ছিল ভিয়েনা। এ সময় ভিয়েনা হয়ে উঠেছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। থিওডর হার্জেল (১৮৬০-১৯০৪) জন্মেছিলেন হাঙ্গেরিতে। তিনি পেশায় ছিলেন একজন সাংবাদিক। সাংবাদিকতা করতেন ভিয়েনাতে। হার্জেলকে বলা হয় আধুনিক জায়োনবাদের প্রতিষ্ঠাতা।

অ্যান্থনি ইডেন

কনজারভেটিভ পার্টির নেতা রবার্ট অ্যান্থনি ইডেন (১৮৯৭-১৯৭৭) ব্রিটেনের তিনবারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। তিনি ১৯৫৫ সালে প্রধানমন্ত্রী হন, আর ৫৭ সালে পদত্যাগ করেন। সুয়েজ যুদ্ধের পর স্বাস্থ্যগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করেন তিনি। তার নির্দেশেই বাধে ১৯৫৬ সালের প্রথম আরব-ইজরাইল যুদ্ধ বা সুয়েজ যুদ্ধ।

সুয়েজখাল

আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে প্রভাবিত করে যে সকল বিষয় বা জায়গা, তারই একটি হলো সুয়েজখাল। সুয়েজখালের প্রকৃত নাম 'হে সুয়েজ ক্যানেল'। কৃত্রিম এ সামুদ্রিক খালটি ভূমধ্যসাগরকে যুক্ত করেছে লোহিত সাগরের সঙ্গে। সুয়েজখালের নির্মাণকাজ শুরু হয় ১৮৫৯ সালের ২৫ এপ্রিল। ১৮৬৯ সালের নভেম্বরে এসে এর নির্মাণকাজ শেষ হয়। প্রথম অবস্থায় এটি ১৬৪ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং ৮ মিটার গভীর ছিল। পরে বিভিন্ন সময়ে কয়েক দফায় খননকাজ চালিয়ে এর পরিধি বৃদ্ধি করা হয়। বর্তমানে এর দৈর্ঘ্য ১৯৩ কিলোমিটারের কিছু বেশি, প্রস্থ ২০৫ মিটার এবং গভীরতা ২৪ মিটার। এই খাল তৈরির আগে কোনো জাহাজকে ইউরোপ থেকে দক্ষিণ এশিয়া আসতে হলে আফ্রিকা মহাদেশ ঘুরে আসতে হতো।

গোলান মালভূমি

সামরিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ গোলান মালভূমি প্রায় ৭০০ বর্গমাইলের এক এলাকা। সিরিয়ার মালিকানাধীন এই মালভূমির ৫০০ বর্গমাইল এলাকা ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে দখলে নেয় ইজরাইল। এরপর ১৯৮১ সালে এক আইন পাস করে জায়গাটি নিজেদের মূল ভূখণ্ডের সাথে যুক্ত করে ইজরাইল, যার আন্তর্জাতিক কোনো বৈধতা নেই। অধিকৃত গোলান এলাকায় ৫০ হাজারের মতো মানুষ বসবাস করে, যাদের প্রায় অর্ধেক দ্রোজ আর বাকিরা ইহুদি সেটেলার। গোলানের চূড়া থেকে দামেস্কের সামরিক তৎপরতা নজরদারি করে থাকে ইজরাইল।

ওয়াহাবিজম

আরব ভূখণ্ডে মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব নামে এক ব্যক্তি অষ্টাদশ শতকে এক ইসলামিক আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। পাশ্চাত্যে এই আন্দোলনই ওয়াবিজম বা ওহাবি মতবাদ নামে পরিচিতি পায়। তার আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল বিশুদ্ধ ও অনাড়ম্বর ইসলামি জীবনব্যবস্থায় ফিরে যাওয়া। এই মুভমেন্ট মুসলিম বিশ্বে আল্লাহর একত্ববাদ বা আল মহায়দিন আন্দোলন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। আব্দুল ওয়াহাব মনে করতেন পীর বা আউলিয়ার ধারণা ইসলাম ও মুসলিম উম্মার ক্ষতি করছে, শিরকে উৎসাহ জোগাচ্ছে। তিনি পবিত্র কুরআন শরিফ পড়া ও বোঝার ওপর গুরুত্ব দেন এবং সে মোতাবেক জীবন গড়ার পরামর্শ দেন। তার মতে, সুফিবাদ বা দরবেশবাদের প্রাধান্য দিয়ে তুর্কি সুলতানরা (অটোমান সুলতান/খলিফা) ইসলামের ক্ষতি করেছেন। সৌদি আরব বহু বছর আগে থেকেই ওয়াহাবি ধারায় পরিচালিত হয়ে আসছিল, তবে এটি শক্ত ভিত্তি পায় বাদশাহ খালিদের সময় ১৯৭৯ সালে একদল চরমপন্থি সালাফি কর্তৃক পবিত্র কাবা অবরোধের পর। যদিও যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের কঠোর মনোভাবের কারণে সৌদিতে ওয়াবিজম এখন কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে।

শেখ আহমেদ ইয়াসিন

শেখ আহমেদ ইয়াসিন ছিলেন মুসলিম ব্রাদারহুডের সদস্য, তিনি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ আন্দোলন হামাসের আধ্যাত্মিক নেতা ছিলেন; যারা এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেছিল তাদের একজন। ইয়াসিনের জন্ম হয় ফিলিস্তিনের আলজুরা এলাকায় ১৯৩৭ সালে। মাত্র তিন বছর বয়সে ইয়াসিনের বাবা মারা যায়, আর ১২ বছর বয়সে খেলতে গিয়ে বিকলাঙ্গ হয়ে যান তিনি; চোখেও খুব একটা দেখতে পান না। চলাফেরা করতেন হুইল চেয়ারে বসে। ১৯৪৮ সালের প্রথম আরব-ইজরাইল যুদ্ধে ইহুদি সেনারা আল জুরা গ্রামটি দখলে নিলে সপরিবারে গাজায় চলে আসেন ইয়াসিন। সেখানকার আল-শাতি ক্যাম্পে তারা আশ্রয় নেন। মিশরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় ব্রাদারহুডের চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসেন এই ফিলিস্তিনি ইসলামি নেতা। পরবর্তী সময়ে তাঁর উদ্যোগেই জন্ম হয় হামাসের।

প্যালেস্টাইন ইসলামিক জিহাদ

প্যালেস্টাইন ইসলামিক জিহাদ বা পিআইজি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮১ সালে ডক্টর ফাতি আব্দুল আজিজ শাকাকি ও শেখ আব্দুল আজিজ আওদার হাত ধরে। সহ প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে আরও আছেন– রামাদান আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ সালাহ ও বশির মুসাসহ আরও কয়েকজন। চিকিৎসক ফাতি ও ইসলামিক স্কলার আওদা-এরা দুজনই ব্রাদারহুডের সদস্য ছিলেন। তারা দুজন মিশরীয় ইসলামিক জিহাদের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, কিন্তু মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত আততায়ীদের হাতে নিহত হলে সংগঠনটিকে মিশর থেকে বহিষ্কার করা হয় এবং ফাতি ও আওদা গাজায় ফিরে প্যালেস্টাইন ইসলামিক জিহাদ প্রতিষ্ঠা করেন। ইজরাইলকে হটিয়ে একটি ইসলামিক ফিলিস্তিন গড়ে তোলাই সংগঠনটির উদ্দেশ্যে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও কানাডা এটিকে সন্ত্রাসী হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে। ১৯৮১ সালে সংগঠনটির একটি সামরিক শাখা খোলা হয়, যার নাম আল-কুদস ব্রিগেড। পশ্চিম তীরের হেবরন ও জেনিনে-এর শক্ত অবস্থান রয়েছে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হামাসের সাথে তাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মিল রয়েছে।

হিজবুল্লাহ

হিজবুল্লাহ আরবি শব্দ, যার অর্থ আল্লাহর দল। দাপ্তরিক ঘোষণা অনুযায়ী এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৫ সালে; যদিও ১৯৮২ সালে প্রথম ইজরাইল-লেবানন যুদ্ধের প্রাক্কালেই এর জন্ম। শেখ রাগিবের সমর্থকদের নিয়ে গড়ে উঠা শিয়াপন্থি ইহুদিবিরোধী একটি সশস্ত্র সংগঠন হিজবুল্লাহ, যাদের অভিজ্ঞতা আছে ইজরাইলি আর্মির বিরুদ্ধে দুর্ধর্ষ প্রতিরোধ গড়ে তোলার। সংগঠনটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ইরান ও সিরিয়া। এদের আবার লেবাননের জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব আছে। তাদের দুই-একজন মন্ত্রিসভাতেও আছেন।

যুক্তরাষ্ট্র, নেদারল্যান্ডস ফ্রান্স, বাহরাইন, কানাডা এবং অবশ্যই ইজরাইলের কালো তালিকাভুক্ত এটি। বর্তমানে এর মহাসচিব (তৃতীয়) হচ্ছেন হাসান নাসরুল্লাহ। তাকেই শীর্ষনেতা হিসেবে ধরা হয়। হিজবুল্লাহর প্রথম মহাসচিব ছিলেন সুভি আল তুফাইলি।

আইজাক রবিন

আইজাক রবিন (১৯২২ -১৯৯৫) পঞ্চম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দুই মেয়াদে ইজরাইলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ইজরাইলে (মূলত প্যালেস্টাইনে) প্রথম জন্মগ্রহণকারী প্রধানমন্ত্রী তিনি। আলোচনায় থেকেছেন ইজরাইল-ফিলিস্তিন শান্তি প্রক্রিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে। ১৯৯৫ সালের নভেম্বরে কট্টর ইহুদি সন্ত্রাসী ও ইজরাইল-ফিলিস্তিন শান্তি প্রস্তাবের বিরোধী ইগাল আমির রবিনকে খুন করেন। জেরুজালেমের একটি মেডিকেল সেন্টারে জন্ম হয়েছিল রবিনের; তার বাবা-মা ইউরোপ থেকে (ইউক্রেন) প্যালেস্টাইনে অভিবাসিত হয়েছিলেন। কৃষিতে পড়াশোনা করলেও ১৯৩৮ সালে আরব উত্থানে সামরিক বিষয়ে তার আগ্রহ জন্মে। কিশোর বয়সেই পালমাখে যোগ দেন রবিন। ১৯৪৮-এ নবগঠিত ইজরাইল প্রতিরক্ষা বাহিনীতে (আইডিএফ) যোগ দেওয়া রবিন ১৯৫৯ থেকে ১৯৬৩ মেয়াদে আইডিএফের পরিচালক ছিলেন। ১৯৬৪ সালে চিফ অব জেনারেল স্টাফ হিসেবে মনোনীত হন ও ১৯৬৭ সালে ছয় দিনের আরব-ইজরাইল যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়ে বিজয় ছিনিয়ে আনেন। গোল্ডা মেয়ারের পদত্যাগের পর ১৯৭৪ সালে ইজরাইলের প্রধানমন্ত্রী হন রবিন।

মেনাখেম বেগিন

ইউরোপের পোল্যান্ডে জন্ম নেওয়া মেনাখেম বেগিন (১৯১৩ -১৯৯২) ইজরাইলের ষষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি কট্টর ইজরাইলি রাজনৈতিক দল লিকুদ পার্টির প্রতিষ্ঠাতা। ইজরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগে সশস্ত্র ইহুদি সংগঠন ইরগুনের নেতৃত্ব দেন বেগিন। ইরগুনের প্রধান হিসেবে তিনি ফিলিস্তিনের বিষয়ে ব্রিটিশদের নজর কাড়েন এবং ১৯৪৭-৪৮ সালে আরবদের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনকে ঘিরে গৃহযুদ্ধে অংশ নেন। ১৯৪২ সালে ইরগুনে যোগ দিয়েছিলেন বেগিন। ১৫ মে, ১৯৪৮ সালে রেডিওতে এক বেতার ভাষণে ইরগুনের গুপ্ত অবস্থান থেকে প্রকাশ্যে চলে আসার ঘোষণা দেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ১৯৭৯ সালে মিশরের সাথে শান্তি-চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এর ফলে মিশরের নেতা আনোয়ার সাদাতের সাথে যৌথভাবে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান। তিনি ইজরাইলের শত্রু বলে পরিচিত আরব রাষ্ট্রগুলোকে পরমাণু শক্তিসম্পন্ন হওয়ার বিরোধী ছিলেন এবং শক্তি প্রয়োগ করে তাদের পরমাণু কার্যক্রম শেষ করে দেওয়ার নির্দেশ দেন, যা বেগিন থিউরি নামে পরিচিতি পায়।

গোল্ডা মেয়ার

বর্তমান ইউক্রেনের কিয়েভে জন্ম নেওয়া গোল্ডা মেয়ার (১৮৯৮ -১৯৭৮) এক প্রথিতযশা ইজরাইলি রাজনীতিক। ইজরাইলের চতুর্থ প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করা মেয়ার একই সঙ্গে বিশ্বের চতুর্থ মহিলা প্রধানমন্ত্রীও। ১৯৬৯ তারিখে লেভি এসকলের আকস্মিক মৃত্যুতে একই বছরের ১৭ মার্চ ইজরাইলের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন তিনি। ইজরাইলের রাজনীতিতে 'আয়রন লেডি' নামে তাকে ডাকা হতো। ১৯৭৩ সালে ইয়োম কিপ্পুর যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ১৯৭৪ সালে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেন মেয়ার। জুনের দিকে তার স্থলাভিষিক্ত হন আইজাক রবিন।

জিমি কার্টার

জিমি কার্টার একজন আমেরিকান রাজনীতিবিদ, লেখক এবং ডেমোক্রেটিক পার্টির সদস্য, যিনি ১৯৭৭ থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩৯তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তার মধ্যস্থতায় ১৯৭৮ সালে মিশর ও ইজরাইলের মধ্যে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি সই হয়। ২০০২ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন কার্টার। প্রথম জীবনে জিমি কার্টার ছিলেন একজন চীনাবাদাম বিক্রেতা। তিনি তার বাড়িতে চিনাবাদামের চাষ করতেন। পরবর্তী জীবনে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হন।

খেইম ওয়াইজম্যান

খেইম ওয়াইজম্যান ছিলেন একজন রুশ ইহুদি কেমিস্ট। কিন্তু তিনি বিশ্বযুদ্ধ বাধার আগে দিয়ে ইংল্যান্ডে আসেন এবং হতে পারেন ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কেমিস্ট্রির অধ্যাপক। তিনি জানতেন, সস্তায় যথেষ্ট পরিমাণে এসিটন উৎপাদন করার একটি গোপন কৌশল। ফিলিস্তিনে ইজরাইল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ওয়াইজম্যান হন তার প্রথম প্রেসিডেন্ট।

তালমুদ

ইহুদিদের অন্যতম পবিত্র ধর্মগ্রন্থ 'তালমুদ'। এটি তোরাহ বা তাওরাত/তৌরিত থেকে আলাদা। এটি কেবল ইহুদিদের দ্বারা মৌখিক আইন হিসেবে পরিচিত। তালমুদ লেখা শুরু হয় যখন ইহুদিদের সেকেন্ড টেম্পল বা জিহোভার মন্দির ধ্বংস হয়ে যায়। কারণ, তারা ধারণা করেছিল– এটা না করলে ইহুদি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে।

দ্য কিংডম অব আউটসাইডারস
'দ্য কিংডম অব আউটসাইডারস' যেসব প্রশ্নের জবাব দেবে–
০১. হিটলারের ইহুদি বিদ্বেষের কারণ কী?
০২. রথসচাইল্ড পরিবার কীভাবে রাজনীতি ও অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করত?
০৩. কীভাবে সুদি কারবার, পুঁজিবাজার ও ব্যাংক প্রতিষ্ঠা পেল?
০৪. ইজরাইল কীভাবে মিশর, লিবিয়া, সিরিয়া ও ইরানের পরমাণু বোমা তৈরির প্রজেক্ট ভণ্ডুল করে দিলো?
০৫. কীভাবে ব্রিটেনকে ডিঙিয়ে আমেরিকা মধ্যপ্রাচ্যের নিয়ন্ত্রণ নিল?
০৬. ক্রুসেডের নেপথ্যে আসলে কী ছিল?
০৭. মোসাদ কীভাবে আরব গুপ্তচর নিয়োগ দেয়?
০৮. হোয়াইট হাউজে ইহুদি লবি কীভাবে কাজ করে?
০৯. মোসাদের খালিদ মিশাল হত্যাচেষ্টার মিশন কেন ব্যর্থ হয়েছিল?
১০. ইয়াসির আরাফাতের কি স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে?
১১. আল আকসা মসজিদ ও বায়তুল মুকাদ্দাস কি একই কাঠামো?
১২. ইহুদি ম্যাকানিজম কীভাবে মধ্যপ্রাচ্যের মানচিত্রকে পালটে দিলো?
গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস
www.guardianpubs.com
9 789848 254707